আমার দুঃখের কণামাত্র রেখাও পৃথিবীর বুকে কোথাও পড়ল না। সূর্য উঠল, অস্ত গেল। শুধু আমার জগৎ গেল পালটে। মানুষ নিজের মন দিয়েই জগৎকে দেখে। আমার সংসার, আমার স্বামী, ভাশুর, দেশ, সমাজ, পরিচিত বন্ধুবান্ধব, মানুষজন সব বিসর্জন দিয়ে বিধবা মা, আইবুড়ো বোন, তারপর আমি বিধবা হয়ে ফিরে এলাম ভাই-ভাজের সংসারে।

আমার সেই বিবাহ-পূর্ব জীবনের বাপের বাড়ির সহজ জীবনযাত্রা আর নেই। সেটাই স্বাভাবিক। আমিও তো আর আগের আমি নেই। সবই কালের গতিতে পরিবর্তিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু হৃদয়ের টান দুঃখের দিনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এক-একবার প্রকাশ হয় মাত্র। তখন আবার আমরা পরস্পর নিকট হই। অনেক সময় দেখা যায়, দৈনন্দিন জীবনের স্বার্থের সংঘাত নিকট-সম্পর্কের মানুষকেও দূরে সরিয়ে নেয়।

বড়ঠাকুর মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরে আমার স্বামী ভাটপাড়ায় এসেছিলেন। বড়ঠাকুরের পারলৌকিক কাজের জন্য পুরোহিত ইত্যাদি ঠিক করে ও ছোটমামার সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় যান এবং সেখানে বড়ঠাকুরের সাহিত্যিক বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ঘাটশিলায় ফিরে যান। সুস্থ মানুষ কলকাতা গিয়েছিলেন, ফিরলেন ভাঙা মন নিয়ে। তারপর কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল, কিছু বোঝার আগেই সব শেষ।

কে যেন ভাটপাড়ায় তার করেছিলেন। যে মানুষটি ক'দিন আগে ভাটপাড়া থেকে ঘুরে গেলেন, হঠাৎ তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমার দাদা ও মেজ জামাইবাবু ঘাটশিলা যান। ওঁরা গিয়ে আমার স্বামীকে দেখতে পাননি।

আমার স্বামী চলে যাওয়ার পর কয়েকটা দিন কীভাবে আমার কেটেছিল একটুও মনে নেই। কারও কথাই মনে নেই। কে এসেছিলেন, কী হয়েছিল আমি জানি না। শুধু একটি ঘটনা মনে পড়ে। পরদিন ভোরে দিদি (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল বাঁধে। ওখানে কপালের সিঁদুর মুছে. শাঁখা ভেঙে স্নান করে বাড়ি এসেছিলাম। বাঁধের ওপারের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। নিজের সর্বহারা অবস্থা যেন অনুভূতিতে আসছিল না। তারপর কত রাত এসেছে, কত দিন কেটেছে, আমি শুধু কেঁদেছি আর কেঁদেছি।

আমাকে দাদারা ভাটপাড়ায় নিয়ে আসবে, আমি আসতে চাইনি। মনে হচ্ছিল আমি চলে যাব, উনি এখানে একলা থাকবেন? কিন্তু রূঢ় বাস্তব অন্যপথে চলে। একলা আমাকে দাদারা কোথায় রেখে আসবে? তাই আসতে হল। দিদির বাবা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন ওখানে ছিলেন। উনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার স্বামীর অস্থি উনিই এনে ব্যারাকপুরের গঙ্গায় দিয়েছিলেন। দিদির ভাইরা— খোকা, বাবু আমার নিজের ভায়ের মতো। ওদের সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক।

আমার ঘাটশিলা থেকে চিরদিনের মতো চলে আসার দিন সকালবেলা দিদির বাবা আমাকে বললেন, 'যমুনা, তোমার কাছে বাড়ির দলিলপত্র যা সব আছে, আমাকে দিয়ে দাও।' শুনে প্রথমটা আমি চমকে উঠেছিলাম। তারপর দেশের বাড়ির দলিল, ঘাটশিলার বাড়ির দলিল, যা ছিল একে একে সবার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওঁর হাতে তুলে দিলাম। তখন বুকের মধ্যে একটা অকথিত যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল, সত্যিই আজ আমার কেউ নেই, কিছু নেই। ছায়াছবির মতো ওঁর করুণ মুখখানা মনের পটে ভেসে উঠল।

মনে পড়েছিল, আমি ঘাটশিলায় আসার পর, একবার বড়ঠাকুর কলকাতা থেকে এসেছেন, দুই ভাই বারান্দায় বসে কথা বলছেন, আমি বড়ঠাকুরকে খাবার করে দিয়েছি, খেয়ে মুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে আমার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে তামাক খেতে খেতে বললেন, 'বৌমা, আমার লেখার সুটকেসটা নিয়ে এসো তো।'

নিয়ে এসে ওঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখলাম। বড়ঠাকুর সুটকেস খুলে তার মধ্যে থেকে ব্যারাকপুরের বাড়ি ও ঘাটশিলার বাড়ির দলিলদুটো, লাল খেরোর মলাটের একটি খাতা দিলেন, যাতে আমার শ্বশুরমশায়ের নিজের হাতের লেখা,

বড়ঠাকুরের, আমার স্বামীর ও ওঁদের সব ভাই-বোনের জন্মসময়, বড়ঠাকুরের পৈতে, ভাত এবং বংশ-পরিচয় দিয়ে কবিতা— আরও কত কী লেখা ছিল। আর দিয়েছিলেন আমার বড় শাশুড়ি হেমাঙ্গিনী দেবীকে লেখা আমার শ্বশুরমশাইয়ের একটি পোস্টকার্ড। তখন আমার শাশুড়ির বিয়ে হয়নি। উনি কাশী থেকে ফিরছেন, তারই সংবাদ দেওয়া ছিল। আর আমার বিয়ের কার্ড— বড়ঠাকুরের নামে ছাপানো। ওইগুলি সব একটি একটি করে বার করে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'এগুলো ভালো করে বাক্সে তুলে রাখো।'

সেইদিন থেকে এগুলি আমার কাছেই ছিল। আমার স্বামীও সেগুলি কখনো খুলে দেখেননি। ইতিমধ্যে বড়ঠাকুর দিদিকে বিয়ে করেছেন, দেশের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেছেন, বাবলু হয়েছে। কিন্তু কখনো এগুলি আমার কাছ থেকে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজ সেগুলি অপরের হাতে তুলে দিতে গিয়ে মনে হল, জীবনের সবই বদলে যাচ্ছে। তখন ঈশ্বরের কথা মনে এল না। শুধু ওঁদের দুই ভায়ের ওপর অভিমানে চোখে জল এল। মনে হল ওঁরা দু'ভাই অদৃশ্যভাবে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি আমার অগ্নিপরীক্ষা দেখছেন?

মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেদিন প্রথম ঘাটশিলার বাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলেছিলাম। সেদিন আমার স্বামী বলেছিলেন, 'বহুকাল পরে আমার মার সংসারে তুমি বধূরূপে এসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বাললে।' তারপর আমার স্বামী, আমার সাজানো সংসারকে পিছনে ফেলে, একাকী জীবনের বন্ধুর পথে পা বাড়ালাম। দাদা ও জামাইবাবুর সঙ্গে রিক্ত, নিঃস্ব, শূন্য হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম মার কাছে। চিৎকার করে কেঁদে নিজের ব্যর্থতার ব্যথাকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারিনি, শুধু চোখের জলে সিক্ত হয়েছে বুকের বসন।

কোনোদিনই আমি নিজের কথা বেশি বলতে পারি না। উনি বলতেন, 'তুমি নিজেকে প্রকাশ করো না। আমি প্রকাশ বড় ভালোবাসি। আজীবন তুমি কিছু বললে না।' তাই বোধহয় উনি শেষটায় আমার ওপর প্রতিশোধ নিলেন। নিজের মৃত্যুর ইচ্ছা আমাকে গোপন করে চলে গেলেন।

মনে আছে মা, দিদিরা, বোনেরা কাঁদছে। সবার চোখে জল। তখন আমার বড়দি ভাটপাড়ায় ছিলেন। বিকেলে ও-বাড়ি থেকে মা, ছোট মামিশাশুড়ি ও মাসিমা এলেন। কেমন যেন ভাব, সবাই আছে অথচ সব বদলে গেল? উনি নেই, কিছুতেই মনে আসছে না, কথা বলতে ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে কোনো অন্ধকারে মুখ গুঁজে শুধু কাঁদি আর কাঁদি। সবাই আসছে, চুপ করে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে। এদের কাউকে আমার ভালো লাগছে না, আপন মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এ আমি

কোথায় এলাম! ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না, ওঁর কথা শুনছি না, এখানে ওঁর কিছুই নেই। এখানকার উনি জামাই। ওঁর বাড়ি, ওঁর পরিচিত মানুষ ও আপন লোক— ওঁর চলাফেরার জায়গা হচ্ছে ঘাটশিলা। মনে হচ্ছে ছুটে চলে যাই, সেখানে গেলে আমি ওঁকে পাব, অপেক্ষা করে থাকব ওঁর আসার সময়। ওখানেই হয়তো আমি নিজেকে খুঁজে পাব—ঘাটশিলার আকাশে বাতাসে, ওখানকার মানুষজনের মধ্যে। সকলেই আমাকে বলবে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। এখানে আমি অপরিচিত, এখানে আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। এতদিন যে আমি সংসার করেছি, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেখানে আমার নিজের একটা স্বাধীন সত্তা ছিল, সবকিছুর স্বাধীনতা ছিল, অধিকার ছিল; আমি সবার সম্মান পেয়েছি, ভালোবাসা পেয়েছি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, বিভূতিবাবুর ভায়ের স্ত্রী বলে সবাই ভালোবেসেছে। এখানে আমার পরিচয় বিধবা বোন অথবা বিধবা মাসি, পিসি। টাটকা টাটকা মুখে কেউ না বললেও পরে বলবে 'আশ্রিত' অথবা ঘুরিয়ে বলবে— 'আছেন'। এক ফুৎকারে ভোজবাজির মতো আমি হয়ে পড়লাম অপরের 'আশ্রিত', 'গলগ্রহ'।

ওঁর মৃত্যুর পর কদিন খাইনি। প্রথম মার কাছে এসে, মার রান্নাঘরে খেতে বসেছি, মা আমার সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেলেন। আমি দেখলাম, মার নিরামিষ ঘরে, পিতলের সরাতে, মার যাতে করে রান্না হয়, আমার ভাত আজ এখানে রান্না হয়েছে। ভাতের থালা কোলের কাছে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। মা ঘুরে এসে বলেছিলেন, 'একটু মুখে দাও, যা হারিয়েছ তা আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। সেই শান্তি— সেই স্বাচ্ছন্দ্য— জীবনের মতো হারিয়ে ফেলেছ। শক্ত হও।'

কতদিন কারওর সঙ্গে কথা বলিনি। বোনেরা আসে, পাড়া-প্রতিবেশীরা আত্মীয়স্বজন সবাই দেখা করতে আসে। আমি চুপ করে দেখি, কার আগমন প্রতীক্ষায় আমার চোখ, মন, আমার সমগ্র সত্তা উন্মুখ হয়ে থাকে। আমি বাতাসে যেন ওঁর গায়ের গন্ধ পাই, সিগারেটের গন্ধ নাকে এলেই মনে হয় উনি সিগারেট খাচ্ছেন, ওষুধের গন্ধে ওঁর উপস্থিতি অনুভব করি। পিওন এলে মনে হয় ওঁর চিঠি আসবে। মোটর সাইকেলের শব্দে চমকে উঠি।

সবাই বলছে, ঠাকুরকে ডাকো। আমার মেজ জামাইবাবু রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত, আমাকে বললেন, 'যমুনা, তোর যে ঠাকুরকে ভালো লাগে তাঁর নাম জপ কর, মনকে অন্যদিকে যেতে দিস না।' কয়েকদিন পরে ঠাকুরঘরে গেলাম। ঠাকুরের ওপর আমার দুর্জয় অভিমান ও রাগ। কেন তিনি ওঁর বুদ্ধিকে ভুলপথে চালিত করলেন? কেন

আমাকে কাঁদালেন? কী করেছি আমি? কোন পাপে, কোন কর্মফলে আমার এই নিদারুণ শাস্তি? মনে মনে ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করি। উনি তো কোনো দোষ করেননি, তবে কেন ওঁকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল? কেন ঈশ্বর ওঁকে এমন দুর্বল করে দিলেন! কেন বুদ্ধিকে ঠিকপথে চালিত করলেন না! অনেকে বলছে, আত্মহত্যা পাপ। জানি না কী শাস্তি এর জন্য ওঁকে পেতে হবে। ভাবলে বুকটা টনটন করে ওঠে। না জানি উনি কত কষ্ট পাচ্ছেন। ক্ষণিকের খেয়ালে উনি এ কাজ করেছেন। জীবনের প্রতি ভালোবাসা ওঁর একটুও কম ছিল না। জীবনকে ভোগ করতে চাইতেন। সবাইকে ভালোবেসে একসঙ্গে আনন্দ করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কোথা থেকে এ ঝড় এল? বড়ঠাকুরেরও যাওয়ার বয়স হয়নি, মাত্র ছাপ্পান্ন বছর কিছুই নয়, আরও অন্তত কুড়ি বছর বাঁচতে পারতেন। তিনি তো বড়ঠাকুরের চেয়ে এগারো বছরের ছোট ছিলেন। বড়ঠাকুর থাকলে উনিও থাকতেন। কার এই অভিশাপ? দু'ভাই মাত্র আটদিনের ব্যবধানে চলে গেলেন। ঠাকুরের কাছে কাঁদছি, কিন্তু সান্ত্বনা পাচ্ছি না।

উলবোনা শুরু করলাম। প্রতিটি ঘর বোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে জপ করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বুকের ব্যথা কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার অজান্তে মন কখন ওঁর কাছে চলে যায়। ওঁর অদর্শন কিছুতেই পূরণ হচ্ছে না। ভুলতে পারছি না। আজও পারিনি। আজও প্রায় সমান যন্ত্রণাই আমি অনুভব করি। একটু চুপ করে বসলেই ওঁর মুখ আমার বুকের মাঝে ঈশ্বরের আগে ভেসে ওঠে। সুদীর্ঘ দিন জপ করছি, আমি জানি একটুও এগোইনি। এ যেন নোঙর ফেলে দাঁড়টানার মতো আমার অবস্থা। নৌকা একচুলও নড়ছে না। ঈশ্বরের চরণে যে ভালোবাসা দেওয়ার কথা তা দিতে পারছি না। আমার বন্ধু মায়া বলে, 'আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অমৃতটুকু আমরা অপাত্রে দিই, যা ঈশ্বরকে দেওয়ার কথা তা অন্যত্র দিই বলে অমৃতত্ব লাভ করতে পারি না।' ওঁর প্রতি আমার ভালোবাসা তো স্বতোৎসারিত, তা কি ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে? না অন্যদিকে পরিবর্তিত হবে? কে জানে, আমার তো হচ্ছে না। এতদিন ধরে জপ করছি, কিন্তু কই পারলাম ওঁকে ভুলে যেতে? অবশ্য অধ্যাত্মজগতের পথিকরা বলবেন, এটা বদ্ধজীবের লক্ষণ। জীবন ক্ষণস্থায়ী এটা জেনেও যে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত না হয়, সে বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিছুদিন পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ওঁর জন্য প্রার্থনা করতাম। আমার স্বামীর আত্মার মঙ্গল করো। ওঁর ঊর্ধ্বগতি হোক, শান্তি লাভ করুন। বড় অশান্ত মন নিয়ে উনি চলে গেছেন। যেখানেই থাকুন, হে ঈশ্বর, তোমাকে যেন না ভোলেন। আর একটা প্রার্থনা মনের মধ্যে ধ্বনিত হত। আমার বুদ্ধিনাশ যেন না হয়, যেন নিজের ভার

নিজে বহন করতে পারি। আমার স্বামী ও ভাশুরের মর্যাদা যেন রক্ষা করতে পারি। আমার জন্যে উনি হয়তো বাড়ি ঘর অর্থ ঐশ্বর্য কিছুই রেখে যাওয়ার সময় পাননি, কিন্তু আমাকে যে ভালোবাসা দিয়ে গেছেন তাতেই আমি ধনী। অহর্নিশি এই গুঞ্জন মনের মধ্যে চলত।

২

মামাশ্বশুর বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন। ওখানে গিয়ে মনে হত আমার স্বামীর মামার বাড়ি; ওঁরই ভাই বোন, ওঁর কথা হয়, বড়ঠাকুরের কথা হয়। ওখানে গেলে যেন স্বামীর অস্তিত্ব অনুভব করি। মনে হয় এখানেই প্রথম ওঁর সঙ্গে বিয়ে হয়ে এসেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ি। এই অনুভবের জন্য আমার ও-বাড়ির সবকিছু ভালো লাগত। আজও ভালো লাগে। মা-মাসিমা-মামার অপার স্নেহ পেয়েছি, পেয়েছি দেওর-ননদের অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। ছোট যারা— প্রীতি, রাণু, চন্দনা ওদের সহৃদয় ব্যবহার ও ভালোবাসা আজও আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। আমার শ্বশুরবাড়ির ভাগ্য ভালো। উনি বলতেন, 'তুমি ভাটপাড়ায় মামার বাড়িতে খুব আনন্দে থাকো।'

এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে দিন কাটতে লাগল। দিদির (বড় জা) কাছে যেতাম। প্রথম দিকে দিদিকে বলেছিলাম, 'দিদি, তুমি আর আমি বাবলুকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকি।' কিন্তু দিদি বাবলুকে নিয়ে ওইভাবে থাকতে সাহস করেনি। বাবলুকে বড় করে তুলতে হবে, মানুষ করতে হবে— এটাই তখন আমাদের কাছে বড় কথা ছিল। যাই হোক, আমাদের এক জায়গায় থাকা সম্ভব হয়নি। দিদি রইল বাবার কাছে, আমি রইলাম ভাটপাড়ায়।

আমি ঘাটশিলা থেকে চলে আসার কয়েকদিন পরে দিদিরা বাড়ির সব ব্যবস্থা করে দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় অর্থাৎ দ্বিজেনদার কাছে বাড়ির চাবি দিয়ে আসেন। তখন দিদিরা ব্যারাকপুরে ভূতনাথ কুটিরে থাকতেন। ওই বাড়িতে বড়ঠাকুর বহুবার এসেছেন। থেকেছেন। ওই বাড়িতেই বাবলু হয়েছে। কিছুদিন পরে আমার মেজদা ও নিতাইদা দিদিকে জানিয়ে ঘাটশিলায় গিয়ে দ্বিজেনদার সঙ্গে দেখা করেন। এবং তখন আমার স্বামীর ডিসপেনসারি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি বিক্রি করে কাজ সেরে চলে আসেন। তারই সঙ্গে শেষ হয় আমার ঘাটশিলার সঙ্গে সম্পর্ক। কিন্তু বাইরে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও মনে তার নিত্য আনাগোনা। ভুলতে পাবি না ঘাটশিলাকে, ভুলতে পারি না সেই আমাদের ছোট্ট খোলার বাড়িটিকে, যার মধ্যে লেখা আছে

আমাদের জীবনের বহু দিন-রাত্রের ইতিকথা। ভুলতে পারি না ওঁর কর্মক্ষেত্র, ওঁর শেষবিদায়ের স্থানটিকে।

বহতা নদীর মতো সময় বয়ে চলেছে পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে পাক খেতে খেতে। মনে আছে সদ্য ঘাটশিলা থেকে আসার পর একদিন উমা-শচীন এল দেখা করতে। ওরা কাগজে সংবাদ পেয়ে ওয়ালটেয়ার থেকে এসেছে। প্রথমে ঘাটশিলায় গিয়েছিল, বাড়িতে তালা ঝুলছে দেখে ব্যারাকপুরে দিদির সঙ্গে দেখা করে আমার কাছে এসেছে। ওদের দেখে মনে হয়েছিল ওরা কাছে থাকলে হয়তো ওদের ছোটমামা এমনি করে চলে যেতেন না। আজ ওদের মামারা নেই, কতদূর থেকে এসেছে, থাকলে আজ কত আনন্দের দিন। মা, দাদারা, বৌদি ওদের যথাসাধ্য যত্ন করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এটা তো ঘাটশিলায় আমার বাড়ি নয়, ঈশ্বর আমাকে কোন পাপে এই শাস্তি দিলেন। এক ঝড়ে আমার জীবন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে গেল! স্বামী, সংসার, দেশ, পরিচিত মানুষ সবার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বড়ঠাকুরও যদি থাকতেন, তাহলে আমাকে এভাবে বাপের বাড়ি হয়তো আসতে হত না। এ যেন আমার নির্বাসন অথবা জন্মান্তর ঘটল, কিন্তু রইল শুধু অজস্র স্মৃতির ছায়া যা চিরদিন আমাকে কাঁদাচ্ছে।

এইভাবে দিন কাটছে। কিন্তু ভালো লাগছে না। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। কী যেন করছি না। মনে হত উনি যা ভালোবাসতেন, আমি তাই করব। পড়াশুনো খুব ভালোবাসতেন, তাই করব। কিন্তু আরম্ভ করতে পারছি না। সংকোচ হচ্ছে। ইংরেজি জানি না, অঙ্ক কষতে হবে। এই চিন্তার তরঙ্গ মনের মধ্যে উঠছে। মনে পড়ছে, পড়া আরম্ভ করার আগে অনেক ভেবেছি, কিছু ঠিক করতে পারছি না। ক'দিন ধরেই এই ভাবনা চলছে। একবার মনে হল, বড়ঠাকুর যদি বলতেন কী করব তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম।

সে সময় আমি মামাশ্বশুরবাড়িতে আছি। বেশ মনে আছে, ওপরের বড়ঘরে তখন দু-দিকে দুটো খাট ছিল। একটাতে মা শুতেন আর একটাতে পুতু। আর মেঝেয় বিছানা করে, আমি, খুকু, আরতি ও গীতা শুতাম। সেদিন রাত্রে শোয়ার সময় মনে হল বড়ঠাকুর যদি আমার পথ নির্দেশ করে দিতেন বড় ভালো হত। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখলাম কি প্রত্যক্ষ করলাম জানি না, মনে হল বড়ঠাকুর এসে বললেন, 'বৌমা, যা ভাবছ তাই করো।' আর কিছু বললেন না। মুখটা যেন বিষণ্ণ নিরানন্দময়। উনি আমার মাথার কাছের সিংদরজা দিয়ে বেরিয়ে রান্নাঘরের ছাদ

দিয়ে চলে গেলেন। আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। বুকের মধ্যে কেমন করছে। চোখে জল এসে গেছে। দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।

এ-পাড়ারই একটি মেয়ে গীতা ঘোষ প্রায়ই আমাকে বলত, 'বৌদি, পড়াশুনো শুরু করুন। আমি তো বয়সেই পড়াশুনো আরম্ভ করেছি।' সেবার ও অনার্স পরীক্ষা দেবে। ও একদিন এসে বললে, 'বৌদি, আজ দুপুরবেলা আমাদের বাড়ি যাবেন, পড়াব।' বই আগেই জোগাড় ছিল, সেদিন দুপুরে গিয়ে পড়া আরম্ভ করলাম। গীতার কাছে আমি চিরঋণী। ও জোর করেছিল বলেই আমি জোর পেয়েছিলাম।

বাপের বাড়ি এসে মাকে বললাম, 'মা, আমি পড়ব। একজন মাস্টারমশাই ঠিক করে দাও।' মা আমাকে প্রাণকেষ্ট মাস্টারমশায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মাস্টারমশাই আমার দাদার বন্ধু। এ ছাড়া, আমার ননদরা, বোনঝিরা সবাই ওঁর কাছে পড়েছে। মাস্টারমশাই বললেন, 'তুমি আমার স্ত্রীর কাছে দুপুরবেলা এসে পড়বে, অঙ্ক করবে। আমিও দেখব। এবং এবছরই পরীক্ষায় বসবে।'

তখন স্কুল ফাইনালের মাত্র কয়েক মাস দেরি। আমি বলেছিলাম 'এই ক'দিনে কী করে হবে!' উনি বলেছিলেন, 'হবে না জেনেই পরীক্ষা দেবে। এবছর বসবে সাহস করার জন্যে, পরের বছর ঠিক হবে।'

মার কাছে থেকে পড়া শুরু করলাম। সরু কালো-পাড় মিলের শাড়ি, মাথায় ছ-টাকা দামের ছাতা, পায়ে অল্প-দামি চটি দিয়ে রোজ দুপুরে কাকিমার কাছে গিয়ে পড়া শুরু করলাম। মাইনের টাকা কারও কাছে নিতে ইচ্ছা করছে না। আমার নিজের কিছু গহনা বিক্রি করে টাকাটা ধার দিলাম, সুদও আট টাকা পেলাম। টাকাটা ধার নিয়েছিলেন আমাদের পাড়ারই এক বৌদি, জগন্নাথ রায়ের স্ত্রী। এ ছাড়া, ঠোঙা গড়তাম, শেতলদির ছেলে গঙ্গা দোকানে দিয়ে আসত। মার সঙ্গে নিরামিষ খাই, বাগানে কচু-ঘেচু-কলা এসবের অভাব নেই, যেদিন যা জোটে তাই খাই।

মনে পড়ছে বড়কাকিমাকে (পাড়ার)। রোজ সন্ধ্যাবেলায় মার কাছে আসতেন আর অনেক রাত পর্যন্ত মার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প করতেন। আমি পাশের ঘরে পড়তাম। ওই কাকিমা মাঝেমাঝে ডেকে বলতেন, 'যমুনা, পড়ছিস তো?' পড়তে পড়তে কত কথাই মনে পড়ত, মন চলে যেত ঘাটশিলায় ওঁর আশেপাশে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত, সংবিৎ আসত কাকিমার ডাকে। তখন চোখ মুছে তাড়াতাড়ি করে পড়তে শুরু করতাম।

এমনি করে পড়া এগোচ্ছে। মাঝেমাঝে মনে হয়, সত্যিই কি আগের আমি আর এখনকার আমি এক? আমার একই দেহে নবজন্ম হল? তাই যদি হল তবে কেন আগের সবকিছু ভুলে যাচ্ছি না, কেন বারেবারে ওঁর মুখ, ওঁর হাসি, কথা, গান,

গল্প, বকুনি, ভালোবাসা মনে পড়ে মনকে উতলা করে তুলছে? কেন ভুলিয়ে দিচ্ছে আমার সব কাজ? সব চিন্তার মাঝে কেন আমার অলক্ষ্যে ওঁর চিন্তা এসে নিজের আসন করে নিচ্ছে?

ওঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ণ হলে গয়ায় 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে' গিয়ে কাজ করেছিলাম। সঙ্গে গিয়েছিলেন মা, আমার বড়মামা সন্তোষ ব্যানার্জি আর ছোট বোন নীলিমা। ওখানে গিয়ে বিধিমতো নিষ্ঠার সঙ্গে ফল্গু নদীর নীচে কুশপুত্তলিকা দাহ করে এগারো দিন অশৌচ পালন করেছিলাম। মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। কাজ শেষ করে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে তাঁদের হাতে গীতা, সোনা ইত্যাদি দান করে আমার ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলাম। গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিয়ে ওঁর শান্তি কামনা করেছিলাম। ওখানকার মহারাজ সমস্ত সুষ্ঠুভাবে করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ওঁদের দয়ায় এবং সহানুভূতির জন্য আমি আমার স্বামীর কাজ করতে পেরেছিলাম। ওখানকার প্রেসিডেন্ট মহারাজের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাঁর চরণে আমার অশেষ প্রণাম। সমস্ত কাজ সেরে একুশ দিন পরে ভাটপাড়ায় ফিরি।

এসে দেখি বড়দি ও বড়জামাইবাবু ঝরিয়া থেকে এসেছেন। শুনলাম ওঁরা তীর্থদর্শনে বেরুচ্ছেন। আমি এবং মা ওঁদের সঙ্গী হলাম।

প্রথমে ঝরিয়া হয়ে কাশী। কাশী থেকে দিদির মেজমেয়ে সাবিত্রী ও গোবিন্দ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে দিল্লি, আগ্রা। আগ্রায় তাজমহল দেখলাম। ওখান থেকে মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আজমির ও সাবিত্রী-পুষ্কর যাওয়া হয়েছিল। গোবিন্দর মামার বাড়ির তরফে ওঁরা গোবিন্দজির সেবায়েত। সুতরাং গোবিন্দ সঙ্গে থাকাতে আমাদের বৃন্দাবন-দর্শন খুব ভালোভাবে হয়েছিল। প্রাণভরে গোবিন্দজি দর্শন করেছি, প্রসাদ পেয়েছি। একদিন বৃন্দাবন পরিক্রমা করা হল।

কিন্তু মন শান্ত হচ্ছে না, মনে হচ্ছে উনি কোথায় কতদূরে ঘাটশিলায়, আমি একলা এ কোথায় এসেছি? একদিন বৃন্দাবন থেকে শ্যামকুণ্ডু, রাধাকুণ্ডু, গিরিগোবর্ধন বাসে করে দেখতে যাচ্ছি, ওঁর জন্যে বুকটা কেমন করে উঠল, অভিমানে চোখে জল এল। বারেবারে চোখের জল মুছছি, সে যে কী কষ্ট হয়েছিল বোঝাতে পারব না। বাসে জানলার কাছের সিটে বসেছিলাম, যখন খুব কষ্ট হচ্ছে তখন মনে হল প্রচণ্ড জোর একটা হাওয়ার ওপর ভেসে উনি যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার কিছুক্ষণ পরে মনটা আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। মনে হল বোধ হয় আমার এ কাতরতা ওঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

মথুরা বৃন্দাবন দেখে পরে আজমির। আজমির যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ন'টা। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি করে পুষ্কর। পুষ্করকুণ্ডে স্নান করে সাবিত্রী পাহাড়ে উঠব, তখন দুপুর, রোদ্দুরে চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। অনেকখানি বালি ভেঙে তবে সাবিত্রী পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছোনো যাবে। তারপর পর্বতারোহণ, বালি তেতে আগুন, পা দেওয়া যাচ্ছে না। কোনো দিকে কোনো লোকজন নেই। আমরা খেয়াল করিনি হঠাৎ দেখি একটি মাঝবয়সি মহিলা, পরনে একটা মোটা লালপাড় শাড়ি, গলায় কতকগুলো মালা, গায়ে জামা নেই, খালি পা, কাছে এসে হেসে বললেন, 'ওমা, তোমরা বুঝি সাবিত্রী পাহাড়ে উঠবে? এই দুপুররোদে! তবে ইচ্ছা হয়েছে যখন যাও।' তারপরে আমরা নিজেরাই যাওয়ার কথাবার্তা বলছি, ওঁকে আর খেয়াল করিনি, হঠাৎ গোবিন্দ বললে, 'মাসিমা, সেই মহিলাটি কোথায় গেলেন?' তখন আমাদের মনে হল, সত্যি তো, উনি কোথা থেকে এলেন এবং এর মধ্যে গেলেনই বা কোথায়। দিব্যি বাংলা বললেন। গোবিন্দ বললে, 'নিশ্চয়ই সাবিত্রী দেবী এই রোদ্দুরে আমাদের কষ্ট হবে বলে নিজেই এসে দেখা দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন।'

সেই তপ্ত বালির ওপর দিয়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠলাম। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বড্ড খাড়াই। ওখান থেকে জয়পুরে এসে গোবিন্দজি-দর্শন করে অম্বর গিয়েছিলাম। ভালো লেগেছিল, ভাঙা মন নিয়ে যতটুকু লাগা সম্ভব।

৩

মনে পড়ছে অমরকৃষ্ণ পাঠশালায় তখন সকালে মেয়েদের স্কুল হত। ওখানে টেস্ট দিলাম। ভাটপাড়া হাইস্কুলে ফাইনাল পরীক্ষার সিট পড়ল। পরীক্ষা দিলাম। ক'মাস পরে ফল বেরুল। ইংরেজিতে কম্পার্টমেন্টাল। অবশ্য আমি জানতাম ফল এমনি হবে, তবুও মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাস্টারমশাই বললেন, 'তুমি তো জেনেই পরীক্ষায় বসেছিলে। আবার দাও।'

আবার পরীক্ষা দিলাম। সিট পড়েছিল ডাফ স্কুলে। বিজু আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন একলা কোথাও যেতে পারতাম না। ও সারাক্ষণ বসে থেকে আমায় পরীক্ষা দিইয়ে নিয়ে এসেছিল। ব্যাঙকাকা, অন্তু, দেব— এরা সবাই আমার স্নেহের পাত্র। পরীক্ষা দিয়ে মামাশ্বশুরবাড়ি এসেছি। তখন প্রীতি নতুন বৌ, ননদের বিয়ে হয়নি।

দিন কেটে যাচ্ছে। একদিন বড়ঘরে সবাই শুয়ে ঘুমোচ্ছি, কখন ভোর হয়েছে টের পাইনি, হঠাৎ খোকন (দেওর)-এর ডাকে ঘুম ভাঙল, 'বৌদি, আপনি পাশ

করেছেন।' বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠলাম। তখনকার দিনে বোধ হয় কাগজে রেজাল্ট বেরুত। ভালো মনে করতে পারছি না। খোকন বাইরে থেকে শুনে এসে বললে। প্রথম পাশের সংবাদ পেয়ে মনটা কেমন হয়ে গেল। একটুও আনন্দ হল না। মনে হল আজ এভাবে পাশ না করে যদি উনি থাকতে পাশ করতাম, তা হলে কত খুশি হতেন। যদি পাশ করে বিয়ে হত তা হলে অনেক অনুশোচনার হাত থেকে বাঁচতে পারতাম। মা, আমার ছোট মামিশ্বাশুড়ি বললেন, 'আজ নুটু থাকলে সবচেয়ে বেশি খুশি হত।' সবাই খুশি হয়েছেন, এ-বাড়ির মা, ও-বাড়ির মা, মেজদি, বোনেরা। যাঁর ভালো লাগার জন্য আমার পড়াশুনো শুধু তিনিই কিছু জানতে পারলেন না।

মনে পড়ছে কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা। তখন জিজার বোন ছবি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে বি. এ. পড়ছে, একদিন আমাকে বললে, 'চলুন যমুনাদি, আপনাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়ে আসি।' আমারও মনে মনে পড়ার ইচ্ছা হচ্ছিল। ছবির সঙ্গে গিয়ে ভর্তি হলাম। ইংরেজিতে দারুন কাঁচা, স্পেশাল বেঙ্গলি নিলাম। তখন প্রফেসার ছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎবাবু, পরেশবাবু, নরেনবাবু, একেজি, আরও অনেকে। ক্লাস করতে ভালো লাগত। মেয়েরা সবাই ভালোবাসত। ক্লাস করতে করতে কখন মন চলে যেত আমার হারানো দিনগুলোতে, চোখে জল আসত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়তাম।

এমনিভাবেই এগোচ্ছে পড়া। আই. এ. পরীক্ষায় পাশ করলাম। সবাই আনন্দিত, আমি কিন্তু নই। যাকে খুশি করব বলে পড়াশুনো সেই তো নেই, তবে কীসের আনন্দ। মানুষের দেওয়া অপমানে, উপেক্ষায়, দুঃখে চোখে জল আসে না, অথচ যখন ভালো সংবাদ এবং সহানুভূতির স্পর্শ পাই তখন দু'চোখ বেয়ে জলধারা নেমে আসে। মনে হয়, এ আমি পাগলের মতো কী করছি? কীসের জন্য আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রা?

যাই হোক, বি.এ.তে ভর্তি হলাম। পরীক্ষা নেই। ধীর মন্থরগতিতে দিন কাটছে। মনে পড়ে একদিন সকালে গরুকে খেতে দেব বলে খড় কাটছি, ভ্রান্তি, আমাদের পাড়ার মেয়ে, এসে বললে, 'যমুনাদি, আমি রথতলার ওদিকে নারায়ণপুরের একটি স্কুলে কাজ করছি। ওই স্কুলে একজন টিচার বি.এ. পরীক্ষা দেবে, ছুটি নেবে, তার বদলে ক'মাস আপনি কি কাজটা করবেন?'

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। ও বললে, 'মাইনে পঁচিশ টাকা।' মনে মনে ভাবলাম—মন্দ কী! পঁচিশ টাকাই বা দেয় কে?

পরদিন সকালে ভ্রান্তির সঙ্গে যাত্রা করলাম। কাঁকিনাড়া স্টেশনের রেলের মস্ত বড় ব্রিজ পার হয়ে 'রথতলা'। বাজার, দোকানপাট, ডাক্তারখানা, বেশ জমজমে

জায়গা। ওখান থেকে বেশ খানিকটা গিয়ে দুধারে ধানখেত। এখন ওসব জায়গায় বসতি হয়েছে, বড় বড় দোকান হয়েছে। ধানখেত ছাড়িয়ে কয়েকটি দোকান, একটি বিরাট গাছ, তার তলা সুন্দর করে বাঁধানো। সবাই বলে 'খেদাইতলা'। তার ঠিক গায়ে স্কুল। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ, শান্ত স্নিগ্ধ, মনকে জুড়িয়ে দেয়। স্কুলের নাম নারায়ণপুর হরিচরণ তরফদার হাইস্কুল। স্কুলটি ছেলেদের, সকালে মেয়েদের স্কুল হয়। মেয়েদের স্কুলের ওই একই নাম। 'নারায়ণপুরে'র তরফদারদের এক ব্যক্তি স্কুলের জন্য জমি দান করেন। মেয়েদের স্কুলের জন্যও জমি ওঁরাই দিয়েছেন। 'এল' প্যাটার্নের বাড়ি, একদিকে কয়েকটি পাকা ঘর, অন্যগুলি টিন এবং টালি দিয়ে ছাওয়া। কোণের দিকের একটি ঘর মেয়েদের অফিসরুম। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ বড় একটি পুকুর, পুকুরের ওপাশ দিয়ে রাস্তা, তার পায়ে লম্বা বাঁশ, আম, জাম, নারকেলের বাগান। গেটের দু-দিকে দুটি গাছ। একটি বকুল অপরটি কৃষ্ণচূড়া।

ভ্রান্তির সঙ্গে অফিসরুমে গেলাম। দেখি মাস্টারমশাই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয় টেবিলে বসে কাজ করছেন। উমাদি হেডমিস্ট্রেস, তখন কল্যাণীতে বি.টি. পড়তে গেছেন। ভ্রান্তিই তখন অ্যাকটিং হেডমিস্ট্রেস। সেক্রেটারি রামপদ তরফদার মশাই।

চাকুরি হল মাত্র ক'মাসের জন্য। নীলিমা ছুটি নিয়ে চলে গেল। আমি বি.এ.তে ভর্তি হয়েছি বটে, কিন্তু সকালে স্কুল। আমার দুপুরে কলেজ যেতে কোনো অসুবিধা হত না।

ক'মাস পরে নীলিমা পরীক্ষা দিয়ে চলে এল। আমিও ফিরে এলাম বাড়ি। ওই সময় টাকা-পয়সার একটু অসুবিধা হচ্ছিল। আমার মামিশাশুড়ি বললেন, 'বউমা, আমার কথার অবাধ্য হোয়ো না, এখন বড় বৌমার কাছে কিছু করে টাকা চাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁর আদেশে দিদির কাছে টাকা চাইলাম। দিদি আমার বি. এ. পড়ার সব খরচ দিয়েছিল। সেকথা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব। সবই করছি, কিন্তু ভুলতে পারছি না আমার প্রিয় মানুষটিকে।

মাসখানেক পরে ওই স্কুলেরই একজন টিচার বকুল মুখার্জি বললে, 'যমুনাদি, আমি কিছুদিন ছুটি নেব, আপনি আমার কাজটা করে দেবেন?' আমি বলেছিলাম, 'না ভাই, এভাবে ছুটিতে আমি যাব না, ছেড়ে আসার সময় মন বড় খারাপ লাগে। সেক্রেটারিকে বলো উনি যদি আমাকে স্কুলে স্থায়ী চাকরি দেন তবে যা মাইনে দেবেন তাতেই করব।' পরের দিন সেক্রেটারি আমাকে ডেকে চাকরি দিলেন। স্থায়ী চাকরি হল, মাইনে হল ত্রিশ টাকা।

কলেজ করি, স্কুল যাই। মার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার মাইনের টাকা থেকে মাকে কুড়ি টাকা দিতাম। দশ টাকা আমার নিজের খরচার জন্যে রাখতাম। আমি চাকরি পাওয়াতে মার খুব আনন্দ। তাড়াতাড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন।

বেশ মনে আছে হেঁটে স্কুল যেতাম। ভারী মজা করে আমরা টিফিন খেতাম। ভেজানো ছোলা আর মুড়ি। উমাদি, রেণুদি, আমি আর কয়েকজন। চা তো ছিলই। স্কুলে চা করার সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল! মাঝেমধ্যে ভালোমন্দও খাওয়া হত। লক্ষ্মী-অমূল্য ওরাই সব করে দিত। স্কুলকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেছিলাম। মনে হত আমার স্কুল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিশে নিজেকে ভুলে যেতাম। ভুলে যেতাম অতীতকে। ভবিষ্যতের ছবি আঁকতাম। এরা বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। অবশ্য আমাকে মনে রাখবে না। না রাখুক, আমি ওদের কাছে পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি সে তো ওদেরই দান।

গ্রাম অঞ্চল, তাই অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে মেয়েরা স্কুলে আসত। সে সব গ্রামে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি, বাবা-মারাও অনেকক্ষেত্রে লেখাপড়া জানতেন না। তাঁরা স্কুলে এসে অতি বিনীতভাবে বলতেন, 'আপনারা একটু দেখবেন দিদিমণি।' শহর-ঘেঁষা শিক্ষিত পরিবার থেকেও ছাত্রী আসত। সব মিলিয়ে আমাদের স্কুল একটি প্রাণবন্ত পরিবার হয়ে উঠেছিল।

বেশ মনে আছে কত ভোরে উঠে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তাম। পথে নামলে একটা অন্য আনন্দ। অবশ্য বর্ষাকালে নয়। পৌনে ছ'টায় স্কুল বসত, ছুটি হত সাড়ে দশটায়। ওরই মধ্যে সাতটা পিরিয়ড করতে হত। বেলা, উষা ওরা দুজনে রুটিন করতে বসে যেত। তখন টিচারদের লেসেন প্ল্যান করতে হত। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেরা পড়ত। পঞ্চম শ্রেণিতে উঠে চলে যেত ছেলেদের স্কুলে। প্রথম দিকে আমরা কয়েকজন টিচার ছিলাম। উমাদি, রেণুদি, বকুল, ইলা, ভ্রান্তি, গৌরী, গীতা, পারিজাত, পূর্ণিমা, নবনীতা, সবিতা, বেলা, চন্দনা, মলিনা, অর্চনা, গৌরী সরকার। পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতেন, সতীশবাবু ইংরেজি। ক্লার্ক ছিলেন তখন বামাচরণবাবু। এখন মিহির আব নবকুমার দুজন। বিষ্ণু সম্প্রতি এসেছে।

স্কুলে পড়াশুনোর সঙ্গে তাল রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। এসব ব্যাপারে বকুল ছিল প্রধান, আমি ওর সঙ্গে থাকতাম। বেশ মনে আছে, মেয়েদের স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন মায়া ব্যানার্জি এসেছিলেন, আর ব্যারাকপুর থেকে দিদি রমা ব্যানার্জিকে আনা হয়েছিল। ওই সময় আমরা মেয়েদের দিয়ে 'তাসের ঘর' করিয়েছিলাম। 'উর্বশী' কবিতাটি নৃত্যনাট্যের মতো হয়েছিল। তখন এইসব নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল। মেয়েদের স্কুলে প্রথম যেদিন নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করি সেদিন সকালে স্কুলে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হয়েছিল। আমি ছিলাম তার উদ্যোক্তা এবং আর সমস্ত টিচার। আমাদের স্কুলে প্রচুর মুসলমান মেয়ে পড়ে। ওই সিন্নিতে কারওর আপত্তি হয়নি। সিন্নি খেয়ে মেয়েদের খুব আনন্দ।

এদিককার সবকিছু করি বটে, কিন্তু দিদির সঙ্গে যোগাযোগ কোনোদিনই হারাইনি। সময় পেলেই দেখা করে আসি। বাবলু বড় হচ্ছে, পড়াশুনোয় ভালো রেজাল্ট করেছে। শুনে আনন্দ হয়। ওর বাবা কাকা থাকলে আমরা এক জায়গায় তো থাকতাম। মনে হত বড়ঠাকুর থাকলে কি আমাকে দূরে রাখতে পারতেন! বাবলুর পৈতে হল, আমি কিছুই দিইনি। তখন অর্থের অনটন ছিল। কী জানি কেন, তখন প্রচণ্ড একটা অভিমান হয়েছিল। কার ওপর জানি না, হয় ভাগ্যের ওপর, নয় ওঁর ওপর। শুধু কেঁদেছি। মনে পড়ছিল বাবলুর ভাতের কথা, কত আনন্দ ও শান্তির সঙ্গে অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে আড়ম্বর ছিল না, ছিল না বিরাট সমারোহ, শুধু সবাই আমরা ছিলাম, ছিল পরিপূর্ণতা।

৪

মার বয়স হয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছিল, তবুও মায়ের মনের জোর ছিল অসম্ভব। আর সম্বল ছিল কিছু গহনা। মা না থাকলে আমার যে কী হত জানি না। মনে আছে মার অসুখ ক্রমশই বাড়তে লাগল। ওই সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশনে আমাদের টিচারদের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তখন চিনা আক্রমণ চলছে, ওই চাইনিজ অ্যাগ্রেশনের ওপর একটা প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছিল।

যাই হোক, পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। মার গায়ে রক্ত নেই, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। স্কুলে ছুটি নিলাম, বোনেরা সকলে আসছে যাচ্ছে। মেজদি, মেজজামাইবাবু, খোকন রোজ আসে। খোকন রাত জাগে, দিদিমার সেবা করে। দাদারা আছে। রণু, মাধবী, জগন্নাথ, বলরাম তখন ছোট। সবাই রয়েছে। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আসেন।

এইভাবে দেড় মাস কাটল। মার স্মৃতি একটুও হারায়নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান ছিল। একদিন দুপুরে মা আমাকে বললেন, 'আমি যখন থাকব না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না, আমার এই ঘরে থাকবে। পরঘরি কখনও হোয়ো না, তাতে বড় কষ্ট। যত অসুবিধাই হোক, বাড়িতে থাকবে।' সেই অসুখেই মা মারা গেলেন। চতুর্থী সারা হল, দাদারা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলেন। বাবার বেলায়ও তাই করেছিলেন।

মার মৃত্যুতে আমার জীবনে এল আর একটা সংকটময় মুহূর্ত। শুরু হল আর এক অধ্যায়। মার ঘরদোর জিনিসপত্র বিছানা-মাদুর সবই রয়েছে, মা নেই। সব মিটে গেলে বোনেরা ও অন্য সবাই চোখের জল ফেলে চলে গেল। শেষে ছোটবোন যেদিন বিকেলে চলে গেল সেদিনকার মানসিক অবস্থার কথা লিখতে গেলে কলম থেমে

যায়। মা নেই। শূন্য বাড়ি। দাদা-বৌদি ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য বাড়ি। সেদিন আসন্ন সন্ধ্যায় উঠোনের তুলসীমঞ্চের কাছে একলা দাঁড়িয়ে মুক্ত আকাশের দিকে চোখ রেখে নিজের অসহায় অবস্থার জন্য অঝোরে কেঁদেছিলাম। কাকে ডেকে, কার ওপর অভিমান করে কেঁদেছিলাম জানি না, তবে বুক নিঙড়ে সে কান্না আমার বেরিয়ে এসেছিল। সেদিন একলা ভালো লাগছে না, রাত্রে মেজদির বাড়ি এসে শুলাম।

এমনি করে ক'দিন চলল। মেজদাদাবাবু বললেন, 'এখানে চলে আয়।' তবুও আমি বাড়িতে ক'দিন রান্না করি। মার কথা মনে ছিল— বাড়ি ছেড়ে যেয়ো না। কিন্তু আমি সাহস করতে পারছি না, একলা আমি, কারুর সঙ্গে পরামর্শও করতে পারছি না। ভয় করছে, মন খারাপ লাগছে। বুঝতে পারছি না। মেজদাদাবাবু আবার বললেন, 'কী রে যমুনা, আমি কি তোকে দুটো খেতে দিতে পারব না! এখানে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকবি। খোকন তোকে ফেলবে না।'

আমি তখন দিশাহারা। বাড়ির পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আমি মেজদির বাড়িটাই নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করলাম। বাবলু বড় হয়নি, ওদিক থেকে কোনো আশ্বাস পাচ্ছি না, অবশ্য ঠাকুরপোরা বলেছিল, 'আপনার জন্যে আমাদের দরজা চিরকাল খোলা থাকবে।' দেওর খোকন বলেছিল, 'বৌদি, চলে আসুন।' আমি ভাবলাম ওটা আমার শ্বশুরবাড়ি। এটা দিদির বাড়ি। আমার বোনপো। এখান থেকে স্কুল-কলেজ করতে পারব, কোনো সংকোচ হবে না। শ্বশুরবাড়িতেও সব সুবিধা পাব, কিন্তু হয়তো আমার নিজের একটু সংকোচ হবে। তাই ওখানে না গিয়ে মেজদির বাড়ি এলাম। ঠিক করলাম কি না জানি না, তবে মেজদিদের বোঝা বাড়ালাম। সেজন্য আমি মনে মনে লজ্জিত। তবে আমার মনে হয় আমার মতো অসহায় অবস্থায় পড়লে যে কেউই এই ব্যবস্থা মেনে নিত। কারণ মেজদিই দেশের মধ্যে, অন্যরা দূরে। মেজদির মাতৃসম ব্যবহার, মেজদাদাবাবু, খোকন, বৌমা ও মেয়েদের সহৃদয় ব্যবহার— আমার দিন ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল। তারপর ঝুমু, রুমন, সুমন এইসব নাতি-নাতনিদের নিয়ে দিন চলছিল দ্রুততর।

এখানে এসে বি.এ. পাশ করলাম। কলেজ-স্কুল যাওয়ার কোনো অসুবিধা হয়নি। বাড়ির কাজ করতে হত না, স্কুলে মাইনেও বেড়েছে। চল্লিশ টাকা পাই। অভাব নেই। একে ওকে সাধ্যমতো উপহার দিই। লৌকিকতা করি, ইচ্ছামতো খরচ করি। খাওয়ার খরচ লাগে না।

মনে আছে কিছুদিন পরে অনার্স পরীক্ষা দিলাম। তখন অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পড়েছিলাম। এবার স্কুল বললে, বি.টি. পড়তে হবে। মাদরাল

বি.টি. কলেজে ভ্রান্তি এবং আমি দুজনে ভর্তি হলাম। বেশ মজা, স্কুল নেই। বাড়ি থেকে খেয়ে ধীরেসুস্থে দুজনে কেটোপুল পার হয়ে, মাঠের মধ্যেকার সরুপথ দিয়ে গল্প করতে করতে কলেজ যাই। কলেজের ক্লাস হত ভারী ভালো জায়গায়। ডা. পঞ্চানন ঘোষালের তৈরি মাদরালে যে সুন্দর পার্ক ও মন্দির ইত্যাদি হয়েছিল, সেখানেই কয়েকখানি ঘরে ক্লাস হত। পরিবেশটি ভারী সুন্দর ছিল। একেবারে বাংলার পল্লির কোলের মধ্যে।

চারদিকে সবুজ আর সবুজ, বড় বড় ধানখেত, ইতস্তত কিছু বাঁশঝাড়। আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদির বাগান। বেড়া-দেওয়া কোনো কোনো গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে কলাগাছের ঝাড়। দূর থেকে দেখা যেত বাড়ির উঠোনের কুয়ো থেকে কে যেন জল তুলছে। বহুদূরের মেঠো পথ দিয়ে দু-একজন পথিকের আনাগোনা। ওই সব দেখে মনে পড়ে যেত আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ গোপালনগর-ব্যারাকপুরের কথা। মনে পড়ত আমার বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি ভাটপাড়ার কথা।

এখন ভাটপাড়ার কত পরিবর্তন হয়েছে। এই তো রেলের লাইন পার হলেই ভাটপাড়া। আমার কৈশোরের ভাটপাড়াকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বললে খুব একটা ভুল হয় না। যদিও সে সময় আশপাশে দু'চারটি জুটমিল স্থাপিত হয়ে গেছে। কয়লা ইঞ্জিনের রেলগাড়ি সিটি বাজিয়ে ভাটপাড়ার বুকে স্পন্দন জাগিয়ে পূর্বদিক দিয়ে সদর্পে চলে যাচ্ছে। তবুও তখন ভাটপাড়া পল্লির স্নিগ্ধতা হারায়নি, শুধু শহরের আগমন বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছে মাত্র।

ছোট জায়গা। এর মধ্যে দিয়ে জিটি রোড চলে গেছে। বেশ মনে পড়ে আগে রাস্তায় ছিল টিমটিমে আলো। তারপর এল ইলেকট্রিক। ভাটপাড়ার দক্ষিণদিকে কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, শ্যামনগর হয়ে কলকাতার ওদিকে চলে গেছে। উত্তরে নৈহাটি, কাঁঠালপাড়া কল্যাণীর ওদিকে। পূর্বে রেললাইন পার হয়ে রথতলা, মাদরাল, নারায়ণপুর ইত্যাদি আর পশ্চিমে বয়ে চলেছে পতিতপাবনী গঙ্গা। গঙ্গার ওপারে সারিবদ্ধ গাছগাছালি, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বাড়িঘর, বাঁধানো ঘাট। যজ্ঞেশ্বরের শুভ্র মন্দির চূড়া, মহসীন কলেজ।

এপারে সারিবদ্ধ বাঁধানো ঘাটে লোকজনের আনাগোনা লেগেই আছে। দূর থেকে দেখা যায় নৈহাটির খেয়াঘাট, হুগলির ব্রিজ, দক্ষিণে ক্লার্কসাহেবের ঘাটের কাছে মিলের বিরাট জেটি।

ভাবতে বেশ লাগে পাড়ায় পাড়ায় ভাগ করা সমস্ত দেশটা, যেমন-- বাবুপাড়া, রায়পাড়া, ঠাকুরপাড়া, চালকিপাড়া। রাস্তারও বিভিন্ন নাম। ব্রাহ্মণপ্রধান হলেও সমস্ত

বর্ণের মানুষকে নিয়েই এর পরিচয়। বাঁধানো ঘাটগুলির আবার আলাদা আলাদা নাম। বাবুপাড়ায় 'রূপদাসবাবুর ঘাট'। এই ঘাটের দু-দিকে দুটি ঘর। একটি গঙ্গাবাসীর অপরটিতে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি স্থাপিত। এখানে নিত্যপূজা হয়। উড়িষ্যার একটি পুরোহিত পরিবারের ওপর এঁদের পূজা ও সেবার ভার ন্যস্ত। রথের সময় অত্যন্ত সমারোহে রথের টান হত। ছোটবেলায় এবং এখনও এই রথই আমরা টেনে আসছি। আগেকার দিনে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি হত অক্ষয় দাদামশায়ের কয়লার গোলায়। আমাদের বাড়ির কাছেই। ত্রিপল দিয়ে সাময়িক ঘর তৈরি হত, সেখানে উল্টোরথ পর্যন্ত ঠাকুর থাকতেন। ঘটা করে পুজো আরতি হত। ভোগের প্রসাদের গন্ধ এখনও যেন নাকে ও হাতে লেগে আছে। সুস্বাদু মালপো তৈরি হত ঠাকুরের ভোগের জন্য। সব করতেন পূজারি শ্যামঠাকুর, কোনোবার ওর ভাই উমাকান্ত ঠাকুর। প্রতিদিন মা সিদে ও পায়েসের জন্য দুধ পাঠাতেন। পাড়ার সমস্ত বাড়ি থেকেই সিদে যেত, আমরা সবাই প্রসাদ পেতাম। সুন্দর করে ফুল দিয়ে ঠাকুর সাজানো হত। সুগন্ধি ফুল চন্দন ধূপধুনোর মিলিত গন্ধে যেন আকাশ বাতাস প্লাবিত হয়ে যেত। আমাদের তখন খেলার জায়গা হত রথ।

রায়পাড়ায় বকুলতলার ঘাটে তখন বকুলফুলের গাছ ছিল। একটু একটু মনে আছে, আমরা তখন দল বেঁধে ফুল কুড়োতে যেতাম। বকুলফুলের ছটাগুলো দিয়ে মালা গাঁথতাম। ওখানে কয়েকটা বাদাম গাছ ছিল। বাদামের আশায় তার তলায় ঘুরঘুর করতাম। যে কেউ একটা পেলে, ইঁট দিয়ে ভেঙে বকুলতলায় বসে ভাগ করে খেতাম। বাল্যের সারল্য আর ফুলের সুগন্ধে একটা আনন্দের শিহরন জাগত। এই বকুলফুলের জন্যই ঘাটের নাম বকুলতলার ঘাট। বলরাম সরকারের ঘাট সবচেয়ে বড় ঘাট। এখানে 'নবীন সঙ্ঘ' ক্লাব। এই ক্লাবের সদস্যদের উদ্যোগেই জগত্তারিণী মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার সেজদা এই ক্লাবের একজন অন্যতম সদস্য। প্রতি বছর এখানে দুর্গাপূজা হয়।

মনে পড়ে নীলের দিনে পঞ্চাননতলার উৎসবের কথা। পঞ্চানন আমাদের গ্রাম্য দেবতা, অনেকে এঁকে বাবাঠাকুরও বলে থাকেন। নীলের দিনে সন্ন্যাসীরা ঘটা করে পুজো করেন। নীলাবতী বিয়ে হয়। তা ছাড়া প্রতি বাড়ির ছেলেমেয়েদের আঠারো মাস বয়স হলেই বাবাঠাকুরতলায় গিয়ে পুজো দিয়ে চুল দিয়ে আসতে হয়। মনে পড়ছে ঝুমু, রুমন ও সুমনের চুল দেওয়ার কথা।

ভাটপাড়া পণ্ডিতপ্রধান অঞ্চল। কাশী ও নবদ্বীপের মতো এখানকার পণ্ডিতদেরও প্রচুর খ্যাতি। ঠাকুরপাড়ায় ভট্টাচার্য ও পণ্ডিতদের বাসই বেশি। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ,

তাঁর পিতা পঞ্চানন তর্করত্নমশাই এখানকার মানুষ। এ ছাড়া বহু পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের টোল ছিল। এখনও দু-চারটি টোল আছে। তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা আসতেন পড়তে, এবং উপাধি নিয়ে যে যাঁর দেশে চলে যেতেন।

এখানে পাঁচ মন্দির একটি ভারী সুন্দর জায়গা। একই স্থানে ইতস্তত ছড়ানো পাঁচটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এইসব মন্দিরগাত্রে এখনও পোড়ামাটির কাজ কিছু কিছু দেখা যায়। আগে ওই মন্দিরগুলিতে বিধি অনুসারে পূজা হত। শুনেছি সন্ধ্যায় যখন পাঁচটি মন্দিরে একই সঙ্গে আরতির ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠত, সেই ঐকতান যেন মহাশূন্য ভেদ করে কোনো অসীম অনন্তে মিশে যেত। এখন অবশ্য সেই ঐকতান স্তব্ধ বেদনায় মূক। দু-একটি মন্দির ছাড়া অন্যগুলিতে দেবতার কোনো স্থান নেই।

মনে পড়ে ধুনিকাকার বাড়ির উঠোনে কত যাত্রাগান, থিয়েটার হয়েছে। সবাই শুনতে যেতাম। মনে আছে ছাদে বসে শিবপুরের 'নদের নিমাই' দেখেছিলাম।

তখনকার ছেলেরা কত থিয়েটার করত। একবার রাজাপাড়ায় 'বঙ্গে বর্গী' থিয়েটার হল। কী ভালোই লেগেছিল। দাদাদের 'কলাকেন্দ্রে' প্রতি বছর একটা করে বই হত। আমাদের বাইরের ঘর ছিল কলাকেন্দ্রের কেন্দ্রস্থল। সন্ধ্যা থেকে রিহার্সাল চলত। জমজমাট ব্যাপার। দাদাদের 'কংস' পালা খুব নাম করেছিল। 'টিপু সুলতান', 'শাজাহান', 'চাণক্য' আরও কত কী। এখন আর তেমন থিয়েটারের মহড়া দেখি না।

·

মনে পড়ে বোঁচাদার আশ্রমের কথা। বোঁচাদা ছিলেন মেজদির দেওর। নাম ছিল সুধীরকুমার রায়। এঁর ছিল ছেলেদের নিয়ে কুস্তির আখড়া। অনেক ছেলেই তখন ওই আখড়াতে এসে শরীরচর্চা শিক্ষা করত। তা ছাড়া, ব্রহ্মচর্য পালন ও আধ্যাত্মিকতার অভ্যাস করত। বোঁচাদার শক্তি ছিল অসীম, গতিশীল মোটরগাড়ি ধরে রাখতে পারতেন। তখন একডাকে বোঁচাদাকে সবাই চিনত। আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে স্মরণ করে। উনি পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান। রামকৃষ্ণ মিশনের মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী নাম— আনন্দস্বরূপ। পাশেই ওঁর আশ্রম ছিল। আশ্রমে প্রতি বছর পুজো হত। আয়োজন ছিল প্রচুর। যিনি আসতেন তিনিই প্রসাদ গ্রহণ করতেন। বোঁচাদা গান করতেন খুব ভালো। আমার জামাইবাবুও গান করতেন অর্গ্যান বাজিয়ে।

একবার নিমতায় গিয়েছিলাম। দেখছি সে কথা ভুলিনি। নিমতা আমার বাবার আসল বাড়ি। আমরা ঠাকুরদা ত্রৈলোক্যনাথ একমাত্র সন্তান ছিলেন। এদিকে আমার ঠাকুমা হবিদাসী তাঁর মার একমাত্র সন্তান। তাই ঠাকুমা বেশিরভাগই বাপের বাড়ি

থাকতেন। ভাটপাড়া আমার ঠাকুমার বাপের বাড়ি। আমাদের আসল দেশ নিমতা। নিমতার স্মৃতি স্পষ্ট মনে আছে। সেও গ্রাম। বেলঘরিয়া নেমে ঘোড়ার গাড়ি করে গিয়েছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। যেতে যেতে ডানদিকে একটা বিরাট উঁচু প্রাচীর পড়েছিল। কী জানি সেটা কীসের প্রাচীর। ভারী শান্ত নির্জন পরিবেশ ছিল।

ভদ্রেশ্বরে পিসিমার বাড়ি। আমরা গঙ্গা পার হয়ে পিসিমার বাড়ি যেতাম। গঙ্গার ধারেই বেশ বড় দোতলা বাড়ি। বৈশাখ মাসে ভদ্রেশ্বর শিবের পালা পড়ত। কত প্রসাদি মিষ্টি, চিনির তক্তি। খুব খেতাম। তখন মিষ্টি খেতে কোনো আলস্য ছিল না। মনে পড়ে আমাদের বাড়িতে পিসিমা আসতেন প্রায়ই দুপুরবেলা, সঙ্গে পাড়ার যে কেউ একজন, সঙ্গে পুজো করা মিষ্টি। আমাদের কী আনন্দ। মা তাড়াতাড়ি ভাত চড়িয়ে দিলেন। পিসিমা খেতে বসলে আমরা সব ঘিরে বসতাম। মা পাখা হাতে করে পাশে বসতেন। পিসিমা ভালো গান করতেন, গল্প বলতেন। আর আমরা সব ভাইবোন মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

মা ও পিসিমাতে খুব ভাব ছিল। মা কর্মীমানুষ ছিলেন। সবকিছুতে ছিল অদম্য উৎসাহ। বাড়িতে পূজা-পার্বণ আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। মা নিজের হাতেই সব করতেন। মার হাতের রান্না ছিল ভালো। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, পিঠেপুলি মার হাতে সবই ছিল নিঁখুত। তখনকার দিনে অনাহূত অতিথির প্রায়ই আগমন ঘটত এবং প্রায় গৃহস্থের বাড়িতে হাঁড়িতে ভাত-তরকাবি কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকত। কেউ এলেই মা আমাদের হাতে একটা লম্বা ছড়ি দিয়ে বলতেন, 'শিগ্রি যা, বাগান থেকে একটা কলাপাতা কেটে আন। কলাপাতায় হাত না পেলে একটা মানকচুপাতা নিয়ে আসবি।' সেই পাতা ধুয়ে অতিথিকে ভাত দিতেন, মাটির গ্লাসে জল। দিব্যি খেয়ে সে জায়গা পরিষ্কার করে তারা চলে যেত।

মার খুব সেলাই-এর ঝোঁক ছিল। সবরকম সেলাই জানতেন। ক্রুশ, কাঁটা, সূঁচ কোনোটা বাদ ছিল না। বাড়ির সর্বত্র মার হাতের সেলাই। মা পড়তে ভালোবাসতেন। লাইব্রেরি থেকে দাদারা বই এনে দিতেন। মা রাত জেগে বই শেষ করতেন। মার খুব ব্যক্তিত্ব ছিল। কথার নড়চড় হত না। মা ঘর সাজাতে ভালোবাসতেন, গহনা গড়াতে ভালোবাসতেন আর কাপড়ের শৌখিনতা মার অবশ্যই ছিল। আমরা মার কত গহনা দেখেছি। বোম্বাই বেঁকি, পটলি প্যাটার্ন। শেষকালের দিকে একজোড়া গোকড়ি চুড়ি গড়িয়েছিলেন। মার খুব মোটা মোটা তারের বালা ছিল, মটর রুলি ছিল, ওপর হাতে অনন্ত তাবিজ। গলায় ১৪ ভরির পাটি হার। কোমরে ইয়া চওড়া জড়োয়ার খামি দেওয়া ১৮ ভরির বিছে। একটা বিরাট লম্বা মফচেন ছিল। কানে পাশা, ফুল, মাকড়ি।

মাথার জন্যে ছিল দু-জোড়া কাঁটা, আর তারাফুলের বাগান। মাকে আমার বেশি গহনা পরতে দেখিনি। হাতে চুড়ি, বালা, গলায় বলবিছে হার, কানে ফুল, নাকে নাকছাবি। আর গহনা সব বাক্সে থাকত।

শাড়ির ব্যাপারে মা মুক্তহস্ত ছিলেন। যখন যে শাড়ি উঠত মা কিনতেন। মণি-যুগী বলে একজন মহিলা তখন বাড়ি বাড়ি কাপড় বিক্রি করতেন। ভাটপাড়ায় তখন কাপড়ের দোকান ছিল না। এখনও নেই। এখনকার মতো নৈহাটি গিয়ে অথবা কলকাতা গিয়ে কাপড় কেনার রেওয়াজ ছিল না। বাড়ির মেয়েরা মণি-যুগীর কাছ থেকে পছন্দমতো কাপড়-জামা কিনতেন। মণি-যুগীর ভালো নাম কী ছিল জানি না। জাতে যুগী ছিলেন। আধাবয়সি দোহারা চেহারার মানুষটি, মুখটি গোল, রং কালো। বিধবা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁটে গুল দিতেন যা তামাক পাতা দিয়ে তৈরি। সেইগুলোর একটি লম্বামতো ছোট কৌটো আঁচলে বাঁধা থাকত। বেশ মনে আছে, দালানে কাপড়ের বোঁচকা নামিয়েই পা ছড়িয়ে বসে আগে কৌটো থেকে গুল মুখে দিতেন, তারপর পুঁটলিতে হাত। আমরা সব ঘিরে বসেছি। মা রান্নাঘরে। পুঁটলি খুলতে খুলতে ডাকতেন, 'বৌ, এসো।' মা এলে পুঁটলি থেকে সুন্দর সুন্দর কাপড়, নতুন ডিজাইনের ফ্রক ইত্যাদি বার করে দেখাতেন। মা পছন্দমতো কিনতেন। পাড়ার সব বাড়িতেই ওঁর ছিল অবাধ গতি। এখন ভাবি, তখনকার দিনে অল্পশিক্ষিত মহিলা হয়েও কী সুন্দর ব্যবসা করতেন।

আর একজন ভদ্রলোক আসতেন ফরাসডাঙা থেকে সাদা শাড়ি নিয়ে। তাঁর নাম কী ছিল জানি না, বাবা-মা বলতেন 'হাঁস'। হাঁস সুন্দর সুন্দর পেটা জরিপাড় মুগাপাড় শাড়ি, আরও অন্যরকম শাড়ি নিয়ে আসতেন।

মনে পড়ছে তখন আমাদের বাবুপাড়ায় একজন ভদ্রলোক টিনের একটি ছোট সুটকেস করে ছোটখাটো গহনা নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করতে আসতেন। তাঁকে সকলে বলত রংওয়ালা, তাঁর প্রকৃত নাম কী ছিল জানি না। দেখতে গোলগাল, ফর্সা, ধুতির ওপর একটা সাদা কোট পরে ডানহাতে সুটকেস ও বাঁ-বগলে ছাতা নিয়ে আস্তে আস্তে গলির দরজা দিয়ে ঢুকে রকের ওপর বসতেন। তাঁর কাছে কানের দুল, মাকড়ি, নাকছাবি, লোহা-বাঁধানো, শাঁখা-বাঁধানো লেসপিন, পাশ-চিরুনি, খোঁপায় দেওয়া চিরুনি এইসব থাকত। মায়েদের ছোটখাটো একটি দল ছিল। বড়কাকিমা, অনন্ত কাকিমা, বোঁচাদির মা, নেড়ার মা, ন কাকিমা, বিটুদার মা, আরও সব। এঁরা একজনে যা করবেন সকলেই তাই করবেন, কিনবেন। দুপুরে আমাদের বাড়ি ওঁদের আড্ডা বসত। বড়মা তাস নিয়ে আসতেন। পানের বাটা থাকত।

আমার বাবা ছিলেন সরল সোজা মানুষ। কলেজের অফ পিরিয়ডে বসে বসে কত কথাই মনে পড়ত। তারপর ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতাম ক্লাস করতে। তখন অধ্যাপক ছিলেন পি বি। প্রশান্ত ব্যানার্জি। জি এম। আরও অনেকে। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের ভাটপাড়ার ছেলে ডাবু। বি.টি. বেশ আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলাম। পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলাম স্কুলে।

৫

দিন কেটে যাচ্ছে। একদিন মেজদাদাবাবু (আমার মেজজামাইবাবু, বারাসত কোর্টের উকিল ছিলেন) কোর্ট থেকে এসে বললেন, 'শিশিরবাবু সপরিবারে বেনারস যাচ্ছেন।' মেজদিকে বললেন, 'চলো, আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।' আমাকে বললেন, 'তুই আমাদের সঙ্গে গেলে যেতে পারিস।' বেড়াবার জন্যে আমি সবসময় রেডি।

একদিন মেজদি, মেজদাদাবাবু, পুস্তি ও কুতান, মেজদির দুই মেয়ে যাত্রা করলাম বিশ্বনাথ-দর্শনে। সুধীরদা (বৌমা সন্ধ্যার বাবা) ওখানে তাঁর বন্ধুর বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন। বেনারস স্টেশনে আমরা নামতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি রাজাসাহেবের ম্যানেজার। আমাদের থাকার জন্যে তিনি একটি বাগানবাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। এবং বাড়িটি বিশ্বনাথের মন্দিরের অপর পারে অর্থাৎ বোধ হয় বরুণা নদী পার হয়ে।

আমরা ব্রিজ পার হয়ে রিক্সা করে অনেকখানি ঘুরে একটি মস্তবড় বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

বাগানের মাঝে মাঝে দেখা যায় নর্তকী মূর্তি। কতরকমের ফুলের গাছ। আরও কতকিছু গাছ। সামনে বিরাট বড় বাড়ি, জানলা-দরজা সব বন্ধ। শার্সি, খড়খড়ি দেওয়া দরজা-জানলা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। বাড়িতে ওঠার সিঁড়িতে বড় বড় ঘাস, সেখানে কতকাল যে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি ভগবান জানেন।

আমাদের এই বাড়িটির পিছনদিকে একটি ছোট্ট বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। এবাড়ির অবস্থাও তথৈবচ, অবশ্য কলে জল ছিল, লাইটও রয়েছে। এই ব্যবস্থা দেখে আমরা অবাক। যাই হোক, সে বেলা খিচুড়ি রান্না হল, আনন্দ করে খাওয়া হল। কিন্তু এখানে তো থাকা যাবে না। মেজদাদাবাবু রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে মহারাজদের বলে একটি বাড়ি ঠিক করে এলেন। কিন্তু সে রাত্রিটা তো ওই বাড়িতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, চারপাশে জনমানবহীন। সবার ভয়-ভয় করছে, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হল। সারাদিনের ক্লান্তি, সবার ঘুমও

পেয়েছে। শুতে গিয়ে দেখা গেল দরজায় খিল নেই। বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মতো সে কথা শুনে সকলে হতবাক, সবার ঘুম ছুটে গেল। ভয়ে সে রাতটা একটু ঘুমিয়ে একটু জেগে কেটে গেল।

পরদিন আমরা নতুন বাসায় চলে এলাম। ক'দিন রোজ বিশ্বনাথ দর্শন করেছি। একে একে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখা হল।

কাশী থেকে এলাহাবাদ। ওখানে প্রয়াগে স্নান করে চিত্রকূট যাওয়া হল। এলাহাবাদ থেকে চিত্রকূটের জন্য বাসের টিকিট কাটা হল। রামায়ণের চিত্রকূট যাচ্ছি, মনে বেশ আনন্দ! বাসে নির্দিষ্ট সিট, ভিড় নেই। প্রশস্ত পাহাড়ি রাস্তা, পথে অন্য যানবাহন অত্যন্ত কম। বাস হু হু করে ছুটে চলেছে, বহু দূরে দূরে শিক্ষকমশাই কয়েকটি ছাত্র নিয়ে গোল হয়ে গাছের তলায় বসে পড়াচ্ছেন। বাসকে আসতে দেখে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। দূরের দিগন্তরেখা পাহাড়ে ঘেরা। হু হু মুক্ত বাতাসে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। পথের পাশে একটি ছোট ছেলে গরু চরাচ্ছিল। বাসের শব্দে গরুগুলো পালাল আর তার ছোট্ট মালিক অবাক হয়ে বাসের দিকে তাকিয়ে রইল। সুন্দর পথ-পরিক্রমা করে আমরা চিত্রকূট পৌঁছেছিলাম। কাছের একটি ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে বেরুনো হল মন্দাকিনী স্নানে।

রামায়ণের মন্দাকিনী সরু স্বচ্ছতোয়া। জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ওপারে অরণ্যানী। জলে অজস্র মাছ। ঢল নামলেই ঝাঁক বেঁধে পায়ের কাছে চলে আসছে। এখানে মাছ কেউ ধরে না, কেউ খায় না। বরং মাছকে খাওয়ায়। বাঁধানো ঘাট, আমরা স্নানের জন্য নামলাম। অনেকক্ষণ জলে গলা ডুবিয়ে বসে রইলাম। মনে পড়ল ওঁর কথা। বুকের মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা। এখন উনি কোথায় জানি না, কোনো আশাই ওঁর পূর্ণ হয়নি। মন খারাপ হয়ে গেল, পূর্ণ আনন্দ আর পাওয়া হল না। ভাবতে চেষ্টা করলাম এই সেই মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত মন্দাকিনী। কত মুনি-ঋষি এই জলে অবগাহন করেছেন। অবগাহন করেছেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবী। তখনও মন্দাকিনীর জলস্রোত এমনিই বয়ে যেত। তখন আমি এবং উনি যে এখানে ছিলাম না, তা কে বলতে পারে? হয়তো ছিলাম। এই পবিত্র শীতল জলধারায় দুজনে স্নান করেছি। ওই অরণ্যভূমির ছায়ায় ছায়ায় কত বেড়িয়েছি, পাখিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করেছি। ভাবতে ভালো লাগছিল। কিন্তু কল্পনার ডানায় ভর করে জন্মান্তরের যবনিকা উত্তোলন করে বসে বসে ভাবার সময় কোথায়! তাই স্নান সেরে উঠে ভোজ্য উৎসর্গ করে তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় করলাম। মন্দাকিনীর জলে তর্পণ করলাম মৃত প্রিয়জনদের উদ্দেশে।

মন্দাকিনীর পাশে ছোট একটি পাহাড়ে উঠলাম। এখানে রামচন্দ্র সীতাদেবী কিছুদিন বাস করেছিলেন। ওখান থেকে ভরত-মিলনের জায়গায় এলাম। এখানে ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তার থেকে একটু উঠে তুলসীদাসের সাধনস্থান ইত্যাদি দেখা হল।

বিকেলে আমরা প্রমোদভবন দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সূর্য অস্তাচলগামী। আমরা মন্দাকিনীর ঘাট থেকে নৌকায় যাত্রা করলাম। সরু নদী, একদিকে পার্বত্যসঙ্কুল বনভূমি, অপরদিকে লোকালয়। ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কুলায় ফেরা পাখিদের কলকাকলি আর মাঝে মাঝে বানরদের একটা অদ্ভুত ডাক কানে আসছে। এখানে প্রচুর বানর দেখেছিলাম। আমরা বেশ অন্ধকারে প্রমোদভবনে এসে পৌঁছলাম। পূজারি আলো ধরে আমাদের নৌকো থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

চারিদিকে বাগান। অন্ধকার রাত্রি। ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। পরপর ছোট ছোট কয়েকটি ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। একটি ঘরে বেদির ওপর শ্বেতপাথরের লক্ষ্মীমূর্তি। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে সেই সজ্জিত লক্ষ্মীমূর্তির অপূর্ব চোখদুটি দেখে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম। ঠিক জীবন্ত মনে হয়েছিল। আজও মাঝেমধ্যে চিন্তা করলে সেই চোখদুটির আবেশঘন চাউনি মনের আকাশে ভেসে ওঠে।

সেবার চিত্রকূট থেকে বিন্ধ্যাচল যাই। ওখানে বিন্ধ্যদেবী দর্শন করে যাই চুনার। চুনার হয়ে ফিরি বাড়ি।

তারপর যথারীতি রুটিন-বাঁধা জীবন। ইতিমধ্যে খোকন 'অমরকৃষ্ণ পাঠশালায়' মাস্টারমশাই হয়েছে। বিয়েও হয়েছে। মনে আছে বৌমা সন্ধ্যাকে দেখতে গিয়েছিলাম। বি. এ. পাশ, ভালো গান করে।

যাই হোক, নিয়মিত স্কুল করি। আমাদের স্কুলে সবার সঙ্গে সবার একটা সুন্দর যোগসূত্র ছিল। সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত ছিলাম। উমাদি হেডমিস্ট্রেস। চেহারা ছিল বিরাট, আর ছিল দরদি অন্তর। আমাকে পরীক্ষার সময় ছুটি দিয়েছেন, যতবার বেড়াতে গেছি ছুটি নিয়েছি, প্রচণ্ড বকেছেন, আবার ছুটি মঞ্জুরও করেছেন। উমাদির মেয়েদের বিয়েতে আনন্দ করেছি।

মনে পড়ে, উমাদির ছোট মেয়ে কৃষ্ণা প্রথম স্বামীর কাছে যাচ্ছে। কৃষ্ণার স্বামী মিলিটারিতে কাজ করতেন, আগ্রায় পোস্টেড। সেবার কৃষ্ণাকে নিয়ে আগ্রায় যাচ্ছে। উমাদি কৃষ্ণাকে সাজিয়ে স্বামীর সঙ্গে হাওড়ায় রওনা করে দিয়ে স্কুলে এসেছেন, কিছুক্ষণ পরে খবর এল অ্যাকসিডেন্টে জামাই মারা গেছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে, কৃষ্ণার স্বামী জায়গা রাখবে বলে তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে কামরায় উঠতে গিয়ে কীভাবে লাইনে পড়ে যায় এবং তখুনি হয় মৃত্যু। সে একদিন গেছে। সেদিনের কথা

ভাবলে ভয়ে বুক শিউরে ওঠে। মাথায় ফুলের মালা, কপালে সিঁদুরের টিপ, সুন্দর করে সেজে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে, সেই মেয়ে ফিরে এল সেই সাজে। তখনও তাজা ফুলের গন্ধ ওর সর্বাঙ্গে। কপালে জ্বলজ্বলে টিপ। সেদিন এই ঘটনার সংবাদে সারা ভাটপাড়া বোধহয় বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন নিজের দুঃখ ভুলে কৃষ্ণার দুঃখে বুকটা টনটন করে উঠেছিল।

আনন্দের সংবাদও আছে। সব শিক্ষিকাদের বিয়েতে গিয়ে সবাই আনন্দ করেছি। আমার স্বামীর একটি ডায়েরির পাতায় লেখা ছিল, কার কোটেশান জানি না— "নিজের দুঃখ ভুলিয়া পরের আনন্দে সহানুভূতিশীল হইবে।" আরেকটি ছিল "পর্বত নির্ঝরিণীর ন্যায় উচ্ছল থাকিবে।" প্রথমটি অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম। আমার স্বামী দুটোই আয়ত্ত করেছিলেন। উনি অত্যন্ত উচ্ছল ও প্রাণবন্ত ছিলেন। একটা কথায় আছে না "নিশিদিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে ক্রন্দনের নাহি অবসান।" আমার লেখার ক্ষেত্রে বোধহয় এ কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু আমার এই দুর্বলতা আমি কিছুতেই জয় করতে পারছি না। সেজন্য মার্জনাপ্রার্থী। পরের দুঃখ শুনতে দু-একদিন ভালো লাগে, তারপর আর নয়। আমার ছোট মাসশাশুড়ি বলতেন, 'যমুনা, যখন তখন দুঃখ হলেও কেঁদো না, যাদের বাড়ি যখন থাকবে তারা তোমার দুঃখ বুঝবে না। ভাববে চোখের জল ফেলছে, বাড়ির অমঙ্গল হবে। মুখ গম্ভীর করেও থেকো না। তোমার দুঃখ তাদের ভালো লাগবে না, তোমার সামনে এখন অনেক পরীক্ষা।'

তখন থেকে হাসিমুখে থাকার চেষ্টা করেছি আর কেঁদেছি সবার অন্তরালে। কিন্তু এখন চোখের জল আর বাঁধ মানছে না। দুঃখের তার এত টান করে বাঁধা যে সেই তারে একটু আঘাত লাগলেই ঝনঝন করে বেজে উঠছে। চোখ ছাপিয়ে নেমে আসছে জলধারা। আর বারেবারে ঘুরেঘুরে আসছে আমার স্বামীর কথা। মনে পড়ছে ধীরে ধীরে বাবলু বড় হয়েছে। বি. এ. পাশ করে, ইংরেজি নিয়ে এম.এ.তে ভর্তি হয়েছে। তখন আমি বলেছিলাম, বাবলু, আমাকেও ভর্তি করে দে।

ভর্তি হলাম। কলকাতায় যাই পড়তে। শিয়ালদা স্টেশন থেকে অল্প একটু দূরে ইউনিভার্সিটি। হেঁটেই যাই। বন্ধুও মিলে যায় এখান থেকে। সুচিত্রা ঘোষ, ছন্দা, গোপা— ওরা নৈহাটি থেকে ট্রেন উঠত। চিত্রা উঠত কল্যাণী থেকে, মনীষা বেলঘরিয়া। বেশ আনন্দেই যেতাম আসতাম। আরও অনেকে ছিল। নামগুলো ঠিক মনে নেই। মনে পড়ছে কতবার দলবেঁধে চিত্রার বাড়ি গেছি, ওর বাবা-মা-বোনেরা কত যত্ন করেছেন। ছন্দা, গোপা— সবার বাড়িতেই গেছি। সুচিত্রার বিয়েতে ওরা এল আমাদের বাড়ি। থাকল মজা করে, বিয়ে দেখল।

পড়তে যাচ্ছি বটে, তবে অসুবিধা একটু হচ্ছে। কারণ আমার সকালে স্কুল ছিল, লাস্ট পিরিয়ড অফ পেয়েছিলাম, তাই সম্ভব হয়েছিল। তখন নিতাই বলে একটি ছেলে আমাকে রিকশা করে স্কুলে নিয়ে যেত এবং নিয়ে আসত। আমি বাড়ি এসে তৈরি হয়ে ওরই রিকশায় স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতাম। এতে আমার সময় অনেকটা বাঁচত। নিতাইকে না পেলে তখন আমায় বড় অসুবিধায় পড়তে হত।

৬

মনে পড়ে ওই সময় শুনলাম ঠাকুরপোরা 'কেদারবদরী' যাচ্ছে। আমার বহুদিনের ইচ্ছা হেঁটে কেদারবদ্রী ঘুরব। মাসিমার কাছে কত গল্প শুনেছি। ওদের বললাম, আমিও যাব।

মা ঠাকুরপোদের বললেন, বৌমাকেও নিয়ে যাও।

আর আমাকে বললেন, খাওয়াদাওয়া নিয়ে কোনো ঝামেলা কোরো না, তা হলে ওরা তোমায় সঙ্গে নেবে না। অবস্থা বুঝে সবকিছু মেনে নেবে।

আমি তাতেই রাজি হয়েছিলাম। বড়ঠাকুরপো, মেজঠাকুরপো, প্রীতি ও আমি— এই চার জন, পরম উৎসাহে গোছগাছ শুরু করলাম। দেওর খোকন টাকা দিলে। সব যোগাযোগ ঠিকঠাক হয়ে গেল। টিকিট রিজার্ভেশনও হয়ে গেছে। সে বছর প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, কাগজে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ওদিককার সব জলমগ্ন। পাহাড়ে ধস নেমে পথ বন্ধ ইত্যাদি। সবাই বলছে, এ অবস্থায় যেয়ো না। তীর্থ তো পালাচ্ছে না।

আমরা অবশ্য কোনো বাধা না মেনেই রওনা দিয়েছিলাম। রাত্রের গাড়ি, ঘুমিয়ে জেগে গল্প করে কেটে গেল। দু-রাত্রি ও একটা দিন পরে সকাল ন'টায় আমরা হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছলাম। এর আগেও একবার মা ও বড়দির সঙ্গে হরিদ্বার এসেছিলাম। ওঁর কথা মনে পড়ল। উনি বলেছিলেন, আমরা প্রথম বেড়াতে যাব দার্জিলিং। আমি বলেছিলাম, তারপর হরিদ্বার। সেই হরিদ্বারে আমি দু-বার এলাম আর উনি কোথায় থেমে রইলেন। মনে পড়ল বড়ঠাকুরের কথা। বলতেন, হরিদ্বারের দৃশ্য ঠিক ঘাটশিলার মতো।

মনে পড়ে আমরা ভোলাগিরি ধর্মশালায় উঠেছিলাম। খেয়েছিলাম বৌদির হোটেলে। বিকেলে হর-কি-পউরিতে গিয়েছিলাম। সেজ ঠাকুরপো ফুলের নৌকো ও প্রদীপ কিনে এনে দিল। আমি আর প্রীতি ফুলের নৌকোয় প্রদীপ ভাসালাম। সন্ধ্যা হয়ে এল। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। আমরা গঙ্গা এবং অন্য মন্দিরের আরতি দেখে লাঠি এবং কিছু কেনাকাটা করে ধর্মশালায় ফিরেছিলাম।

পরদিন সকালে ট্যাক্সি নিয়ে হৃষীকেশ। ওখানে কালী-কমলীর ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে বাকি জিনিসপত্র সমস্ত ওখানকার পোস্টমাস্টারমশায়ের জিম্মায় রেখে আমরা পরদিন খুব ভোরে বাসে গুপ্তকাশী যাত্রা করেছিলাম। সেই পবিত্র ভোরে সমবেত যাত্রীকণ্ঠের 'জয় কেদারনাথ, জয় গঙ্গামায়ী' ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাস ছাড়ল। এখনও যেন সেই জয়ধ্বনি কানে এসে বাজছে।

পাহাড়ের পথ ভালোই লাগছিল। প্রথমে আমরা দেবপ্রয়াগ, পরে শ্রীনগর কীর্তিনগর ইত্যাদি পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছলাম। ওখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। বেশ কিছুক্ষণ এখানে বাস দাঁড়িয়েছিল। সেই সুযোগে ওখানকার প্রকৃতিকে দু-চোখ ভরে দেখে নিয়েছিলাম। এরপর বাস অলকানন্দার সেতু পার হয়ে মন্দাকিনীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলল।

এই পথই গুপ্তকাশী হয়ে 'কেদারনাথ' যাবে। ওপারে দেখা যাচ্ছে অলকানন্দার তীর বেয়ে বদ্রীবিশালজির গিরিবর্ত্ম। খেতরি, রামপুর ইত্যাদি ফেলে আমরা অগস্ত্যমুনি বলে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় সন্ধ্যাবেলায় এসে পৌঁছলাম গুপ্তকাশী।

সব কথা যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে। তখন বেশ ঝেঁপে বৃষ্টি এল। ভিজতে ভিজতে রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে একটি গেস্ট হাউসে উঠলাম। ওখানেই আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। পাশেই মন্দির, আমরা রাত্রেই দেখতে গিয়েছিলাম।

পরদিন ভোরে উঠে বাইরে এসে দেখি, সামনেই দেখা যাচ্ছে চৌখাম্বা, বদ্রীনাথ ও মদমহেশ্বরের শৈলশিখর। নবীন সূর্যের কিরণসম্পাতে তুষারমণ্ডিত হিমালয় যেন ঝলমল করে উঠেছে। পূর্বরাত্রের বৃষ্টির বিষণ্ণতা কোথাও নেই। নীচে মন্দাকিনীর উপত্যকা পার হয়ে অপরপারে উখীমঠ। গুপ্তকাশী থেকেই ভালো পথ-জানা একজন কুলি ঠাকুরপো়রা ঠিক করে নিয়েছিল, কারণ আমাদের গন্তব্যস্থান শুধু কেদারনাথ নয়, সম্ভব হলে মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ ও অনসূয়া যাওয়া হবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় মাথায় টুপি, পায়ে কেড্স এবং হাতে লাঠি নিয়ে 'জয় কেদার' বলে পায়ে হাঁটা শুরু করেছিলাম। সেদিন প্রথমে ফাটা হয়ে রামপুরায় এক দোকানির দোতলায় রাত কাটিয়েছিলাম। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। পরদিন অপরিচিত পরিবেশে প্রথমে ঘুম ভেঙেই মনে হল আজ ত্রিযুগীনারায়ণ যাব।

আমরা চা খেয়ে হাঁটা শুরু করেছিলাম। এক জায়গায় একটি পাহাড়ের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে 'ত্রিযুগীনারায়ণ মার্গ'। এটা ঠিক কেদারের পথে নয়,

একটু উঠে গিয়ে। সবই পাহাড়ি চড়াই। পথে পড়ল শাকম্ভরী দেবীর স্থান। তারও একটু ওপরে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির। মন্দিরে নারায়ণ মূর্তি, কুণ্ডে অখণ্ড অগ্নি জ্বলছে। ওখানে নাকি হরপার্বতীর বিবাহ হয়েছিল নারায়ণ সাক্ষী করে। চারিদিকের দৃশ্য অপূর্ব। ওখান থেকে আমরা অন্য একটি পথ দিয়ে শোন ব্রিজ পর্যন্ত এসেছিলাম। এই পথটির সবটাই ছিল উতরাই। পায়ে-চলা পথ, পর্বতগাত্রে ঘন অরণ্য। পায়ের তলায় পুরু ঝরাপাতার স্তর।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর পেলাম শোনগঙ্গা। এখানে শোনগঙ্গা ও মন্দাকিনীর মিলনস্থান। নদীর ওপর মস্ত ব্রিজ, সামনে বিরাট খাড়াই পাহাড় আর তার গা বেয়ে পায়ে-চলা সরু পথ। ওই চড়াই পার হয়ে ক্লান্তপদে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ডের রেস্ট হাউসে। রেস্ট হাউস থেকে একটু নেমে গৌরীদেবীর মন্দির, উষ্ণকুণ্ড চটি, কয়েকটি দোকান, আর তার পাশ দিয়ে মহানন্দে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী নদী।

গেস্ট হাউসটি ভালো এবং নতুন। ওখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। দারুণ শীত। লেপ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফিসু পোকার কামড়ে লেপ গায়ে রাখা দায়। চোখে তাদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অনবরত কামড়ে চলেছে। সেদিন খুব ক্লান্ত ছিলাম, তবুও নতুন জায়গা দেখতে ভালো লাগছিল। নীচে পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উপত্যকায় ছোট্ট গ্রাম 'গৌরীকুণ্ড'। সামনে বনাবৃত শৈলশ্রেণী, নীচে খরস্রোতা শব্দমুখরা মন্দাকিনী। একটি টানা জলতরঙ্গ কানে এসে বাজছে। রাত্রে অনেকক্ষণ আমরা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের নিভৃত বক্ষের ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্য দেখেছিলাম।

সেদিন ফিসু পোকার কামড়কে উপেক্ষা করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কাচের জানলা দিয়ে অনেক রাতে-ওঠা চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। আর কানে আসছে মন্দাকিনীর জলধারার শব্দ যা স্বর্গীয় সংগীতের মতো মধুর। আমি উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের বুকের ওপর থেকে অন্ধকার সরে গেছে এবং হালকা জ্যোৎস্নায় ভেসে কে যেন সবটাকে আবৃত করে দিয়েছে। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা মুহূর্তের মধ্যে মনকে এক অপার্থিব অনুভূতিতে ভরিয়ে দিল। মনে হল আমি যেন এ পৃথিবীর মানুষ নই, অন্য কোনো বহুদূরের গ্রহান্তরের মানুষ, আমি সেখান থেকে জ্যোৎস্নার স্তিমিত আলোকে পূর্বজন্মের ফেলে-আসা পৃথিবীর দিকে বেদনাতুর চোখে তাকিয়ে আছি। মনে পড়ছে আমার জন্মভূমি, আমার স্বামীর গৃহ, তাঁর ব্যথা-ভরা ম্লান মুখ। মনে পড়ল বড়ঠাকুরের কথা। ওঁর লেখা 'দেবযান'-এর কথা।

পরদিন ভোরে আমরা কেদারনাথের উদ্দেশে রওনা হলাম। চড়াই পথ, ক'দিন ধরে ক্রমাগত হাঁটা হচ্ছে, তাই হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। ঠাকুরপোরা খুবই উৎসাহ দিচ্ছে। বিখ্যাত রামওয়াড়ার চড়াই উঠছি। ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে সর্বত্রই পাহাড় আর পাহাড়। তাদের গা বেয়ে নেমে আসছে অজস্র ঝরনাধারা। মাথার ওপর মুক্ত আকাশ আর খরদীপ্ত রৌদ্র।

জঙ্গলচটি, ভীমশীলা পার হলাম। ঠাকুরপোরা বলছে, বৌদি, এসে গেছে। ওই যে গড়ুর চটি দেখা যাচ্ছে, ওটা পার হলেই ব্যস—

বহু কষ্টে গড়ুর চটি পার হলাম। অবশেষে দেখা দেল কেদারনাথের মন্দিরচূড়া। সতৃষ্ণ নয়নে তাকালাম, সত্যিই তাহলে এসে গেছি! বুকভরা বিস্ময় ও ভালোবাসা নিয়ে ক্লান্তপদে মন্দাকিনীর ব্রিজ পার হলাম। বেলা তখন চারটে হবে।

কেদারনাথের মন্দিরে এসে দেখি মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ দুয়ারে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দেখি— একটি লোক এসে আমাদের হাতে পোলাওয়ের মতো মিষ্টি সুস্বাদু ভোগ দিলেন, বললেন, 'এই চারটের সময় কেদারনাথের ভোগ হয়।' অপ্রত্যাশিতভাবে ভোগ পেয়ে খুবই তৃপ্তি হয়েছিল।

সেদিন রাত্রে কেদারনাথের আরতি দেখেছিলাম। অপূর্ব ফুলের সাজে কেদারনাথকে সাজানো হয়েছে। অনেক ব্রহ্মকমল ফুল ছিল। প্রধান রাওল অনেকক্ষণ ধরে আরতি করলেন। প্রাণভরে দেখলাম। পরদিন প্রধান রাওল আমাদের কেদারনাথের পুজো করালেন। ভারী তৃপ্তি হয়েছিল। প্রাপ্তির আনন্দ যেন লাভ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল আমার স্বামীর কথা, চোখে জল ভরে এসেছিল। আমি কত কিছু দেখছি, শুনছি। উনি কিছুই পেলেন না।

সেজ ঠাকুরপো মন্দাকিনীর জলে তর্পণ করলে। তারপর নামার পালা। উতরাই পথ। দেবদর্শনের পর আমাদের চলার ছন্দ তখন লঘু হয়ে উঠেছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে, তখন আমরা গৌরীকুণ্ডে এসে পৌঁছলাম। প্রীতি এবং আমি কুণ্ডের গরম জলে বেশ করে স্নান করেছিলাম।

পরদিন পুনরায় যাত্রা শুরু। বাসে করে এসে আমরা নালা চটিতে নামলাম। এবার সামনে আমাদের নতুন রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে মদমহেশ্বর যেতে হবে। পথের দুপাশে তেজপাতার অরণ্য, বড়ঠাকুর এসব দেখলে কত খুশি হতেন। আমরা তেজপাতা পেড়ে এবং মাড়াতে মাড়াতে চলেছি। দেশে এগুলো আমরা কিনি। একসময় কানে এল কালীগঙ্গার জলের শব্দ। ব্রিজ পার হয়ে বেলাশেষে আমরা 'কালীমঠে' পৌঁছেছিলাম। কালীগঙ্গার পাশেই আমাদের থাকার ঘর ঠিক হয়েছিল। সেদিন সারারাত্রি কালীগঙ্গার জলকল্লোল আমাদের ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়েছিল।

বেশ মনে আছে, পরদিন ভোরে আমাদের যাত্রা শুরু। ঠিক হয়েছিল সেইদিনই 'গণ্ডার'-এ পৌঁছোতে হবে। প্রথমে যাই 'লেক' বলে একটি জায়গায়। তারপর 'রসি' গ্রামে পৌঁছোলাম। এখানে 'রাবেশ্বরী' দেবীর মন্দির। রসিতে পূজারির আতিথ্য নিয়ে পুনরায় হাঁটা শুরু। পথ বড় দুর্গম, সেবার বর্ষা বেশি, তাই পথঘাট খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পার্বত্য নদীর বুকে স্থানীয় লোকের কাঠকুটো দিয়ে তৈরি সেতু সব বর্ষার জলে নড়বড় করছে, কোথাও বা খানিকটা ভেঙে গেছে। অতি সন্তর্পণে আমরা একটার পর একটা পার হয়ে প্রায় সন্ধ্যায় গণ্ডারে এসে পৌঁছেছিলাম।

মন্দাকিনীর ধারে পঞ্চায়েত-কক্ষে কোনোমতে একটু স্থান পেয়েছিলাম। সেবার বর্ষার জন্য ওদিককার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল, তাই আহার জুটেছিল নামমাত্র, অবশ্য তাতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। আমরা পৌঁছোবার একটু পরেই ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। সে রাত্রে আমরা ভেবেছিলাম এখানেই আমাদের সলিলসমাধি হবে, এটাই আমাদের কপাললিখন। সে রাতটা সত্যিই আমাদের কাছে বড় ভয়াবহ হয়ে এসেছিল। দুর্যোগের সে রাত্রি কাটিয়ে প্রভাতে আমরা রওনা দিয়েছিলাম মদমহেশ্বরের উদ্দেশে। সঙ্গের সব জিনিস গণ্ডারে রেখে যাওয়া হয়েছিল, শুধু সঙ্গে ছিল কফির সরঞ্জাম, কারণ সেদিনই ফিরে আসা হবে ঠিক ছিল। সেদিনের কথা ভাবলে এখন আনন্দ এবং বিস্ময় দুই-ই হয়।

মদমহেশ্বরের পাহাড় সবটাই খাড়াই এবং চড়াই। প্রথমদিকে কোথাও গাছপালা নেই, ঝরনাও দেখা যায় না। কেদারনাথের চেয়েও উঁচু। হাঁটতে হাঁটতে কেবলই জল তেষ্টা পাচ্ছে, তার ওপর প্রচণ্ড রোদ্দুর। কে বলবে গত রাত্রে গণ্ডারে জলবৃষ্টির ঠেলায় আমরা ভেসে যেতে বসেছিলাম। একটু হাঁটলেই ক্লান্তি আসছে। একটু করে উঠি আর লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াই। এইভাবে বেশ অনেকটা ওঠার পর কিছুটা রাস্তায় ঘন অরণ্য পেয়েছিলাম। সেই গাছগাছালির মধ্য দিয়ে সূর্যকিরণের আলোছায়ার আলপনা মাড়াতে মাড়াতে চলেছি।

অনেকটা দূর থেকে দেখতে পেলাম মদমহেশ্বরের মন্দিরচূড়ার শ্বেতপতাকার কাঁপন। তাই দেখে ক্লান্ত অবসন্ন পদেও বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলাম। অবশেষে মন্দিরদুয়ারে যখন পৌঁছোলাম তখন বেলা বারোটা। এটি পঞ্চকেদারের এক কেদার। এখানে মহিষরূপ মদমহেশ্বরের নাভি পড়েছিল। মন্দিরের মধ্যে পাথরের শিবলিঙ্গ, আরও কয়েকটি দেবতার মূর্তি রয়েছে। পাশেই আকাশছোঁয়া পাহাড়। সেখানে বৃদ্ধ মদমহেশ্বরের আবাস। আমরা পূজা দিলাম, ভালো লেগেছিল।

পাহাড়ের ওপর উন্মুক্ত প্রান্তর, ওপরে নীল আকাশের নীলিমা। ভারী চমৎকার দৃশ্য। মন্দির থেকে কিছুটা দূরে একটি টিনের ছাউনি দেওয়া কোঠাঘর যাত্রীনিবাস।

প্রীতি সেই ঘরে বসে কফি তৈরি করে আমাদের দিলে। পূজারি রাওলও আমাদের সঙ্গে কফি খেলেন। একমাত্র রাওল ছাড়া আর কোনো লোক দেখলাম না। একটু বিশ্রাম করে নেমে আসব, হঠাৎ কালো মেঘ করে এল বৃষ্টি। ঠাকুরপোরা চিন্তিত, কারণ প্রচণ্ড শীত, সঙ্গে গরমের কিছু নেই। জামা নেই, বিছানা নেই, খাদ্যও নেই। সবই গণ্ডারে। প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে রাওল বললেন, সামনে রাত্রি, এই বৃষ্টিতে সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন, আমি আপনাদের যেতে দিতে পারব না। রাতটা এখানে থেকে যান।

কী আর করব, বসে বসে বৃষ্টি দেখছি। সমস্ত পৃথিবী যেন জলে একাকার হয়ে গেছে। ভালো লাগছে, আবার ভয়ও করছে। যাই হোক, পূজারি তাঁর থাকার ঘরের পাশে আমাদের একটি ছোট ঘর দিলেন আর দিলেন একটি লেপ ও একখানি কম্বল এবং আধসের আটা। উনি আর কী করবেন, ওর বেশি ওঁর কাছেও কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে বাহাদুর ছিল। সে রুটি বানালে, সঙ্গে চিনি ছিল, তাই দিয়ে আমরা পাঁচজন খেলাম। মজা হল শোয়ার সময়। পাতার কিছু নেই, মাটির মেঝে কনকন করছে। প্রীতি ও আমি লেপটা নিয়ে একটু গায়ে দিলাম। ঠাকুরপোরা দুজন কম্বলটা নিলে, বাহাদুর নিজের গামছা। একটু পেতে সেই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে শুনলাম রাওলের ঘরে রেডিয়োতে সংবাদ হচ্ছে। তাঁর ঘরে একটি কস্তুরী মৃগকেও দেখেছিলাম।

সেদিনের সেই বিচিত্র রাত্রির কথা একটুও ভুলিনি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝুপঝুপ শব্দ, মাঝে মাঝে মেঘ ও বিদ্যুতের ছটা। আমার স্বামীর কথা মনে পড়ল। এসময় উনি থাকলে কী করতেন, ঘন ঘন সিগারেট খেতেন আর গান করতেন। বড়ঠাকুর হলে চুপ করে বসে প্রকৃতির মাঝে অরূপের লীলা আস্বাদন করতেন। আমাদের সেই রাত্রি কাটল। ভোরে উঠে দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার ও বৃষ্টি থেমেছে। পাহাড়ের দেশের এই মজা— কখনও মেঘ, কখনও রৌদ্র। আমরা মদমহেশ্বরের বন্ধদুয়ারে প্রণাম করে পথে নেমে পড়লাম।

গণ্ডারে এসে জিনিসপত্র নিয়ে লাঠি হাতে আবার শুরু হল পদযাত্রা। এরপর আমরা উখীমঠে যাচ্ছি। বৃষ্টির জন্য সারাপথই জখম ছিল। অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা এবং নদী পার হতে হয়েছে। এক জায়গায় আমরা মন্দাকিনীর ওপর ইংরেজ আমলের বিরাট ব্রিজ পার হয়ে কেদারখণ্ডকে প্রণাম জানিয়ে বদ্রীখণ্ডে প্রবেশ করলাম। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত উখীমঠ উষাদেবীর মন্দির, মন্দিরে ওঁকারেশ্বর শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি এবং পঞ্চমুখ শিবের রৌপ্যনির্মিত একটি মূর্তি রয়েছে। এটি পঞ্চকেদারের প্রতিরূপ শুনলাম। শীতকালে কেদারনাথ ও মদমহেশ্বরের ভোগমূর্তি এখানে আসেন, এখান থেকে তাঁদের উদ্দেশে পূজা হয়। পরদিন আমরা তুঙ্গনাথের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম।

উখীমঠ বেশ শহর জায়গা। আমরা হাঁটছি। সেদিন হাঁটা শেষ হয়েছিল 'বেনিয়াকুণ্ড' কালীকমলীর ধর্মশালায় পৌঁছে। সেদিন সারাটা পথ হাঁটতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ধর্মশালায় এসে আর কোনো অসুবিধা হয়নি। নির্বিঘ্নে রাতটা কাটল। গতদিনে আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে দেখে ঠাকুরপোরা বলেছিল, বৌদি, আপনি না হয় এখানে থাকুন। আমরা তুঙ্গনাথ ঘুরে আসি।

তুঙ্গনাথ কেদারনাথের চেয়েও উঁচু শুনে অনেকক্ষণ মনের সঙ্গে কথা বললাম। মনে হল, জীবনে আর তো আসা হবে না, মরি আর বাঁচি— যাব। রাত্রে খুব করে পায়ে মালিশ ও সেঁক করলাম এবং ওষুধও খেলাম। তা ছাড়া রাত্রে ঘুমিয়ে শরীরও ঠিক হয়েছে। অসুবিধা হবে না, যেতে পারব।

'জয় তুঙ্গনাথ' বলে সবাই একসঙ্গে পথে বেরুলাম। আমরা তুঙ্গনাথ যাচ্ছি শুনে একজন পুরোহিত আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, আর একজন দোকানিও সঙ্গে গেলেন। ছাড়লেন না। বললেন ওখানে ওঁর দোকান আছে, যাত্রী গেলে তাদের পুরি ও তরকারি করে খাওয়ান, সুতরাং আমাদেরও খাওয়াবেন। আমাদের ভালোই হল।

আজ কত কথাই মনে পড়ছে। বাহাদুর আমাদের সঙ্গে যায়নি, ওকে জিনিসপত্র নিয়ে কাছের একটি বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তুঙ্গনাথের পথ শুধু চড়াই। গাছপালা বিশেষ দেখলাম না। চারিদিকের দৃশ্য অপরূপ। দৃষ্টি এখানে সীমিত গণ্ডির মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে না। যতদূর চাও দেখা যাচ্ছে মেঘহীন সুনীল আকাশ। ওখান থেকে বহু দূরে দূরে সব পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছিল। একদিকে কেদারশৃঙ্গ ও কেদারডোম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, অপরদিকে চৌখাম্বা। একটু পাশে মদমহেশ্বরের শৈলশ্রেণী। সামনে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী। নীচে তৃণাচ্ছাদিত পার্বত্যভূমি।

একটু একটু করে হাঁটছি আর দাঁড়িয়ে দেখছি। কষ্ট হলেও আমল দিচ্ছি না, যা সুন্দরের মেলা চারিদিকে! বোধহয় বেলা এগারোটা নাগাদ তুঙ্গনাথ পৌঁছোনো হল। তুঙ্গনাথ তৃতীয় কেদার, বহুশ্রুত এই তীর্থ। ওখানে একজন পূজারি থাকেন, আমাদের দেখে বেরিয়ে এলেন। বয়স অল্প। মন্দিরচত্বরের একদিকে পাহাড়ের ওপর চমৎকার হালফ্যাশানের কয়েকটি ঘর। তিনি বললেন, এখানে একরাত্রি থাকুন। আমি কম্বল বিছানা দেব। দেখবেন রাত্রে কী দৃশ্য!

আমাদের খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল থাকতে, কিন্তু বাহাদুরকে নীচে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, তা না হলে আমরা থেকে যেতাম। বাধ্য হয়েই ফিরতে হল। মনে হচ্ছিল বড়ঠাকুর হলে থেকে যেতেন আর বলতেন, 'বাহাদুর চ্যান করুকগে।' আর আমার স্বামী বোধহয় ভাইদের সঙ্গেই নেমে আসতেন। যাই হোক, আমরা পুজো দিয়ে, সেই দোকানির কাছ থেকে রুটি-তরকারি খেয়ে, সবার কাছে বিদায় নিয়ে, একটি বনাকীর্ণ

পথে পা বাড়ালাম। মনে হচ্ছিল বহুকাল এ পথে মানুষের পদস্পর্শ ঘটেনি। ঝরাপাতায় রাস্তা পুরু হয়ে আছে, তেমনি জোঁকের উপদ্রব। ছায়াশীতল উতরাই পথ নামতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না। দুটোর বাস ধরা হবে বলে তাড়াতাড়ি করে বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখা গেল বাস কোন সকালে ছেড়ে দিয়েছে। অতএব হন্টন, আজই আমাদের 'মণ্ডলে' যেতে হবে। পায়ে-চলা পথে হাঁটছি, কিছুক্ষণ পরে নামল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে পথচলা যে কী কষ্ট তা বলার নয়। অনেক দুর্ভোগের পর পাওয়া গেল 'মণ্ডল'।

এতক্ষণ বোঝাই যাচ্ছিল না আমার কোথায় চলেছি। খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে তরতরিয়ে নেমে আমরা কালীকমলীর ধর্মশালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখি দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বললে, আপনাদের আসতে দেখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। আপনারা কি বাঙালি?

ওদের মধ্যে একটি ছেলে বাঙালি, অপরটি মাদ্রাজি। আমার প্লেন করে কাপড়-পরা দেখে ওরা আন্দাজ করেছিল আমরা বাঙালি। বাঙালি ছেলেটির নাম প্রদীপ, বর্ধমান জেলার কোনো গ্রামে ওর বাড়ি। বাড়িতে আমারই মতো বিধবা মা আছেন। ওরা গুটিপোকার কী যেন অফিস আছে, সেখানে কাজ করে। কাছেই ওদের মেস।

কালীকমলীর ধর্মশালার অবস্থা বাসযোগ্য নয়। সামনে রাত্রি! কী করা হবে? অঝোরধারে বৃষ্টি পড়ছে। ছেলেদুটি তাদের মেসের একমাত্র ঘরটি ছেড়ে দিলে। সে রাত্রি ওদের ঘরে থাকলাম। সেদিন ওদের না পেলে আমাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হত।

পরদিন সকালে ওদের মেসে জিনিসপত্তর রেখে আমরা অনসূয়া দর্শনে যাত্রা করলাম।

প্রদীপদের মেসের পিছনে কয়েকটি রামদানা খেত। তারই সরু আলপথ দিয়ে আমাদের অনসূয়া যাওয়ার পথ। আগের দিনের বৃষ্টিতে পথঘাট থইথই করছে, যেতে যেতে দুটি ঝরনা পাওয়া গেল। পাথরে পা টিপে টিপে আমরা চলেছি। একটা গ্রাম পেলাম। অনসূয়া পাহাড়ও বেশ বড় এবং উঁচু। পাহাড়ের ওপর মন্দির। সামনে খোলা ছাদের মতো বেশ খানিকটা জায়গা। পাশে দুখানি চালাঘর। পূজারি আমাদের দেখে মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। অনসূয়া কিশোরী মূর্তি। মন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে, তারই মৃদু আলোতে মায়ের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। পূজারি আমাদের পূজা করালেন। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

মাথার উপর দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশ। তারই তলে অনসূয়ার মন্দিরটি ভারী সুন্দর লাগছিল। নির্জন স্নিগ্ধ পরিবেশ। পূজারি আমাদের রুটি ও আলুর তরকারি

খাওয়ালেন। এঁরা বড় অতিথিবৎসল। যখন ফিরে আসছি তখন মেয়েরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, আবার আসবার জন্যে বারবার বলতে লাগলেন। যতক্ষণ দেখা যায়, দাঁড়িয়ে রইলেন। ফেরার সময় বড় মন খারাপ হয়ে গেল, যেন নিকট কোনো আত্মীয়কে ছেড়ে আসছি।

পরদিন প্রদীপদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোপেশ্বর, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে আমরা হৃষীকেশে ফিরেছিলাম। বাহাদুরকে রুদ্রপ্রয়াগে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। একদিনে ও যেন আমাদের আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল।

৭

হৃষীকেশ থেকে হরিদ্বারে এসে একটা ট্যাক্সি করে দেরাদুন এলাম। ওখানে বিষ্ণু অর্থাৎ ডা. বিশ্বনাথ জোয়ারদার সস্ত্রীক ছিল। ওর বাসায় গিয়ে দেখা করে হোটেলে একদিন থেকে পরদিন গিয়েছিলাম মুসৌরি। মুসৌরি খুবই ভালো, কিন্তু গিয়ে বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ল ঘাটশিলার কথা। তখন আমি সংসার করছি। দিদি-বড়ঠাকুরের আসার কথাবার্তা চলছে। আমরা দুজনে দিন গুনছি কবে আসবেন। একদিন আমার স্বামী ডাক্তারখানা থেকে এসে বললেন, দাদার চিঠি এসেছে। ওঁরা বেড়াতে যাচ্ছেন। তাহলে ওঁদের আসতে দেরি হবে।

বলে স্নান করতে চলে গেলেন। বড়ঠাকুর লিখেছেন—

বনগাঁ

নুটু,

আমি এদিকে বড় ব্যস্ত। ১০ই এপ্রিল 'মেঘমল্লার' অভিনয় হবে নৃত্যে। কালিকা থিয়েটার, ভবানীপুর। কাল full rehearsal ছিল, কলকাতায় গিয়েছিলুম। এইমাত্র আসচি। অনেকগুলো বই-এর contract হাতে— এত busy যে একা পেরে উঠচি নে। তোমার বৌদিকে পাঠানো বর্ত্তমানে সম্ভব হোল না। একা লোক, প্রায়ই Cal যেতে হচ্ছে। তুমি আসবে play দেখতে? ১০ই বৈশাখ গজেনরা সবাই সস্ত্রীক হরিদ্বার যাবে। আমি ও তোমার বৌদিদিকে ওরা নিয়ে যেতে চাইচে ওদের ব্যয়ে। অবশ্য ভ্রমণবই লিখতে হবে। ওদের দিতে হবে।

তোমার বিষয়ে আশা করি সব ভালো। বাড়ীটা এখনো মল্ল ছাড়েনি। বাড়ীর সব ভালো। আশীর্ব্বাদ দিও বৌমাকে ও তুমি ও গুটকে নিও।

আঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন চিঠি এল দিল্লির কুতুবমিনার ডাকঘরের ছাপ বহন করে। বড়ঠাকুর ভাইকে লিখেছেন, সঙ্গে দিদি আমাকে একটু লিখেছে—

কুতুবমিনার, দিল্লী

নুটু,

এইমাত্র তোমার বৌদিদি ও আমি কুতুবমিনার থেকে এলুম। এখনও হাঁপাচ্ছি। পরশু আগ্রা থেকে এসেছি। জ্যোৎস্নায় তাজমহল কী অপূর্ব। তোমার বৌদিদি কেঁদে ফেললে। কুতুবমিনার ডাকঘরের ছাপ দেখো উল্টোপিঠে; এখানে লেখা আছে— এই ডাকঘরে চিঠি দাও। 'কুতুবমিনার' ডাকঘরের ছাপ থাকবে। সময় কম, এখন অনেক দেখতে হবে, বেলা ৪টা। আশীর্ব্বাদ নিও।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদি আমাকে লিখেছে—

কুতুবমিনার, দিল্লী

যমুনা,

আমার আশিস নে। কুতুবমিনার থেকে লিখছি। খুব ঘুরছি। উমা-ফুচুকে, ঠাকুরপো অজিতকে আশীষ দিস। ইতি—

তোর দিদি

ওই সময় দিদিরা অনেক জায়গায় ঘুরেছিল। দিদি বলেছিল, কাশীর সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থানগুলো দেখে আমরা আগ্রা গিয়েছিলাম। সেবার কাশীতে খুব বৃষ্টি পেয়েছিলাম। ঠাণ্ডা লেগে তোর বড়ঠাকুরের জ্বর হল। জ্বর গায়ে আগ্রা যাওয়া হয়েছিল। সেইজন্যে ফতেপুর সিক্রি যাওয়া হল না, তবে সেকেন্দ্রাবাদ, ফোর্ট এইসব দেখে সন্ধ্যায় তাজমহল। সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সেই জ্যোৎস্নায় তাজমহল দেখলাম। অপূর্ব রে! আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এরপর মথুরা দেখে দিল্লি। ওই সময়ই হরিদ্বার-হৃষীকেশ-লছমনঝুলা হয়ে দেরাদুন মুসৌরি যাই।

মুসৌরি থেকে বড়ঠাকুরের চিঠি এল। ভাইকে লিখেছেন—

মুসৌরি, ৩১.১০.৪৫
বুধবার

কল্যাণবরেষু,

দেরাদুন হয়ে মুসৌরী এসেছি, অপূর্ব রাস্তা দেরাদুন থেকে। মুসৌরী ৬০০০ ফুট হিমালয় পর্বতের ওপর, ঘুরে ঘুরে মোটববাস উঠলো। Regent Hotel নামে

একটি ভালো হোটেলে উঠেছি। বহু নিম্নে দেরাদুনের সমতলভূমিতে রৌপ্যধারার মতো কী একটা নদী বয়ে চলেছে। খুব কনকনে শীত, এখন বেলা ৫টা। শীতে জমিয়ে দিচ্ছে। তবে dry শীত, জবুথবু করে ফেলে না। আজ সকালে বরফাবৃত হিমালয়শৃঙ্গের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

Camel Back নামক একটি স্থান থেকে ৫০০ ফুট লম্বা তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যায়। তোমার বৌদিদি আসবার পথে বমি করে ফেলেছিল, এত এঁকেবেঁকে হু হু করে উঠছিল বাসটা। এখানে এসে খুব ভালো আছে।

অপূর্ব দৃশ্য চারিধারে। তবে বড্ড বেশী কনকনে শীত, এই যা কষ্ট। একটু কুয়াশার মতো জমেছে নীচের দিকে; সাহেবী জায়গা, বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, সাহেবী দোকান, বাটার দোকান ইত্যাদি, সাহেবী বাংলোবাড়ী ইত্যাদি। জিনিসপত্র আক্রা।

হরিদ্বারে লছমনঝুলা ও হৃষীকেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বিরাট gorge, কুলুকুলু বাহিনী গঙ্গা গভীর ফুলে নেমে আসচেন। নিবিড় বনভূমি। হঠাৎ দেখি লেখক মণীন্দ্রলাল বসু ও তার স্ত্রী নামচে বাসে হৃষীকেশ দেখে। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা— তাঁর বাড়ী নবদ্বীপে। তিনি আবার আমাদের দেশের কথা জানতেন। ভালো আছি। শীত। আকাশ পরিষ্কার। গুটকে কেমন আছে? ফুচু কেমন আছে? তোমরা আশীর্ব্বাদ নিও।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদি লিখছে—

বোন যমুনা, ভীষণ ঘুরছি। কেমন আছিস? আমরা ভালো। ঠাকুরপো, তুই, উমা, গুটকে, ফুচু আমার আশীষ নে; তোদের কথা সবসময় মনে পড়চে এত বৈচিত্র্যের ভেতরেও। ভারী সুন্দর লাগচে। তোদের আমার কথা মনে পড়চে তো? মুসৌরীতে উঠবার পাহাড়ের পথটা বেশ লাগল। আজ উঠি। সকলে আশীষ নে আমার।

ইতি
তোর দিদি

চিঠি পড়ে আমরা দুজনে ঠিক করলাম আমরাও বেড়াতে যাব এবং দেরাদুন-মুসৌরি নিশ্চয়ই যাব।

৮

আবার চলল খাওয়ার পরে রাঁধা, রাঁধার পরে খাওয়া। স্কুল করি, কলকাতা যাই। অনুভব করি কেমন যেন একটা পরিবর্তন আসছে। জগৎই তো পরিবর্তনশীল। আমার নিজের মাথা গোঁজার স্থান নেই। মা বাড়ি দিতে চেয়েছিল। আমি জিদ করে নিইনি, কারণ মনে হয়েছিল, বিধবা মেয়ে সুবিধা নিচ্ছে। তা ছাড়া মনে হয়েছিল, একটা জীবন যা হোক করে কেটে যাবে। সবাই তো বলছে, এসো এসো। কিন্তু হায়রে আমার কপাল। জীবনটা আমার ভুলে ভরা। দুনিয়া বড় বিচিত্র, জীবনটাও।

এম. এ. পাশ করলাম। সবই চলছে, তবুও কোথায় যেন একটা ছন্দ কেটে যাচ্ছে।

একবার স্কুল থেকে ছাত্রীদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়া হয়েছিল। সারারাত বাসযাত্রা। আনন্দ করে সব দেখাশোনা হয়েছিল। একবার কলকাতা যাওয়া হয়েছিল। সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে আমরা প্ল্যানেটেরিয়ামে ঢুকলাম। খুব ভালো লেগেছিল। ওই সময় পরেশনাথের মন্দির দেখতে যাওয়া হয়েছিল। মনে পড়ছে বিয়ের পর একবার আমার স্বামীর সঙ্গে পরেশনাথের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবে অবাক লাগে মনের গতি কত দ্রুত। সে কবেকার কথা। চকিতের মধ্যে মনে পড়ে গেল।

ছোটবোন নীলিমার শ্বশুরবাড়ি খড়দহে। ওর স্বামী সন্তোষ গোস্বামী। মাঝে মাঝে ওর বাড়ি শ্যামসুন্দর দর্শন করি। একবার খেয়াল চাপল কাছাকাছি যত দেবদেবীর মন্দির আছে দেখব। প্রথম শুরু করলাম কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্রের রাধাবল্লভ দিয়ে। তারপর কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে কেষ্টবাইজির মন্দির। মন্দিরের পরিবেশটি ভারী ভালো লেগেছিল, মূর্তিটিও সুন্দর। প্রায় প্রতিমাসে একবার করে যেতাম। গ্রাম জায়গা, গাছপালায় ছাওয়া সরু পথ, বেশ লাগত। চারিদিকে সবুজ স্নিগ্ধতা।

গঙ্গার আরপাড়ে হংসেশ্বরীর মন্দির। জাগুলিয়া হয়ে বিরহী যেতে হয়। বিরহীতে ভাইদ্বিতীয়ার মেলা বসে। মন্দিরের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। একদিন ঘুরে এলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে আড়ংঘাটাব জগুিযুগলের সমারোহে মেলা বসে। একদিন গিয়েছিলাম। এইভাবে ঘুরি, কিন্তু কোথায় শান্তি? বৈশাখ মাসে যণ্ডেশ্বরে গিয়ে বাবার মাথায় জল দেওয়া আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি। ছোটবেলায় যণ্ডেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে মেলা দেখতাম। প্রচুর পদ্মফুল বিক্রি হত আর ছিল বৈঁচির মালা। বৈঁচির মালা কিনে গলায় পরতাম আর মাঝেমাঝে মালা থেকে বৈঁচি নিয়ে মুখে পুরতাম।

একবার ছুটলাম মাহেশের রথ দেখতে। বেলুড়মঠ আর দক্ষিণেশ্বর তো প্রায়ই যেতাম। একবার রথে পুরী যাওয়ার কথা হল। অনেক জল্পনার পর ঠিক হল, খাওয়া

হবে। মনে প্রচুর আনন্দ। জগন্নাথ দর্শন হবে, সমুদ্র দেখব। দিদির কাছে (বড় জা) সমুদ্রের গল্প শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনতাম দিকহীন অনন্ত সমুদ্রের সৌন্দর্য বিরাটত্ব ও ভীষণত্বের কথা। আমার মেজদি, সেজদাদা, সেজদি, কুতান ও আমি গিয়েছিলাম। রথে জগবন্ধু দর্শন হল। সমুদ্র দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আর দেখেছিলাম জনসমুদ্র। এত ভিড়, একত্রে এত মানুষ কখনও জীবনে দেখিনি।

সেবারই প্রথম সমুদ্র দেখি। কত কথাই মনে পড়ছিল। আমার স্বামী একবার একা পুরী এসেছিলেন। দিদি ও বড়ঠাকুরের পুরী আসার কথাও খুব মনে পড়ছিল। দিদি-বড়ঠাকুর তো বেশ বারকয়েক পুরী এসেছেন। একবার উমা সঙ্গে ছিল। প্রত্যেক বারই বড়ঠাকুর ভাইকে চিঠি দিয়েছেন, সঙ্গে দিদিও লিখছেন—

পুরী

১৪.৬.৪৩

প্রিয় নুটু,

আমরা (উমা ও তোমার বৌদি) গত মঙ্গলবার পুরী এসেচি ও যথেষ্ট আনন্দ পাচ্চি। সমুদ্রের ধারে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ধর্মশালায় আছি। পুরী আসবার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ক্লার্ক হলে আমায় প্রধান অতিথি করে সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করলেন। চারিদিকে খুব বেড়ানো গেল।

দিনরাত অপার নীলাম্বু রাশির শোভা দেখচি বাসা থেকেই— সমুদ্রতীরেই এই ধর্মশালা। এখান থেকে বুধবারে ভুবনেশ্বর যাচ্চি এবং খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি দেখবো। ১৯শে ভুবনেশ্বর থেকে রওনা হয়ে (পুরী প্যাসেঞ্জারে) হাওড়া পৌছবো, ২০শে নাগাদ বাড়ি পৌছবো, দু-একদিন থেকে। সে সময় তুমি বারাকপুর এসো। ১৯শে ভোরবেলা পুরী প্যাসেঞ্জার খড়গপুর পৌছবে, যদি পারো দেখা করতে পারবে খড়গপুরে? ১৯শে জুন ভোরে পুরী প্যাসেঞ্জারের second বাসায় খুঁজবে। ১৮ই ভুবনেশ্বর থেকে বেলা... টার সময় রওনা হবো।

নাম লিখতে ভুলে গেছেন। দিদিও তাঁর ঠাকুরপোকে লিখেছেন ছোট্ট চিঠি—

প্রিয় ঠাকুরপো,

তোমার পত্র পেয়েচি। উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল নানা কারণে। পুরী পৌছেচি বৃহস্পতিবার। খুব সুন্দর লাগছে— একথা বলাই বাহুল্য। কেমন আছো? যমুনার পত্র নিশ্চয়ই পেয়েছে? আজ আর নয়। ইতি—

আঃ বৌদি

আর একবার দিদি ও বড়ঠাকুর পুরী গেছেন। দলবল অর্থাৎ গজেনবাবু ও সুমথবাবুরা সবাই আগে চলে গেছেন, পরে বড়ঠাকুরদের পুরী স্টেশনে এসে নামিয়ে নিয়ে যান। সেবারও দিদি-বড়ঠাকুর আমার স্বামীকে চিঠি লিখেছেন—

পুরী
২রা জুন

কল্যাণবরেষু,

সুন্দর সমুদ্রের হাওয়া হু হু করে বইচে। এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম টের পেলুম না। দলের সাথে সমুদ্রস্নান ইত্যাদি রোজ চলচে। তোমার বৌদিদি বেশ সমুদ্রস্নান করে। আমি ভয়ে ভয়ে তীরের কাছেই থাকি। বড্ড বড় ঢেউ, জোয়ারের সময় উত্তাল হয়ে ওঠে, ওদের একদল মেয়ে নামে।

তোমার এক বন্ধু এসেচে— নির্মল চক্রবর্তী, চেনো? বলে শিমুলতলায় আলাপ হয়েছিল, বর্তমানে কুষ্ঠিয়া সিটি কলেজের অধ্যাপক। আর একজন তোমার নাম করছিল, চন্দ্রকান্তবাবু। গায়ক, গিরিজাবাবুর ছাত্র, চেনো?

সেদিন পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে মিটিং হয়ে গেল, তোমার বৌদি ও মেয়েরা গিয়েছিল। অনেকে কলকাতা থেকে এসেচেন এ সময়। রোজ সমুদ্রস্নান করার সময়ে ও তীরে বিকেলে বেড়াবার সময় দেখা হয়। পরিমল দাসের সঙ্গে সমুদ্রস্নানের সময় সেদিন হঠাৎ দেখা। প্রোফেসর বিশ্বাসের শালী মিস দাস, ওঁরা তোমার বৌদিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। একসঙ্গে পাইকপাড়া রাজবাড়ীর মিটিং-এও যাওয়া হোল। আহা! মনে পড়লো, ঘাটশিলার দ্বিজুবাবুর সুবর্ণ সংঘের মিটিং-এর কথা। এবার ঘাটশিলায় সাহিত্যসভা জমাতে হবে। সুবর্ণ সংঘের সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়ে গেছে।

কাল আমরা একদল ৩০ জন মোটরবাসে কোনারক যাবো কথা হচ্চে। ৫ টাকা মাথাপিছু ভাড়া— মোট ১৫০ টাকা ভাড়া। ৫৬ মাইল যেতে। ওখান থেকে ফিরে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাওয়া হবে সোমবার। ৮ই জুন ফিরবো এখান থেকে। তোমরা আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদি লিখেছে—

পুরীধাম

পরম স্নেহাস্পদেষু প্রিয় ঠাকুরপো,

পুরীতে এসেচি। কি আশ্চর্য্যভাবে সে এবার পুরীতে এসেচি সেটা খুবই অদ্ভুত

ব্যাপার। দেখা হলে সব বলব। জগন্নাথদেবের সব দয়া। খুব আনন্দ পাচ্ছি। মনের ভাবনাগুলো ভারী বিচিত্র লাগচে আজকাল আমার।

যমুনা কেমন আছে? যমুনাকে আমার আশীষ দিও; তুমি কেমন আছো? আমার আশীষ নিও। ইতি—

আঃ বৌদিদি

কোনারক থেকে ফিরে ভাইকে লিখেছেন। বড়ঠাকুরের একটা ব্যাপার ছিল। যেখানেই যান, যাই দেখুন, দিদিকে সঙ্গে চাই। আর ভাইকে সবসময় ঠিক কাছে না পেলেও অন্তত সব খবর এবং তার বর্ণনা দিয়ে আনন্দ পেতেন, তৃপ্ত হতেন। লিখেছেন—

পুরী,
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার

কল্যাণবরেষু,

কাল কোনারক থেকে রাত একটার সময় ঘুরে এলুম। আমরা একটা বাসে ৩০ জন ছিলুম। মিস দাস সঙ্গে ছিলেন। মহাকালের শোভাযাত্রার কি বিরাট শিল্পনিদর্শন দেখলুম কোনারকে। বিশাল সূর্য্যমন্দির সূর্য্যদেবের।... এক বিরাট রথ, তেজস্বী সাতটি পাথরের ঘোড়াতে রথ টানছে। বিশাল মন্দির ধূ ধূ বালির সমুদ্রে একা দাঁড়িয়ে নির্জনে। মন্দিরের উপরে উঠে তোমার বৌদিদি ও আমি কার্নিসে শুয়ে বিশ্রাম করলাম। হু হু হাওয়া। অদূরে নীল সমুদ্র বালিয়াড়িব ওপারে। এখানে মরীচিকা দেখা যায়। বালির চরে হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়। সে অপূর্ব দৃশ্যের কথা মুখে বলা যায় না।

কাল মোটরবাসে বড় ভিড় ছিল, তবে সবাই আমাদের দল, ১০/১৫টি মেয়ে আর সবাই পুরুষ। আজ ওবেলা ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাবো ঐ পার্টির সঙ্গে। পরশু ৮ই জুন রওনা হয়ে কলকাতা যাবো। ৯ই জুন রাত ৮টা ১৫ মিনিটে রেডিও বক্তৃতা আছে। ১১ই বা ১২ই জুন বারাকপুরে। ভাল আছি।

আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

আঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ— ঘাটশিলার সেই... আজ এখানে বক্তৃতা দেবে।

আরও একটা চিঠি এখানে দিচ্ছি। আমার স্বামীকে লেখা এমনি সুন্দর কত চিঠি যে হারিয়ে গেছে। ভাবলে বড় আপশোশ হয়। থাকলে কত কথা, কত ঘটনা, কত বর্ণনা এখন জানতে পারতাম। প্রথম থেকে অর্ধেক জীবনের চিঠিগুলি তো নীরবে

কালের কবলে বিলীন হয়ে গেছে। তবুও যা পাওয়া গেছে তাই অমূল্য। পুরী থেকে ফিরে লিখেছেন—

কল্যাণবরেষু নুটু,

পুরী হইতে ৯ই জুন কলিকাতা আসিয়াছিলাম, ওদিন রেডিও ছিল, শুনিয়াছিলে কি? ১২ই জুন 'মেঘমল্লার' পুনরায় অভিনীত হইল কালিকা থিয়েটারে। পুরী হইতে ফিরিয়া দেখি সর্বত্র poster পড়িয়াছে— বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার'।

১৩ই জুন বাড়ী আসিয়াছি। এখনও প্রচুর আম। বাড়ীর গাছের আম পাঠাইলাম। শান্তকে পাঠাইয়া দিবে ২/৩ দিনের মধ্যে। এস্থলে লোকের এখনও দরকার। ধানচাষের সময়।

আমি পুরী হইতে আসিয়া ঘাটশিলা যাইতাম, কিন্তু পরশু বাণী রায়ের মার মুখে শুনিলাম তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। বড্ড গরম ঘাটশিলায়। একটু জল পড়িলে রথের ছুটিতে ইন্দু ও আমি ৩/৪ দিনের জন্য যাইব। এখন গেলে ধান-রোয়ার ব্যাঘাত হইবে। আষাঢ় মাস রোয়ার সময়। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরি উদয়গিরি বেড়াইলাম। তোমার বৌদিদির উদয়গিরি কোনারক বড় ভাল লাগিয়াছে। এদিকে order এত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। পুরীতে জমি দেখা হইয়াছে।

গজেনও আমি ও সুমথ jointly বাড়ি করিব সস্তায় সমুদ্রের ধারে। যখন ইচ্ছা যে কেহ আমাদের family-র গিয়া থাকিতে পারিবে। পুরীতে হু হু হাওয়া, গরম নাই। 'পথের পাঁচালী' গুজরাটিতে অনুবাদ হইয়াছে, বিক্রয় হইতেছে।

এখানে সব ভাল। শুধু বড় গরম ও মশা। প্রচুর আম। আশীর্ব্বাদ জানিও। বৌমা ও গুটকেকে দিও। গুটকের বাড়ীর সব ভাল। ইতি—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ: ঘাটশিলায় কোন ছোটখাটো বাড়ী বিক্রয় আছে কি? কিনিতাম। রেখা বাংলো বিক্রি হইল কত টাকায়? আমায় জানাইলে না কেন?

বড়ঠাকুরের মাঝে মাঝে খেয়াল হত বাড়িঘর, জমিজমা কেনার। যখন 'মাতৃধাম' বিক্রি হবে শুনেছিলেন তখনই কেনার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। 'রেখা বাংলো' কিনতে পারতেন, যদি বিক্রি হবে সে সংবাদটি আগে পেতেন। আমার যতদূর মনে হচ্ছে ওই সময় বড়ঠাকুর দেশেও কিছু ধানজমি, আম-কাঁঠালের বাগান কিনেছিলেন। অবশ্য কিছুটা দিদির আগ্রহে। দিদির জমিজমা, বাড়িঘর প্রভৃতি বাড়িয়ে তোলার দিকে ঝোঁক ছিল। চার্নক ব্যারাকপুরের এই বাড়িও দিদির তৈরি।

বড়ঠাকুরের আর একটা খেয়াল ছিল। যখন যে দেশে বেড়াতে যেতেন, তা সে গভীর অরণ্যই হোক বা উত্তাল সমুদ্রতীর হোক অথবা দুর্গম গিরিচূড়াই হোক ভালো লাগলেই হল, বলতেন, এখানে একটা বাড়ি করলে বেশ হয়। তখন অবশ্য পুরীতে বাড়ি কেনার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু কেন কেনা হয়নি জানি না। বাড়ি হলে খুব ভালো হত, পুরী গিয়ে থাকতাম। জগন্নাথদেব এবং সমুদ্র দেখে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম।

তখনকার দিনে মা-কাকিমাদের দেখতাম দল বেঁধে তিনঠাকুর দেখতে যেতেন। খড়দার শ্যামসুন্দর, ওপারের মদনমোহন, আর সাঁইবনার নন্দদুলাল। শোনা যায় এই তিনমূর্তি একই পাথর কেটে তৈরি।

বারোমাসে তেরো কালী অর্থাৎ প্রতি মাসে একবার করে কালীদর্শন। কালীঘাটের কালী দিয়ে শুরু করলাম। শ্যামনগরের ব্রহ্মময়ী ও শ্যামাসুন্দরী, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, ভাটপাড়ার জগত্তারিণী, নৈহাটির শ্যামাসুন্দরী, আমডাঙার করুণাময়ী ইত্যাদি। একদিন ভ্রান্তি ও আমি 'বিড়া' গিয়েছিলাম কালীদর্শন করতে। একেবারে গণ্ডগ্রাম।

এমনি করে চলে জীবনের রথ। মনে পড়ে একদিন মাসিমা (মাসশাশুড়ি) বলেছিলেন, 'যমুনা, আমি মরে গেলে, আমার কথা তোমাদের মনে থাকবে না, না?' আমি বলেছিলাম, 'না মাসিমা, আপনার কথা আমাদের সবার মনে থাকবে।' শুনে হেসেছিলেন। মাসিমা সাধিকা ছিলেন, তবুও মনে হয়, নিঃসন্তান বিধবার অপরের মধ্যে বেঁচে থাকার একটি ছোট্ট কামনা জেগেছিল। বালবিধবা স্বামীর কথা মনেই ছিল না। কেমন দেখতে ছিলেন তাও মনে ছিল না। কারণ তখনকার দিনে ফটো তোলার অত রেওয়াজ ছিল না। হাতের রান্না ছিল খুব ভালো। কাজ ছিল নিখুঁত।

স্কুল থাকলে অনেকটা সময় সেখানে কাটে, ছুটিগুলোতে হয় মুশকিল। মাঝে মাঝে গঙ্গায় গিয়ে বসি। গঙ্গার সঙ্গে আমার অতি শৈশবেই পরিচয় হয়েছিল। তারপর থেকে গঙ্গা আমরা একান্ত বন্ধু হয়ে ওঠে। বড়মার মৃত্যুকে উপলক্ষ করেই আমাদের প্রথম পরিচয়।

আমি আমার ঠাকুমাকে দেখিনি। কিন্তু ঠাকুমার মা দীনময়ী দেবীকে দেখেছি। তখন তিনি অতি বৃদ্ধা। আমার তাঁকে বড়মা বলতাম। তিনি ছিলেন বাড়ির গৃহিণী। মা বাবা বড়মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আমি তখন ছোট। বড়মার খুব প্রিয় ছিলাম। শুনেছি তাঁর ইচ্ছানুসারে সজ্ঞানে তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়েছিল। গঙ্গায় গিয়ে পাঁচদিন

বেঁচেছিলেন। গঙ্গাবাসীর ঘরে রাখা হয়েছিল। মা-পিসিমা পালা করে যেতেন। রাত্রে পাড়ার মাতব্বররা থাকতেন। আমি সকালবেলা মা-পিসিমার সঙ্গে গিয়ে বড়মার পাশে বসতাম। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতাম। একটানা গঙ্গা বয়ে চলেছে, তার সঙ্গে কত কী ভেসে যাচ্ছে। কখনও দেখতাম মাঝগঙ্গা দিয়ে দু-চারটে নৌকো ভেসে যাচ্ছে। কখনও ডাঙার কাছ দিয়ে মাছের নৌকা বেয়ে জেলেরা চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটা স্টিমার ভোঁ বাজিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধীর মন্থরগতিতে চলে যাচ্ছে। দেখতাম স্টিমারের মধ্যে কত লোক চলাফেরা করছে, কী যে করছে ওরা কে জানে। কেউ বা বালতিতে দড়ি বেঁধে গঙ্গা থেকে জল তুলছে, কোথায় ঢালছে দেখা যাচ্ছে না। তাকিয়ে থাকতাম। আস্তে আস্তে স্টিমার অনেক দূরে চলে যেত, তারপর একটু পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত সিঁড়িতে। তখন ফিরে যেতাম বড়মার পাশে। মন কেন যেন খারাপ হয়ে যেত।

যেদিন বড়মা মারা গেলেন সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বেলা দশটা হবে। ঘাট থেকে কী খবর এল, বাবা-মা ও পিসিমা শুনেই ছুটলেন। আমি বাড়িতে, আর আমাদের কাজ করার লোক হাবি। কী হয়েছে ভালো বুঝতে পারিনি, তবে বুঝেছিলাম বড়মার কিছু হয়েছে। খালি বাড়ি। এঘর-ওঘর করতে করতে বড়মার ঘরের চৌকিতে গিয়ে বসেছিলাম। দেখি বড়মার একটা কাপড় আলনায় ঝুলছে, বড়মার মুড়ি খাওয়ার বাটিটা জানলায় উপুড় করা, পাশে বড়মার পিতলের ছোট্ট হামান দিস্তেটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই হামান দিস্তে দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে বড়মা পান ছেঁচে খেতেন। আমি কাছে বসে থাকতাম, নিজে ছেঁচা-পান মুখে দিয়ে আমার মুখে একটু গুঁজে দিতেন। বড়মার তোরঙ্গটা একটা জলচৌকির ওপর বসানো, তার ওপর দুটো কাঁথা পাট করা। শোয়ার চৌকিটা খালি। হঠাৎ বড়মার জন্যে ভীষণ মন কেমন করে উঠল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম. হাবি এসে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। তারপর বড়মা আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। আমার শিশুমন কেমন করে যেন বুঝেছিল, যে যায় সে আর আসে না।

মাঝে মাঝে গঙ্গার সিঁড়িতে বসে বসে মার কথা ভাবতাম। মা যখন চলাফেরা করতে পারতেন, তখন রোজ বিকেলে বকুলতলার ঘাটে এসে বসতেন। অনেকেই আসতেন। মার বন্ধুরা, পাড়ার কাকিমা, পিসিমারাও। ওঁরা গল্প করতেন, আমি ওঁদের থেকে দু-একটা সিঁড়ি নীচেয় জলের ধারে গিয়ে বসতাম। মনে মনে জপ করতাম। মন কিন্তু চলে যেত আমার সেই ছোট্ট খোলার বাড়িতে, যেখানে আমার সব রেখে এসেছি। ঈশ্বরের কাছে ওঁর জন্য প্রার্থনা জানাতাম। একটু একটু করে সন্ধ্যা নেমে

আসত। এপারে ওপারে সারি সারি আলো জ্বলে উঠত। জলের ওপর দিয়ে দু-একটা জেলে-নৌকা ভেসে চলেছে। প্রায়দিন মায়েদের ধর্মালোচনা হত। বড় কাকিমা, চনু ও কানাইদার মা ভাগবতের গল্প বলত। মার মুখে শবরীর উপাখ্যান খুব ভালো লাগত। কোনোদিন হয়তো আমার কাছে গান শুনতে চাইতেন। তারপর আস্তে আস্তে সবাই উঠত, আমিও মার সঙ্গে বাড়ি আসতাম।

ভালো লাগে না সংসারের খুঁটিনাটি কথা নিয়ে জাল-বোনা। নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না। আমার সংসার নেই, কেউ নেই. সবার আমি পর। সবার সংসারে আমি অপ্রয়োজনীয় তৃতীয় ব্যক্তি। চেষ্টা করেছিলাম নিজেকে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে, আপন হতে। কিন্তু বেলাশেষে দেখলাম, আমার যেখানে স্থান সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি, একচুলও এদিক-ওদিক নড়িনি। মন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। তাই মনে মনে বলি:

"মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইহারে তাহারে উহারে;
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়শোণিত বরণে।"

৯

মনে পড়ে সেবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, স্কুলের পরীক্ষাও শেষ, মেয়েরা আসে না। টিচাররা সব কমনরুমে বসে গজালি করে, কেউ কেউ বা শূন্য ক্লাসরুমে গিয়ে বসে, পাশে থাকে দু-একজন মনের মতো সঙ্গী। গল্প করে, খাতা দেখে। ঘণ্টাখানেক থেকে কেউ বা বাড়িতে কাজ থাকলে চলে যায়। এই সময়টা শিক্ষিকারা একটু হালকা থাকে। অবশ্য সে আর ক'টা দিন, মার্কশিট করা, প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি, নানান কাজ। সেদিন ছিল টিচারদের মিটিং। মিটিং শেষ হতেই ইটিং-এর ব্যবস্থা। স্কুলের দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটেছিল। কর্মজীবনের শেষদিনটিতে সবাই খুব সমারোহ করে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিল। মৈত্রীর সুন্দর গান চিরকাল মনে থাকবে। মেয়েরা কেঁদেছিল, টিচারদের চোখে জল। আমার চোখেও জল এসেছিল, খুব কষ্ট হয়েছিল। অনেক দিনের আশ্রয় ও অবলম্বন শেষ হল। এখন শুধু স্মৃতি রোমন্থন করা।

মনে পড়ে হাবির কথা। আমাদের বাড়ির কাজের লোক। শুনেছি আমি যখন ছোট তখন ও আমাদের বাড়ি আসে। তারপর বহুকাল আমাদের বাড়ি ছিল। আমার বিয়ের কিছুদিন পরে মারা যায়। কথা কইতে পারত না। ইশারায় সব বুঝিয়ে দিতে হত, তাতে কাজের বা বোঝার কোনো অসুবিধা হত না। মা অদ্ভুতভাবে হাত নেড়ে ওকে সব বুঝিয়ে দিতেন, আমরাও তাই। দেখতে সুন্দর ফরসা, অপরিচিত কোনো লোক দেখলে ভাবত আমাদের বাড়িরই লোক। ওর কোণের ঘরটা ছিল আমাদের খেলার জায়গা। বেশ ফিটফাট গোছানো ঘর। একটা চৌকিতে বিছানা দিনের বেলা গুটিয়ে রাখত। আমরা পুতুলের বাক্স নিয়ে ওর ওপর বসে খেলা করতাম। ঘরের কুলুঙ্গিতে জারভর্তি আচার থাকত, দড়ির আলনায় কাপড় ও সেমিজ, কয়েকটা ঘটিবাটি। বন্ধুরা এলে ওই ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতাম। পুতুল খেলতাম। কী সুন্দর সুন্দর পুতুল ছিল তখন! আমাদের দুটো পুতুলের ক্যাশবাক্স ছিল। কাচের ছোট বড় নানারকম পুতুল। তাদের কী সুন্দর চোখ-মুখ-নাক। ফোলা ফোলা গালদুটি দিয়ে কী সুন্দর গোলাপি আভা বেরুত। বেনেবউ পুতুল ছিল আর ছিল আলুর পুতুল। এত ভালো না! এখনও আমার পুতুলগুলোর জন্যে লোভ হয়। হাত-পাওয়ালা কী সুন্দর, যত বড় পুতুল চাইবে পাবে, আবার ছোটও পাবে। মনে পড়ছে আমার বিয়েতে ওঁর বন্ধুরা একটা বেশ বড় আলুর পুতুল দিয়েছিলেন। সেইসব পুতুলদের কতরকমের কাপড়, কতরকমের পুঁতির মালা। সত্যি তখন সেইসব আমাদের কাছে খুবই লোভনীয় বস্তু ছিল। পুতুলের বিয়ে হত, তত্ত্ব হত। সবই খেলাঘরের। বিয়েতে মা লুচি-আলুভাজা করে দিতেন, বন্ধুরা সবাই মিলে খেতাম। আর বৃন্দেবুড়িকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতাম। ও পুঁতির মালা নিয়ে আসত।

বৃন্দেবুড়ির সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের খুব ভাব ছিল। ওর বাড়ি ছিল চালকিপাড়ায়। ওর কেউ ছিল কি না জানি না। ওর নাম কী ছিল তাও জানি না। জাতে যুগী ছিল এটা শুনেছিলাম। তবে মানুষটা ছিল খুব ভালো। আমাদের পুঁতি দিত, পুঁতির মালা গেঁথে দিত। পুঁতির কাজ করে পৈতে কেটে ওর দিন চলত। সুন্দর সুন্দর পুঁতির সাজি, ফুলদানি, চেয়ার-টেবিল কত কী করে বিক্রি করত। প্রায়ই ওর বাড়ি যেতাম। মাটির চালাঘর। যে উঁচু দাওয়া তারই একপাশে ছোট উনোন পাতা। তাতে রান্না করত। আর থাকত পৈতে কাটার সরঞ্জাম। দু-দিকে দুটো ঘড়া, তার গলায় পৈতের সুতো টানা দেওয়া। একটা নারকোল মালায় থাকত বেলের আঠা, তাতে একটু জল দেওয়া, আর একটু ন্যাকড়া। তরঙ্গের বাটিতে থাকত টেকো আর তুলো। যখনই যেতাম দেখতাম কাজে ব্যস্ত। হয় সুতো কাটছে নয়তো পুঁতি গাঁথছে, কোনো সময় পৈতে তৈরি করছে। বসে বসে দেখতে বেশ লাগত। আর ভালো লাগত ওর উঠোনের নীলকণ্ঠ ফুলের ঝাঁকড়া গাছটা।

তখন কী সুন্দর পরিবেশ ছিল। ছিল নির্মল আনন্দে দিন কাটাবার চেষ্টা। বৈশাখী সংক্রান্তি তখন মেয়েদের জীবনে একটা বিশেষ সমারোহ নিয়ে আসত। নানারকম ব্রত পূজাপার্বণ লেগেই থাকত। মা-দিদিদের কত ব্রত করতে দেখেছি। সারা বৈশাখ মাস আমরা শিবপুজো, হরিচরণ, দশপুত্তুল, পুণ্যিপুকুর, গোকাল এইসব করতাম। হরির চরণ করতে খুব ভালো লাগত। একটা তামার ঠাটে চরণ এঁকে তাতে দুটি শ্বেতচন্দন মাখানো তুলসীপাতা দিয়ে তার ওপর দুটি আঙুল দিয়ে চোখ বুজিয়ে দুলে দুলে বলতাম—

হরির চরণ হরির পা
হরি বলে, মাগো মা,
কোন্ যুবতী পূজে পা,
সে যুবতী কী বর চায়?
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়,
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়, ইত্যাদি।

যখন খুব ছোট ছিলাম এবাড়ি ওবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যেত কুমারী করতে। বেশ ছিল সেই সব নিষ্পাপ দিনগুলো। বোশেখ মাসভর প্রতিদিন মা ব্রাহ্মণবাড়িতে জল দিতেন। ছোট ঘড়া করে একঘড়া গঙ্গাজল আর মিষ্টি। গরমের দিনে অশ্বত্থতলায় জলসত্র হত। দরমা দিয়ে অস্থায়ী ঘর হত। জালাভর্তি জল, আর ভিজে ছোলা আর ফেনি বাতাসা। তৃষ্ণার্তরা ছোলা-বাতাসা খেয়ে, জল খেয়ে চলে যেত। কত কথাই মনে পড়ছে। বড়ঠাকুরের 'জলসত্র' গল্পটা মনে পড়ে গেল।

মনে পড়ছে এই তো সেদিন, দিদি ব্যারাকপুরের বাড়িতে দুর্গাপূজা করলে। বছর যাচ্ছে না জল যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। নীচের ঘরে প্রতিমা এনে সমারোহে পূজা হল। বৌমা (মিত্রা) সবদিকে অগ্রণী, সবদিকে লক্ষ। বড় কাজের মেয়ে। আমার ওপর ভোগ রান্নার ভার। দিদি পুজোর দিকে সবসময় হাজির। প্রতিমা সবদিকে। পুষ্প, চন্দনা, বড়বৌমা (শান্তর বৌ), জ্যোৎস্নাবরণী এরা সবাই কোমর বেঁধে লাগল। দিদি মহাখুশি। পুজোর জন্যে কতদিন আগে থেকে বাসন কিনে রেখেছে। সব সিন্দুক থেকে বার করা হল। অম্বুজদা কৃষ্ণনগর থেকে পুরোহিত আনলেন। নমিতা (বৌমা মিত্রার মা), মিত্রার বোন মুন্নি, ভাই শঙ্কর, পিনাকী (মুন্নির স্বামী) সবাই পরম উৎসাহে লেগে পড়েছে। সবই হচ্ছে, তবুও মনের কোণে মেঘ। বোধনের সময় প্রথম যখন ঢাকে বাড়ি পড়ল, তখন ছাঁত করে মনে হয়েছিল, আজ যদি ওঁরা দু'ভাই থাকতেন। তা হলে আজ কত আনন্দের দিন।

মানুষের জীবনে কতকিছু অপূর্ণ থেকে যায়। আমার জীবনে বহু সময় দেখেছি, হয়তো যখন আনন্দ মুহূর্তগুলি এগিয়ে আসছে, সেটি অনুভূতির কিনারায় পৌঁছবার আগেই অতীতের হারিয়ে যাওয়া মুখগুলির ঢেউয়ে তা অনেক দূরে সরে যায়। যাই হোক, উমারাও পূজায় এসেছিল। উমা, আমি আর দিদি, আমরা যেন একসূত্রে গাঁথা ছিলাম। যে যেখানেই থাকি মনের যোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। ওঁরা দু'ভাই মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে, শচীন ওয়ালটেয়ার থেকে কলকাতায় চলে এল এবং পরে চেতলায় বাড়ি করলে। উমা-শচীন প্রায়ই চিঠি দেয়। বিজয়ার প্রণাম জানাতে কখনও ভুল হয় না। ওরা আগ্রহভরে লেখে, আমাদের কাছে আসুন। উমা লেখে—

শ্রীচরণেষু

ছোট মামীমা, আপনি আমার ঁবিজয়ার প্রণাম জানবেন ও আর সব গুরুজনদের প্রণাম জানাবেন। ছোটদের আশীর্বাদ দেবেন। ভাইফোঁটার দিন বাবলু ও বড় মামীমা আসছে। আপনিও নিশ্চয়ই আসবেন। না এলে খুব দুঃখ পাব। আপনার লেখা পড়ে আমাদের সকলের খুব ভালো লেগেছে। এলে অনেক গল্প করব। আসবেন কিন্তু—

ইতি
উমা

শচীন লিখেছে—

'তীরভূমি'
৭বি/১সি মহেশ দত্ত লেন
কলকাতা-২৭

শ্রীচরণেষু মামীমা,

ঁবিজয়ার প্রণাম নেবেন। আমাদের সবার একান্ত ইচ্ছা ভাইফোঁটার দিন রবিবার আপনি এখানে আসুন আর দিনকয়েক আমাদের মধ্যে কাটিয়ে যান। নিজে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একে অফিসের চাপ, দ্বিতীয়ত বিশেষ রে গত তিনমাস শরীর সুস্থ যাচ্ছে না। ডাক্তারের পরামর্শমতো হয়তো মাসখানেকের ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে হতে পারে।

আপনার লেখাটি স্বয়ংপ্রকাশ, প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। অতি অনাড়ম্বর ও নিরভিমান ভঙ্গিতে বিভূতিভূষণ ও তাঁর পরিবারকে যেভাবে আপনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে আজকের দিনে খুব সুলভ নয়।

বিভূতিভূষণে আপনার আরম্ভ, কিন্তু এখানেই থামবেন না যেন। যাই হোক, বাকি কথা সাক্ষাতে হবে।

নমস্কার জানবেন ও বড়দের জানাবেন। ছোটদের আশীর্বাদ।— ইতি

বিনীত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একবার আমি উমাকে চিঠি দিয়েছি, তার উত্তর পাচ্ছি না। মনে মনে চিন্তা হচ্ছে কী হল, অনেকদিন হয়ে গেছে, উত্তর এল না। এমন তো হয় না! একদিন চিঠি এল। শচীন লিখেছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার অপূর্ব চিঠিখানি উমাকে লিখেছিলেন ২৯.০৯.২৬ তারিখে। আমি বারবার ওকে তাগিদ দিয়েছি উত্তর রচনা করতে, কিন্তু সে কর্তব্য সে পালন করেনি। শেষ পর্যন্ত ভেবেছিলাম ওর হয়ে আমিই লিখব। নানান দুর্বিপাকে আমিও সময় করে উঠতে পারিনি। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য মার্জনা চাইছি।

উমা দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিল অম্বল ও হজমের গোলমালে। এখন মোটামুটি সুস্থ বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও ফিরে পায়নি। আমি দীর্ঘদিনের নিম্ন-রক্তচাপের রোগী। কিন্তু সে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করিনি কোনোদিন। তবে বছর দু-আড়াই হল এ ভ্রামমাণ চাকুরি থেকে মোহ দূরীভূত হয়েছে। জীবনে একটা অন্য ধরনের অনুভব করছি। পূর্ণভাবে যদি সাহিত্যে মগ্ন হতে পারতাম তাহলে সম্ভবত শান্তি পেতাম।

আমার জীবনের এটাই একমাত্র অবলম্বন, যেখানে আমার আত্মা শান্তিকে খুঁজে পায়। কিন্তু জীবন ও জীবিকা এক না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায় এবং যতদিন না সেটা ঘটছে ততদিন আমিও সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারছি না। আর পারছি না বলেই সংসার পথযাত্রায় বহুতর ত্রুটি ঘটছে। বহু কর্তব্য করা হয় না, বহু সদিচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা যায় না।

বিশেষ করে বর্তমান চাকুরিটি আমার বহু ইচ্ছার অন্তরায়। বিগত দশ-এগারো বছর আদৌ পড়াশুনো করতে পারিনি, তদুপরি অবাঞ্ছিত সংসর্গে কাটাতে হয়েছে। লাভের মধ্যে হয়েছে এই— সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াতে পেরেছি। সাহিত্যপথিক হিসাবে এ সঞ্চয় অবশ্য উপেক্ষনীয় নয়।

কিন্তু সামাজিক আমি সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছি। আত্মীয় বন্ধু পরিবার এদের কাছ থেকে পলে পলে দূরে সরে গেছি। অথচ আমার মানসিক প্রবণতা মাত্র প্রকৃতিকে ঘিরেই নয়, মানুষও সাধারণভাবে আমার সমান কৌতূহলের বস্তু। তার

মধ্যে শিশুরা একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে, কিন্তু আমার সন্তানদেরই বা আমি সঙ্গ দিতে পারি কতটুকু?

মনে মনে স্থির করেছি এই ভ্রাম্যমাণ জীবিকাকে ত্যাগ করব, সম্প্রতি মনে মনে তারই প্রস্তুতি চলছে।

আমরা দুজন প্রায়ই জল্পনা করছি ভাটপাড়ায় গিয়ে আপনাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসব। হয়তো অসুবিধা হবে আপনার; কিন্তু উমা ও আপনার পক্ষে যে পারস্পরিক সম্বন্ধের অস্তিত্ব আমি অনুভব করেছি তাতে করে মনে হয় বাহ্যিক অসুবিধাটা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।

আমি সম্পর্কে আপনারা জামাই; কিন্তু এই 'জামাই' শব্দটির সঙ্গে এমন একটা দূরত্বের সুর জড়িয়ে আছে যে, আমি এটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী নই। আপনি আমার মায়ের সখী বন্ধু ছিলেন, আমার মনে হয় সে সম্পর্কই সব থেকে অগ্রাধিকার পাবে। আমার বলার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার সামাজিকতা ও লৌকিকতার ঊর্ধ্বে উঠলেই আসা-যাওয়ার দ্বিধাটাকে পরিহার করা সহজ হবে।

আপনার পত্র পেলে হয় আমি নয় উমা আপনাকে আনতে যাব। আমাদের পত্র অস্বাভাবিক বিলম্বে, কিন্তু আপনার পত্র চাই সত্বর। না হলে বুঝব ক্ষমা করেননি।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন। বড়দের প্রণাম, ছোটদের আশীর্বাদ। ইতি—

প্রণত

শচীন্দ্র

শচীন-উমার চিঠি আসে, যথাসময়ে উত্তরও দিয়ে থাকি। কয়েকবার ওদের কাছে গিয়েছি। ওদের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার মুগ্ধ করে। উমা একটুও বদলায়নি। গেলে শুধু ঘাটশিলার কথা, দেশের কথা, ওর মামাদের গল্প হয়। আমরা দুজনে এক জায়গায় হলেই দিদির কথা বেশি করে মনে পড়ে। দিদি তো সবসময় যেতে পারে না।

শচীন অত্যন্ত ভালো ছেলে। গেলেই নানারকম গল্প, বিশেষ করে সাহিত্য নিয়ে। ওর সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং ওর সাহিত্যপ্রচেষ্টার জন্য বড়ঠাকুর শচীনকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বড়ঠাকুর বুঝেছিলেন শচীন ভবিষ্যতে সাহিত্যজগতে একদিন নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেবে। তাই শচীনকে জামাতা নির্বাচন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। শচীনের লেখা 'জনপদবধূ' একটি অনবদ্য বই। ওর 'বন্দরে বন্দরে' বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র নিয়ে লেখা একটি অসামান্য বই। আমার খুবই ভালো লেগেছে। ওর যখনই যে লেখা বেরোয় তখনই আমাকে এক কপি করে পাঠিয়ে দেয়।

এখানে একটা কথা মনে পড়ল। বড়ঠাকুরের নাকি একটি নাম ছিল— শচীন। অবশ্য আমার শোনা কথা। বড়ঠাকুর 'ঘোষপাড়ার' সতীমার দোরধরা ছিলেন, তাই শচীন নাম রাখা হয়েছিল। সে নাম অবশ্য বহুদিন অন্তর্হিত হয়েছে। যাই হোক, শচীনের নাম করতে করতে মনে পড়ে গেল।

উমাদের কাছে যখনই গেছি ওদের আগ্রহভরা আদর-যত্নে আমার ওঁদের দু'ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যেত। ওঁরা উমার সংসার দেখে যেতে পারলেন না। বড়ঠাকুরের খুব ওয়ালটেয়ার যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়নি। যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে শচীনকে চিঠি লিখেছিলেন—

ব্যারাকপুর
Gopalnagar P.O.
Dt Jessore
18.12.46

কল্যাণবরেষু শচীন,

তোমার পত্র পেলাম ৩ দিন পর। ১০ই ভাইজাগ থেকে রওনা হয়েছে পত্র। এখানে এলো ১৩ই, অথচ আমার জন্মোৎসবের চিঠি ৩ মাস পরে গেল। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। বাংলায় ঠিকানা লেখার দরুন এ ব্যাপার ঘটতে পারে। আমি কালীপুজোর সময় এবং তারপরেও প্রায় ১০ দিন হলো ঘাটশিলায় ছিলাম। কলকাতার অশান্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত সম্ভব ছিল না তখন। এখন দেশেই আছি। এখানে কোনো গোলমাল নেই। তোমার মা কি এখন ওয়ালটেয়ারে আছেন? আমার যাবার ইচ্ছা আছে তোমার ওখানে, তবে বড়দিনের সময় আমি সভাপতিত্ব করছি হাজারীবাগ, তার পরে যাবো। বড় ইচ্ছা আছে চৈতন্যদেবের চরণপূত জীয়ড়নৃসিংহক্ষেত্র (সীমাচলম) দর্শন করবো। তোমার দ্বারা যদি আমার সে অভিপ্রায় পূর্ণ হয় সে তো সৌভাগ্যের কথা আমার। তোমার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি। অনেক কথা জমে আছে।

তোমার মা বাবা কি ওখানে আছেন? আমার সঙ্গে ওঁদেরও কতদিন দেখা হয় না। আমার এখানে একবার এসো। আনন্দ পাবে। বাংলার পাড়াগাঁ তোমার ভালো লাগবে। বনপ্রকৃতির শোভা এখানে সত্যিই আছে। কোনার্ক কেমন দেখলে? সেবার আমি ও তোমার কাকিমা পুরী থেকে মোটরবাসে কোনার্ক গিয়েছিলুম। অধুনালুপ্ত প্রাচী নদীর তীরে প্রাচীন যুগের সূর্যমন্দির, নিজের গৌরবে দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এতকাল পরেও। অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল।

আশা করি ভালো আছ। ওয়ালটেয়ারের ভাড়া কত আমায় জানিও। কোন্ ট্রেনে গেলে সুবিধা? সরস্বতীপুজোর সময় যাওয়ার ইচ্ছে করি অথবা জানুয়ারীর শেষে। ওখান থেকে এমন কোনো লাইন আছে যা BNR Main Line-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে? আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার মা ও বাবা যদি ওখানে থাকেন তাঁদের নমস্কার দিও আমার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ— তারাশঙ্করের সঙ্গে গত শনিবারে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। সে মোটর কিনেচে। তার মোটরে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে এল মিত্র ও ঘোষের দোকানে। আমায় খুব ভালোবাসে।

মানুষের সব ইচ্ছাই কি পূর্ণ হয়? হয় না, এটাই মেনে নিতে হয়।

যাই হোক, বড়ঠাকুরের জন্মদিনে অথবা পারিবারিক কোনো উৎসবে সবাই একত্রিত হই। উমার ছেলে-মেয়েরা— শমীন্দ্র, শুভেন্দ্র, ভুনু, (ইন্দ্রাণী)— ইদানীং দুই নাতবৌ হয়েছে, শমীন্দ্রর স্ত্রী কাবেরী, শুভেন্দ্রর স্ত্রী সুস্মিতা। ভুনুর স্বামী হেমেন্দু। ব্যারাকপুরে বাবলু, বৌমা, বাবু, আম্পা— চাঁদের হাট। ওঁরা দেখতে পেলেন না।

একবার বাবলু দিদি-উমা-আমাদের সবাইকে নিয়ে ভিডিয়ো তুললে। সেবার বাংলা আকাদেমিতে বড়ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হল। শুধু শুভেন্দ্র এসেছিল। বাবলুকে বলে সে রাত্রে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। পাতাল রেল চড়ালে। আমাকে হঠাৎ দেখে উমাদের কী আনন্দ! শমীন্দ্র, কাবেরী বাড়ি এল। প্রায় রাত্রি ৩টে পর্যন্ত সবাই মিলে গল্প!

পরদিন শুভেন্দ্র ও আমি ব্যারাকপুরে দিদির কাছে এলাম। তারপর দিদি ও আমরা সবাই মিলে গোপালনগরে রওনা দিলাম। নাতি-নাতনিদের বিয়ে পৈতে সব কাজে গিয়েছি, আনন্দ করেছি, দিদিও গেছে। এমনি করে দিদির আশ্রয়ে তারই ছায়ায় আমাদের পরিবার আবার এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। চলাই জীবনের ধর্ম।

বছর ঘুরে এসেছে। পুজো এল। শেষও হল। এল উমা-শচীনের চিঠি বিজয়াদশমীর প্রণাম নিয়ে। শচীন লিখেছে—

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

"বিজয়ার প্রণাম জানবেন। পুজোর আগে থেকেই শয্যাশায়ী ছিলাম, এখন কথঞ্চিৎ সুস্থ, অফিস করছি।

পুজোয় শুয়ে শুয়ে বিভূতিসাহিত্য আর একবার পড়লাম, সঙ্গে আপনার 'উপলব্যথিত গতি'। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতো, ছোট বইটিতে স্মৃতিকথায় মানুষটির কথা যেভাবে আপনি বিবৃত করেছেন, তা সত্যিই চমৎকার। সমগ্র রচনার মধ্যে আপনার হৃদয়ানুভূতিটি প্রবল। এটাই লেখকের পক্ষে চরম সার্থকতা। কিন্তু মামীমা, কলম যেন থামে না। আরও লিখে যান।

আমাদের সবার একান্ত ইচ্ছা, আপনি আমাদের কাছে এসে এখন ক'দিন থাকুন। সাহিত্য আলোচনা করে আনন্দে কিছু সময় কাটানো যাবে। আমি আপনাকে বারবারই বলব লিখতে। ওই যে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর বেড়াতে গিয়েছিলেন, তা লেখবার মতো। প্রণাম নেবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ঠাকুর ওয়ালটেয়ার যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ঘাটশিলা থেকে উমাকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানাও এখানে তুলে দিলাম।

কল্যাণীয়াসু

উমা, তোমার বড় মামীমা ও বাবলু ১ মাস হলো ঘাটশিলায়। আমি দেশের বাড়িতে ছিলাম, কাল এসেছি। এবার বড় বিপদে পড়েছিলাম। আমার জমিজমা ফাঁকি দিয়ে নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল জরিপের সময়। তাই নিয়ে এখন দেশে থাকতে মামলা করতে হচ্চে। এদিকে আবার 'ইছামতী' প্রেসে দিয়েছি, ছাপা হচ্চে। সেটারও শেষ অংশ লিখে দিতে হবে। আমার ইচ্ছা আছে বিষয়ের গোলমাল মিটে গেলে পুজোর পরে ওয়ালটেয়ার যাবো। চলে যাবো একা। তোমার মামীমা ও বাবলু এখানে থাকবে। বাবলু বড় হয়েছে। অনেক কথা বলে। খুব বুদ্ধিমান হয়েচে এবিষয়ে ভুল নেই। আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার বড়মামা

১০

দিদির মন ছিল অত্যন্ত বড় মাপের। যেমন ছিল ব্যক্তিত্ব, তেমনি ছিল কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ। দিদির মা বহুদিন অসুস্থ ছিলেন। বাবা বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত। দিদির বড়দিদি মায়া দেবী নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। দিদি ছোট ভাইবোনেদের মাতৃসম স্নেহছায়ায় ঢেকে রেখেছিলেন। লেখাপড়া করানো, সব ভাইবোনেদের বিয়ে

দেওয়া। বিয়ে-থা দেওয়ার পরও যার যখন দিদিকে যেমন প্রয়োজন, তা তারা দিদির কাছ থেকে স্বচ্ছন্দে পেয়েছে। কোনো ত্রুটি রাখেননি, কার্পণ্য করেননি।

বাবলু এদের সবার সঙ্গে থেকেই বড় হয়েছে। দিদি বড়ঠাকুরের শিষ্যা, তাঁর আদর্শেই বাবলুকে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কোনো বিলাসিতার মধ্যে বাবলু বড় হয়নি। রেশনের মোটা চালের ভাত, আর ভাতের পাতে এক টুকরো মাছ অথবা আধখানা ডিম পেলেই ও ছিল মহাখুশি। জামা-প্যান্টের বিলাসিতা ওর কোনদিন ছিল না, আজও নেই।

ছোটবেলায় ইতিহাসে পড়া শিবাজির মা জিজাবাঈ-এর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তিনি যেমন ছোটবেলায় শিবাজিকে তার পিতৃ-পিতামহের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের কথা শোনাতেন, শোনাতেন তাঁদের দেশপ্রেমের কথা, ঠিক তেমনি দিদিও বাবলুকে তার বাপ-ঠাকুরদার কথা, কাকার কথা বলতেন। বলতেন ওঁদের গুণাবলি আদর্শ, ওঁদের সুগঠিত পবিত্র চরিত্র এবং ওঁদের সহজ সরলতা ও গৌরবময় দারিদ্রের মধ্য দিয়ে মানুষ হওয়ার কথা। এই বীজমন্ত্রই দিদি শিশুকাল থেকে বাবলুর কানে দিয়েছেন। আজকাল হয়তো বাবলুকে প্রয়োজনবোধে অথবা শরীরগতিকের জন্য সময় সময় মোটর চড়তে হয়। খাদ্যের ব্যাপারেও ও অনায়াসে শশা-মুড়ি খেয়ে রাত কাটাতে পারে, আবার পোলাও মাংসও খেয়ে উঠছে। ওর মধ্যেও একটি উদাসী নির্লিপ্ত মানুষ আছে, ঠিক বড়ঠাকুরের মতো। ওর একমাত্র ভালোবাসার বস্তু— বই। তা পড়তেও যেমন ভালোবাসে, কিনতেও তেমনি, তা যত দামই হোক। বড়ঠাকুরও এমনি বই-পাগল ছিলেন। একবার উনি কলকাতার মেসে থাকতে, মাসের প্রথমেই মেসের খাওয়ার টাকাটা দিয়ে কিছু দামি বই কিনে ফেললেন। তারপর সারা মাস অনাহার অর্ধাহারে চলল— তাতে দুঃখ নেই, বইগুলো তো তাঁর হয়েছে! বাবলুর পাঠপ্রীতি বড়ঠাকুরের মতো হয়েছে। ওর কাকাও পড়তে তো খুব ভালোবাসতেন। আগে পড়েছেন খুব, ইদানীং পড়ার সময় বড় কম পেতেন। তার জন্য মন খারাপ হত। বড়ঠাকুর ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের রীতিমতো পাঠক।

দিদিও খুব পড়তে ভালোবাসত। লিখতে তো পারতই। দিদির মধ্যে একটা অপূর্ব মাতৃত্বের ফল্গুধারা বয়ে যেত। প্রথম দিকে দিদির দুটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। সেই সন্তান হারানোর ব্যথা দিদি কোনোদিনই ভুলতে পারেনি, হয়তো কোনো মা তা পারেন না। দিদির সেই ব্যথিত মাতৃত্ব যেন দিদিকে সবার মা করে তুলেছিল। তাই যিনিই দিদির সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিই সেই মাতৃত্ব অনুভব করতেন।

দেশের 'গোপালনগর' স্কুলে যখন বড়ঠাকুর চাকরি করতেন তখন দেখেছি বড়ঠাকুরের কত ছাত্র বাড়িতে আসত। দিদিকে মা বলে ডাকত, আবদার করত।

নিতু, নারান, আরও কত সব। সবার প্রতিই দিদির ছিল সমান স্নেহ। বড়ঠাকুরের কলকাতা স্কুলের ছাত্র ডাক্তার আবিরলাল মুখোপাধ্যায়কে দিদি বলতেন, 'আবির আমার বড়ছেলে।' পরবর্তীকালে দেখেছি বাবলুর সব বন্ধুরাই দিদির কাছে আসত, তারা সবাই দিদির কাছ থেকে মায়ের মতো স্নেহ পেয়েছে, সাহচর্য পেয়েছে। ওদের নিয়ে দিদি গল্প করত। সাহিত্য আলোচনা করত। ওদের সামনে বড়ঠাকুরের আদর্শ তুলে ধরেছে। বাবলুর বন্ধুরা অনেকেই কবি ও লেখক। ওরা নিজের নিজের লেখা নিয়ে এসে দিদিকে শোনাত। দিদি শুনে ভালো বললে ওরা নিজেদের লেখা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হত। ভালো বলেছেন মানে লেখাটা উতরে গেছে। এইভাবে দিদি সবাইকে নিয়ে বাবলুকে বড় করে তুলেছে।

দিদির মধ্যে অনেক গুণ ছিল। সাহিত্য-সমালোচক, প্রকৃতি-প্রেমিকা, সুলেখিকা। বিয়ের আগে থেকেই দিদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখেছে। বড়ঠাকুর দিদির লেখার প্রশংসা করতেন। এইসব গুণগুলি বড়ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে আরও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতিকে ভালোবাসতে বড়ঠাকুর দিদিকে প্রেরণা দিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছেন। গাছগাছালি, ফুল, লতাপাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, পাখি চিনিয়েছেন, লিখতে উৎসাহিত করেছেন। সমাজ-সংসারে কেমনভাবে চলতে হয়, কেমনভাবে সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে হয়, সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়— এইসব শিখিয়েছেন। এখানে বড়ঠাকুরের বিয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে দিদিকে লেখা একটি চিঠি তুলে দিলাম। বড়ঠাকুর লিখেছেন—

41, Mirzapur Street
Calcutta
1940
রবিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এবারকার পত্রখানি চমৎকার হয়েছে, কল্যাণী। শেষের কবিতাটি কার, রবীন্দ্রনাথের? কোথায় যেন দেখেচি! অথচ ঠিক মনে করতে পারচি নে। কানু শনিবার না শুক্রবার এখানে এসেছিল, সে বোধহয় রবিবার বনগাঁ যাবে। তার কাছে কয়েকটি দরকারী কথা ছিল বলে দিয়েচি। আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যত বিয়ে এগিয়ে আসছে। কাজকর্মের কিছুই ঠিক হল না, এখনও অনেক কিছু অনুষ্ঠান আছে বিয়ের। পিঁড়ি চিত্র করা, শ্রী গড়া, ডালা সাজানো এসব কে করবে বুঝতে পারচিনে। কানুকে দিয়ে বলে দিয়েচি বিভূতি মুখুজ্জেকে বলতে কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা ঠিক করা।

আমারও খুব আশ্চর্য মনে হয় তোমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সব কথা ভাবলে। এখন মনে হচ্ছে হয়তো অনেক জন্মের বন্ধন ছিল তোমার সঙ্গে, নয়তো এমন হবে কেন?

কল্যাণী, তুমি আমার অনেকদিনের পরিচিতা। এবার এত দেরিতে দেখা হল কেন জানি না। আরো কিছুকাল আগে দেখা হলে ভালো হোত। যাক, আর কী করা যাবে— ভবিতব্য সেই মুহূর্তে আসবে যে মুহূর্তে তার সময় হবে। আমি এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের আয়ু দ্বারা মানুষের সত্যিকার বৃহত্তর জীবন মাপা যায় না। এ একটা বিরাট বৃত্ত, হাজার হাজার বছর এর পরিধি। তুমি নেই, আমি নেই। আছে আমার আত্মা, তোমার আত্মা। লক্ষ বছর তাদের স্থিতিকাল। সে বিরাট vision দিয়ে জীবনকে যে দেখেচে, জীবনকে সত্যিকার সেই চিনেচে।

আমি তোমার সঙ্গে হৃদয়হীন ব্যবহার করবো কেন জীবনে? তা বুঝি কেউ করে? আমি তোমায় ভালোবাসবো, যেমন বাসি— স্নেহ করবো, যেমন করি। এর থেকে একতিল ভালোবাসা কমবে না, বাড়বে বই কমবে না। তুমি ভালোবেসে আমার ঘরে আসতে চাও, তোমার কত ভালো পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারতো— কিন্তু তা যখন তুমি ফেলে আসতে চাইচ, তখন তোমার ভালোবাসার মান আমায় রাখতে হবে বই কি। তোমায় ভালোবাসি ও স্নেহ করি বলেই বিবাহে মত দিয়েছিলুম, নইলে কেউ কি আমায় আবার বন্ধনের মধ্যে ঢোকাতে পারতো? আশীর্ব্বাদ করি তুমি ভালোবেসে তৃপ্তি পাও। সুখী হও জীবনে। আমাকে তোমার ভক্তি করতে লাগবে না।

(পূর্ববঙ্গের টান এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। দ্যাখো কাণ্ড!)

ভালোবেসো, তা হলেই আমার আনন্দ। শ্রদ্ধা ভক্তি— এসব দেবতাদের প্রাপ্য। মানুষ কি পায়? মানুষের কত ত্রুটি-বিচ্যুতি, কত ভুলচুক, তারা কি ভক্তির পাত্র? আমার মধ্যে কত হীনতা দেখবে, কত খারাপ দেখবে। তখন কি ভক্তি হয়? তা হয় না। হ্যাঁ, তবে ভালোবাসা অন্য জিনিস। যে যাকে ভালোবাসে তার শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও সে ভালোবাসা কমে না বরং বাড়ে।

ভালোবাসাকে বড় বলচে এইজন্যে। Love is God। মানুষের যে হৃদয়ে বন্ধুত্ব, ক্ষমা, করুণা ও স্নেহের সিংহাসন পাতা— ভগবানের সিংহাসনও সেখানে।

সুতরাং তুমি নিঃসন্দেহে থাকতে পারো, ভালোবাসবো চিরকালই তোমায়। তোমার ওপর নিষ্ঠুর হতে বুঝি পারবো কোনোদিন? খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার জীবনে কারো সঙ্গে কোনোদিন করিনি, যতদূর আমার মনে হয়। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে সেগুলো ফুটিয়ে তোলা আমার একটা বড কাজ হবে। সব দিক থেকে। কল্যাণী,

আমি জানি তুমি ক্লিওপেট্রা বা নূরজাহান নও। কিন্তু বাইরের রূপ কতদিনের? অন্তরের যে রূপ চিরদিনের, তোমার মধ্যে আমি তা প্রত্যক্ষ যদি না করতুম, তবে কি আমি তোমার সাথে এত মিশতাম?

নুটুকে চিঠি লিখে দিয়েচি, সে বৃহস্পতিবার দিন সম্ভবত বনগ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। আমি যাবো রবিবার বা সোমবারে। তুমি সুরেশকে বলেছিলে বারাকপুরে পুরোহিত ঠিক করার কথা? সে কি গিয়েছিল? আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রী ছাড়া লিখি না। তুমি সেই বলেছিলে তারপর থেকে, কোথাও না। ভাবি, কল্যাণীর অনুরোধ, না রেখে পারি?)

পুঃ— তুমি ৪/৫টা গান ভালো করে তৈরী করে রেখো, কথা ও সুরসুদ্ধু। মামার বাড়িতে বা অন্যত্র তোমার গান শুনতে চাইবে। হারমোনিয়ামের সঙ্গে সেট করে রাখতে যদি পারো তো ভালো হয়। কারো ওপর নির্ভর না করে যাতে গাইতে পারো এজন্যে কথাগুলো জানা দরকার। এটা বিশেষ দরকার, মনে থাকবে?

বিয়ে বৌভাত মিটে যাওয়ার পরের দিনই বড়ঠাকুর দিদিকে নিয়ে ভাটপাড়ায় দাদার বাড়ি এসেছেন। আমিও তখন ভাটপাড়ায়। দিদিকে আমার এবং বাড়ির সকলের খুবই ভালো লেগেছে। সেদিন বড়ঘরের মেঝেয় আসন পেতে ঠাঁই করে সবাইকে খেতে দেওয়া হয়েছে। মামা, বড়ঠাকুর, ঠাকুরপোরা, আমার স্বামী, সবাই খাচ্ছেন। বড়ঠাকুর বিয়ের একদিনের গল্প করছেন। কথায় কথায় দিদির কথা উঠল। বড়ঠাকুর মাকে বললেন, 'বুঝেচ মামিমা, কল্যাণী বেশ গুণী মেয়ে। ভালো গান করে, গল্প লেখে, রান্নাও করতে পারে। সেদিন আমাকে মুড়িঘণ্ট করে খাইয়েছিল। ভারী চমৎকার হয়েছিল! বলি, কল্যাণী, বেশ ভালোই রেঁদেচ।'

বড়ঠাকুরের গল্প শুনতে শুনতে সবার মুখে হাসি, শুধু মামা গম্ভীর। মামাশ্বশুর তো। কথাটা কিন্তু খুবই সত্যি। দিদির হাতের রান্না খুব ভালো ছিল। ভাজা বিউলির ডাল, মোচা চিংড়ি, খিচুড়ি আর মাছের ঝাল অত্যন্ত ভালো ছিল। দিদির সব কাজই ছিল সুন্দর পরিপাটি। সকালবেলায় কুটনো কুটতে বসত। গামলাভর্তি জল, কুটনো ধোয়ার জন্যে। ধুয়ে রাখার জন্যে থালা, বসার পিঁড়ি, বঁটি সবকিছু। দিদির সুডৌল লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে করা কাজ দেখতে ভারী ভালো লাগত। আজও চোখের সামনে ভাসছে। আমের সময় দেশে বড়ঠাকুর খেতে বসলে দিদি বঁটি, জল ও আমের ধামা নিয়ে বসে বড়ঠাকুরের পাতে আম কেটে দিত। বড়ঠাকুর খেতেন অল্প। কিন্তু বিভিন্ন টেস্টের আম চাই। টক, অল্পটক, মিষ্টি— এমনি ধারা সবরকম একটু

একটু। কোনোটার এক চাক্‌লা, কোনোটার আঁটি, এমনি। বড়ঠাকুরের সব কাজেই দিদির ছিল আনন্দ।

বড়ঠাকুর ভবিতব্যে বিশ্বাসী ছিলেন। জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন। দিদি-বড়ঠাকুরের বিবাহ দৈব-নির্দেশিত। কেননা বড়ঠাকুর বিয়ে করবেন না বলেই বহুদিন বিয়ে করেননি। ভায়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু হঠাৎ দিদির সঙ্গে দেখা, পরিচয়। দুজনের ভালোবাসা, বিয়েতে তার পরিণতি। বিয়ে না হলে আমরা বাবলুকে পেতাম না। সবই পূর্ব-নির্ধারিত ছকে বাঁধা, অলক্ষ্য শক্তিকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

দিদি-বড়ঠাকুরের দাম্পত্যজীবন ছিল অপূর্ব সুন্দর। দুজন দুজনকে পেয়ে ছেলেমানুষের মতো খুশি ছিলেন। দুজনের বয়সের পার্থক্য ওঁদের ভালোবাসার মধ্যে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। বড়ঠাকুর যা পছন্দ করতেন বা ভালোবাসতেন দিদি সবসময় তাই করবার চেষ্টা করত। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা কোনদিনই দিদি বড় করে দেখেনি, কখনো বলেনি, ভালো লাগছে না। বড়ঠাকুরকে সুখী করাই ছিল দিদির জীবনের ব্রত বা লক্ষ্য। নিজের সবকিছু বড়ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন।

বড়ঠাকুর অত্যন্ত সাদামাটা লোক ছিলেন বটে, কিন্তু সবসময় চলতেন নিজের খেয়ালে। কখনও গভীর রাত্রে দিদির ঘুম ভাঙিয়ে বলতেন, 'চলো কল্যাণী, বনে আগুন লেগেছে, দেখে আসি।' কখনো বা কোনো সন্ধ্যায় ওঁরা দুজনে বেরিয়ে পড়তেন চায়ের কেটলি হাতে কোনো গাছের তলায় বসে চা করে খাবেন বলে। কখনো জ্যোৎস্নারাতে ইছামতীর ধারে কোনো বনঝোপের তলায় বসে শুনতেন ইছামতীর কলকল্লোল। দেখতেন জ্যোৎস্নার শোভা। এইভাবে প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করতেন। দিদিও এসব ব্যাপারে সানন্দে সাড়া দিত। এইখানে দুজনের মন এবং মতের খুব মিল ছিল।

মাঝে মাঝে আবার দিদিকে সংসারী হতে শেখাতেন, বলতেন, 'কল্যাণী, খরচপত্র কমাও, সংসারী হও। আমরা ছাপোষা গৃহস্থ। দেখ, দেশের মানুষ কত অল্প টাকায় সংসার চালায়।' একটু এদিক-ওদিক হলে মাঝেমধ্যে একটু-আধটু বকতেনও।

দিদির খুব মিশুকে স্বভাব ছিল। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিশে গিয়েছিল। নিজের কোনো অহমিকা ছিল না, যা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। বড়ঠাকুরেরও কোনো অহমিকা ছিল না। তাই দেখেছি ঘাটশিলায় অনায়াসেই একটি সাঁওতালের পাশে বসে তার দেওয়া টাটকা শালপাতার বিড়িতে সুখটান দিতে বড়ঠাকুরের কোনো দ্বিধা ছিল না। উপরন্তু এতে ছিল তাঁর দুর্লভ সরলতার আনন্দ আস্বাদন।

একদিন কী হল, গ্রামের হাজারি জেলেনি প্রচণ্ড জ্বরগায়ে আমাদের বাড়ির রোয়াকে এসে শুয়ে পড়েছে। এবং জ্বরের ঘোরে কাপড়-চোপড়, রকের মেঝে খানিকটা ময়লা করে ফেলেছে। বড়ঠাকুর ঠেসচেয়ারে বসে আছেন। এই হাজারি জেলেনি আগে দুধের ব্যবসা করত। আমাদের বাড়িতে দুধ দিত। বড়ঠাকুর ওর দুধ খেয়েছেন ছোটবেলায়, তাই হাজারির ওপর বড়ঠাকুরের একটা বিশেষ টান ও ভালোবাসা ছিল। হাজারিও খুব স্নেহ করত। যাই হোক, হাজারির ওই অবস্থা দেখে বড়ঠাকুর দিদিকে ডেকে বললেন, 'কল্যাণী, তুমি ওর ছেলে-বৌকে খবর দাও; এসে হাজারিকে বাড়ি নিয়ে যাক। আর তুমি ওই জায়গাটা নিজে পরিষ্কার করে ফেল। আমার মা থাকলেও তো তুমি করতে! হাজারি আমার মায়ের মতো। বুড়োমানুষ।' দিদি সেদিন সব পরিষ্কার করে ইছামতী থেকে অবেলায় স্নান করে এল।

দিদির ব্যবহার ছিল খুব মিষ্টি। সবার সঙ্গে একই রকম আপনজনের মতো ব্যবহার করত। কেউ এলে প্রথমে তার শরীর কেমন, পরে তার বাড়ির প্রত্যেকের খোঁজখবর নেওয়া। কখনো কেউ কোনো আশা নিয়ে এলে তাকে দিদি বিফল করত না। দিদির কাছে এসে কেউ ভারী মন নিয়ে ফিরে যায়নি। সময় নেই অসময় নেই অনেকেই দেখা করতে আসতেন, বড়ঠাকুরের কথা শুনতে চাইতেন। দিদি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। বড়ঠাকুরের কথায় দিদির ক্লান্তি ছিল না। নিজের খাওয়া-শোয়ার বিশ্রামের কোনো সময় ঠিক থাকত না। যদি বলতাম, 'কথা পরে বোলো, খাওয়াটা ঠিক সময় করে নাও তো দিদি', তখুনি বলতেন, 'ঠিক সময়েই তো করছি রে।' নিজের প্রতি ঔদাসীন্য চিরদিনের।

আমার কাছে দিদি ছিল একটা পরম নির্ভরতার স্থল। ক্লান্ত মন নিয়ে যখনই দিদির কাছে গেছি জননীসুলভ মমতা দিয়ে তৃপ্ত করতেন। কোনো সমস্যা নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সহজ সহানুভূতিতে মন ভরিয়ে দিতেন। এমন মানুষ দুর্লভ। দিদি বড় লোকজন খাওয়াতে ভালোবাসতেন। কেউ গেলে কিছু-না-কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না।

দিদির কাছে বড়ঠাকুরের কত কথা শুনেছি। বড়ঠাকুর দিদির কাছে সুপ্রভাদির গল্প করেছেন। বড়ঠাকুরের প্রতি সুপ্রভাদির শ্রদ্ধানম্র বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও অসংখ্য গুণাবলি বড়ঠাকুরকে মুগ্ধ করেছিল। সব কথাই দিদি শুনেছিলেন। সুপ্রভাদি ভালো লিখতেন। অধ্যাপিকা ছিলেন। সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য, তদুপরি শিল্পীমন, গৃহসংসারের কাজেও পারদর্শিনী ছিলেন। বড়ঠাকুর প্রায়ই সুপ্রভাদির গল্প করতেন। দিদির বিয়ের পর দিদিকে নিয়ে বড়ঠাকুর দার্জিলিং গিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ

সুপ্রভাদিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সঙ্গে সুপ্রভাদির মা, স্বামী ও বোনঝি ছিলেন। দিদির সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। ওদের হোটেলে দিদি-বড়ঠাকুর চায়ের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। বড়ঠাকুর প্রায়ই দিদির কাছে গৌরীদির কথা বলতেন। খুবই প্রশংসা করতেন। দিদির বিয়ের পর দিদিকে নিয়ে পানিতরে গৌরীদির বাপের বাড়ি যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল। কারণ গৌরীদির বাবা অনেক করে যেতে লিখেছিলেন। অবশ্য যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

দিদির কাছে খুকুর অনেক গল্প শুনেছি। খুকুর ভালো নাম ছিল প্রীতিলতা। দেখতে সুন্দর। আমাদের গ্রামের পাশের বাড়ির মেয়ে। খুব হাসিখুশি, সুন্দর কথা বলতে পারে। গান করে, বই পড়তে ভালোবাসে। বড়ঠাকুর দেশের বাড়ি গেলে বড়ঠাকুরের কাছে আসে, গল্প করে, বই নিয়ে যায়। বড়ঠাকুরকে যত্ন করে। বড়ঠাকুরের ভালো লাগে, স্নেহ করেন। খুকুর সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পান। খুকুর জন্য বই নিয়ে আসেন। নিজে যা লেখেন পড়ে শোনান। নিঃসঙ্গ জীবনে খুকুর অল্পসল্প সান্নিধ্য ওঁর ভালোই লাগে। 'দেবযান' প্রথম কিছুটা লিখে খুকুকে শুনিয়েছিলেন। খুকু বলেছিল, 'বেশ হয়েছে। নতুন রকম। সবই তো আমি আর তুমি।' খুকুর বিয়ে হয়েছিল আমাদের দেশের বাড়ির পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে। খুকুদের বনগাঁতে একটি বাড়ি ছিল, প্রায়ই ওরা বনগাঁ থাকত।

দিদির বিয়ের পর বড়ঠাকুর দিদিকে নিয়ে খুকুদের বাড়ি যেতেন। তিনজনে মিলে গল্প করতেন। দিদির মনে কিন্তু কোনো ঈর্ষা বা রাগ ছিল না। বড়ঠাকুর ছিলেন সহজ সরল মানুষ। যখন যা মনে হত দিদিকে কোনো দ্বিধা না রেখেই বলতেন। কোনোদিন সুপ্রভার কথা ভেবেছেন, কোনোদিন খুকুর কথা মনে হয়েছে এই সময়। বড়ঠাকুরের যাকে ভালো লেগেছে, অকপটে তার বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। বড়ঠাকুর বলতেন, 'মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন কক্ষ আছে। যার যে কক্ষ, সেটি তার নিজস্ব। সেখানে অন্যের প্রবেশাধিকার নেই।'

বড়ঠাকুরের হৃদয়ে নিজের কক্ষে দিদি একক উজ্জ্বল হয়ে ছিল। বড়ঠাকুরের নিঃসঙ্গ জীবনকে দিদি এসে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলেছিল।

১১

একবার বাবলু-বৌমার বিয়ের তারিখে আমি, দিদি, অধীশ, বাবলু ও বৌমা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। সবকিছু দেখে খুব ভালো লেগেছিল। ওখান থেকে গিয়েছিলাম বক্রেশ্বর। উষ্ণকুণ্ডে গলা ডুবিয়ে আমি আর দিদি কতক্ষণ গল্প করেছিলাম। শিবের পুজো দিয়েছিলাম।

পরদিন খুব ভোরে আমরা যাত্রা করেছিলাম জয়দেব-কেন্দুলির পথে। কেন্দুলিতে পৌঁছতে আমাদের একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল। গিয়েই সকলে অজয়ে স্নান করলাম। বেশ শীত, তবুও স্নান করতে ভালো লাগছে। বহু লোক স্নান করছে। স্নান সেরে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখলাম। বেশ বড় মেলা। সবকিছুর দোকান, প্রচুর ভিড়। জায়গায় জায়গায় বাউলগান হচ্ছে। নেচে নেচে বাউলগান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলাম। খুব ভালো লাগছিল। বহুদিন ধরে বাউলমেলার কথা শুনে আসছি। সেদিন চাক্ষুষ দেখে মন ভরে গেল।

একবার দিঘায় গিয়েছিলাম। দিদি, আমি, বাবলু, বৌমা ও নাতিরা— বাবু, আম্পা। সকালে ব্যারাকপুর থেকে বেরুনো হল। পৌঁছলাম বিকেলে। সমুদ্রের কাছেই একটি হোটেলে বাবলু থাকার ব্যবস্থা করেছিল। আমার আর দিদির ঘরের দুটো জানলা ছিল ঠিক সমুদ্রের ওপর। জানলা খুললেই দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। ঘরে বসেই ঢেউয়ের খেলা, রূপের মেলা দেখতাম, আর গল্প করতাম দুজনে। সমুদ্র-স্নান— সে একটা মজার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। বৌমা-বাবলু হাত ধরে স্নান করিয়েছে। খুব স্নান করেছি। পরদিন বিকেলে তালসারি যাওয়া হয়েছিল। বড় শান্ত নির্জন স্থানটি। সমুদ্রতীরে ঘন ঝাউগাছের সারি। সমুদ্রের প্রশস্ত বালুকাবেলায় আমি-দিদি কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। বৌমারা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ফেরার সময় পথেই চন্দনেশ্বর শিবমন্দির পড়ল। দর্শন করে এসেছিলাম।

দিদির সঙ্গে এই ধরনের ভ্রমণ আমরা প্রায়ই করেছি। দেশে যেতাম, বাবলু-বৌমা, বাবু-আম্পা। আরও অনেকে থাকত। যশোর রোডে গাড়ি ঢুকলেই মনটা অন্যরকম হয়ে যেত। দুপাশে মস্ত বড় বড় গাছের সারি। যেন মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দুপাশে কতরকমের ফুল, লতাপাতা, গাছগাছালি। তাদের মধ্যে দু-একটার নাম হয়তো জানা। বেশির ভাগই অজানা। কিন্তু দিদিকে জিজ্ঞেস করলেই তার ঠিকঠাক নাম জানা যাবে। বড়ঠাকুরের সঙ্গে বেড়িয়ে দিদি অনেক গাছের নাম জেনে গিয়েছিল।

একবার বাবলুর জন্মদিন। দিদি বলল, 'যমুনা, আয়। আগে বাবলুর আশীর্বাদটা সেরে নিই। তারপর খাওয়া-দাওয়া হবে।' বৌমা একটা ডিশে করে ফুল-চন্দন, ধান-দূর্বা, প্রদীপ সাজিয়ে এনে দিল। বাবলুকে বসিয়ে দিদি আশীর্বাদ করতে লাগল। আমরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। দিদি বাবলুর মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে বললেন, 'ধান্যের মতো দয়াবান হও; দূর্বার মতো আয়ুষ্মান হও।' কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বললেন, 'চন্দনের মতো স্নিগ্ধ হও।' ফুল হাতে দিয়ে বললেন, 'পুষ্পের মতো সুগন্ধ-

যুক্ত হও।' প্রদীপের শিখা থেকে বুড়ো আঙুলে তাপ দিয়ে বাবলুর কপাল দিয়ে বললেন, 'আগুনের মতো দীপ্তিমান হও।' বলে আশীর্বাদ করে বাবলুকে চুমু খেলেন। আমরাও একে একে ওইভাবে আশীর্বাদ করলাম। মনে পড়ল বড়ঠাকুর আশীর্বাদ করতেন 'কল্যাণ হোক' বলে। আমিও 'কল্যাণ হোক' এই আশীর্বাদ-বাণীটি শিখে নিয়েছি। ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্যে যেন সমগ্র অন্তরের শুভকামনা ঝরে পড়ছে।

দিদির কাছে যখনই যেতাম, দিদি আগে হাসিমুখে বলত, 'আয়, আয় যমুনা, বোস।' তারপর নিজের একটা ভালো কাপড় বার করে দিয়ে বলত, 'পর।' দিদির একটা মজার স্বভাব ছিল, খুব কাপড় কিনতে ভালোবাসত। আলমারি-ভর্তি দিদির কাপড়। গহনা গড়ানোরও শখ ছিল। বড়ঠাকুর দিদিকে অনেক গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। দিদি নিজেও গড়াত, কিন্তু নিজে পরত না। সব থাকবে, অপরে পরবে। তাতেই দিদির ছিল আনন্দ।

কাপড় ছেড়ে খাটে বসে দুজনের গল্প শুরু হত। খেইহীন কতরকমের কথা তার ঠিক নেই। অবচেতন মনে কখন যে দুজনে আমাদের সেই ঘাটশিলা আর দেশের দিনগুলিতে চলে যেতাম বুঝতেই পারতাম না। গল্পেরই ফাঁকে দুজনে একসঙ্গে খেতাম। তারপর শুয়ে চলত আরও গল্প।

দিদি বড়ঠাকুরের সঙ্গে কত জায়গায় বেড়িয়েছে। দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ, হরিদ্বার, আরও কত কী! একবার বড়ঠাকুর দিদিকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় বেশ মজা করেছিলেন। দিদি বলেছিল, জানিস যমুনা, সেবার আমি দেশে আছি। একদিন তোর বড়ঠাকুর কলকাতা থেকে এসে বললেন, এবার পুজোর ছুটিতে গজেনবাবু সুমথবাবুরা সালানপুর যাচ্ছেন, আমি বলেছি, আমরাও যাব। কল্যাণী তৈরি হও। আমি বললাম, সালানপুর আবার কোথায়? কখনও তো নাম শুনিনি! কত ভালো জায়গা রয়েছে, তা না সালানপুর! তোর বড়ঠাকুর মিটিমিটি হাসছে। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আমাকে বললেন, শোনো কল্যাণী, সালানপুর অতি ভালো জায়গা, আসানসোলের কাছে ছোট্ট গ্রাম, পুকুর-ধানখেত, সিনসিনারি অপূর্ব! চলো, দেখবে। আমি রেগেমেগে বললাম, এত জায়গা থাকতে ঠাকুরপোরা এই জায়গা ঠিক করলেন! এক গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রামে! জানিস, মনে একটুও উৎসাহ পাচ্ছি না। তোর বড়ঠাকুরের খুব উৎসাহ। যতদিন এগিয়ে আসছে, ততই উৎসাহ বাড়ছে। বলছেন, সব গোছগাছ করে ফেল। যাওয়ার আগের দিন তোর বড়ঠাকুর বললেন, আমাদের ট্রেন রাত্রে। শুনে জানিস আমার একটু অবাক লাগল। এই তো আসানসোলের কাছে গ্রাম। রাত্রে যাওয়ার কী দরকার। ভাবলাম বটে, কিন্তু ওঁকে কিছু বললাম না।

তারপর যাওয়ার দিন আমাকে স্টেশনে মালপত্রের কাছে বসিয়ে রেখে উনি এদিক-ওদিক ঘুরছেন আর বলছেন, ওরা এখনও এল না। হঠাৎ দেখেন সুমথবাবুর দাদা প্রমথবাবু আসছেন। তোর বড়ঠাকুরের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা হল। তারপর আমার কাছে এসে বললেন, বৌদি, এবার আপনাদের লম্বা পাড়ি, খুব ঘুরবেন। হঠাৎ দেখি তোর বড়ঠাকুর প্রমথবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বললেন, তখন প্রমথবাবু তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জানিস, তখন আমার মনে একটু খটকা লাগল। আচ্ছা, প্রমথবাবু লম্বা পাড়ি বললেন কেন? ট্রেনে উঠেই দেখি তোর বড়ঠাকুর শোয়ার তোড়জোড় করছেন। আমি বললাম, সত্যি বলো তো আমরা কোথায় যাচ্ছি? টিকিটটা আমাকে দেখাও। তোর বড়ঠাকুর টিকিট দেখালেন না। বললেন, সে অনেক হ্যাপা, সুটকেসে আছে, এখন দেখানো যাবে না। অগত্যা শুয়ে পড়তে হল। ভোরে ঘুম ভেঙেছে। দেখি বিরাট বড় একটা স্টেশন। নাম 'মোগলসরাই'। তখন ভাবলাম, সালানপুর নয়, অন্য কোথাও যাচ্ছি। উনি আমাকে বলছেন না।

সকাল সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ গাড়ি একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তখন তোর বড়ঠাকুর আমাকে ডেকে বলছেন, 'দেখ তো কল্যাণী, একটা কেমন সুন্দর দেশ।' দেখি একটা নদী, তাতে নৌকা চলছে, ডানদিকে একটি প্রাচীন নগর। তখন তোর বড়ঠাকুর বলছেন, 'কল্যাণী, আমরা কাশী এসেছি। ওই দেখ বেণীমাধবের ধ্বজা।'

সঙ্গে সঙ্গেই দেখি বারাণসী স্টেশন। গজেন ঠাকুরপো, সুমথ ঠাকুরপো আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। তোর বড়ঠাকুর গজেনবাবুকে বললেন, 'জানেন গজেনবাবু, কল্যাণী জানত সালানপুর যাচ্ছে, কাশীতে পা দিয়ে এখন বুঝেছে কাশী এসেছি।'

এই ধরনের কত গল্প। রাত্রি কোথা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে টের পেতাম না। দিদি বলত, 'আর নয়, অনেক রাত হল। এবার ঘুমো। কাল ভোরে আবার স্কুল যাবি।' আমি বলতাম, 'না দিদি, আর একটু বলো।' দিদি বলত, 'তোর বড়ঠাকুরের কাশী খুব প্রিয় জায়গা ছিল। আমার শ্বশুরমশাই, বড়মা কাশীতে ছিলেন। ওইখানেই বড়মা বিশ্বনাথের কাছে পুত্র কামনা করেছিলেন। তার কিছুদিন পরে আমার শাশুড়ির কোলে তোর বড়ঠাকুর আসেন। আমাদের মামাশ্বশুরবাড়িরও কারা যেন কাশীতে থাকতেন, তখন তোর বড়ঠাকুর কাশী গিয়েছিলেন।'

তখনকার ছোটমামাকে লেখা একটা চিঠি আছে। তখন চিঠিখানা দেখিনি বটে, কিন্তু এখন সেই চিঠিখানা পেয়েছি। এখানে উল্লেখ করলাম। আজমাবাদ কাছারি থেকে লিখছেন আমার ছোট মামাশ্বশুর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে—

আজমাবাদ কাছারি
পোঃ সুখটিয়া
ভাগলপুর
১০. ১. ২৭

Dear Chotomama,

তোমার পত্র পেয়েচি। আমি কাশী থেকে চুনার ও বিন্ধ্যাচল হয়ে পথে গয়া ও বুদ্ধগয়া হয়ে এখানে ফিরেচি। ভাগলপুরে এসেই আবার উপরোক্ত কাছারীতে জানুয়ারীর... জন্য... হয়েছি।

অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখলাম বিশ্বনাথের মন্দিরের... নতুন ধরনের। সকলের চেয়ে ভালো লাগল— বৈকালে পঞ্চকেদার ঘাট থেকে নৌকা করে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত বেড়িয়ে সমস্ত ঘাটের শোভা দেখে বেড়ালাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে বারাকপুরের সরোজিনী... এদের বাড়ি...। যুগলকাকার সঙ্গে দেখা হল... কাশীতেই থাকেন। রামনগরে বাগান প্রাসাদ দেখতে যাবার ইচ্ছা... কিন্তু Prince of Wales এসে সেখানে আছেন। শুনলাম যেতে দেবে না। মোটরে একদিন দিদিমা, বড়মামা ও আমি সারনাথ দেখতে গেলাম। এখানে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন। পুরোনো আমলের অনেক মন্দির প্রতিমূর্তি বেরিয়েছে। চুনারের দুর্গ একটি দেখবার জিনিস... প্রকাণ্ড পাহাড়ের মাথায়... পাথরের তৈরি দুর্গ থেকে আরম্ভ করে পর্যন্ত, সকলে হয়তো জেনেছে দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে চারিধারে পাহাড় উঁচু-নীচু দৃশ্য যা দেখার। চুনারে একটি পুরানো আমলের বাগানের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর... এক কবর, কী চমৎকার পাথরের ওপর কাজ। দাঁড়িয়ে দেখলে চোখ ফিরোনো যায় না। এত গোলাপ এর আগে আর কোথাও ফুটে থাকতে দেখিনি। গোলাপ গাছের নিভৃত জঙ্গলের মধ্যে দিল্লীর বাদশাজাদার এই পরিত্যক্ত অনাদৃত কবরটি বড় করুণ লেগেছিল সেদিন।

চুনারে আর একটি জিনিস আছে। শাহ সেলেম আলির দরগা। এটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। নকশা-কাটা পাথরের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। প্রাচীনকালের জালিকাটা পাথরের কাজ করা। পাথরের উপর এত সূক্ষ্মকাজ হতে পারে, তা আগে আমার ধারণা ছিল না। চুনারের দৃশ্য, চারিধারে পাথর বার-করা পাহাড়, জলহাওয়া অতি সুন্দর। এখানে অনেকে হাওয়া বদলাতে আসে। চুনার সুজাপুর জেলায় পড়ে— U.P.। চুনার দেখে বড় মুগ্ধ হয়েছি। এক হিসাবে কাশীর চেয়েও চুনার ভাল লেগেছে।

গয়ায় পিতা-মাতার পিণ্ডদান ইত্যাদি সেরে বুদ্ধগয়া দেখলাম। বুদ্ধগয়া অতি সুন্দর, কিন্তু বিশ্রী জায়গা। ধুলো... বিশ্রী। দুদিন ছিলাম, পালাতে পারলে বাঁচি। মন্দির

ও তার মধ্যে বুদ্ধের মূর্তি একটা দেখবার জিনিস। যে গাছতলায় বুদ্ধ সিদ্ধ হয়েছিলেন তার ডাল থেকে যে গাছ বেরিয়েছে তা এখনও আছে। এখানে অনেক তিব্বতী লামাকে দেখলাম। ফল্গু নদীতে পিণ্ড দিচ্ছি এমন সময় দেখি ডাক্তার বিধুবাবু, বনগাঁয় যাঁর বাসাতে আমি first class পড়ার সময়ে ছিলাম। তিনিও বহুদিন পরে আমায় দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন— তিনিও শ্রাদ্ধাদির জন্য আমার পাশে বসেই পিণ্ড দিয়েছেন। আবার সেইদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েও দেখা হল, একসঙ্গে বেড়ালাম। বড়মামার ছোটছেলেটি দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে... নাম... পানীও দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। পশ্চিমের জলহাওয়ায় এই মোটা খাস্তীর শীঘ্র বিয়ে হবে। বোধহয় সেসময় আর একবার কাশী যাব। পত্রের উত্তর বড়বাসার ঠিকানায় দিও।

প্রণত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটমামা ছিলেন বড়ঠাকুরদের একমাত্র অভিভাবক। যখন যেখানে গেছেন বা প্রয়োজন হয়েছে বড়ঠাকুর ছোটমামাকে চিঠিতে জানাতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেইসব মূল্যবান চিঠি একটাও আজ আর পাওয়া যায় না। শুধু এইটি ছাড়া।

যাই হোক, গল্প শুনতে শুনতে রাত গভীর থেকে গভীরতর হত, আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। মাঝে কখনও ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম— দিদি পড়ছে। শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বইপড়া দিদির অভ্যাস ছিল। দিদি রাত করে শুলেও উঠত খুব ভোরে। তাড়াতাড়ি করে স্নান সেরে ঠাকুরপ্রণাম করে লিখতে বসত, তারপর সংসারের কাজ— কুটনো কোটা, ভাঁড়ারের জিনিস বার করা, কাজের লোকেদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া সবই করত। ইদানীং দুই নাতিকে স্কুলে দিয়ে আসত, নিয়ে আসত।

আমি যেদিন যেতাম তার পরদিন সকালে চলে আসতাম। দিদি প্রমীলাকে (কাজের লোক) ডেকে বলত, 'আগে ছোটমাকে চা করে দে।' আর বারেবারে আমাকে বলত, 'আবার কবে আসবি যমুনা? শিগ্গি করে আসবি তো?' প্রণাম করলে বলত, 'কল্যাণ হোক। দুর্গা দুর্গা।'

এইভাবে কতদিন কেটে গেছে। আমার যাওয়া-আসা যেন রুটিনের মতো হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে দুজনে শুয়ে কত গল্প করেছি। দিদি খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারত। দিদির বাবার ছিল বদলির চাকরি। সেই উপলক্ষে দিদি অনেক দেশ দেখেছিল। দিনাজপুর, বালুরঘাট, ময়মনসিং এমনি সব কত জায়গার গল্প করত। দিদির জন্ম ফরিদপুরের ছয়গাঁ বলে জায়গায়। সাহিত্যের প্রতি ছিল একটা আন্তরিক

টান। প্রকৃতিকে দেখার চোখও ছিল। তাই বড়ঠাকুরের মতো জহুরি দিদিকে স্ত্রীরূপে নির্বাচন করতে ভুল করেননি। দিদি বেড়াতেও ভালোবাসত। বড়ঠাকুরের সঙ্গে যেমন পশ্চিমের বড় বড় শহর দেখেছে, তেমনি বাংলার শ্যামস্নিগ্ধ বনভূমি, স্বচ্ছতোয়া ইছামতীর দুই তীরের গ্রামপ্রান্তর, সেখানকার সরল মানুষজন, তাদের উৎসব-আনন্দ, তাদের দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা— বড়ঠাকুর সব দেখিয়েছেন।

দিদি বিয়ের আগেই বড়ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের গ্রামে গিয়েছে। 'বনসিমতলি ঘাটে'র উপরে পিকনিক করে এসেছে। দিদি বলত, তোর বড়ঠাকুরের সঙ্গে 'মড়িঘাটার' মেলায় গিয়েছিলাম। গ্রামের অনেকে ছিল, এক নৌকোভর্তি। খুব আনন্দ করেছি রে! ওখানে রান্না করে খাওয়া হয়েছিল।

যেখানেই বেড়াতে যাওয়া হোক না কেন, কী ঘাটশিলা, কী ব্যারাকপুর, দিদি কিন্তু রান্নার ভারটা নিত। মনে আছে, ধারাগিরি গিয়ে দিদি খিচুড়ি রান্না করেছে। আমি দিদিকে বললাম, 'দিদি, একবার মি. সিনহার সঙ্গে তুমি-বড়ঠাকুর ঘাটশিলা থেকে অরণ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলে?'

দিদি বললে, 'হ্যাঁরে, সেবার খুব বেড়িয়েছি। ভালোও লেগেছিল। নিবিড় অরণ্যের গাম্ভীর্যপূর্ণ রহস্যময় রূপ দেখেছিলাম। কোনদিন ভুলব না রে। প্রথমে ঘাটশিলা থেকে রওনা হয়ে রাঁচি, ওখান থেকে ফরেস্ট রোড ধরে বরকেলা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সৈদপা বলে একটা ছোট্ট গ্রামে। ওইখানে বনবিভাগের কর্মচারীদের জন্য একটা বাংলো ছিল। বামিয়াবুরু ওইখান থেকে অনেকটা দূর, সময়ও লাগবে অনেক, বেলা গড়িয়ে যাবে, তাই ঠিক হল সৈদপাতে খাওয়া সেরে তারপর বামিয়াবুরুর উদ্দেশে যাওয়া যাবে। ওইখানে মনে আছে চা করে সকলে খেয়েছিলাম। তারপর বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা যাত্রা কবলাম। সমস্ত রাস্তাটা ঘন বন, কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। বেলা পড়ে এসেছে। আমরা বামিয়াবুরু বাংলোয় পৌঁছলাম। বাংলোটা ছিল ভারী সুন্দর একটা খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর, লাল টালি দিয়ে ছাওয়া। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে শুধু উঁচুনিচু অজস্র পাহাড়ের চূড়া, আর ঘন অরণ্য। আমরা বাংলোর সামনে টেবিল-চেয়ার পেতে চা খেলাম, তারপর তোর বড়ঠাকুর বললেন, 'চলো, কাছাকাছি একটু দেখে আসি। অরণ্যের শোভা অপূর্ব।' সেদিন রাত্রে দরজা বন্ধ করেই ঘরের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। কারণ মি. সিনহার সঙ্গে আমাদের হরদয়াল সিংও ছিলেন। ওঁরা বললেন,'রাত্রে এখানে আশেপাশে চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ায়।'

পরদিন সকালে আমরা বেশ খানিকটা ঘুরে এলাম একটা উপত্যকায়। বসে সবাই গল্প হল। পাশেই ঝরনা, বনে অসংখ্য পাখি, তাদের কলকাকলিতে স্থানটি মনোরম

লাগছিল। সেদিন দুপুরে আমরা খিচুড়ি খেয়েছিলাম। পরে গাছপালায় ঘেরা চওড়া পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি যাচ্ছে, অনেক উঁচুনিচু মাঠবন পার হয়ে আমরা চলেছি, পথে দু-একটা হো-দের গ্রাম দেখেছিলাম। জানিস, কী বিরাট আর মোটামোটা শালগাছ, তাদের যে কত বয়স কে জানে। বড় বড় গাছ আর লতাগুল্মে জড়ানো গভীর অরণ্য। পাহাড়ের গায়ে গায়ে নুনের স্তর। ওইসব জায়গায় বন্য জন্তুরা নুন খেতে আসে।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর দেখি মহুয়া গাছের তলায় হাট বসেছে। হো মেয়েরা সেজেগুজে হাটে এসেছে। এ ওর সঙ্গে হাসছে, গল্প করছে। ওইখানে মুরগির লড়াই দেখলাম। একটা চাদর কিনলাম। দেখলাম কত টুকিটাকি জিনিস লোকেরা কিনছে। ওখান থেকে আরও তিনটি হো গ্রাম পার হয়ে চিটিমিটি পৌঁছলাম। যেতে যেতে একটা ছড়া তৈরি করলাম। শোন—

আগে হল পেটাপেটি
বাঁকে বুয়াটলির করজুলি
তারপর চিটিমিটি।

ছড়া শুনে তোর বড়ঠাকুর বললেন, 'বেশ হয়েছে।' চিটিমিটিতে আমাদের থাকা হল না, বাংলোটা বাসযোগ্য ছিল না। হরদয়াল সিংহ বললেন, 'রাত্রেই চাইবাসা চলে যেতে হবে।' কিন্তু বরকেলা পর্বতশ্রেণির ঘন বনের মধ্য দিয়ে এই রাত্রিবেলা যাওয়া একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। তবুও আমাদের চাইবাসা ফেরাই সাব্যস্ত হল। আসার সময় কিছুটা এসে একটা ভালো জায়গায় গাড়ি রেখে আমরা একটা বড় পাথরের ওপর বসে সবাই চা খেলাম। আমাদের সঙ্গে ফ্লাস্কে চা করা ছিল। নিবিড় অরণ্যে রাত্রের একটা থমথমানি ভাব, দু-একটা রাতজাগা পাখির ডাক, মনে একটা অদ্ভুত ভাব হল। মি. সিনহা, হরদয়াল সিংহ গল্প বলছিলেন— তাঁদের বিচিত্র অরণ্য-অভিজ্ঞতার কথা। সে রাত্রে চাইবাসায় যখন পৌঁছলাম তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

বড়ঠাকুরের সঙ্গে দিদি বহু জায়গায় ঘুরেছে, বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। বিয়ের পর বড়ঠাকুর দিদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিদি বলেছিল, জানিস যমুনা, ওঁকে আমার দেবতার মতো মনে হয়েছিল। কী স্নেহময় ব্যবহার! আমি প্রণাম করলাম, প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, বৌমা, একবার তোমার কাছে যাব। ওঁর আসা আর হয়নি। একদিন শুনলাম, তিনি মরদেহ ছেড়ে চলে গেছেন।

জানিস যমুনা, আমার রবীন্দ্রনাথকে দেখারও খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাও হয়নি। যেদিন রবীন্দ্রনাথ মারা যান সেদিন তোর বড়ঠাকুর কলকাতায় ছিলেন। তোর বড়ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের শবাধার থেকে একটি শ্বেতপদ্ম আমাকে এনে দিয়ে বলেছিলেন, কল্যাণী, প্রণাম করো। আমি সে পদ্মটি হাতে নিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। বড় কষ্ট হয়েছিল রে।

একবার তোর বড়ঠাকুরের সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনি বহুভাষাবিদ পণ্ডিত মানুষ। কত সুন্দর কথা বলেছিলেন। জীবনে কত লোকের সঙ্গেই না পরিচয় হল।

চলচ্চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' সিনেমা করার সময় দিদির কাছে এসেছিলেন। ওই উপলক্ষে কয়েকবার দিদির সঙ্গে দেখা এবং কথা হয়েছে। ওঁর ছেলের বিয়েতেও দিদি, বাবলু, বৌমা সবাই গিয়েছিল। আমি দিদির কাছে গেলেই দিদি গল্পের ঝুলি উজাড় করে আমাকে ঢেলে দিত। কোথায় গেছে, কে কে এসেছিলেন সবকিছু। বাড়িতে কখন কী ঘটছে কোনোটাই বাদ যেত না।

একবার আমি গিয়ে দিদির কাছে বসেছি, দিদি বললে, 'জানিস যমুনা, খুকুর ছেলের হঠাৎ তড়কা হয়েছিল। ওই তো ওইটুকু ছেলে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, প্রচণ্ড জ্বর আর অজ্ঞান অবস্থা। শুনে আমি গেলাম। দেখি খুকু ছেলে-কোলে বসে আছে আর কাঁদছে। আমি যেতেই ছেলেকে আমার কোলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, মেজদি, তোর কাছে কোনো অমঙ্গল আসতে পারে না। আমার ছেলেকে তোর কোলে দিলাম। আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করছি আর সেই অজ্ঞান ছেলে নিয়ে ঠায় প্রায় দু-দিন বসে রইলাম। উঠিনি, খাইনি, এমনকী বাথরুমে পর্যন্ত যাইনি। পরে ছেলের জ্ঞান ফিরল। একটু সুস্থ হল। খুকুর কোলে ছেলে দিয়ে, দু-দিন পরে বাড়ি এসে চান-খাওয়া করলাম। এ ক'দিন যে কী উৎকণ্ঠায় দিন কেটেছে কী বলব!'

এমনি ছিল দিদির মানসিকতার দৃঢ়তা। আর অপরের নির্ভরস্থল।

১২

সেবার বাংলা আকাদেমিতে বড়ঠাকুরের জন্মদিন হল। আমি, বৌমা, বাবলু, শুভেন্দ্র গিয়েছিলাম। ভানু, প্রদোষ, মণীশ, ডা. আবিরলাল মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। সভাশেষে মণীশ এসে প্রণাম করে গল্প করতে করতে বলল, বৌদি, মনে আছে ঘাটশিলায় একবার কাকিমা (গজেনবাবুর স্ত্রী—প্রতিমাদি) বড়দার জন্মদিন করছিলেন? বড়দার প্রথমে ঘোর আপত্তি।

(বলা হয়নি, মণীশ, ভানু এরা সবাই বড়ঠাকুরকে বড়দা বলত।) বড়বৌদিকে লালপাড় শাড়ি পরিয়ে বসানো হল। আপনি সারাদিন ধরে রান্না করেছিলেন। ধোঁকার ডালনা হয়েছিল। মনে আছে?

ওর কথা শুনে বহুদিনের ভুলে যাওয়া ঘটনা মনে পড়ে গেল। সত্যি, তখন কত আনন্দ করেছি সবাই মিলে। বড়ঠাকুররা দুই ভাই, দিদি, গজেনবাবু, প্রতিমাদি, রমু, ভানু, মণীশ— কত সুন্দর ছিল সে দিনগুলো। প্রতিমাদি খুব হই-হই করতে পারত। বড়ঠাকুর মণীশদের সঙ্গে খুব মজা করতেন। ওদের বেড়ানো, গল্প খুব চলত। মাঝেমাঝে আবার ওদের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'দে টিপে।' ওরা পরম আনন্দ টিপতে বসে যেত।

মণীশ বললে, 'ওইবারই নুটুদার সঙ্গে মুসাবনি গিয়েছিলাম। একদিন নুটুদা আমাকে আর রমুকে বললেন, চলো আজ আমার সঙ্গে মুসাবনি চলো। আমরা তো তখুনি রাজি। নুটুদা হেচং হেচং করে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিলেন। আমরা পিছনে বসলাম। কী করে জানি না গাড়ির সাইলেন্সারে লেগে আমার পা পুড়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। না বৌদি, মনে আছে, সেইসব দিনের কথা ভাবলে আজও আনন্দ হয়।'

মনে মনে ভাবি এতসব স্নেহের পাত্র, কত গুরুজন ব্যক্তি, কত সহৃদয় বন্ধু ছিল, কিন্তু ওঁর যাওয়ার সময় কেউই কাছে ছিল না। কারও কাছেই নিজের মনের কথা বলতে পারেননি, একলা একলা শুধু ভেবেছেন।

এখন যখন কোনো উৎসব আনন্দে অথবা দুঃখের দিনে বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে মিলিত হই, তখন সিনেমার ছবির মতো আমার সেই দুঃখের, অন্ধকারময় দিনরাত্রির কথা, আমার স্বামীর ম্লান মুখ মনের মাঝে ভেসে ওঠে। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি, এইভাবেই মানুষের দিন কাটে, এইভাবেই এগিয়ে যেতে হয় মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত।

সময় সময় ভাবি কত মানুষের মনের মধ্যে কত দুঃখ-বেদনা লুকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, আমরা বোঝার চেষ্টাও করি না। কী অপূর্ব জীবনরহস্য।

বড়ঠাকুরেব মুখে শোনা, আমার শ্বশুরমশায়ের একটি গান মনে পড়ছে—

"হরি, দুঃখ দাও যেজনারে,
যার কপালে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ,
দুঃখের উপরে দুঃখ দাও যে তারে।"

ঈশ্বর মানুষের সহনশীলতা পরীক্ষা করেন। যে যত সহ্য করে সে ততই দুঃখ পায়। দিদির সহ্যশক্তি ছিল অসীম। কখনও কোনো অবস্থাতেই দিদি মুষড়ে পড়ত না। দিদির মুখের হাসি এবং মিষ্টি ব্যবহার চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

ঋতুচক্রে উৎসব ঘুরে ঘুরে আসে। প্রতি বছরই বড়ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয়। কোনোবার হয় শিশির মঞ্চে, রবীন্দ্রসদনে, কোনোবার সুকান্ত সদনে। কখনও বা বাড়িতে, বাংলা আকাদেমিতেও হয়। দিদির সঙ্গে আমরাও সকলে সেই উৎসবে যেতাম। বিভূতিভূষণ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে প্রতি বছর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। দিদি নিজে হাতে করে সেই পুরস্কার প্রাপকের হাতে তুলে দেন।

মনে পড়ছে বড়ঠাকুরের শতবর্ষের জন্মদিনে বর্ষব্যাপী উৎসবের প্রথম দিনটিতে দিদি শিশির মঞ্চে নিজে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনাপর্ব শুরু করেন। তারপর সারা দেশ-বিদেশে যাপিত হয়েছিল সেই বর্ষব্যাপী উৎসব। দেশব্যাপী তাঁদের প্রিয় লেখককে তাঁদের শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। ওই সময় থেকেই দিদির শরীর একটু একটু খারাপ হচ্ছিল। বহু জায়গা থেকে দিদির কাছে জন্মদিনের নিমন্ত্রণ এসেছে, কিন্তু শরীর খারাপ বলে যেতে পারেনি। ভাটপাড়ায় সুখময়দের 'আজ বসন্ত'-এর তরফ থেকে শতবর্ষের জন্মদিন পালিত হয়েছিল বি. ওয়াই. এম. ক্লাবে। প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রাবন্ধিক সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন। 'আজ বসন্ত'-এর সভ্যসভ্যাবৃন্দ সুন্দর অনুষ্ঠান করেছিল। এই অনুষ্ঠানে দিদি এসেছিল, কারণ এটি বড়ঠাকুরের মামার বাড়ির দেশ। আর কোথাও যেতে পারেনি। এটিই দিদির শেষ অনুষ্ঠানে আসা।

বড়ঠাকুর বহুবার ভাটপাড়ায় এসেছেন। মামা, মামিমা, মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন। এ জায়গাটি বড়ঠাকুরের বড় প্রিয় ছিল। দিদিকে বিয়ে করে প্রথমে ভাটপাড়ায় মামার বাড়ি আসেন। এখানকার অনেক লোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থমশাই বড়ঠাকুরকে খুব স্নেহ করতেন। একবার বনগাঁতে যখন বড়ঠাকুরের জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন শ্রীজীবঠাকুর সুন্দর একটি সংস্কৃত কবিতায় আশিসবাণী পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া, দিদি আমাদের বাড়ি সেজদির বাড়ি অনেকবার এসেছে। এখনও বাবলু, মিত্রা খোকনের বাড়ি (দেবপ্রসাদ রায়), কাকাদের কাজে আসে।

মনে পড়ছে বড়ঠাকুরের ডায়েরি 'স্মৃতির রেখা'র একটা জায়গায় পড়েছি—সুদূর ভাগলপুরের বড়বাসায় (আমার যতদূর মনে পড়ছে) বসে একদিন ওঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ভাটপাড়ায় বিজয়া দশমীর দিন দুটি বৌ, তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ওঁকে ডেকে যত্ন করে খাইয়েছিলেন। আমি ভাটপাড়ার মেয়ে। এটা পড়ার পর খোঁজ করেছিলাম। সেই বৌদুটির কিন্তু খোঁজ পাইনি।

যাইহোক, দিদির শরীর ভালো নয়। দুর্গাপুর থেকে জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ এসেছে, দিদি যেতে পারল না। আমি বাবলু আর তথাগত যাব ঠিক হল, আর যাবেন লেখক

নারায়ণ সান্যাল মশাই। ওঁর পৌরোহিত্যে করার কথা ছিল। সবাই একসঙ্গে গিয়েছিলাম। ওর লেখা পড়েছি, ওঁর লেখা তো খুবই ভালো লাগে। ব্যবহারও অতি সুন্দর। একই জায়গায় আমরা ছিলাম। বাবলুদের গল্প বিরামহীন। আমি শ্রোতামাত্র। নারায়ণ সান্যালের কাছে দু-লাইন কিছু লেখা চেয়েছিলাম। উনি আমাকে 'দিদি' সম্বোধন করে একটু লিখে দিয়েছিলেন।

"যমুনা দিদিকে—

তুমি মহান স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছ। তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমরা দূর থেকে তাঁর সৃষ্টি থেকে রসাস্বাদনের ব্যর্থ চেষ্টা করছি। তুমি একটি লাইন লিখে দিতে বললে, কিন্তু একটি লাইনে কী লিখি বলো তো?

ঠাঁই যে বড়ই ছোট!
মন্দের মাঝে কুন্দের মতো
সুন্দর হয়ে ফোটো।"

প্রীতিমুগ্ধ ছোটভাই—
নারায়ণ সান্যাল

মনে পড়ছে দুর্গাপুর থেকে ফিরতে আমাদের বেলা বারোটা হয়ে গিয়েছিল। এসে দেখি দিদি স্নান করে খাটের ওপরে বসে আছে। দিদির কাছে দুর্গাপুরের গল্প করলাম। তখনও ঠিক আছে। আমি সেদিনই বিকেলে খড়দা গেলাম, আমার ছোট বোনের মেয়ে শিখার বিয়ে। আমি কন্যা সম্প্রদান করেছিলাম। ওর বোন পম্পাকেও আমি সম্প্রদান করেছিলাম। যাই হোক, যাবার সময় দিদিকে বললাম, 'আজ যাই দিদি।' দিদি আমার হাতটা ধরে বললে, 'আবার কবে আসবি বল?' 'শিগগির আসব' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ধীরে ধীরে একটু একটু করে দিদির শরীর খারাপ হতে লাগল। দিদি আগেও বেশ ভুগেছে। বড়ঠাকুর থাকতে দেশের বাড়িতে দিদির দু-তিনবার এমন জ্বর হল যে জ্বরের প্রাবল্যে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে দিলে। বড়ঠাকুর প্রতিবারই

ভাইকে লিখতেন— 'তোমার বৌদিদির জ্বর।' বড়ঠাকুর মারা যাওয়ার পরও দিদিকে কয়েকবার হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। দু'বার বড় অপারেশন হল, একবার গলব্লাডার। আর একবার মাথার অসহ্য যন্ত্রণা। শেষবার কী যে হল, পেটে কিছু থাকছে না, শুধু যা খাচ্ছে বমি হয়ে যাচ্ছে। আর একটু একটু করে যেন সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। বাবলু অনেক ডাক্তারকে দেখালে। শেষে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে আবার পিজিতে ভর্তি হল। ডাক্তার সুনীল চক্রবর্তীর চিকিৎসাধীনে। পরিশেষে ডা. অবনী রায়চৌধুরী দেখলেন। মাথায় স্ক্যান করা হল। রোগ ধরা পড়ল Alzhimer disease। মস্তিষ্কের কোষগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে চিন্তাশক্তি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যেতে লাগল। ভাবা যায় না, যে দিদির বুদ্ধির দীপ্তি ছিল প্রখর, মন ছিল সংবেদনশীল, স্মৃতিশক্তি ছিল অফুরন্ত, সে আস্তে আস্তে নীরব হয়ে এল। হারিয়ে ফেলল বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বাক্‌শক্তি। করার কিছু ছিল না। ডাক্তার, ওষুধ, সেবা ত্রুটিহীনভাবে চলছে। এই রোগে এমনিই হয়। বাবলু মুষড়ে পড়েছে। আমরা নীরবে পাশে নিয়ে বসি, দেখি তিলতিল করে শেষ হয়ে আসছে দিদির প্রাণশক্তি। বুকটা বেদনায় মুচড়ে উঠত। দিদি আমার বন্ধু, আমার বড় আশ্রয়স্থল। শেষের দিকে সবসময় দিদির কাজেই ছিলাম। বাবলু, বৌমা, নাতিরা আর বুলু, দিদির সেবিকা, আমরা দিদিকে ঘিরে বসে থাকতাম। মনে পড়ছে দিদির বোধহীন বড় বড় চোখদুটির অবোধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে কী বোঝাতে চাইত জানি না। আমরা বুঝতে পারতাম না। সে দৃষ্টি মনে পড়লেই কষ্ট হয়।

একদিন অতি চুপিচুপি মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়াল। আমরা সবাই বুঝেছিলাম এবার যাবার সময় হয়ে এল। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। বাবলু দিদির পাদুটি জড়িয়ে ধরে আছে। আমি মাথার কাছে বসে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছি। বৌমা নাতিরা আর সকলে পায়ের কাছে। নির্বাপিত হল দিদির জীবনদীপ। নেমে এল সন্ধ্যা। ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য, সেবা, ভালোবাসা- সবার মাঝখান থেকে মৃত্যু দিদিকে নিয়ে চলে গেল। সে দিনটি ছিল ১৯৫০-এর ১৯শে এপ্রিল। শুক্রবার।

১৩

মনে পড়ল বড়ঠাকুরের মৃত্যুক্ষণটির কথা। ১৯৫০। ১লা নভেম্বর। রাত্রি সাড়ে আটটায় বড়ঠাকুরের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল। ঘাটশিলার বাড়ির বড়ঘরে বড়ঠাকুর চৌকির ওপর শুয়ে আছেন, মাথার কাছে বসে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ নাম শোনাচ্ছেন, দিদি পাশে, আমার স্বামী কাছে বসে গীতাপাঠ করছেন, বাবলু আমার কোলে। সমস্ত গৃহ যেন বেদনায় থরথর করে কাঁপছে। শেষ হল পৃথিবীর

বন্ধন। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল দিদি ও দিদির ঠাকুরপো। আমি বাবলুকে বুকে নিয়ে কেঁদেছিলাম।

বড়ঠাকুরের মৃত্যুর আট দিনের মাথায় ঘটেছিল আর এক মৃত্যু। বড় নিঃশব্দ চরণে সে এসেছিল। মৃত্যুকালে কোনো প্রিয়জনের আকুল দৃষ্টি বা অশ্রুজল সে পাথেয় করে নিয়ে যায়নি। শাল-মহুয়ার অরণ্য-ছায়ায় উপলাকীর্ণ ভূমিশয্যায় সে ছিল শায়িত। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সুবর্ণরেখার মৃদু জলকল্লোল হয়তো তাকে শেষ ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়েছিল। আমি তার পাশে ছিলাম না। সে বড় একা, বড় একা ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে পরপর ছবিগুলো মনের মাঝে ভেসে উঠল। মনে হল দীর্ঘদিন পরে, অবশ্য যদি 'দেবযান' সত্য হয়, আবার বড়ঠাকুরের সঙ্গে দিদির দেখা হবে। দিদির ঠাকুরপোর সঙ্গেও হয়তো দেখা হবে। কী জানি, হয়তো হবে, হয়তো হবে না।

একে একে ওরা দু'ভাই, দিদি চলে গেলেন। আমি এখন আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ি হয়ে স্মৃতির পাতা উলটে যাচ্ছি। দিদি চলে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। যখন বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাইনি, তখন দিদি আশ্বাস দিয়ে বলত, 'দাঁড়া না, বাবলু বড় হোক, আবার আমরা এক জায়গায় থাকব।' নিজেই চলে গেল, কোথায় রইল সেসব প্রতিশ্রুতি।

অনন্ত কালপ্রবাহে জীবন ও মৃত্যু এক-একটি ছেদমাত্র— তাই পৃথিবীর সময়সীমা দিয়ে আত্মার চলার গতিকে বিচার করা যায় না। আমরা কত জন্ম, কত মৃত্যু পার হয়ে এলাম কে জানে। তাই ভাবি বড়ঠাকুরের 'দেবযান' যদি সত্যি হয়, তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে। হয়তো কোনো জন্মান্তরের বীথিপথ বেয়ে আবার আমরা সবাই মিলে গৃহ রচনা করব।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। প্রথমবার যখন কেদারনাথ যাই সেবার বদ্রীনারায়ণ যাওয়া হয়নি। প্রচণ্ড বর্ষায় পথ খারাপ হয়েছিল বলে। ঠাকুরপোরা ঠিক করেছে বদ্রীনারায়ণ যাবে। তবে কেবলমাত্র বদ্রী নয়, ওই সঙ্গে নৈনিতাল, কৌশানি, রানিক্ষেত ইত্যাদি হয়ে বদ্রী যাবে। আমি এবং প্রীতি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি।

বেশ মনে আছে অক্টোবর মাস, দুর্গাপুজো, সবাই আনন্দ করছে কিন্তু আমার মনের কোণে বেদনার অশ্রুবিন্দুতে সিন্ধুর কল্লোল যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মাঝেমাঝে অকারণে এমনি আমার হয়। ব্যথার মেঘ যেন ঘনিয়ে আসে, তারপর বর্ষণান্তে আকাশ নির্মল হয়। উৎসব আনন্দের দিনে নিজেকে বড় অসহায়, বড় একা মনে হয়। তখন অদৃশ্য দেবতার প্রতি একটা দুর্জয় অভিমান আসে। শেষে হয় রাগ ও দুঃখ।

'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।'

চোখের জলে তখন আমি শক্তি পাই।

সেবার পুজো মিটে গেছে, আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম তীর্থপথে। বাচ্চু ও স্বাতীর যাওয়ার কথা ছিল, কী কারণে যেন হল না। এবার আমরা নতুন দুটি সঙ্গী পেয়েছি। কার্তিক ও বীথি। ওরা স্বামী-স্ত্রী। ভাটপাড়ারই ছেলেমেয়ে।

হাওড়া থেকে যথাসময়ে দুন এক্সপ্রেস ছাড়ল। মনে মনে ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম, যেখানে যা দেখব সবকিছুর মাঝে যেন তোমার প্রকাশ অনুভব করতে পারি।

রাত্রের ট্রেন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। অনেকদিন পরে দূরপাল্লার গাড়িতে চড়েছি। ভালো লাগছিল। রাত কাটল, দিন কাটল।

পরদিন বিকেলে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেছিলাম। বিরাট স্টেশন। দোতলার একটি ওয়েটিং রুমে আমরা উঠেছিলাম। সুন্দর ব্যবস্থা। কয়েক ঘণ্টা ওখানে থেকে রাত্রি নটায় নৈনিতাল এক্সপ্রেস ধরা হল। মিটারগেজ গাড়ি, একটু ছোট হলেও ব্যবস্থা ভালো। রিজার্ভেশন করাই ছিল। রাত্রি ঘুমিয়েই কেটে গিয়েছিল, তাই ওদিককার ভূমি-প্রকৃতি কিছুই দেখা হয়নি। ভোরে ঘুম ভাঙল, দেখি বেশ শীত করছে। বেলা আটটা নাগাদ আমরা 'হালদুয়ানি' স্টেশনে পৌঁছলাম। কাঠগোদাম দিয়েও যাওয়া যেত, আমরা হালদুয়ানি দিয়েই যাচ্ছি। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা নৈনিতাল রওনা হলাম।

বেশ মনে আছে পাহাড়ি পথ, মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে আমরা নৈনিতাল ম্যালের ধারে পৌঁছেছিলাম।

শৌখিন জায়গা। ম্যালকে ঘিরেই ছোটবড় দোকান হোটেল। আমরা 'অশোকা' হোটেলে উঠেছিলাম। পাশেই লেক। এই লেককে ঘিরেই এখানকার সমারোহ। বহু লোক লেকের ধারে বেড়াচ্ছে, বোটিং করছে। লেকের ধারে সারিবদ্ধ গরম জিনিসের দোকান। প্রচুর ফুল বিক্রি হচ্ছে। লজেন্স, ঝালমুড়ি, ফুচকা, কিছুরই অভাব নেই। লেকের অপর দিকে নৈনিদেবীর মন্দির। শুনলাম, দেবীর নাম অনুসারে এই স্থানটির নাম হয়েছে নৈনিতাল। কার্তিকের উৎসাহে আমাদের নৌকাভ্রমণ হল এবং নৈনিদেবীরও দর্শন হল। এখান থেকে মেজঠাকুরপো আমাকে একটা কার্ডিগান কিনে দিল। সেটা অনেকদিন পরেছি। পাহাড়ে ঘেরা নৈনিতাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। লেকের ধারেই সব ট্রাভেলিং এজেন্সির অফিস। ঠাকুরপো সাইট সিয়িং দেখার জন্য বাস ঠিক করল। আর ঠিক হল ওই বাসই আমাদের কৌশানি ও আলমোড়া দেখিয়ে রানিক্ষেত পৌঁছে দেবে।

পরদিন আমরা নৈনিতালের আশেপাশের জায়গাগুলো দেখতে বেরিয়েছিলাম। প্রথমে ভীমতাল। পাহাড়ে ঘেরা একটি দীর্ঘ প্রশস্ত ও গভীর জলাশয়। জলের মধ্যে একটি সুন্দর সুসজ্জিত হোটেল। বোটিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। প্রচুর ভিড়। জোড়ায় জোড়ায় ফটো তোলা হচ্ছে। ওখান থেকে কাঞ্চিতাল। এটিও একটি লেক। দেবদেবীর মন্দির। বৈষ্ণোদেবীর মন্দির দেখেছিলাম। চারিদিকে ফুলের গাছ। আমি কয়েকটা ফুলপাতা তুলে নিলাম বইয়ের মধ্যে রেখে দেব বলে। মনে পড়ল ঘাটশিলায় কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানকার চিহ্ন হিসাবে কয়েকটা ফুল, কখনও বা পাতা নিয়ে এসে দু-একটি বইয়ের মধ্যে রেখে দিতাম, তারপর বেশ কিছুদিন পরে আমরা স্বামী আর আমি দুজনে মিলে খুলে দেখতাম— শুকিয়ে গেছে বটে, তবে আকৃতিটা ঠিক আছে। বেশ ভালো লাগত।

পরদিন আমরা যাত্রা করেছিলাম রানিক্ষেতের উদ্দেশে। বাস কোথাও না থেমে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। ঝমঝমে রোদ্দুর। অবশ্য বাতাস ছিল প্রচুর। আলমোড়ায় বাস দাঁড়াল না, সুতরাং আমাদের কিছু দেখাও হল না। বাস চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে কৌশানির দিকে। মন একটু খারাপ হল, কিন্তু মন খারাপ করে বসে-থাকার সময় এখন নয়, বড়ঠাকুরের কথায়, 'দেখতে এসেছ, প্রাণভরে দেখে নাও, কথা ও গল্প করার সময় অনেক পাবে।' তাই চোখে দেখে মনকে ভরিয়ে নিতে হবে। দৃষ্টি রাখতে হবে বাইরের দিকে। বড়ঠাকুর আমাদের বলতেন, 'বেড়াতে এসেছ, চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ। গল্প তো বাড়িতেও করো।' ভালো কিছু দেখলেই ওঁদের কথা মনে পড়ে যায়। প্রকৃতিকে দেখার চোখ এবং ভালোলাগা ও প্রকৃতিকে ভালোবাসা তো ওঁদের কাছেই শিখেছি। সেদিন যেতে যেতে মনে হচ্ছিল যেন প্রকৃতির একেবারে কোলের কাছে এসে গেছি। পথে কত জায়গা পড়ল। 'মাওয়ালি', 'কাঠপুরিয়া' ইত্যাদি ইত্যাদি। বেলাশেষে সূর্যাস্তের পূর্বে কৌশানির পথে একটা ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছলাম। ওইখান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে হবে। বাসসুদ্ধ লোক হুড়মুড়িয়ে নামল।

ডাকবাংলোর বারান্দায় ও তৎসংলগ্ন জমিতে সবাই ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনেই কুমায়ুন পর্বতশ্রেণি। তারই শিখরে শিখরে অস্তসূর্যের বিভিন্ন রঙের খেলা অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম। সেই রঙের পরিচয় দেওয়া যায় না। তেমন রং বুঝি সৃষ্টি হয়নি। এ জগতের কোনো শিল্পীর তুলিতে সে রং বোধ হয় ধরা দেয়নি। পরম আগ্রহে দেখছি কখনও তুষারাবৃত চৌখাম্বার ওপর সূর্যরশ্মির বিভিন্ন রঙের ছটা পরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কখনো বা নীলকণ্ঠ নন্দাঘুণ্টির চূড়া হয়ে উঠেছে উজ্জ্বলতর। নন্দাদেবী, মৃগস্থলি, ত্রিশূল প্রভৃতি শৃঙ্গের উপর অস্তরশ্মির শেষ

আলিঙ্গন দেখেছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব লেগেছিল। কিন্তু তার সঙ্গেই মনে পড়েছিল বঞ্চিত ব্যথিত আমার স্বামীর ম্লান মুখ। সে তো কিছুই দেখল না, কিছুই পেল না। ভাবলে চোখে জল আসে। অদ্ভুত একটা মানসিক অবস্থা নিয়ে দেখছি।

একটু একটু শীত করছে। বাতাসে ক্রমশই শীতের কনকনানি বাড়ছে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল আলোর আভা, অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকারের একটা হালকা আবরণ দেখা দিল। তারপরেই চাঁদের আলোর আত্মপ্রকাশ। প্রায় একই সময়ে, একই আকাশে নবীন চন্দ্র জানাল বিদায়ী সূর্যকে প্রণাম।

সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না নেমে এল, পর্বতশ্রেণির মাথায় গায়ে সর্বত্র। নেমে এল একটি শীতল স্তব্ধতা, যাকে ধ্যানমগ্ন মহাতপস্বীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়।

কিছুক্ষণ রূপের মাঝে অরূপের খেলা দেখে পরে বাসে করে কৌশানির হোটেলে এসে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে হল লোডশেডিং। হোটেলের বাতি দিয়েছিল। আমরা ঘরও ভালো পেয়েছিলাম। পরে আলো এল। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখবার জন্যেই তো এসেছি। দেখি দূরে পর্বতশ্রেণির উপর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে, আকাশে পূর্ণিমার সুডৌল চাঁদ, পর্বতগাত্রের গাছপালা দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু স্বতন্ত্র করে বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতাও যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। রাত্রে বাসওয়ালারা খাইয়েছিল। বেশ মনে আছে গরম ভাত, ডাল আর আলুর তরকারি। সারাদিনের পর খিদের মুখে যেন অমৃত লেগেছিল। জল প্রচুর, কোনো অসুবিধে হয়নি। ইতিমধ্যে কার্তিক একটি অবাঙালি ছেলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সে ছেলেটি ভালো গান জানে। কার্তিকের ঘরে বসে কিছুক্ষণ তার গান শোনা হল। পাশের ঘর থেকে আর একটি বাঙালি পরিবার স্বামী স্ত্রী ও বাচ্চা নিয়ে আমাদের ঘরে এসে বসলেন, তারপর সবাই ঠিক করলেন, 'চলুন, বাইরে থেকে কিছুটা ঘুরে আসি।'

সবাই এক·াঙ্গে বেশ খানিকটা হাঁটা হল। শীত করছিল বেশ, তবু ভালো লাগছিল। দু-একটা ছোট ছোট দোকানে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। সামনে জ্যোৎস্নাবিধৌত পথ। দূর দুরান্তর অনাবিল স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় ঢেকে আছে। জ্যোৎস্নাময়ী শর্বরীর এই ধ্যান মৌনতা একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ বেয়ে অনেকগুলি কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা এসেছে, তার মধ্যে কয়েকটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এটি তার মধ্যে অন্যতম।

মনে পড়ে ঘাটশিলায় আমাদের শেষ লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন। আমি এবং আমার স্বামী বাইরের সিঁড়িতে বসে কতক্ষণ কথা বলেছিলাম। ওঁর বাঁহাতে সিগারেট, ডানহাতটা ছিল

আমার হাতের মধ্যে। সেদিন এমনি জ্যোৎস্নার রং গাঢ় ছিল, বাতাসে ছিল শীতলতা, মনে ছিল অনাবিল আনন্দ। দিদি-বড়ঠাকুর শুয়ে পড়েছিল। বাবলু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। সেদিনের সেই দুর্লভ শান্তি আর কিছুতেই ফিরে পাওয়া যাবে না।

পরদিন ভোরের আলো তখন ফোটেনি, আকাশের বুকে দু-একটি বিদায়ী তারা তখনও জ্বলজ্বল করছে, আমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সূর্যোদয় দেখতে যেতে হবে গান্ধী আশ্রমে। গিয়ে দেখি প্রচুর লোকজন এসেছে। কারও হাতে বায়নাকুলার, কারও কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। সকলেই প্রস্তুত। আস্তে আস্তে পূর্বাকাশে ক্ষীণতম অরুণাভা দেখা দিল। কোনো কোনো শৃঙ্গের চূড়া তারই আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠছে। একটু একটু করে সূর্যদেব প্রকাশিত হতে লাগলেন। তাঁরই সপ্তাশ্বের রশ্মিছটায় গিরিশৃঙ্গগুলি আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। সেই অপূর্ব বর্ণচ্ছটার বর্ণনা করা বুঝি ভাষার অতীত। একবার একবার এক-একটি শৃঙ্গ যেন বেশি জ্বলজ্বল করে উঠছে— কখনও ত্রিশূল, কখনও নন্দাদেবী প্রভৃতি। সবক'টি শৃঙ্গই পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমরা গভীর বিস্ময়ে দেখছিলাম। মাথাটা বারেবারেই বিশ্বদেবতার চরণে লুটিয়ে পড়ছিল।

সময় অল্প, সেইজন্য সেদিনই আমরা রানিক্ষেত পৌঁছেছিলাম। রাস্তার ওপরেই হোটেলটা। সামনের বারান্দা থেকেই দেখা যাচ্ছিল সামনে তুষারাবৃত কুমায়ুন রেঞ্জ। এখান থেকেও শৈলসানুর কয়েকটি শিখর পৃথক পৃথকভাবে দেখা যাচ্ছিল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল মেঘমুক্ত দিন। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। মাত্র দু-দিন আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা কিছুই নাকি দেখতে পাননি। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন।

পরদিন ভোরে প্রীতির হাতের চা খেয়ে আমরা বদ্রীনারায়ণের পথে যাত্রা করেছিলাম। আমাদের ভ্রমণপথে প্রীতি ও ঠাকুরপোরা সবসময় সুখসুবিধার দিকে নজর রাখে।

বহু পাহাড় জনপদ, গ্রাম ইত্যাদি পার হয়ে বেলা আড়াইটেয় কর্ণপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। 'পিণ্ডারিক' নদীর ব্রিজ পার হয়ে ওপারের 'ট্রাভেলার্স লজে' উঠেছিলাম। জায়গাটি বেশ মনোরম। পাশেই চঞ্চল পিণ্ডারিক গঙ্গা, ওপারে কর্ণপ্রয়াগের দোকানপাট ইত্যাদি। পরদিন সাড়ে ছ'টার বাস ধরতে হবে। টিকিট আগেই কাটা ছিল, কিন্তু জায়গা তো রাখতে হবে। তাই সেজঠাকুরপো আগে বাসস্ট্যান্ডে চলে গেছে। পরে আমরা গিয়েছিলাম।

বাস চলছে। এখন অলকানন্দা আমাদের সাথি। তারই পরপরে সাবেককালের পায়ে হেঁটে বদ্রী যাওয়ার রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার সাহেবের হাতের স্টিয়ারিং

ঘুরে চলেছে। চামোলি, যোশিমঠ, গোপেশ্বর, পাণ্ডুকেশ্বর, হেলেন প্রভৃতি ফেলে রেখে চলেছি। যত যাচ্ছি পথ ততই খাড়া হচ্ছে। গোবিন্দঘাট থেকে রাস্তা প্রচণ্ড ভয়াবহ। বড় বড় বাসগুলো যখন বাঁক নিচ্ছে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি গেল, একচুল চাকা সরে গেলেই অতল খাদে সমাধি লাভ করতে হবে।

গোবিন্দঘাট থেকে হনুমান চটি হয়ে বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। মৃত্যুর দুয়ার পার হয়েই তো অমৃতলোকে পৌঁছনো যায়। বাস যখন এই পথে যাচ্ছিল আমাদের কারও মুখে কথা ছিল না। মুখে কেউ কেউ সাহস দেখালেও বক্ষ দুরুদুরু করছিল। এক জায়গায় দেখি একটা বাস হাড়গোড় ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চল্লিশজন যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল, তার একজনও বেঁচে নেই। ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছি, উর্ধ্ব থেকে আরও উর্ধ্বে। একবার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের অতিক্রম করে আসা পথ সরীসৃপের মতো পড়ে রয়েছে। আর বহু নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দার জলধারা। এই অবস্থায় এক জায়গায় বাস গেল খারাপ হয়ে। ড্রাইভার কিছুক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়া করে তাকে চালু করলে।

যখন প্রায় এসে গেছি তখন বেশ শীত করছিল। একটা প্রশস্ত সমতল স্থানে এসে বাস থামল। তখন বেলা দুটো। দূরে দূরে পাহাড়ের প্রাচীর, দুরন্ত শীতল বাতাস বইছে, অদূরে দেখা যাচ্ছে বদ্রীবিশালজির মন্দিরের চূড়া। আমরা মহারাজ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উঠেছিলাম। কাছেই সুপ্রিয়া হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা।

অলকানন্দার ব্রিজ পার হয়ে একটু গিয়ে বদ্রীনারায়ণজীর মন্দির। খাড়াই সিঁড়ি। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মন্দিরে বদ্রীনারায়ণকে প্রণাম করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাশেই হটস্প্রিং। অলকানন্দার হিমশীতল জলধারার এত কাছে এই ভীষণ ফুটন্ত জলের প্রস্রবণ দেখলে অবাক লাগে। প্রকৃতির কার্যকারণের কথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

ওখানে দাঁড়িয়েই মনে পড়ছিল বড়ঠাকুরের কথা। উনি বলতেন, প্রকৃতির ভাণ্ডার অনন্ত এবং বিচিত্র। এর রহস্য ভেদ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা এর কতটুকু জানি। ঘাটশিলায় একদিন বড়ঠাকুর কয়েকজনকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সঙ্গে কানুমামা ছিলেন। ওঁরা আলোচনা করছেন, এখানকার প্রকৃতি বাংলাদেশের মতো নয়, এখানকার রুক্ষভূমিতে বাংলার মতো গাছগাছালি হয় না, ইত্যাদি। বড়ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, 'হয় না কে বললে? এখানে কতরকমের উদ্ভিদ আছে দেখবে? তোমাদের দেখাব।' বলে মাটিতে বসে পড়ে, কিছুটা মাটির চ্যাঙড় খুঁড়ে তুলে নিয়ে দেখালেন, বললেন, 'এই দেখ, কত অজস্র উদ্ভিদ।' সত্যিই তাই। ওই কাঁকর-বালির মধ্যেও সেই মাটির চাঙড়টিতে অসংখ্য গাছের অঙ্কুর খুদে খুদে গাছ

রয়েছে। বড়ঠাকুর বলতেন, 'প্রকৃতির খেয়াল ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ ব্যাপার নয়। বিশ্বদেবতার সৃষ্টির মাঝে কোথাও দেখ সৃষ্টির আনন্দ কোথাও বা ধ্বংসের মাতন। অহর্নিশি তো এই চলছে। একচোখে আনন্দের ধারা অন্যচোখে অশ্রুর বন্যা। দুইকে বরণ করেই হয় মানবযাত্রার সমাপ্তি।'

পরদিন উষ্ণকুণ্ডে স্নান ও পঞ্চভাই পাণ্ডাঠাকুরের কথামতো ভোজ্য উৎসর্গ করে বদ্রীনারায়ণজী দর্শন করেছিলাম। নারায়ণ মূর্তি, বেশি বড় নয়। মাথায় রুপোর বড় একটি ছাতা। সুন্দর ও সযত্নে প্রভুকে ফুলের সাজে সাজানো। একপাশে গরুড়, অপর পাশে মহর্ষি নারদ। আমরা পূজা দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম নীলকণ্ঠের মাথা তখন সূর্যালোকে ঝলমল করছে। শীত খুব, কিন্তু আগের দিনের মতো হাওয়া নেই। ওই বাতাস নাকি দুপুর থেকে সন্ধ্যারাত্রি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। কেন অন্য সময় হয় না একথা কেউ জানে না। ওখানে একটি সাধু-ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বয়স অল্প, গুরুর আদেশে এসেছে। বর্ধমান জেলার কোন গ্রামে বাড়ি। ছেলেটি বলেছিল, বদ্রীনারায়ণ ধাম স্বয়ং বৈকুণ্ঠধাম। এর আকাশে বাতাসে আধ্যাত্মিকতার বীজ ছড়িয়ে আছে।

তারপর ফেরার পালা। বদ্রীনাবায়ণজিকে প্রণাম করে বাসে উঠলাম। জীবনে আর কখনও এখানে আসা হবে না। আমাদের পদচিহ্ন হারিয়ে যাবে বহু ভক্ত অভিযাত্রীদের চরণধূলির তলায়।

বেশ মনে আছে ফেরার পথে আমরা পেয়েছিলাম 'বিষ্ণুপ্রয়াগ'। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা আর গরুড়গঙ্গার মিলনস্থল। 'নন্দপ্রয়াগে' মন্দাকিনীর সঙ্গে অলকানন্দা এসে মিশেছে, গৌচর ও কীর্তিগঙ্গা হয়ে শ্রীনগর। । রাত্রিরটা শ্রীনগরে কাটিয়ে পরদিন এলাম হৃষীকেশে। সন্ধ্যাবেলায় হৃষীকেশের গঙ্গায় ফুলের নৌকা ভাসালাম প্রিয়তমের উদ্দেশে। আমার তীর্থশেষের প্রণাম।

মনে পড়ল ছোটবেলায় কার্তিক মাসে ভরসন্ধ্যায় আমরা গঙ্গায় প্রদীপ দিতে যেতাম। অনন্তপ্রবাহিনী গঙ্গার শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করত। ওপারের ঘাটে ঘাটে প্রদীপমালা, এপারেও প্রদীপ জ্বলছে। কেউ বা শালপাতার ঠোঙায় করে জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া, জগন্নাথের ঘরে, তুলসীতলায়, কালীতলায়, শিবের মন্দিরে প্রদীপ দিতাম। গঙ্গার ধারে ঝোপেঝাড়ের মধ্য থেকে ভেসে আসত ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতান। অন্ধকার রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলায় গাছগাছালির মধ্যে জোনাকির আলোকবিন্দু দেখে নয়ন-মন তৃপ্ত হয়ে যেত। বাড়ি এসে দেখতাম ছোড়দার আকাশপ্রদীপ তুলে দেওয়া হয়ে গেছে।

১৪

সারা তীর্থপথই ওঁর কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে উনি যদি সঙ্গে থাকতেন তাহলে সারা তীর্থপথ আমার মনের আনন্দানুভূতির মাধুর্য দিয়ে ভরিয়ে তুলতাম। সে আনন্দ হত অন্য স্বাদের, তখন হৃদয় থাকত পরিপূর্ণ। আর এখন শূন্য হৃদয়ের হাহাকার বুকে নিয়ে শুধু শান্তির অন্বেষণে ঘুরে বেড়ানো। ওঁর তো কত আশা ছিল বেড়াবেন। কিছুই হল না। এ ব্যর্থতা কেন? ওঁর তো সবকিছু ছিল। শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, অর্থেরও অপ্রতুল হত না। তবে কেন মাঝপথে ওঁকে থেমে যেত হল? কী পাপে? কোন কর্মের ফলে ওঁর এই নিষ্ঠুর পরিণতি? ওঁকে যতটুকু জেনেছি বুঝেছি চিনেছি কোথাও তো ওঁর মনের কোনো অপবিত্রতার আভাস পাইনি। কেন ঠাকুর ওকে এভাবে বঞ্চিত করলেন। কেন ওঁর বুদ্ধিকে ভুলপথে চালিত করলেন। তিনিই তো ইচ্ছারূপে ওঁর মনে প্রবেশ করেছিলেন। কেন তিনি আমার এই বুকভরা ভালোবাসা দিলেন? এইসব জিজ্ঞাসা মনের মাঝে অহরহ উঠছে।

কত কথাই মনে পড়ছে। মামাশ্বশুরবাড়ি থাকি। মার বোনের বাড়ি আত্মীয়রা আসেন, সবার সঙ্গে আমার পরিচয়। সবার ভালোবাসা পেয়েছি। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি সবার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। সব পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম।

দিন কাটছে, কিন্তু খোঁটায় বাঁধা গরুর মতো ঘুরে ঘুরে সেই খোঁটার কাছেই আসছি। আমার সংসার স্বামী, আমার ব্যর্থ জীবনের সাথি, তার কাছে। কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না। ভুলতে পারছি না আমার ভাশুর আমার জাকে। জায়ের সংসার।

মনে পড়ে একবার কীসের যেন হাফছুটিতে আমরা, মানে সব শিক্ষিকারা মিলে ববর্তির বিল দেখতে গিয়েছিলাম। নারায়ণপুর কুতুবপুরের মধ্যে দিয়ে বাঁশবাগান আমবাগানের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াময় পথ পেরিয়ে বিলের কাছে গিয়ে দেখি, একদিকটা বেনোজল, অন্যদিকটা কেমন মজা শ্যাওলা ও জলজ উদ্ভিদে ভরা। ওখান থেকে একটু দূরে একটা ব্রিজ, ঘুরেঘুরে দেখে 'বেল্লেয়' এলাম। এখানে শিব উঠেছেন। একটি দোচালার মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ আপনি নাকি উঠেছে। দেখে ফিরছি, দেখি আমাদের দুটি ছাত্রী এসে দিদিমণি বলে প্রণাম করে দাঁড়াল। এদিককার মেয়েরা বড় কষ্ট করে পড়াশুনো করে। কোথায় মুকুন্দপুর, কোথায় তেঁতুতে তপনপুর। কত দূর দূর থেকে ওরা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে, কেউ হেঁটে কেউ সাইকেলে স্কুল যায়। সেদিন ওদের দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।

প্রতি বছর আমি আর ভ্রান্তি স্কুল থেকে মাঠের দোল অর্থাৎ জয়চণ্ডীর দোল দেখতে যেতাম। স্কুল থেকে একটুখানি গিয়েই দোলতলা। এটি বহুদিনের পুরোনো। দোলপূর্ণিমার সাতদিন পরে জয়চণ্ডীর দোল হয়, আর ভাটপাড়ায় পাঁচদিন পরে হয় পঞ্চম দোল। আমরা ছোটবেলায় হিরণ পিসিমার সঙ্গে এখানে দোলের মেলা দেখতে আসতাম। তখনকার দিনে তালপাতার পাখা, মাটির কলসি, কুঁজো ইত্যাদি বিক্রি হত। আমরাও পাড়ায় অনেকে মিলে পাখা কিনে বাদামভাজা খেতে খেতে বাড়ি ফিরতাম।

মাঠের মধ্যে ছোট একটি বেশ উঁচু মন্দির। বছরে একবার জয়চণ্ডী এখানে আসেন। দোল হয়, তারপর গ্রামের এক ব্রাহ্মণের বাড়ি থাকেন। তাঁদেরই ঠাকুর। দোলের দিন সকাল থেকে পুরোহিত পুজো করেন, আশেপাশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মেয়ে-ঝিরা পুজো নিয়ে আসে, পুজো করিয়ে মাকে আবির দিয়ে চলে যায়। অনেকে আবার মন্দিরের পাশের বড় মনসা গাছটায় মনস্কামনা করে লালসুতো দিয়ে ঢিল বেঁধে দিয়ে যায়। অনেকে আসে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তাই ঢিল খুলে দিয়ে পুজো দেয়। গ্রাম্য পরিবেশে এই মেলাটি আমার ভারী ভালো লাগে।

একবার মেজদাদাবাবু বললে, যমুনা, তুই আর তোর মেজদি জয়রামবাটি, কামারপুকুর ঘুরে আয়।

মেজদাদাবাবু ওখানকার মহারাজকে লিখে সব ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমি আর মেজদি জয়রামবাটি, কামারপুকুর কোয়ালপাড়া ঘুরে এসেছিলাম। বেশ মনে আছে মায়ের মন্দিরের পাশের দিকে খড়ের ঘরে আমরা ছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। ইনু বিভূতিদের সঙ্গেও একবার জয়রামবাটি গিয়েছিলাম।

আর একবার দিদি (আমার বড় জা), আমি, আলো— নীলুভায়ের সঙ্গে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম। নামখানা না কোথা থেকে নৌকা। নৌকোর মধ্যে চমৎকার ঘর, রান্নার ব্যবস্থা, খাবার জায়গা। সেদিন রাত্রেও ওই নৌকার মধ্যেই ছিলাম। শুধু জল আর জল। সে একটা অন্যরকম অনুভূতি হয়েছিল। দিদি, আমি আর আলো তিনজনে কত গল্প করেছি। খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া হয়েছিল।

স্কুলের দু-একদিনের ছুটিগুলো এমনি করেই কাটে। বেশিদিন স্কুলে না গেলে আবার মন খারাপ লাগে। স্কুল ছিল যেন আমার নিজের জায়গা। শীতের দিনে অফ পিরিয়ডে সামনের কম্পাউন্ডে বসে রোদ পোয়াতাম, অমূল্য অথবা ত্রিনাথ চেয়ার বার করে দিত। কখনও বা ঘাসের ওপর খবরের কাগজ পেতে বসে খাতা দেখতাম, কোনো কোনোসময় হাতে বোনা থাকত। একে একে অনেক টিচারই এসে বসত। সবারই হাতে কাজ, মুখে গল্প। চন্দনা ক্লাস অনুযায়ী মেয়েদের নিয়ে কমপাউন্ডের

একদিকে পিটি করাত। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া ক্রমশ এগিয়ে আসত। সোনাঝুরি গাছটার পাতা দুলে দুলে সারা হত। বেশ লাগত।

ত্রিনাথ কী একটা ছোট ছোট লালফুলের গাছ লাগিয়েছিল। সারা বছর গাছটা লালফুলে আলো হয়ে থাকত। ক্লাস নাইনের ঘরে ক্লাস করতে করতে আমার চোখ পড়ত ওই ফুলে-ভরা গাছটার ওপর। মেয়েদের পড়াতাম, পড়া না পারলে বকতাম। কেমন একটা ধারায় দিন চলছিল। কখনো আবার ক্লাস করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তাম। মনে হত এই তো বেলা হল, এই সময় উনি ডাক্তারখানা থেকে ফিরতেন। কোথায় কতদূর আমার সেইসব হারানো দিন? মেয়েদের ডাকে তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে আবার পড়ানো শুরু করতাম।

ছাত্রীরা ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। ওদের সবে কৈশোর চলছে, মনে কোনো মালিন্য নেই। সহজ আনন্দে হাসে, বকলে কাঁদে। আমি জীবনে যত ছাত্রী পেয়েছি সবাই ভালো। হয়তো অনেকেই পড়াশুনোয় ধারালো নয় কিন্তু ব্যবহার ও সহবত শিক্ষায় ওরা অনেক ভালো। স্কুলের কথা ভাবলে স্কুলের সব ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। আচ্ছা, স্কুলবাড়ির পিছন দিকে সেই কদমফুলের গাছটা কি এখনও আছে? সে প্রতি বর্ষায় কী সুন্দর ফুলের সাজে সেজে উঠত। তার মৃদু সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসত অলিকুল। আর সেই কৃষ্ণচুড়া আর রাধাচূড়া গাছদুটো, বাথরুমে যেতে গেলে হাত দিয়ে যার ফুল পাড়তাম? ঝরাফুল আর পাতা রাস্তার ওপর বিছিয়ে থাকত। তখন জীবনের এই দীর্ঘ শুষ্কপথ পায়ে পায়ে বেশ অতিক্রম করে চলেছিলাম। অবসাদ এলেও তাকে সরিয়ে দিয়েছি। এখন দিন যেন কাটতেই চায় না।

একদিন রবিবারের এক সকালে ভদু আর ভঙ্গিমা এসে বললে, মামণি, (ওরা আমাকে মামণি ডাকে) বাবা, মা, ছোটকাকা, কাকামণি নেপাল যাচ্ছে, তুমি যাবে?

আমি তো একপায়ে খাড়া। মে মাস। প্রচণ্ড গরম। আমাদের বাড়ি 'ভূপতি ভবনে'র সামনে থেকে বাস ছাড়ল। মেজদি, বৌমা, তুতু, এবাড়ি থেকে মা, রামু, আমার ভাইপো বলরাম, রুনু সবাই তুলে দিয়ে গেল। এই প্রথম আমাদের বাসযাত্রা। পশুপতিনাথকে স্মরণ করে যাত্রা হল শুরু। মার মুখে গল্প শুনেছি নাকি তিনটে বড় বড় পাহাড় ডিঙিয়ে তবে নেপাল যেতে হয়। বালি ব্রিজ পার হয়ে সিউড়ির ওপর দিয়ে আরও কিছুটা গিয়ে শান্তিনিকেতনের পথ পাশে ফেলে দুমকার পথ ধরে বিকেলে ম্যাসাঞ্জোরে পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকে রাত্রি প্রায় আটটায় দেওঘরে গিয়ে নামলাম। যাত্রীনিবাসে মাথা গোঁজার স্থান হয়েছিল। প্রচণ্ড গরম, একফোঁটা বৃষ্টি নেই। পরদিন সকালে বৈদ্যনাথের পুজো দিয়ে দর্শন করে খাওয়া সেরে আবার বাস।

প্রচণ্ড রোদ্দুর। বিহারের শুষ্ক বন্ধুর প্রকৃতি দেখতে দেখতে চলেছি। মজঃফরপুর দিয়ে যাওয়ার সময় পথের দুধারে প্রচুর লিচুগাছে লিচু ঝুলে থাকতে দেখেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, এই লিচুবাগানে যদি ঝুমু, সুমন, রুমন, নেলি, ভুতুকে এনে ছেড়ে দেওয়া যেত, ভারী মজা করে ওরা গাছ থেকে পেড়ে পেড়ে লিচু খেত। তারপর মতিহারি, মোকামা পার হয়ে আমরা রাত্রি প্রায় ন'টায় রক্সৌল পৌঁছেছিলাম এবং 'অজন্তা হোটেলে' আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

রক্সৌল ভারতের সীমান্ত নগর। রাত্রি প্রভাতে নবীন সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে যাত্রা করেছিলাম। রক্সৌলের পর বীরগাঁ। এটি নেপালের সীমান্ত। দুটি সীমান্তেই চেকিং-এর কড়া ব্যবস্থা, সেইজন্য বাস এখানে একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এই অবসরে একবার বাস থেকে একটু নেমে দাঁড়ালাম। দেখি পথের ঠিক পাশেই একটি পুষ্পিত আকন্দফুলের গাছ বাতাসে দুলছে। দেখে খুব আনন্দ হল। আকন্দ ফুল মহেশ্বরের প্রিয় ফুল। একবার মনে হল তুলে নিয়ে যাই। কিন্তু শুকিয়ে যাবে। তাই নীল আকাশের দেউলতলে সারা গাছের ফুলগুলিকে মনে মনে দেবাদিদেব মহাদেব পশুপতিনাথের চরণতলে নিবেদন করলাম। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করলাম। তাঁর জিনিস তাঁকেই অঞ্জলি দিলাম।

আমলেক থেকে পথ কেবল চড়াই আর উতরাই। এরপর এল ভৈসা বলে একটি জায়গা। হোটেল রয়েছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি উপলাকীর্ণ নদী। ওখান থেকে পথের একদিকে গভীর খাদ অপরদিকে পাহাড়ের প্রাচীর। বাস মুহুর্মুহু বাঁক নিয়ে পাহাড়ের অপরপৃষ্ঠে চলে যাচ্ছে। অবশেষে রাত আটটা নাগাদ কাঠমান্ডুতে পৌঁছলাম।

পরদিন পশুপতিনাথ দর্শন হল। বিরাট মন্দির। দরজার সামনে বিরাট ষাঁড়। এটি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। মন্দিরগর্ভে পঞ্চমুখ মহাদেব। আমরা ঘুরে ঘুরে চার দরজা দিয়ে পঞ্চমুখ দর্শন করলাম। পুজো দেওয়া হল। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পশুপতিনাথ দর্শন হল।

পরদিন সবার কেনাকাটার পালা। মার কথা মনে পড়ল। মা তীর্থ করতে বেরুলে আমরা বোনেরা, মার নাতি-নাতনিরা, সবাই আশা করে থাকতাম মা আমাদের জন্যে কী আনবে। মা সবার জন্যে কিছু-না-কিছু আনতেন। আমাদের সেই পথ-চাওয়া কত আনন্দের ছিল। আর আমার পথ চেয়ে কেউ বসে থাকবে না।

ফেরার সময় আমরা রাজগীর হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। রাজগীরের উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে করতে দিদি-বড়ঠাকুরের কথা মনে পড়ছিল। ওঁরাও রাজগীর এসেছিলেন। ভাইকে চিঠি লিখেছিলেন। সেবার দিদিকে নিয়ে পাটনা যাওয়ার পথে

রাজগীর নেমেছিলেন। ওখান থেকে দানাপুরে পানীর বাসায়। পানী হচ্ছে আমার মামাশ্বশুরের মামাতো বোন। পুটিদিদি ও কালী আমাদের দেশের মানুষ।

রাজগীর
পাটনা

কল্যাণববেষু

নুটু, তোমার বৌদিদি ও আমি পাটনা যাবার পথে রাজগীর এসেছি। এইমাত্র রাজগীর উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করে উঠেছি। বুদ্ধদেব এখানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সেই সোনাভাণ্ডার গুহা এইমাত্র দেখে এলুম। পাহাড়ের ওপর ছায়ায় বসে আছি। সুন্দর হাওয়া। বনে করন্দা ফুল খুব ফুটেছে। কাল দানাপুর পানীর বাসায় (বড়মামার মেয়ে) যাবো ভেবেছি। পুটিদিদি ও কালীদের বাসায় কাল ছিলাম। সবাই ভালো আছে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদি লিখেছে—

পরমস্নেহাস্পদেষু

ভাই ঠাকুরপো, তোমার দাদার চিঠিতে জানতে পারবে। যমুনাদের চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তার উত্তর পাইনি। যমুনা-উমাকে চিঠি দিতে বোলো। গুটকে, শান্ত কেমন আছে? যমুনা-উমা কেমন আছে? তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ নিও। উত্তর দিও চিঠির। ভালো করে। ইতি—

তোমার বৌদি

সেবার দক্ষিণ ভারত যাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠাকুরপোরা করলে, কিন্তু আমার যাওয়া হল না। কারণ সেবার ছিল মেজদির ছোট মেয়ে তুতুর বিয়ে। জয়পুরে বিয়ে হল। জামাই ব্রজদাস মুখার্জি। মনে পড়ছে খোকনের বিয়ের আগে একদিন আমি আর মদন বৌমাকে (সন্ধ্যা) শিবপুরে দেখতে গিয়েছিলাম। গান শুনলাম, বেশ মেয়ে। আসার সময় আমি আর মদন গায়ে-হলুদ দেওয়ার জন্য শাড়ি কিনে নিয়ে এলাম। সেই বৌমা এখন গিন্নি হয়ে গেছে। বৌমার বড় মেয়ে ঝুমু আমাদের নাতনি। বি.এ. পাশ করার পর ভাটপাড়াতেই বিয়ে হল। শৈবাল ভট্টাচার্য বড় ইঞ্জিনিয়ার ছেলে। খুব সমারোহ করে বিয়ে হয়েছিল। ব্যারাকপুরে থেকে বৌমা (মিত্রা), বাবলু, আম্পা এসেছিল। কোনো আত্মীয়স্বজন বাদ যায়নি। খুব আনন্দ করে বাসর জাগা হয়েছিল। ঠাকুমা-দিদিমা, মোনা, লুকু, রুমন, ব্রজ, শান্তনু, লালু, বাতু, কেতু, রাজা, বান্টি, বুলে, ওর বর আরও সকলে। সারা রাত শুধু গান, সনু আর সুমনের আবৃত্তি।

রুমনের বিয়েতেও আনন্দ করেছি। ওর বর দেবাশিস মৈত্রও ইঞ্জিনিয়ার। কল্যাণীতে বাড়ি। বিয়ের দিন সকাল থেকে কী ভীষণ বৃষ্টি! পথঘাট থইথই করছে। বৌমারা বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে সাপুটি হয়ে গঙ্গা থেকে 'জল সয়ে' এল। সামনের বড় রাস্তা যেন জল জমে সমুদ্র। ভিডিয়োতে সেই জলের ছবি তোলা আছে। অবশ্য বিকেল থেকে মেঘ কেটে বৃষ্টি থেমে গেল। আর কোনো অসুবিধা হয়নি। বাবলু, মিত্রা, আম্পা, সব আত্মীয় বন্ধুই এসেছিলেন। সুন্দর বাসর হয়েছিল। সোমা একাই একশো। সোমা আর কেতু গানে গানে ভরিয়ে দিয়েছিল। ঝুমুর মেয়ে বাবলি, লুকুর মেয়ে বুবলি, সোমার মেয়ে আর বুবুল, ছোট্ট সুমন, সনু সবাই রাত জেগেছে, আনন্দ করেছে।

১৫

লিখতে বসে কত মুখই মনে পড়ছে। ভাবছি একটা জীবনে কত মানুষের সঙ্গেই না পরিচয় হয়। সবাই স্মৃতির ভাণ্ডারে নিজের নিজের আসন পেতে বসে, কেউ হারিয়ে যায় না।

মনে পড়ছে একবার একদল জৈন সাধু আমাদের বাইরের ঘরে এসে দু-দিন ছিলেন। কোথায় যেন যাচ্ছেন, পথ-চলতি দুদিনের বিশ্রাম। একদিন সকালবেলায় দেখি বাইরের বাগানে কয়েকজন সুন্দর সুন্দর লোক ঘোরাফেরা করছেন, গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছেন। প্রথমে ছুটে গিয়ে মাকে বললাম। মা বললেন, ওঁরা জৈন সাধু, দু-দিন এখানে থাকবেন।

সাধু মানে গেরুয়া পরবেন, এঁদের কিন্তু সাদা থান। যাই হোক, এঁদের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ওরা ভারী সুন্দর চা করতেন। এলাচ, দারচিনি. লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে। আমি কৌতূহলবশত ওঁদের কাছে কাছে ঘুরতাম। তাই বোধহয় একদিন চা খেতে দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় সেই চা খুব ভালো লেগেছিল। দু-দিন থেকে তাঁরা চলে গেলেন। ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল।

মনে আছে বোঁচাদার আশ্রমের শুচিদি, হিরণদি, গিরিদি, বিভাদি, মেজদি, সেজদি— আমাদের বাড়ির পাশের এই সব স্নেহময়ী দিদিদের কথা। আর একজন দিদি— পারুলদি। এঁর স্নেহলাভ করে আমি ধন্য। আমার দিদিভাগ্য ভালো। আমার মেজদি মহামায়া দেবীর কাছে অপার স্নেহ পেয়েছি। তাঁরই আশ্রয়ে আমার জীবনের সুদীর্ঘ দিন কাটল। ওঁর আশ্রয় না পেলে আমার জীবন হয়তো আর একটু জটিল হত।

একবার বেশ মজা হয়েছিল। আমি আর পুন্তি কল্যাণী গেছি ডাক্তারের কাছে, একটু প্রয়োজনে। সেদিন নেমে দেখি দলে দলে লোক কোথায় যেন যাচ্ছে।

শীতকাল, সবার গায়ে গরমের চাদর। ছেলে-বুড়ো, বাউল-বৈষ্ণব সবাই চলেছে। একজন বুড়োমতো লোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁগো, কোথায় যাচ্ছো গো তোমরা?' বললে, 'কুলের পাটের মেলায়।' শুনে আমরা কাজ সেরে একটা রিকশা নিয়ে কুলের পাটের মেলায় গিয়েছিলাম। শুনলাম ওখানে নাকি চৈতন্যদেবের কাঁথা ছিল, আমরা অবশ্য দেখিনি। নতুন পরিবেশ, নতুন জায়গা। গ্রাম্যমেলা। বেশ লাগছিল। ঘুরে ঘুরে দেখলাম, সবরকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে। খাবারের দোকানও কয়েকখানা রয়েছে। বাদামভাজার দোকান, তেলেভাজার কড়া বসেছে কোনো দোকানে। কুলো, ধামা, চুপড়ি বিক্রি হচ্ছে। আমি একটা ছোট কুলো কিনলাম। এই কুলের পাটে পাড়ার সব মায়েরা মিলে বাসে করে দলবেঁধে আসতেন। রান্না করে খেয়ে বাড়ি যেতেন। মায়েদের খুব আনন্দের জিনিস ছিল এটা।

মায়েদের এবং আমাদের আর একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। তখন অঘ্রান মাসের শুক্লা তিথির কোনো একটি মঙ্গলবারে আমাদের বাড়ির উঠোনে কুলাইচণ্ডীর পুজো হত। পাড়ার যত বৌ, ঝি, গিন্নিরা মুলো কুলো দিয়ে পুজো দিয়ে যেতেন। পুরোহিত এসে পুজো করতেন। বেলায় যে যার বাড়ি থেকে খাবার করে এনে আমাদের উঠোনে সবাই গোল হয়ে বসে ব্রতের কথা শুনে তারপর খেতেন। চিরদিন দেখেছি হিরণ পিসিমা (পাড়ার) কথা বলতেন। কত পয়সা পড়ত, আমরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে পিসিমাকে দিতাম। আর খেতে বসলে সবাইকে চা গরম করে দেওয়া আমাদের একটা কাজ ছিল। কারণ এক আসনে বসে যা খাবে খেতে হয়, অন্য সময় খাওয়া চলবে না। সবারই চায়ের নেশা। প্রত্যেকের কাঁসিতে লুচি সুজির পায়েস থাকবেই, তা ছাড়া যার যা আছে। খাওয়া শেষ হলে যার যার বাড়ির ছোটরা সেই পাতে একটুআধটু প্রসাদ পেত। সবশেষে সবাই কুলোমাথায় আমাদের খিড়কির পুকুরে কুলো ভাসাত।

আমার শ্বশুরবাড়িতেও এই ব্রত ছিল। দিদি ও আমি করেছি। কিন্তু এখন করি না, করে কী হবে? কার মঙ্গলকামনা করব? সবই তো জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। চোখে জল আসে। ছোটবেলায় এই কলুই মঙ্গলবারে কত আনন্দ হত, আজ কোনো আনন্দই নেই। আছে শুধু দুঃখভরা স্মৃতি। আমার জীবন থেকে সবকিছু চলে গেছে। আমার হাত দেখে একজন সাধক বলেছিলেন, এত অদ্ভুত বঞ্চিতের হাত দেখা যায় না, সব পেয়ে সব থেকে বঞ্চিত। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অনেকে বলে, তোমার চেয়ে কত দুঃখী আছে। নীচের দিকে তাকাও। হয়তো তাই। কিন্তু আমার নিজেরটা যে আমাকে বেশি দাগা দিচ্ছে।

জীবনে অনেকের কাছ থেকে ভালোবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছি। আবার কেউ কেউ করেছে অবজ্ঞা, অপমান, উপেক্ষা। আমার সঙ্গে কারও স্বার্থের সংঘাত লাগার কথা নয়, কারণ আমি কারও কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিনি, কাউকে বঞ্চিত করিনি বা কাউকে অতিক্রম করে নিজেকে জাহির করিনি। সেই স্পৃহা আমার কোনোদিন ছিল না, আজও নেই। তবু যদি কারও বিরাগভাজন হয়ে পড়ি, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু ভাবলে মনটা বড় ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় ভাবি এই বিরূপতারও প্রয়োজন ছিল, কারণ তা না হলে হয়তো ঈশ্বরকে ভুলে যেতাম। বা অহমিকা মাথা তুলে দাঁড়াত। তাই দয়াল প্রভু আমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই যাঁরা ভালোবাসলেন বা বিরূপ হলেন তাঁদের উভয়েরই আমি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ঈশ্বরের কাছে তাঁদের সবার জন্য শুভ কামনা রইল।

বড়ঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল। উনি বলতেন, যদি কেউ তোমার নিন্দা বা সমালোচনা করে, জানবে সে তোমার বন্ধুর কাজ করেছে। কারণ তার কথায় তুমি নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে। বড়ঠাকুরের নিন্দা বা সুখ্যাতিতে বিশেষ ভাবান্তর হত না। যদি কেউ বলত, অমুকে আপনার নিন্দা করছে, এই কথা বলছে, চুপ করে শুনতেন, তারপর বলতেন, চ্যান করুকগে যাক। বলে অন্য কথায় চলে যেতেন। আজও যেন বড়ঠাকুরের কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজে। ওঁর মতো মানুষ আজ পর্যন্ত একটিও চোখে পড়ল না। যখন দেখেছি তখন ভালো করে বুঝতে পারিনি।

একবার মামার বাড়ি, আমার নন্দাইরা— বিজিত, শশাঙ্ক ও হৃষীকেশ— তিনজনে এসেছে, আমরা নীচে বড়ঘরে বসে গল্প করছি, শশাঙ্ক বললে, মেজবৌদি, আপনি একবার কিমিন আসুন, প্লেনে নিয়ে যাব।

আমি তো বেড়ানো পেলে আর কিছু চাই না। বললাম, সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই যাব।

পুতুর স্বামী শশাঙ্ক ডাক্তার, তখন কিমিনে পোস্টেড। মা পুতুর ওখানে যাচ্ছেন, আমি বললাম, আমিও যাব। সেজঠাকুরপো প্লেনের টিকিট কেটে আনল।

নির্দিষ্ট দিনে বাপি, সেজঠাকুরপো, খোকন আমাকে ও মাকে দমদম এয়ারপোর্টে গিয়ে তুলে দিয়ে এসেছিল। প্রথম প্লেনে যাচ্ছি, একটা নতুন অনুভূতি। আমি তো একদম আনাড়ি, জানলার কাছে বসেছি, কানের কাছে অনবরত সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম, অপূর্ব লাগছিল। মনে হচ্ছে মেঘের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমার স্বামীর কথা মনে হল। উনি কি ভাবতে পেরেছিলেন যমুনা ওঁকে ছাড়া কোথায় কোথায় ঘুরবে। এক জীবনে কত কিছুই হল। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে দু-একটা কথা বলছি। মনে পড়ল সুদূর অতীতে, দেশের বাড়িতে আমি দিদি-বড়ঠাকুর সবাই আছি, বড়ঠাকুর কলকাতা থেকে এসে বললেন, কোথায় যেন ওদের প্লেনে

করে যাওয়া ঠিক হয়েছে, ওঁরা শীঘ্রই যাবেন। গ্রামের সবাইকে ছোট ছেলের মতো বলে বেড়াচ্ছেন, বলছেন, জানো প্লেনের ওপর থেকে নীচের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাবে, মায় দেশলাই কাঠিটি জ্বাললে তার আলোটুকু পর্যন্ত। দিনের দিন বড়ঠাকুর কাপড়-চোপড় নিয়ে সকালে কলকাতা গেলেন। বিকেলে কিন্তু ফিরে এলেন, কী কারণে ওঁদের যাওয়া হল না। বলেছিলেন, পরে একবার যাব। আর যাওয়া হয়নি। কত বেড়াতে ভালোবাসতেন, সেদিনের সেই আশাহত মুখটা মনে পড়ে মনে বড় কষ্ট হল। অনেক কিছু অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হয়েছে ওঁদের।

যাই হোক, প্লেন উড়ছে, মধ্যে মধ্যে ঘোষিকারা ঘোষণা করছেন। ঠিক মনে নেই, মাত্র কঘণ্টা পরে আমাদের গন্তব্যস্থান লীলাবাড়ি এসে গেল। প্লেন থেকে নেমে দেখি, শশাঙ্ক ছেলে বাবলাকে নিয়ে আমাদের নিতে এসেছে। জিপে বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর জিপ পুতুর কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

সুন্দর কোয়ার্টার, সামনে পিচঢালা চওড়া রাস্তা, বাড়ির সামনে একটা গুলমোহর গাছ। রাস্তা দিয়ে হরদম মিলিটারি গাড়ি যাচ্ছে। স্থানটি মনোরম। আরও মনোরম আমার ননদের ছোট পরিবারটি। শশাঙ্ক সদাহাস্যময়, নিরহংকার। বাবলা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে, পুতুর তো কথাই নেই। আমি মা বেশ আনন্দেই ছিলাম। বিকেলে সামনের রাস্তা ধরে কতদূর চলে যেতাম। আমার বেড়ানো নেশা।

একদিন শশাঙ্ক হসপিটাল থেকে এসে বললে, আজ আমি জিরোয় যাব। মেজবৌদি যদি যেতে চান যেতে পারেন, কিন্তু জিরোর উচ্চতা অনেকটা।

ওর সঙ্গে গেলাম। বাঃ বাঃ! সে যে কত উঁচু। মাথা ঘুরে গা বমি করতে লাগল। জিরো জায়গাটি ভালো। শশাঙ্কর বন্ধুর বাড়িও গিয়েছিলাম।

সেবার ওখানেই পুজোতে ছিলাম। পুজোর মধ্যে একদিন শশাঙ্কর সঙ্গে আমি মা বাবলা একটি পুজোমণ্ডপে গিয়েছিলাম। সেখানে বলি হচ্ছে। প্রতিমার সামনে হাড়িকাঠ, তাকে ঘিরে অসংখ্য মানুষ। সামনে চেয়ার পাতা, আমরা চেয়ারে বসলাম। একটু পরে শুরু হল বলি। প্রথমে কত যে ছাগল বলি হল তা বলার নয়। তারপর মুরগি। যে লোকটি বলি দিচ্ছে, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা, কোমরে আঁট করে নতুন গামছা বাঁধা। কপালে সিঁদুরের বড় করে ফোঁটা। শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা, চোখ দুটি রক্তজবার মতো লাল। এক এক কোপে ঘচাঘচ গলা কাটছে, মনে কোনো বিকার নেই। শেষে এক একটা বিরাট মহিষ, তার দুটো সিং তেল চুকচুক করছে, কপালের মাঝখানে চওড়া করে লম্বা সিঁদুরের তিলক। তার গলাটা হাড়িকাঠে দেওয়া হল, পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, আমরা আর দেখতে পারলাম না, উঠে পড়লাম। এত জীবহত্যা কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে, দেখেও কী পাপ করলাম!

কিমিনের দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল। এবার ফিরতে হবে। কিন্তু আসামে যখন এসেছি কামাখ্যা দেবী না দেখে আসতে ইচ্ছা করছিল না। মাকে বললাম। শশাঙ্ক একটি ছেলেকে ঠিক করে দিল। তার সঙ্গে আমি এবং মা রওনা দিলাম।

রাত্রের গাড়ি। পরদিন সকালে আমরা গৌহাটি স্টেশনে এলাম। ওখান থেকে কামাখ্যায় পাণ্ডাবাড়ি ওঠা হল। পরদিন কামাখ্যা দেবীর পূজা দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে উমাকান্ত ভৈরব দর্শন করলাম। তার পরদিন গৌহাটি থেকে শিলং রওনা হয়েছিলাম।

বিকেলে শিলং পৌঁছলাম। তখন ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হল। মনে হল এই শিলং-এ বড়ঠাকুর কয়েকবার এসেছেন, সুপ্রভাদির সঙ্গে দেখা করেছেন, বেড়িয়েছেন। বড়ঠাকুরের কাছে কত শিলঙের নাম শুনেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শিলং সত্যিই সুন্দর। যাই হোক, শিলঙে বৃষ্টিঝরা মেঘলা আকাশ দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে একটু বেরুনো হল। বড় বড় দোকান ইত্যাদি দিয়ে সাজানো শহর। পরদিন মোটরে শিলঙে সব কিছু ঘুরে দেখা হল। পরদিন গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে দমদম এয়ারপোর্ট। তারপর বাড়ি।

যথারীতি দিন কাটছে। এর মধ্যে একটু পরিবর্তন এসেছে। খোকনের ছেলে সুমন হয়েছে। ওর ভালো নাম বোধিসত্ত্ব। বেশ মনে পড়ে সুমনের ভাতের সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। বন্যা হওয়ার উপক্রম। তাই বেশিকিছু করা হয়নি। বৌমার বাবা সুধীরদা, মা মণিদি, জয়পুর থেকে তুতু, দুলাল, সমু এসেছিল। আর এসেছিল বাবলু। অল্পের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভাত হল।

সুমন একটু বড় হলে ওকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতে হত, বাড়ি থাকতে চাইত না। মোটাসোটা গম্ভীর ছিল বটে, কিন্তু দুষ্টুও হয়েছিল খুব। ছোটদের সঙ্গে খেলা করত। স্টিমার দেখলেই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে হাত মেলে সবাই মিলে ডাকত। এটা ওদের একটা খেলা ছিল। ইলিশ মাছের নৌকো দেখলেই সুমন ডাকত, ও গিন্নি, আছে নাকি? নৌকা কাছে এলে মাছ কিনতে হবে। টাইনি-টটে পড়ত, বৌমা সকালে দিয়ে আসত, আমি দুপুরে নিয়ে আসতাম।

ব্যারাকপুরে গেলে বাবু, আম্পা কোলে এসে বসত। ওদের কাছে তো বেশি থাকা হয়নি। দিদিই ওদের দুই ভাইকে স্কুলে দিয়ে আসত, নিয়ে আসত। ওরা দু'ভাই ভারী বুদ্ধিমান ও লক্ষ্মী।

বাবু, আম্পা, সুমন এদের পৈতের কথাও মনে পড়ে। দিদি নাতিদের ছোট বয়সেই পৈতে দিয়েছিল। বাবুর পৈতেতে খুব আনন্দ করেছি। দিদি তখন সুস্থ। পরদিন বাবুর সঙ্গে সবাই মিলে গঙ্গায় গিয়েছিলাম। বাবু দণ্ডি ভাসাল।

আম্পার পৈতে আর সুমনের পৈতে একদিনে হয়েছিল। আমি সকালে সুমনের পৈতে দেখে এগারোটার সময় আম্পার কাছে গেলাম। পৈতে দেখলাম। সে রাত্রে লোকজন খাওয়ানো হয়েছিল। সে রাত্রি ওখানে থেকে পরদিন সকালে গঙ্গায় গিয়ে আম্পার দণ্ডি ভাসানো দেখে ভাটপাড়ায় ফিরেছিলাম। কারণ ওইদিন সুমনের পৈতের লোক-খাওয়ানো ছিল।

ভাইপো ভাইঝি, বোনপো বোনঝি, ভাগনে ভাগনি, বাবলু, দেওর, ননদ ও নাতি-নাতনিদের ভাত-পৈতে-বিয়ে, কত কিছু দেখলাম। নিমন্ত্রণ খেলাম, আনন্দ করলাম, ভাবলে অবাক হয়ে যাই। কতদিন বেঁচে আছি, আরও কতদিন বাঁচব, সবার আনন্দে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এইভাবেই আমার আনন্দহীন, উদ্যমহীন বোঝাটানা ছ্যাকরা গাড়ির মতো জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছি। কোনোমতে এর শেষ করাই হল আমার উদ্দেশ্য।

একবার পূর্ণিমা ও আমি, পূর্ণিমার মাসতুতো দিদি কমলার বাড়ি কার্শিয়াং গিয়েছিলাম। কমলা খুব যত্ন করেছিল। মনে আছে খুব বেড়িয়েছিলাম। কার্শিয়াং আমার খুব ভালো লেগেছিল। কমলার ছেলে তখন ছোট। ওখান থেকে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। গিয়ে মনে হয়েছিল, আমার স্বামীর খুব ইচ্ছা ছিল দার্জিলিং দেখার। গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল, পরে অবশ্য বাবলুর সঙ্গেও একবার জলপাইগুড়িতে মুন্নি-পিনাকীর বাড়ি থেকে সবাই মিলে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। দার্জিলিং-এর তুলনা হয় না।

১৬

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে স্কুল আর বাড়ি করে। অনেকদিন ধরেই বড়ঠাকুরপো বেশ কিছুদিনের জন্য লম্বা পাড়ি দেওয়ার জল্পনা-কল্পনা করছে। ওর ইচ্ছা এবার আমরা আমেদাবাদ থেকে ভেরাওল হয়ে প্রথমে সোমনাথ তারপর প্রভাস হয়ে সেখান থেকে দ্বারকা ইত্যাদি যাই। ফেরার পথে রাজস্থানের কিছু জায়গায় ঘুরে পুনরায় আমেদাবাদ হয়ে বাড়ি। সেই অনুযায়ী টিকিট রিজার্ভেশন করা হয়েছিল।

তখন গুজরাটে গোলমাল চলছে। যেদিন আমরা যাত্রা করলাম, ঝুমু-র মাধ্যমিক পরীক্ষা সেদিন শুরু হয়েছে। রুমন দর্শনের রিকশা ডেকে দিলে। সুমনকে লুকিয়ে

রিকশায় উঠে বসলাম, রুমন রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। প্রীতি, আমি, বড়ঠাকুরপো। সেজঠাকুরপো এবার যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের হাওড়ায় তুলে দিয়ে এসেছিল।

আমেদাবাদ এক্সপ্রেস। আমাদের কম্পার্টমেন্টে আমরা তিনজন আর একজন অবাঙালি ভদ্রলোক। তিনি দুর্গে নামবেন। রাত্রি কাটল। এ পথে আমরা প্রথম যাচ্ছি। কত যে স্টেশন পড়ল— বরোদা, সুরাট, দুর্গ, আনন্দ, বারদৌলি ইত্যাদি। এ পথে নাগপুর স্টেশন পড়ল। ওঁর সঙ্গে যখন ঘাটশিলা যেতাম, বেশির ভাগই নাগপুর প্যাসেঞ্জারে শেষ রাত্রে ঘাটশিলা পৌছতাম। সে আজ কতদিনের কথা। কত যুগ কেটে গেল ঘাটশিলা যাইনি। সেই তখন থেকে নাগপুর সম্বন্ধে একটা কৌতূহল মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। সেই নাগপুরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। জানলা দিয়ে দেখলাম অন্ধকার রাত্রির পটে দূরের আলো-ঝলমল নাগপুর শহরের ছবি।

ইতিমধ্যে ট্রেনে দু-রাত্রি কাটিয়ে পরদিন বিকেলে আমেদাবাদ স্টেশনে পৌছেছিলাম। রাত্রি ন'টায় সোমনাথ মেল ছাড়বে, আমরা ওয়েটিং রুমে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে বসে রইলাম। রাত্রে সোমনাথ মেল ধরা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণির কামরা, মিটার-গেজ গাড়ি, কামরায় আমরা তিনজন মাত্র, কোনো অসুবিধা হয়নি।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ আমরা খিজিরিয়া স্টেশনে এসে নামলাম। ওখান থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠেছিলাম। গ্রাম অঞ্চল। গাড়ি ঝিকঝিক করে চলেছে। চারদিকে রৌদ্র ঝলমল করছে, সুন্দর মিষ্টি বাতাস। আমাদের গন্তব্যস্থান আর বেশি দূরে নয়। দূরে দূরে পাহাড়, দুধারে খেতিজমি। এই পথেই পড়েছিল গিরনার পর্বতশ্রেণি।

যাই হোক, অবশেষে বেলা আড়াইটেয় আমরা ভেরাওল স্টেশনে পৌছেছিলাম। ভেরাওল থেকে সোমনাথ মাত্র কয়েক কিলোমিটার পথ। আমরা একটি অটো নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। যেতে যেতে মনে হল ভেরাওল বেশ বড় জায়গা। তবে শুঁটকি মাছের গন্ধে বাতাস ভরপুর। পথের দৃশ্য ভালোই। অল্পক্ষণের মধ্যে অটো সোমনাথ পাটনের তোরণদ্বার পার করে আমাদের সোমনাথ মন্দিরের গেস্ট হাউসে পৌছে দিলে। আমরা 'প্রভাস' গেস্ট হাউসে ছিলাম।

নেমে প্রথমেই চোখে পড়েছিল সোমনাথ মন্দিরের আকাশচুম্বি চূড়া, তার ওপর ত্রিশূল। পাশে বিশাল বিস্তৃত আরব সাগর। মন্দিরের তিনটি বড় বড় দুয়ার পার হয়ে তবে সোমনাথের সামনে যাওয়া যায়। দরজাগুলি রুপোর পাতে মোড়া, কারুকার্য করা। প্রথম দরজার ওপরে লেখা 'দিগ্‌বিজয় দুয়ার'। ঢুকেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি। বাইরে আরব সাগরের দিকে একটি বিরাট উঁচু স্তম্ভের ওপর

গোলাকৃতি গম্বুজ। তার উপর ভারতবর্ষের মস্ত বড় ম্যাপ আঁকা। সামনে অসীম নীল সমুদ্র। তার বুকে দূরে দূরে মাছ ধরার নৌকো ভাসছে। মন্দিরের মধ্যে সোমনাথের বিরাট মসৃণ নিকষ কালো লিঙ্গমূর্তি। সামনের দিকে কিছুটা জায়গায় দর্শনার্থীরা দর্শন করে পুজো দেয়। পাশের কিছুটা জায়গায় সোমনাথের গায়ক এবং বাদকবৃন্দ বসে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সোমনাথকে গান শোনান। দরজায় ঢুকেই একটি শ্বেতপাথরের নান্দীমূর্তি, তার পায়ের কাছে কূর্ম। আমরা সেদিন ধুলোপায়ে দর্শন করেছিলাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল। কানে এল মন্দিরে প্রভাতী বন্দনার নহবতের সুর। আর তার সঙ্গে ঐকতান সৃষ্টি করেছে আরব সাগরের অশান্ত জলকল্লোল। সদ্য ঘুমভাঙা মন আমার সেই অপরিচিত পরিবেশে অল্পক্ষণের জন্য যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইলাম। অদ্ভুত লাগছিল দূরশ্রুত নহবতের করুণ মূর্ছনা। কিন্তু সেই অনুভূতিকে বেশিক্ষণ উপভোগ করা গেল না, কারণ বেলা হয়ে গেলে সোমনাথের অঙ্গরাগ দেখা হবে না। তাই প্রীতি এবং আমি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

তখনও ভালো করে অন্ধকার কাটেনি, পথে দেখি ওদেশি একটি দুধওয়ালি ঘড়ামাথায় দুধ বিক্রি করতে যাচ্ছে। আমরা তার কাছ থেকে একঘটি দুধ কিনলাম। গঙ্গার জল সঙ্গেই ছিল। মন্দিরের দরজার সামনে ফল ও পুজো দেওয়ার এলাচদানা ইত্যাদি বিক্রি করছে, সেইসব কিনে আমরা মন্দিরের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সোমনাথের অঙ্গরাগ। গায়ে ঘি মাখিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করানো হল। যথারীতি পূজারি মন্ত্রপাঠ করে পুজো সমাধা করলেন। আমরাও দুধ ইত্যাদি দিলাম। পূজারি সুন্দর করে পূজা করলেন। তারপর আরতি। সমস্ত ভক্তের হাতে পূজার ডালা, মুখে শিবশঙ্করের সুললিত স্তোত্র। মন্দির প্রদক্ষিণ করে করজোড়ে মনে মনে অসংখ্যবার প্রণাম জানালাম সোমনাথকে। তখন আনন্দ ও বিস্ময়ে চোখে জল আসছিল। জানি না, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলে বোধ হয় আনন্দের প্রকাশ হয় অশ্রুধারায়। ওঁর জন্যে প্রার্থনা জানালাম। তারপর দেখি সোমনাথকে অত্যন্ত নিপুণ হাতে সাজানো হচ্ছে। মাথার উপর কারুকার্য করা রুপোর ছাতা, তার নীচে সোমনাথের মাথার প্রচুর ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গায়ে সুন্দর করে শ্বেতচন্দন দিয়ে মোটা করে ওঁ লেখা, তার উপর বিল্বপত্র। অপূর্ব লাগছিল।

কোন সুদূর অতীতে শঙ্করাচার্য এখানে সোমনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা করেছিলেন। তারপর এর ধনৈশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে কতবার কত হানাদার এই মন্দির লুণ্ঠন করেছে। ভারে ভারে মণি-মুক্তা-মানিক্য নিয়ে গেছে নিজের দেশে। ধ্বংস করেছে পবিত্র মূর্তি, যারা বাধা দিয়েছে তারা হয়েছে নিশ্চিহ্ন।

সোমনাথ আমার খুব ভালো লেগেছিল। সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রিতে দেখেও যেন আশ মিটছিল না।

ওখান থেকে প্রভাসপাটনে গিয়েছিলাম। বেশিদূর নয়। পথের সৌন্দর্য অপূর্ব। দুপাশে বড় বড় গাছ, তার তলায় প্রচুর সাধুরা আশ্রয় নিয়েছেন। প্রভাসতীর্থ ত্রিবেণী-সঙ্গম, এখানে শ্রীকৃষ্ণের মরদেহের শেষকৃত্য সারা হয়েছিল। ওই জলে দেখি একটি আট-দশ বছরের ছেলে পানকৌড়ির মতো জলে ডুবছে আর উঠছে। আমাদের বলল, 'জলে পয়সা ফেলুন, আমি কুড়িয়ে দেব।' হঠাৎ ওখানে ওর মুখ বাংলা শুনে আমার অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'বাংলা বলছিস যে?' বললে, 'আমি তো বাঙালি। আমার বাড়ি নৈহাটি। আমার দিদিমা আর আমি এখানে চলে এসেছি। ওই যে শিশি বিক্রি করছে, ও আমার দিদিমা।' দেখলাম, একটা গাছের তলায় কিছু শিশি-বোতল নিয়ে একজন বৃদ্ধা বসে আছেন। দেখে কষ্ট হল। না জানি কত কষ্ট পেয়ে এখানে চলে এসেছেন। তবে অত দূরে দেশের মানুষ দেখে ভালো লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ যে গাছে বসে জরাব্যাধের হাতে বাণবিদ্ধ হয়েছিলেন সেই গাছটি দেখলাম। বলদেবের গুহা ইত্যাদি দেখে সোমনাথে ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে গিয়ে সবাই বসেছিলাম। সামনে দিগন্তহীন উর্মিমুখর সমুদ্র সগর্জনে বেলাভূমির ওপর আছড়ে পড়ছে। দূরে বোধহয় ভেরাওল বন্দর। ক'দিন ধরেই দেখছিলাম তিনটি জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো লাগছিল ভাবতে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আরব সাগরের তীরে বসে আছি।

ধীরে ধীরে সোমনাথ মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। স্বচ্ছ অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে পৃথিবীকে, দূরের জাহাজ তিনটিতেই আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের বুকে ওই আলোয় সজ্জিত জাহাজগুলিকে দেখে মনে হল যেন কোনো উৎসব রজনীর সমারোহ চলছে ওখানে। মাঝে মাঝে মাছধরার নৌকার মিটমিটে আলোও দেখা যাচ্ছিল অসীম জলরাশির মধ্যে। অনেকক্ষণ আমরা ওখানে বসেছিলাম। মন যেন জন্মান্তরের যবনিকার সীমা পার হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল। হয়তো কোনো এক জন্মে এদেশে জন্মেছিলাম, এমনি আরব সাগরের তীরে তীরে খেলা করে বেড়িয়েছি, বড় হয়েছি। তখন এমনি সন্ধ্যায় মহাকালের মন্দিরে আরতি ঘণ্টা বাজত। তখন সেখানে একপাশে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আমি হয়তো মনের মতো কোনো বর ভিক্ষা করেছিলাম। কে জানে তখন কী কামনা করেছিলাম, ভাবলে ভারী কৌতূহল হয়। আরতির পর ভজন শুরু হল, আমরা উঠে পড়লাম। আগামীকাল দিউ যাব। ফেরার সময় সহস্রবুদ্ধির সঙ্গে দেখা হল। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

পরদিন বাসে প্রথমে 'কোদিনা' হয়ে 'উনো'। তারপর বাসবদল করে 'ঘোগলা'। সেখানে থেকে নৌকোয়, ওদেশের ভাষায় 'উড়ি' করে, সমুদ্রপার হয়ে দিউ গিয়েছিলাম। খেয়ানৌকোর জন্যে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এখানে প্রচুর মাছ ধরার নৌকো অনবরত গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনছে আর তীরে ফেলছে।

খেয়ানৌকা এল, সমুদ্রের নৌকো। বিরাট বড় বড় সাদা পাল তুলে নৌকো আরবসাগরে ভাসল। মনে পড়ল ছোটবেলায় শোনা রূপকথার রাজপুত্রের গল্প। ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে রাজপুত্র চলেছেন কোন অচিন দেশের রাজকন্যার সন্ধানে। যদিও আমরা কেউ রাজপুত্র বা রাজকন্যা নই, তবু আমার মনে হয় সকল মানুষের মনের কোণে ঘুমিয়ে থাকে স্বপনপুরীর রাজপুত্র বা রাজকন্যা। সুযোগ পেলেই সে কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে উধাও হয়ে যায় অথবা ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দেয় জলে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দিউ মনোরম। আরব সাগরের কূলে অদ্ভুত সুন্দর স্থান। পরিখায় ঘেরা দিউ ফোর্টে গিয়েছিলাম। মস্তবড় ফটক, তার মাথার ওপর যিশুকে কোলে-নেওয়া মাতা মেরির ছবি। দুজন রক্ষী দরজায় দাঁড়িয়ে। আমরা ফোর্টে ঢুকলাম। মস্তবড় ফুলের বাগান। বিরাট একটা ভাস্কো-দা-গামার জিঙ্কের দাঁড়ানো মূর্তি রয়েছে। বড় বড় কামান দেখলাম। সবই সমুদ্রের দিকে মুখ-করা— বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। ভারী সুন্দর। দূরে সমুদ্রবক্ষে দিউ ডুমার। খুব ভালো লেগেছিল।

পরদিন সোমনাথ থেকে বাসে দ্বারকা যাত্রা করেছিলাম। রাস্তা প্রশস্ত ও মসৃণ। আমরা কখনো সমুদ্রের উপকূল ধরে চলেছি, কখনও বা ধূ ধূ মাঠ প্রান্তরের ওপর দিয়ে বাস দ্রুতগতিতে ছুটছে। যেমন প্রচণ্ড রৌদ্র তেমনি হু হু সমুদ্রের হাওয়া। যেতে যেতে একরকম পাখি দেখলাম। তার নাম 'কুঁদ'। সারাটা পথ পাহাড় আর সমুদ্র আমাদের সাথি ছিল। কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ। পথে পোরবন্দর পড়ল। কৃষ্ণসখা সুদামার বাড়ি। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। 'হর্ষমাতা'র মন্দিরও পথে পড়েছিল। বিকেলে আমরা দ্বারকায় পৌঁছই এবং সমুদ্রের ধারে রেবাধাই ধর্মশালায় ছিলাম। তোতাদ্রির ধর্মশালায় থাকতে পারতাম কিন্তু ঠাকুরপোরা সমুদ্রের ধারই বেছে নিলে। আমাদের ধর্মশালার পাশেই ছিল বিরাট লাইট-হাউস।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা আমরা কতই তো শুনেছি। কিছু কিছু পড়েছিও। এই দ্বারকা সম্বন্ধে কত কাহিনি প্রচলিত আছে। যখন জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করছেন, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে এই দ্বারকায় চলে আসেন। তাই কৃষ্ণের এক নাম 'রণছোড়জি'। মন্দিরকে ঘিরেই দোকানপাট। বড় জায়গা, বিরাট মন্দির, তার

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গোমতী নদী। মন্দিরগাত্রে পুরোনো কারুকার্য। সব সময় মিষ্টি সুরে ভজন হচ্ছে। এই মন্দিরে শুধু নাকি হিন্দুদের প্রবেশাধিকার। মন্দির সকাল ছ'টা থেকে বেলা বারোটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তার মধ্যে ঘড়িঘড়ি পর্দা পড়ছে। প্রাণভরে যে কিছুক্ষণ ঘরে রণছোড়জিকে দেখব তার উপায় নেই।

যাই হোক, আমার দ্বারকাধিপতিকে দেখে ধন্য হলাম, প্রণাম করলাম। বোধহয় বেলা তখন সাতটা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ চলছে, নানাপ্রকার গহনা পোশাক ও ফুলসাজে ভগবান সাজছেন। ভারী ভালো লাগছিল। একটা ভক্তিরসের পরিমণ্ডল। বহু ভক্তহৃদয়ের অনুরাগে রাঙা কত সাধকের সাধনার ধন— সর্বহৃদিশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে হৃদয় মন যেন পুলকিত হয়ে উঠল। মনে হল ভগবানের কত দয়া, কত করুণা প্রতিনিয়ত আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। বোঝার চেষ্টাও করি না। তিনি যদি দয়ালু না হতেন তা হলে আমার মতো অসহায় মহিলার এখানে আসা সম্ভব হত না। এই তো তিনি। তারপর আরতি শুরু হল। পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ ইত্যাদি দিয়ে আরতি হল। ধূপ, ধুনো, ফুলের মিলিত গন্ধ এবং ভক্তজনের হৃদয়ার্তি, তার সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের কৃষ্ণভজন— অপূর্ব লাগছিল। সিংহাসনে নিকষ কালো পাথরের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ অপরূপ সাজে সেজে দাঁড়িয়ে আছেন। চূড়া বামে ঈষৎ হেলানো। আরতি শেষ হলে নীরবে প্রণতি জানিয়ে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

মনে পড়ছে ওখান থেকে খেয়া পার হয়ে ভেটদ্বারকায় গিয়েছিলাম। অকূল সমুদ্রে নৌকো ভাসল। আমরা ফুল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম। সমুদ্রের বুকে ফুলগুলো কত দূর ভেসে গেল। ভেটদ্বাবকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখা সুদামার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এখানকার কৃষ্ণমূর্তি দ্বারকার কৃষ্ণমূর্তির মতো চতুর্ভুজ।

পরদিন রাত্রি আটটার বাসে আমরা রওনা দিয়েছিলাম। আমাদের ভ্রমণতালিকায় ছিল 'মহেশানা' হয়ে 'অম্বাজি', পরে 'আবু পাহাড়'। রাত্রের বাস দ্রুতগতিতে চলেছে। একটু বেশি রাত্রি হতে বাসের সবার চোখে তন্দ্রা নেমে এসেছে। তন্দ্রা নেই শুধু চালকের চোখে, সে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্কভাবে বাস চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেকক্ষণ জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করছি। বড় বড় জায়গায় বাস অনেকক্ষণ ধরে থামছে। বাইরে অন্ধকার। গুজরাটের কত পাহাড়, বন, প্রান্তর, জনপদ, গ্রাম পার হয়ে চলেছি।

রাত্রি একটায় আলোকময়ী রাজকোট শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। তারপর একে একে জামনগর, ভিরামগাঁও পার হয়ে, দীর্ঘ শর্বরী অবসানে আমরা মহেশানায় এসে পৌঁছেছিলাম। মনে আছে গ্রাম-পঞ্চায়েতের ধর্মশালায় উঠেছিলাম। পাশেই হোটেল। আমি আর প্রীতি হাতমুখ ধুয়ে সঙ্গে যা ছিল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠাকুরপো বেচারীর বিশ্রাম হল না, আবার ছুটল বাসের খবর নিতে। কিছুক্ষণ পরে স্নান সেরে পাশের হোটেল থেকে তৃপ্তি করে খেলাম। এদিককার সবই নিরামিষ। তারপর ধীরেসুস্থে বাসে এসে উঠেছিলাম। এবার অম্বাজি।

অনেকক্ষণ বিরতির পর বাসযাত্রা মন্দ লাগছিল না। মাহেশানার পর থেকে ভূপ্রকৃতির রূপ পালটে যাচ্ছে। সমুদ্র নিয়েছে বিদায়, শুরু হয়েছে শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চল। ছোটবড় পাহাড় নিকটে এবং দূরে দেখা যাচ্ছে। দুপাশে খেতিজমি গাছপালা বাড়িঘর। বড় বড় শিংওয়ালা গরু চরছে। মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ উটের গাড়ি চলেছে তো চলেইছে।

বিকেলে আমরা 'খেড়ব্রহ্মায়' পৌঁছেছিলাম। এখানে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি। প্রণাম সেরে বাসে বসলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান আরও দূরে। অতি সন্তর্পণে সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকার আকাশের গায়ে অপূর্ব মেঘসজ্জা এবং বিচিত্র রঙের এক দ্যুতিময় আলোর খেলা দেখতে দেখতে চলেছি।

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হল। মিলিয়ে গেল রঙের খেলা। শুধু বাসের আলোয় রাস্তা আলোকিত হচ্ছে। রাত্রি নটায় আমরা অম্বাজি নেমেছিলাম। অচেনা জায়গা। ড্রাইভারসাহেব বললেন, 'কাছেই ধর্মশালা আছে, চলে যান।' 'বোম্বেওয়ালি' ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। আর খেলাম অম্বাজির ভোজনালয়ে।

পরদিন পুজো দেওয়া হল। এখানে অম্বাজি অষ্টভুজা, সপ্তাহে সাতদিন সাতরকমের বাহনের ওপর উপবেশন করেন— সিংহ, ব্যাঘ্র, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি। বিরাট মন্দির। তখনও তৈরি হচ্ছিল। জায়গাটি ছোটর ওপর সুন্দর সাজানো। যে কটাদিন ওখানে ছিলাম খুব আনন্দে ছিলাম। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না, যেতে হবে আবু। তাই একদিন অম্বাজীকে শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে তাঁর ভোজনালয়ে খেয়ে আমরা বাসে এসে বসেছিলাম।

শুরু হল আমাদের ভ্রমণের আর এক অধ্যায়। রাজস্থানের কিছু অংশ আমাদের দেখে যাওয়ার কথা। গুজরাটে ঘুরছিলাম। সবই ছিল গুজরাটি ভাষায় লেখা। এখন থেকে বাসের টিকিটে ইংরেজি ভাষা দেখা গেল। কতদিন ধরে বাসে বাসে ঘুরছিলাম। এবং একটু অবাক হয়েছিলাম রাস্তাগুলির চেহারা দেখে। কত সুন্দর রাস্তা। ওইসব রাস্তা দেখে আমাদের বাড়ির সামনের বাসরাস্তার দুরবস্থার কথা মনে পড়ছিল।

বাস ছাড়ল। পার্বত্যপথ কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। দূরে দিক্‌চক্রবালে শৈলশ্রেণি আকাশের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একটি শীর্ণকায়া নদী আমাদের পথের পাশে পাশে চলছিল। কোথাও অল্প একটু জল, কোথাও বা সেটুকুও নেই। শুধু দেখা যাচ্ছে উপলবহুল শুষ্ক নদীবক্ষ পড়ে আছে। রক্তরাঙা ফুলেভরা কী একটা গাছ প্রায়ই চোখে পড়ছিল। প্রখর রৌদ্রে সেই ফুলগুলোর দিকে তাকালে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এদের কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। বারেবারে আমার ঘাটশিলার কথা মনে পড়ছিল। এমনি ধরনের শুষ্ক ভূ-প্রকৃতি ছিল ঘাটশিলার। কত বেড়িয়েছি পাহাড়ে, জঙ্গলে। তাই এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনও আমাকে মুগ্ধ করে। ওরা আমার মর্মে মর্মে মিশে আছে। আজ জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েও আমি যেন আমার বিদায়ী কৈশোর ও যৌবনের বাঁশি শুনতে পাই। ভুলতে পারি না ঘাটশিলাকে।

দেখতে দেখতে আবু রোড এসে গেল। বাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল। আবু রোড থেকে বাস ছাড়ার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমরা আবু পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আবুতে আমরা 'শান্তিনিবাস' হোটেলে ছিলাম। হোটেলের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে ওপরে। পরপর কয়েকটা বড় বড় হোটেল, এমপোরিয়াম ইত্যাদি। পাহাড়ি শহর। দার্জিলিং, মুসৌরি, সিমলা, নৈনিতাল, আবুপাহাড় ইত্যাদি সবই দেখেছি, প্রত্যেকটি স্থানই নিজ সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ। যতটা পারলাম পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলাম।

পরদিন গিয়েছিলাম 'নখিলেকে'। পাহাড়ে ঘেরা, জল তরতর করছে, বোটিং হচ্ছে, রাজসিক পরিবেশ। এই পরিবেশে মন শান্ত হয় না, আনন্দ লাভ করে না, বরং চঞ্চল হয়ে পড়ে। তৃতীয় দিনে সাইটসিয়িং করতে গিয়েছিলাম।

প্রথমে দিলওয়ারা মন্দির। জায়গাটি নির্জন। দূর থেকে মন্দিরের গঠন দেখে আহামরি কিছু মনে হয়নি। গোলাকৃতি গম্বুজের মাথার মতো তিনটি মাথা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হল। চতুর্দিকে মন্দিরগাত্রে, অলিন্দে, খিলানে মন্দিরের ভেতরে মাথার ওপর কী দারুণ অপরূপ শ্বেতপাথরের কারুকার্য! কতরকমের ফুল, লতা, পাখি, দেবদেবীর মূর্তি। কত নৃত্যরতা সুন্দরীর অপূর্ব দেহভঙ্গি পাথরে উৎকীর্ণ। অপূর্ব ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট একটি হর-পার্বতীর মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া প্রতিটি মূর্তির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিখুঁত নিটোল লাবণ্যময়। পাথরের বুকে যে এত লাবণ্য ও সুষমা ফুটে উঠতে পারে তা দিলওয়ারা মন্দির না দেখলে কল্পনা করতে পারতাম না। যেসব শিল্পীরা নিজের মনের দরদ ও নৈপুণ্য দিয়ে ছেনি ও হাতুড়ির সাহায্যে

এই পাথরের বুকে অনিন্দ্যসুন্দর শিল্প সৃষ্টি করেছেন মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালাম। আমার দেখা এবং জানা সামান্যই, হয়তো সেজন্য এই শিল্পসৃষ্টিকে আমার অসামান্য বলে মনে হয়েছে। আমি মুগ্ধ হয়েছি, তৃপ্ত হয়েছি। মন্দিরের মধ্যে মহাবীরের মূর্তি। দুপাশে লম্বা বারান্দা। চারকোণে চারটি মূর্তি ছিল। গাইড আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। সময় অল্প, তাই দেখে মন ভরল না।

এরপর গিয়েছিলাম রানাকুম্ভের 'অচলগড়'। অচলগড়ের অচলদেব মহাদেবের দর্শন হল। ওখান থেকে অনেকটা দূরে চারশো সিঁড়ি ভেঙে এক মন্দির, তার মধ্যে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি যোগাসনে উপবিষ্ট। এখান থেকে 'গুরুশিখর' অনেক উঁচুতে। মরতে মরতে উঠেছিলাম, সবচেয়ে ওপরে দত্তাত্রেয় মুনির তপস্যার স্থান। তারপর গিয়েছিলাম অর্বুদাদেবীর কাছে। মাউন্ট আবু মোটামুটি দেখা হল, এবার অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। এবার যেতে হবে 'উদয়পুর'। মাঝে দোল পড়েছিল।

উদয়পুরে রাস্তার ওপরেই 'সাধনা' হোটেলে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। প্রথম দিন হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়। বাপুবাজার বেশ বড় জায়গা, চৈতক সিনেমা ফেলে রেখে আমরা চৈতক মার্কেট পর্যন্ত ঘুরলাম।

পরদিন দোল ঘরে বসেই কাটল। জানলা দিয়ে রাজপুতানার হোলি উৎসব দেখা হল। মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের 'হোরিখেলা' কবিতাটি। আমাদের দেশের মতোই ছেলেরা রাস্তা দিয়ে আবির মেখে আনন্দ করতে করতে চলেছে। উদয়পুরে এসে বড়ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। উদয়পুরের কোনো স্কুল থেকে ওঁকে একবার ডেকেছিলেন চাকরি করার জন্য। উনি ভাইকে লিখেছিলেন, 'হয়তো আমি উদয়পুর যেতে পারি, ওখানে গেলে ওদিকটা সব ঘুরে আসব। তোমার বৌদিদিকেও নিয়ে যাব। তুমি তখন একবার উদয়পুর গিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারবে।' আমার কথা লেখেননি, আমার মনে একটু দুঃখ হয়েছিল। সেদিন উদয়পুরে সেকথা মনে পড়ল। মনে দুঃখ হল ভেবে যে ওঁরা দু-ভাই কেউই উদয়পুরে আসেন নি।

আমরা টাঙা করে উদয়পুরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেছিলাম। পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর শহর। প্রথমে 'প্রতাপ স্মারক'। সেখানে চৈতকের পিঠে রানা প্রতাপের মূর্তি। তারপর 'জগদীশ টেম্পল'। ওখান থেকে সিটি প্যালেস, পিচোলা লেক ইত্যাদি।

পরদিন চিতোর। অনেক দিনের সাধ ও স্বপ্ন— চিতোর দেখব। রানা প্রতাপের চিতোরভূমি স্পর্শ করে ধন্য হব। এ ছাড়া মীরাবাইয়ের সাধনভূমি আকর্ষণীয় তো বটেই। মন লঘুপক্ষে উড়ে চলেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরভূমি চিতোর। বেলা তখন বারোটা হবে। আমরা চিতোরে পৌঁছেছিলাম। স্টেশনের কাছ থেকে একটা টাঙা

নেওয়া হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টাঙা গড়ের মধ্যে ঢুকল। পথ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। সাতটা দরজা পার হয়ে চিতোরগড় ঢুকতে হয়। পোল মানে দরজা, যেমন রামপোল, গণেশপোল, হনুমানপোল। বিশাল গড়, পাশে রানাকুম্ভের গড়। ফতেসিংহের নির্মিত বিরাট প্রাসাদ, মিউজিয়াম, তারপরে বিশাল বিজয়স্তম্ভ। দুটি বিজয়স্তম্ভ। বড়টি বোধহয় পাঁচশো বছর আগের। রানা প্রতাপ একবার চিতোর উদ্ধার করে বিজয়স্তম্ভটি নির্মাণ করেন। একটু গিয়েই মীরার 'কুম্ভশ্যামে'র মন্দির। মীরার অপূর্ব ভজন, তাঁর প্রেমভক্তি, তাঁর গিরিধারীলাল গোপালের জন্য সর্বস্বত্যাগ চিরকালই আমাকে আকর্ষণ করে আসছে। এইসব জায়গায় তাঁর পদরজ মিশে আছে। দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

ওখান থেকে পদ্মিনীমহল। পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিনের নিদ্রাহরণ করেছিল। এঁরই জন্যে চিতোরের স্বাধীনতা বারবার হয়েছিল বিপদাপন্ন। পদ্মিনীর মহল জীর্ণ হয়ে গেছে। একটি সুড়ঙ্গপথ দেখলাম, ওই পথ দিয়ে তিনি স্নানে যেতেন। এই মহলের পিছনে একটি জলাশয়। তার মধ্যে প্রাসাদ। কথিত আছে, আয়নায় প্রতিবিম্বিত পদ্মিনীর রূপ দেখে আলাউদ্দিন উন্মত্ত হয়েছিলেন। একটি ঘরে সেই আয়নাও দেখলাম। ঘরের দেওয়ালে চারটি আয়না টাঙানো রয়েছে। তার মধ্যে একটি ফাটা। ওই ফাটা আয়নার মধ্যেই নাকি আলাউদ্দিন পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখেছিলেন। তারপর জহরব্রতের জায়গা এবং গোমুখ। এই গোমুখে স্নান করে রাজপুত মহিলারা জহর হতেন।

ফেরার সময় এক জায়গায় বাস থামল। দেখি একজন বৃদ্ধলোককে জড়িয়ে ধরে বারো কি তেরো বছরের একটি মেয়ে খুব কাঁদছে, বাসে উঠবে না। তখন তাকে জোর করে বাসে তুলে দিলে কারা যেন। পাশের বাসযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কাঁদছে কেন?' সে হেসে বললে, 'প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, তাই কাঁদছে।' বৃদ্ধ লোকটি ওর বাবা, দেখি বৃদ্ধের চোখেও জল। সবদেশের কন্যাবিদায়ের এই মুহূর্তগুলি সত্যিই বড় করুণ, বেদনাদায়ক। চিরপরিচিত পরিবেশ আপনজন বাবা-মা ভাই-বোন সব ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে অচেনা মানুষগুলির সঙ্গে নিজেকে সঁপে দিয়ে মিলেমিশে থাকতে হবে। সেই মেয়েটির বৃদ্ধ বাবাকে দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল।

পরদিন নাথদুয়ারা গিয়েছিলাম। দশটায় বাস ছাড়ল উদয়পুর থেকে। চৈতক মার্কেটের মধ্যে দিয়ে লোকসংস্কৃতির মণ্ডপ ইত্যাদি পার হয়ে চিতোর যাওয়ার পথকে ডানদিকে ফেলে বাস পাহাড়ের পথ ধরল। প্রথমদিকে বাস ক্রমাগত উঠছে। তারপর কিছুটা যেন সমতল। দূরে দূরে রৌদ্রতপ্ত পাহাড়।

এক জায়গায় বাস থামল। নাম 'কৈলাসপুরী'। পর্বতের নিভৃত কোলের মধ্যে। এখানে একলিঙ্গজীর মন্দির। এই একলিঙ্গজি হচ্ছেন মেবারের কুলদেবতা। দেখি বাজার, দোকান, স্কুল, এমন একটি কলেজও রয়েছে। দেখে বেশ আনন্দ হল। শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। এসব তারই লক্ষণ। বাসে খুব ভিড়। সবাই চলেছে শ্রীনাথজির দর্শনে।

পাহাড়ের কোলে কোলে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। নাথদুয়ারা যখন পৌঁছলাম তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। জায়গাটি বড়। প্রচুর দোকানপাট। আমরা নেমেই সোজা মন্দিরে। মন্দিরদুয়ারে বন্দুকধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে। আমরা শ্রীনাথজি দর্শন করলাম। কৃষ্ণমূর্তি এখানে শ্রীনাথজি নামে পূজিত। শোনা যায়, মথুরার বল্লভাচার্য এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের ভয়ে তিনি মথুরা থেকে শ্রীনাথজিকে মেবারে স্থানান্তরিত করছিলেন, এমন সময় নাথদুয়ারায় এসে রথের চাকা বসে গেল। তাই এখানেই মন্দির তৈরি হল। প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীনাথজি।

ফেরার সময় একটা ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া গেল। তাতেই উদয়পুর ফিরেছিলাম। ফেরার দিন আমেদাবাদে বন্‌ধ ছিল। প্রচুর হয়রানির পর রাজস্থানের শেষসীমা রতনপুর পর্যন্ত এসে আমরা অন্য একটি বাসে আমেদাবাদ এসে পৌঁছেছিলাম। পরদিন হাওড়াগামী এক্সপ্রেসে উঠেছিলাম।

১৭

আবার শুরু হল পড়ানোর জীবন। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন এর-ওর কাছে গল্প করতে ভালো লাগছিল। পরে সে কথাও পুরোনো হয়ে গেল। স্কুলে যাই আসি। তখন সুমন ছোট, ওকে নিয়ে দিন কাটছে মন্দ নয়। মনে পড়ছে তখন খোকন অন্ধকার থাকতে উঠে কে এম ফ্যাকট্রি থেকে দুধ আনত। মাঝে মধ্যে আমিও যেতাম। শীতের ভোর। তখন বেশ অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারা। দুধের পাত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় নামতাম। নির্জন চারদিক, দু-একজন পথিক দেখা যাচ্ছে।

দীর্ঘ রাস্তা, সারি সারি আলো জ্বলছে। শিবুদা হাজারির দোকানের কাছে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে। আর কথা বলছে। কোনো ভয় করত না, বরং ভালো লাগত। বাড়ির কাজের চেয়ে এইসব কাজ আমার বেশি ভালো লাগে। দুধওয়ালি হিন্দুস্থানি বৌটি কত গল্প করত। স্বামী নেই, কার কাছে যেন থাকে। একটি ছেলে। কিছুদিন পরে ওরা ব্যবসা তুলে দিয়ে চলে গেল। বৌটি খুব হাজারিবাগের গল্প করত।

একবার গরমের ছুটিটা পুরো মেজদির হাজারিবাগের রোডের ওপর যে বাড়িটা ছিল সেখানে কাটিয়ে এসেছিলাম। আমি, খোকন, পুন্তি, কুতান। খুব বেড়াতাম। আমগাছ ছিল, খুব আম খেয়েছি।

একদিন দুপুরে বাক্স খুলেছি, চোখে পড়ল আমার নাম-লেখা সরু একটা হিসাবের খাতা। ঘাটশিলায় ওই খাতায় রোজ সংসার-খরচ লিখতাম। সেটা ছিল বড়ঠাকুরের আদেশ। প্রথম ঘাটশিলায় যাওয়ার পর বড়ঠাকুর বলেছিলেন, 'বৌমা, রোজ যা খরচ করবে, একটি খাতায় লিখে রাখবে। তাহলে একটা মোটামুটি খরচের ধারণা হবে।' সেই থেকে হিসাব লিখতাম। একটা পাতা উল্টে দেখি ১৩৫৬ সন, ১৮ই মাঘ, বুধবার। মাছ ১টাকা, কফি ১ টাকা ১২ আনা, পালংশাক ১০ আনা, বেগুন ৬ আনা, পিঁয়াজ ৬ আনা, টম্যাটো ২ আনা ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরামণিমা ৪ টাকা, জল ভারী ৭ টাকা, ঘরভাড়া ২৮ টাকা। নতুন গোয়ালা শবশরণ ১ আনা করে দুধ দিচ্ছে।

খাতাখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলাম। সত্যি, এজন্মে কি সংসার করেছি! আজ আমি সাংসারিক জ্ঞানে অজ্ঞ। ঈশ্বর আমাকে অনেক দিয়েছিলেন। আমার কর্মফলে একঝটকায় সব হারিয়ে গেছে। সব থেকেই যদি বঞ্চিত হলাম, তাহলে হে ঈশ্বর, কেন আমাকে সংসার থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেলে না। কেন তবে আমাকে এই দীর্ঘদিন ধরে সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছ। একেই কি বলে কর্মফল ক্ষয়? কিন্তু ক্ষয় যা হচ্ছে তার চতুর্গুণ যে বেড়ে যাচ্ছে। এই কর্মের ক্ষয় করতে পরের জন্মে আর কোনো ভয়ংকর যন্ত্রণা আর বঞ্চনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে জানতে ইচ্ছা হয়। ঠাকুর, শুনি তুমি দীনদয়াল, অনাথের নাথ, তবে আমার প্রতি তুমি কেন এত অকরুণ? ওঁর জীবনের প্রতি কত ভালোবাসা ছিল, সংসার করার সাধ ছিল, কিন্তু কোন কর্মফলে ওঁকে এভাবে চলে যেতে হল?

মনে পড়ছে একবার পুরী গিয়েছিলাম। পূর্ণিমা, ওর ছোট ভাই বোধন, ওর রেবামামিমা, ভ্রান্তি, সোনা, মাণিক, সবিতা ও আমি। অবশ্য এর আগেও দুবার গিয়েছিলাম। একবার রথে। মেজদি, সেজদি, মেজদা, কুতান ও আমি। যাই হোক, সেবার কানাইদা ও শান্তা ওখানে ছিল। ওরাই আমাদের থাকার ঘর ঠিক করে দিয়েছিল। সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথ দর্শন করেছি, শান্তাদের সঙ্গে এ-মঠ ও-মঠ করেছি, ঘুরেছি আর প্রসাদ পেয়েছি। খুব ভালো লেগেছিল। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের একটি দিকে তখন ডা. জয়দেব মুখার্জি মাকে নিয়ে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় শান্তা আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন উনি চৈতন্যদেবের মৃত্যুর

ওপর রিসার্চ করছিলেন। সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর বেশ, পরনে গেরুয়া। আমাদের সঙ্গে কত গল্প করলেন। খুব ভালো লেগেছিল। কয়েকবছর পরে শান্তার কাছে শুনেছিলাম ডা. জয়দেব মুখার্জি এবং তাঁর মাকে কারা যেন রাত্রিবেলায় বীভৎসভাবে খুন করে রেখে গিয়েছিল। শুনে মন খুব খারাপ হয়েছিল। অমন ভালো লোকের এভাবে মৃত্যু ভাবা যায় না। অবশ্য যিশুকেও তো ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণও জরাব্যাধের হাতে বাণবিদ্ধ হয়েছিলেন।

এই বেড়ানোর দিনগুলোই ছিল আমার মরুজীবনে মরূদ্যানস্বরূপ। একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলা। নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার সময় কোথায়? তাই প্রয়োজন হয় পরিচিত গণ্ডির বাইরে যাওয়ার, অথবা কোনো নিভৃত নির্জন স্থানের। যত জায়গায় গেছি আমার স্বামীকে মনে পড়েছে। একটুও ভুলিনি। মনে মনে বলেছি, আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখ। আমার মন দিয়ে তুমি অনুভব করো। এ জীবনে ওকে ভোলা সম্ভব নয়। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা— যেদিন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করব, সেদিন আমার ইষ্টের মাঝে যেন ওঁকে পাই।

দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। এক এক করে স্নেহনীড় ভেঙে যাচ্ছে। মামা, মামিমা, মা (আমার ছোট মামিশাশুড়ি) চলে গেলেন। এদিকে মা, বড়দা, বড়দি, রনু, মেজদাদাবাবু অনেকেই চলে গেলেন। ওঁদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়। এতদিন একভাবে দিন চলেছে। আমার বড়জা দিদি ছিল আমার বন্ধুর মতো, সুখ-দুঃখ উভয় দিনের সঙ্গী, দিদিও চলে গেল। এখন আমি বয়সের ভারে ক্লান্ত, জীর্ণ দেহমন নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। এখন শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি বহন করে চলেছি।

সেদিন ওঁর, মানে আমার স্বামীর, ছোট ডায়েরিটা নাড়াচাড়া করতে করতে পড়তে শুরু করলাম। পড়লে বড় মন খারাপ হয়ে যায়। তবুও পড়তে ভালো লাগে। পড়তে পড়তে মনে হল উনি থাকলে কত কথা জেনে নিতাম। ওঁর জীবনের কত কথা কত ঘটনা আমার জানা হয়নি। কলকাতা থাকাকালীন কত মানুষকে আমি চিনি না, মাঝেমাঝে একটু-আধটু গল্প করতেন। কিন্তু সময় কোথায়? নিজের ডাক্তারি আর দাদা— এই নিয়েই তো সময় কেটে যাচ্ছিল। কখনও একটুআধটু অবসরে ভাবতাম একটু গল্প করব। তখনই হয়তো কেউ এসে গেলেন বা কোনো কাজে আমার ডাক পড়ল। তা ছাড়া গান বই ডাক্তারি এসব তো আছেই। আগের কথা শোনার মতো সুযোগ কোথায়? এখন মনে হচ্ছে সব কাজ ফেলে রেখে কেন ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি, গল্প করিনি। সব সংকোচ সব লজ্জা ত্যাগ করে কেন ওঁকে আমি দেখিনি! কেন সঙ্গে সঙ্গে থাকিনি! ওঁকে নিবিড় করে পাওয়ার তৃষ্ণা যে আমার মেটেনি।

মাঝে মাঝে ডাক্তারি পড়ার দিনগুলোর কথা বলতেন। একটা নার্সিং হোম করার খুব ইচ্ছা ছিল। বলতেন, 'তুমি নার্সিং করতে পারবে তো? সেবার চেয়ে বড়কাজ আর কিছু নেই।' কোথায় গেল নার্সিং হোম? আর কোথায়ই বা তিনি? এত দীর্ঘদিন পরেও আমি ওঁর অভাব অনুভব করছি। ওঁর প্রতিটি কথা আমার কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। ওঁর মন অত্যন্ত নরম ছিল। কেন যে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। ওঁর দিনলিপির একটা পাতায় আছে—

01.03.1936

ভোরে উঠে নিয়মিত ব্যায়াম করা সেরে একটু ডাক্তারি কেতাব পড়া গেল। কাছাকাছি পরীক্ষা নেই, তাই পড়ায় খুব মন লাগে না। সাড়ে আটটায় হাসপাতালে গেলাম। মেয়েদের ওয়ার্ডে ডিউটি পড়েছে। একটি অপারেশন ছিল, শেষ করে আসতে বেলা প্রায় দুটো হল। আজও দুপুরে খাইনি। ৪টায় পুনরায় হাসপাতালে গেলাম। থিয়েটার হবে, তার ব্যবস্থা দেখতে। ওখানে কয়েকজন এল। খানিকটা এ্যাকটিং হল। চা-টা খাওয়ার ব্যাপারে বেশ খানিকটা কাটল। সন্ধ্যায় দিদি এলেন, আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। Mr. Bose-এর জন্মদিন উপলক্ষে। ওখান থেকে বাজারে কয়েকটা জিনিস কেনা গেল অর্ধেন্দুর জন্য। এত ঘোরাঘুরি, হাসি, খাওয়া— সবটার মধ্যে একটা কেমন হৃদয়হীনতা— কিছুতেই ভালো লাগছে না। কী অশুভ মুহূর্তে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছিলাম।

সত্যি, অশুভ মুহূর্তে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। যদি ডাক্তার না হতেন তা হলে এভাবে মৃত্যু হত না। সবই ঈশ্বরের পরিকল্পিত। দুই ভাইয়ের মাটি ঘাটশিলায় কেনা ছিল বলেই ওঁর একান্ত অনিচ্ছায় ঘাটশিলায় থাকতে হয়েছিল। বড়ঠাকুরের বাড়ি কেনাও অনিচ্ছাসত্ত্বে। বাংলাদেশে বহু ছোট-বড় শহর ছিল, অনায়াসে উনি বসে প্র্যাকটিস করতে পারতেন। কিন্তু বিধি-নির্ধারিত পথেই চলতে হয়েছে। আজ কত দূরে চলে গেছেন। হাজার ডাকলেও সাড়া পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হচ্ছে, মানুষ নিমিত্তমাত্র।

বড়ঠাকুরের একটা কথা মনে পড়ছে। উনি বলতেন, 'প্রত্যেক মানুষের নিজের জীবনের প্রতি একটি প্রসন্ন দৃষ্টি থাকা দরকার। সবার মধ্যে ভালো আছে, খুঁজে বার করতে হয়, তা হলে শান্তি পাবে।'

আর একটা কথা বলতেন, 'মানুষের জীবনে আশা ও কল্পনা থাকে ষোলো আনা, তার মধ্যে যদি এক আনাও সফল হয় জানবে অনেক পেয়েছ।'

বড়ঠাকুর ছিলেন নির্লিপ্ত, উদাসীন। অর্থের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন, কিন্তু সেটাই যে জীবনের সব নয় এটাও গভীরভাবে উপলব্ধি

করেছিলেন। উনি ছিলেন শান্ত সমাহিত চিত্তের মানুষ। সহজে বিচলিত হতেন না। ধন ঐশ্বর্য, বিলাসব্যসন থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। উনি বলতেন, 'এগুলি জীবনের শান্তির পথ নয়।' তখন কতকিছু বলতেন, আমরা শুনতাম, কিন্তু এখন সেগুলো অনুভব করি। তাই দেখি, শত অনুরোধে বা বহু প্রয়োজনেও বড়ঠাকুর কলকাতায় বাড়ি করেননি। যদিও তখন ওঁর আর্থিক অবস্থা কলকাতায় বাড়ি করার মতো হয়েছিল, তবুও। তাই দেখা যায়, যে সময় বহু সাহিত্যিক-শিল্পী কলকাতাগামী হয়েছেন, সে সময় একমাত্র পথের কবি বিভূতিভূষণ একতারা বাজাতে বাজাতে চলেছেন গ্রামের পথে।

বড়ঠাকুরকে প্রণাম করলে বলতেন, 'কল্যাণ হোক'। আমার খুব ভালো লাগত। দিদি একদিন বড়ঠাকুরকে বলেছিল, 'তুমি কল্যাণ হোক বলে আশীর্বাদ করো, যমুনার খুব ভালো লাগে।' শুনে বড়ঠাকুর হেসে বলেছিলেন 'বেশ বেশ।'

মনে পড়ছে বড়ঠাকুরের মৃত্যুর দিন ভোরবেলা বললেন, 'ওভারসিয়ারবাবুকে একবার ডাকো।' আমি লণ্ঠন হাতে নিয়ে ওঁদের ডেকে নিয়ে এলাম। উনি আর বিষ্ণুবাবু এলেন। বড়ঠাকুর বললেন, 'নুটু রইল, দেখবেন।' আমাকে বলেছিলেন, 'বৌমা, তোমার মঙ্গল হবে।'

আচ্ছা, কেন বলেছিলেন? উনি কি বুঝতে পেরেছিলেন আমার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে? বোধহয় পেরেছিলেন, কারণ উনি সত্যদ্রষ্টা মানুষ ছিলেন।

১৮

হঠাৎ হঠাৎ কত কথাই মনে পড়ছে। আবার অনেক সময় ভাবতে বসলেও মনে পড়ে না। মনের এই টানাপোড়েন নিয়ে দিন কাটে। হঠাৎ একদিন প্রীতি এসে বললে, 'দিদি, আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি, আপনারও টিকিট কাটা হয়েছে। যাবেন তো?' শুনে প্রচণ্ড আনন্দ হয়েছিল। ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাব, ভাবাই যাচ্ছে না! ওকে বললাম, 'খুব খুশি হয়েছি রে। নিশ্চয়ই যাব।'

গোছগাছ শুরু হল, স্কুলে ছুটির ব্যবস্থা করলাম। আমি বড়ঠাকুরপোকে বললাম, 'যাচ্ছি যখন, অমরনাথ ঘুরে আসব। আর সম্ভব হলে বৈষ্ণোদেবী যাব।' ঠাকুরপো বলেছিল, 'পরিস্থিতি বুঝে হবে।'

প্রীতি, আমি আর বড়ঠাকুরপো। মাত্র তিনজন! শিয়ালদা থেকে 'জম্মু-তাওয়াই' ধরা হয়েছিল, সেজঠাকুরপো খোকা আমাদের তুলে দিতে গিয়েছিল। দু-দিন দু-রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে সকাল সাড় সাতটায় জম্মু স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। গাড়িতে আমরা ভালোমন্দ খেয়েছিলাম। সুজাতা এবং দত্তমশায় স্ত্রী পুত্রসহ চলেছেন। সুজাতা মেয়েটি বেশ

ভালো। বছর তিনেক হল বিয়ে হয়েছে এক তরুণ আর্মি অফিসারের সঙ্গে। ও জম্মু চলেছে স্বামীর কাছে। দত্তমশাই যাচ্ছেন দেখতে, বেড়াতে। দুর্গাপুর স্টেশনে ভদু দেখা করতে এল, হাতে মস্তবড় খাবারের বাক্স। আসানসোলে শশাঙ্ক, বাবলা ও বুলবুল এল, সঙ্গে পুতু প্রচুর খাবার পাঠিয়েছে। সুজাতার দিদি-জামাইবাবুও এসেছিলেন, সঙ্গে খাবার নিয়ে। মনে আছে সেদিন রাত্রে সব খাবার একসঙ্গে করে সকলে মিলে খেয়েছিলাম।

জম্মু বিরাট বড় ঝকঝকে স্টেশন। সুজাতা স্বামীর সঙ্গে চলে গেল। বড়ঠাকুরপো ও দত্তমশাই বাসের টিকিট কাটতে চলে গেলেন। যাই হোক, টিকিট কেটে আমরা বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রেন জার্নির চোটে শরীর খুবই খারাপ লাগছিল। কিন্তু তা আমরা আমল দিচ্ছি না কারণ তখন আমাদের মন হালকা মেঘের মতো ভেসে চলেছে কাশ্মীরের উপত্যকায় উপত্যকায়। এই যাত্রাটিও আমাদের বহুদিনের ঈপ্সিত সচেতন মনের সোনালি স্বপ্নের মতো। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। কাশ্মীর যাব, দর্শন করব তুষারতীর্থ অমরনাথ। চোখ ভরে দেখব তুষারমৌলি হিমালয়ের অপরূপ রূপমাধুরী। প্রাণভরে নিশ্বাস নেব তারই মুক্ত বাতাসে, হৃদয় ভরে উঠবে একটি আনন্দময় ঝঙ্কারে। ভারী ভাল লাগছিল।

স্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা পথ জম্মু শহরের পাশ দিয়ে চলেছে। পথের একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাওয়াই নদী। দোকান, পেট্রোল পাম্প ইত্যাদির পাশ কাটিয়ে বাস পাহাড়ের পথ ধরল। পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে পৌছতে হবে আমাদের গন্তব্যস্থানে, তাই ক্রমশ আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চে উঠেছিলাম। উধমপুর, পটন প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা পার হয়ে বাস কুণ্ডয় এসে দাঁড়াল। ছোট জায়গা, দু-চারটে দোকান, হোটেল। নিচু নিচু ঝুপড়ির মতো চালাঘর, চা ও পকোড়ার দোকান। হোটেলগুলোতে কয়েকখানা টেবিল-চেয়ার পাতা। নিকটবর্তী কোনো ঝরনার থেকে নল দিয়ে জলধারা টেনে আনা হয়েছে। চার টাকায় ভাত ডাল তরকারি পেট ভরে খাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় সব জায়গাতেই রয়েছে। শুনলাম এখানে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। আরও উঁচুতে বাটোট, পথ কখনো চড়াই কখনও উতরাই। কখনও বা দেখা যাচ্ছে পথের একপাশ অতলস্পর্শী খাদ। অপরপার্শ্বে পাহাড়ের অভ্রভেদী প্রাচীর। এরই মাঝে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে পার্বত্যদুহিতা নদীধারা।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এল। ওদিকে সন্ধ্যা হচ্ছিল সাতটায়। রাত্রি প্রায় দশটায় সময় বাস 'রামবাণে' এসে দাঁড়াল। বাস সেদিন রাত্রে আর যাবে না। ড্রাইভার বললে, 'কাছেই হোটেল আছে চলে যান, পরে খাবার পাবেন না, কারণ পিছনে আরও বাস আসছে।'

সেদিন রাত্রে হোটেলের সব খাবার শেষ, আমাদের ভাগ্যে আর জোটেনি। শোবার জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে হোটেলের মালিক বললেন, সব খাওয়া মিটে গেলে চেয়ার টেবিল সরিয়ে দেব, তখন আপনারা বেডিং বিছিয়ে শুতে পারবেন, এর জন্য মাথাপিছু দু-টাকা করে দিতে হবে।

বড়ঠাকুরপো বাসে রইল। আমি আর প্রীতি একটা কম্বল পেতে আর একটা গায়ে দিয়ে হাতব্যাগগুলো মাথায় দিয়ে মাথার কাছে জুতোজোড়া রেখে শুলাম। সেদিন ভারী অদ্ভুত লাগছিল। একটি ঘরে কত বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ আশ্রয় নিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ভাষার অন্তরায় রয়েছে, তবু একটা মানসিকতা বোধহয় সকলের মনেই কাজ করছিল— আমার ভারতীয়।

প্রথমে ঘুম আসে না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। বেডিং বেঁধে বাইরে এসে দেখি, পাতলা আলোয় পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট গ্রামটি যেন স্নিগ্ধ শান্ত তপোবনের মতো। সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়ল।

পথে সবেমাত্র দু-একজন লোকচলাচল শুরু হয়েছে। হোটেল ডাকঘর সবই রয়েছে। একটু এগিয়ে 'রামবাণের' কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার নদী। এর উৎস পীরপঞ্জল পর্বতমালা। আমরা পথিক, যাত্রা আমাদের অনন্তকালের। রামবাণকে পিছনে ফেলে আমাদের বাস ছুটল। একটা ব্রিজ পার হয়েছিলাম। একদিকে উত্তাল বেগে ছুটে চলেছে লিডার অপরদিকে বিশাল পর্বতশ্রেণি। তারপর দেখতে দেখতে এসে গিয়েছিল বিখ্যাত বানিহাল টানেল। এরই নাম নেহেরু টানেল। পাশাপাশি দুটো ট্যানেল। একটি যাওয়ার অপরটি আসার। আমাদের বাস টানেলে প্রবেশ করল। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ, বাসের মধ্যে আলো জ্বলছে। বাসের হেডলাইটের আলো পথ দেখাচ্ছে। একবাস মানুষ, কারও মুখে কোনো কথা নেই, একটা গম্ভীর শব্দ কানে এসে বাজছে। টানেল পার হতে বোধহয় আট-ন মিনিট লেগেছিল।

অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম আলোর রাজ্যে, মুক্ত বাতাসের কোলে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পীরপঞ্জল। এইবার শুরু হল সমতল। রাস্তার দুধারে সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে পথের ধারে ধারে দীর্ঘ পপলার গাছ। দূর থেকে ছবির মতো মনে হচ্ছিল। আমরা গুহায় পৌঁছলাম। শুনলাম এখান থেকে 'ভেরিনাগে'র পথ, তারপর 'কাজিকুণ্ড'। এখানে বাস থামল, আমরা একটু নেমেছিলাম। এখান থেকে খানাবল হয়ে পথ চলে গেছে পহলগাঁ, অনন্তনাগ, অবন্তীপুরার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীনগর এল।

বাসস্ট্যান্ডে বিশু (ডা. বিশ্বনাথ জোয়ারদার) দাঁড়িয়েছিল। একটা ট্যাক্সি করে ক্যাথে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। যেতে পথে পড়ল একদিকে ডাল লেক,

অপরদিকে ঝিলাম নদী। ডাল লেক ও ঝিলাম নদীর বুকে শিকারা ও হাউসবোট। পুবে আকাশের বুকে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণি। ক্যাথে বাঙালির, হোটেলের কাজকর্ম করছে যারা সবাই বাঙালি, একমাত্র মামাজি ছিলেন কাশ্মীরি মুসলমান। এঁদের ব্যবহার অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ। শীতে পথঘাট গাছপালা বরফে ঢেকে যায়। ডাললেকের জল নাকি বরফ হয়ে যায়, মানুষ তখন হেঁটে পার হয়। ওখানকার লোক খুব কষ্টসহিষ্ণু। শীতের সময় ওরা বুকের কাছে কাংড়া রেখে আগুন নিয়ে একপ্রকার যন্ত্র দিয়ে বরফ কেটে কেটে পথ চলে। তখন খাদ্যবস্তু বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। জমিয়ে রাখা কাঠ ও সঞ্চিত খাদ্য তখন ভরসা।

হোটেলের অফিসঘরে বসে এইসব গল্প শুনছিলাম, আর কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম, চতুর্দিক শুভ্র বরফের কণায় ঢেকে গেছে, প্রতিটি গাছ তার পত্র পুষ্প শাখা-প্রশাখা নিয়ে তুহিন শীতল বরফের তলায় সমাহিত। ওই দূরের পাহাড়শ্রেণি, ঝিলাম নদী, ডাল লেক, উপত্যকার সবকিছু তুষারে আচ্ছাদিত। তারপর ধীরে ধীরে শীত বিদায় নেয়, গাছে গাছে তুষারের অবগুণ্ঠন খুলে যায়, ঘটে সবুজ পাতার আবির্ভাব। আর বিচিত্র বর্ণের পুষ্পের সমারোহ। ঝিলাম নদীর বুকে দেখা দেয় জলধারা। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুমিয়ে পড়া ঝরনাগুলো আবার চঞ্চল নৃত্যে নেমে আসে অর্থাৎ গ্রীষ্মের সূচনায় সর্বত্র বরফ গলতে থাকে। তারই ফলে প্রকৃতিতে আসে নবজাগরণ।

একদিন আমরা শিকারা ভাসিয়েছিলাম ডাললেকে। হাউসবোটগুলির পাশ দিয়ে শিকারা চলেছে, খুব সুন্দর লাগছিল। শিকারা ও হাউসবোটের পৃথক পৃথক নাম। মোটরলঞ্চ চলছে, অনেকে স্কি করছেন। দূরে দেখা যাচ্ছে একদিকে হরি পর্বত, তার ওপর রাজা হরিসিং-এর প্রাসাদ, অপরদিকে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের মাথায় শিবমন্দির। আমরা শিকারা করেই চারমিনার গিয়েছিলাম। জলের ওপর ছোট দ্বীপের মতো উদ্যান, তার চারদিকে চিনার গাছ। এই চিনার গাছ নাকি সম্রাট আকবর পারস্য থেকে এনেছিলেন। নেহেরু গার্ডেন, ফ্লোটিং গার্ডেন দেখা হল।

পরদিন শঙ্করাচার্য পাহাড়ে শিবমন্দিরে গিয়েছিলাম। এদিনই বিকেলে ডাল লেকের কাছে এসে বাস ধরলাম। লালচক শ্রীনগর শহর দেখে বাস বদল করে গ্রামের দিকে যাওয়া হয়েছিল। যেতে যেতে দেখেছিলাম খেতিজমি। শস্য ভালোই হয়েছে বলে মনে হল। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে গ্রাম পড়ছে। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। বাড়ির বাইরে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। আমরা শঙ্করপুরা বলে একটি জায়গায় নামলাম। বিশু আমাদের সঙ্গে ছিল। পথের দুপাশে আখরোট, আপেল ও আলুবোখরার বাগান। গাছে গাছে কচি সবুজ আখরোট হয়ে রয়েছে।

মাঝে মাঝে ডালিমগাছ, থোকা থোকা ফুলে ভরে আছে। বিরাট বিরাট চিনার গাছ। বিশু আমাদের একটি হিন্দু কাশ্মীরি ভদ্রলোকের বাড়ি নিয়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম মাখনলাল কাউল।

আমরা যেতেই দুটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। ওদের মা এলেন। এত সুন্দর দেখতে! তার ওপর সুন্দর করে প্রসাধন করেছেন। ওখানে ওঁদের তাঁতঘর থেকে আমরা কটা কাপড় কিনেছিলাম। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাস ধরবার জন্যে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তখন সন্ধ্যা। মনে পড়ল ভাটপাড়ার কথা। মনে হল উনি কিছুই দেখলেন না। কোন পাপের জন্য এই ব্যর্থতা? মনের মধ্যে প্রার্থনা গুনগুনিয়ে ওঠে, হে ঈশ্বর, উনি যেখানেই থাকুন, তোমাকে যেন বিস্মৃত না হন। শান্তিলাভ করুন।

হোটেলে ফিরে দেখা গেল দত্তমশাই তাঁর একজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন তিনি আমাদের একটি মিলিটারি গাড়ি ঠিক করে দিতে পারেন— দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখার জন্যে। আমরা খুশি। সেই গাড়িই ঠিক হয়েছিল এবং পরদিন সকাল আটটায় গাড়ি আমাদের হোটেলে এল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম। হোটেল আমাদের লাঞ্চপ্যাকেট সঙ্গে দিয়েছিল। প্রথমে 'গুলমার্গ'-এ। পথের সৌন্দর্য অপূর্ব। দুপাশে পাইন, ওক, পপলার গাছ, দেখে মনে হচ্ছে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। ধান ও মশলার খেত। 'হপ' গাছও দেখেছিলাম, এর থেকে নাকি মদ তৈরি হয়।

দুপাশে তুষারাবৃত পাহাড়। মনে হচ্ছিল কে যেন রুপো গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে এবং সেই গলিত তরল রৌপ্য যেন পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যতই উপরে উঠছি ততই মনে হচ্ছে পাহাড় যেন এগিয়ে আসছে। একসময় গাড়িটা অনেকটা উপরে উঠে যাওয়ার পর দেখলাম দূরে তুষারাবৃত পর্বতমালা যেন ঝলমল করে উঠেছে। সে যে কী অপূর্ব শোভা! চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন ধূর্জটির জটাজালের ওপর মোটা মোটা জুঁইফুলের গোড়েমালা দিয়ে কে যেন সাজিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছিল কে যেন মাথার ওপর ঢেলে দিয়েছে শ্বেতশুভ্র মল্লিকার অঞ্জলি। এত ভালো লেগেছিল যে সে অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা নেই।

মনে মনে অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টাকে কোটি কোটি প্রণাম জানালাম— যাঁর একপায়ে মৃত্যুর প্রলয় ছন্দ, অপর পায়ে সৃষ্টির অফুরন্ত আনন্দধারা। তাঁর ক্ষণিক উপলব্ধিতে নিজেকে ধন্য মনে হল। সেদিন যতই এগোচ্ছি, মনপ্রাণ যেন ততই অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠছে। ওই বরফাবৃত গিরিশ্রেণি দেখে আমার মনের মধ্যে যেন মহাদেবের ডম্বরু ধ্বনিত হতে লাগল। মনের মধ্যে অনুরণিত হতে লাগল, 'হরহর ব্যোম ব্যোম

মহাদেব।' যাঁর আবাস এবং প্রকাশ এই হিমালয় তাঁকে বারেবারে প্রণাম জানালাম। যতই যাচ্ছি দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া হিমবাহের থেকে কেমন করে জলধারা নেমে এসে উপলাস্তীর্ণ উপত্যকার বুকের উপর দিয়ে নামতে নামতে উত্তাল খরস্রোতা নদীরূপ লাভ করছে।

১৯

গুলমার্গ পর্বতবেষ্টিত একটি স্থান। পাইন ও পপলার গাছ। রোপওয়ে রয়েছে। ওখানে গিয়ে ঘোড়া করে আমরা আরও ওপরে গিয়েছিলাম। জায়গাটির নাম 'খিলেনমার্গ'। ওখানে ঝুরোঝুরো তুষার অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়েছিলাম। ভারী অদ্ভুত লাগছিল। ওখান থেকে 'চশমাশাহি'। একটি মোগল আমলের উদ্যান। এই বাগানটি জাহাঙ্গীর শুরু করেছিলেন, পরে শাহজাহান নাকি শেষ করেছেন। তিনধাপে বাগানটি। পাশে পাহাড় থেকে জলধারা নেমে আসছে। অজস্র ফল, সুন্দর বাগান। ক্যামেরাম্যান ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরদিন গিয়েছিলাম পহলগাঁ। গাড়ি ছুটল যে পথ দিয়ে প্রথমদিন শ্রীনগর এসেছিলাম সেই পথে। পাইন, ফার, পপলারের ছায়াঘন পথ পামপুর পার হয়ে অবন্তীপুরায়। পামপুরে প্রচুর জাফরান হয়। জাফরান গাছ দেখলাম বটে কিন্তু তার ফুল-ধরা দেখলাম না।

অবন্তীপুরা সুদূর অতীতে জনপদ ছিল। এখন তার ধ্বংসাবশেষ এখানকার দ্রষ্টব্য। ওখান থেকে খানাবল হয়ে অনন্তনাগে গিয়ে আমাদের গাড়ি থামল। অনন্তনাগের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ছায়াঘন বড় বড় গাছ। পাখি ডাকছে। দুটি কুণ্ডে মাছ ভর্তি। একটি কুণ্ডে অনন্তনাগের মন্দির। এ ছাড়া বৈষ্ণোদেবী ও অন্যান্য মন্দির রয়েছে। এর আশেপাশে সর্বত্র প্রচুর সাধুসন্তর মেলা। সবাই চলেছেন অমরনাথ দর্শনে। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে অমরনাথের ছড়িযাত্রা শুরু হবে। তারপর সকলে অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করবেন। ওখান থেকে 'মাটন' হয়ে পহলগাঁর পথ।

পহলগাঁর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার নদী। এই নদীর ধারে ধারে পথ। শুনেছিলাম কোলাহাই পর্বতই এই নদীর উৎসস্থল। আমরা দুপাশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নির্বাক হয়ে গেছি। আকণ্ঠ সেই সৌন্দর্যসুধা পান করেছি, তবুও তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এ পথের যেন শেষ না হয়। এল পহলগাঁ। দেখি মানুষের কচকচি। ইতিপূর্বেই কয়েকখানা বাস এসে গেছে। আমাদের গাড়ি এইসব ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে সাঁ করে একেবারে লিডার নদীর ধারে একটি সমতল স্থানে এসে দাঁড়াল।

হু হু করে বাতাস বইছে। সেদিন মনে হল যেন আকাশ একটু মেঘাচ্ছন্ন। দেখলাম বেশকিছু তাঁবু খাটানো, শুনলাম থাকার জন্যে নাকি ওগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। ঘোড়া নিয়ে ঘোড়াওয়ালা ঘুরছে। নানারকম মালা ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। আমরা লিডার নদীর ধারে সতরঞ্চি পেতে বসলাম। শীতের দেশ কখনও দেখিনি, সবই ভালো লাগছিল। নদীর ওপারে পাহাড়ের কোল দিয়ে রাস্তা। এপারের সঙ্গে ওপারের সংযোগ সেতু, তার ওপর দিয়ে কত সব ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। আমরা দুপুরের খাবার ওখানে বসে খেলাম, পান করলাম লিডার নদীর জল। ওই জলেই এঁটো বাসন মেজে নেওয়া হল। তারপর ব্রিজ পাব হয়ে হাঁটা শুরু করলাম। সমুদ্রপারের দেশগুলি কেমন জানি না, আমার কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে যেন এমনি একটি দেশের স্বপ্ন আমি দেখতাম। তাই নিজের ইচ্ছার প্রাপ্তি ও পূর্ণতায় আমি বিস্মিত, আমি মুগ্ধ, আমি তৃপ্ত।

সেইদিনই আমরা ফিরেছিলাম। গাড়ি ছুটছে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে, হঠাৎ দেখি পাহাড় থেকে জলধারা নেমে এসে এক জায়গায় জমা হয়ে পুকুরের মতো হয়েছে। আর তাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্নান করছে, সাঁতার কাটছে। কাচের মতো স্বচ্ছ জলের আবরণ ভেদ করে তাদের উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ, তাদের হাত-পা নাড়ার ত্বরিত গতি, জলেভেজা মুখের ওপর ভেজাচুল এসে পড়েছে। অপূর্ব লাগছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, রূপকথার কোনো সরোবরে জলপরীরা খেলা করছে, স্নান করছে।

ক্রমে বেলা পড়ে এল। পাহাড়ি গ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। বেলাশেষে আমরা 'আচ্ছাবল'-এ এসে পৌঁছলাম। এটি একটি সুসজ্জিত উদ্যান। ওখান থেকে 'কোকোরনাগ'। এটি একটি ঝরনাধারাকে কেন্দ্র করে সুন্দর বাগান। তারপর 'ভেরিনাগ'। অন্যান্য উদ্যানের মতোই এখানে ঝরনার সঞ্চিত জলে প্রচুর মাছ রয়েছে।

পরদিন গিয়েছিলাম শোনমার্গে। এবার আমাদের পথের পরিবর্তন হয়েছে। শহরের মধ্য দিয়ে রাস্তা। উচ্চতায় 'শোনমার্গ' গুলমার্গের চেয়েও বেশি। গিরিপথ কখনও অরণ্যময়, কখনো উষর খাড়াই অরণ্যহীন। কোনো সময় গাড়ি উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায়, কখনো বা হড়হড় করে কোথায় নেমে যাচ্ছে। এবার আমাদের সারাপথের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সিন্ধুনালা। তার অপরপার্শ্বে তুষারমৌলি গিরিশ্রেণি। সমস্ত পথটাই এরা আমাদের হাতছানি দিতে দিতে নিয়ে চলেছে। এ পথে মিলিটারিদের আনাগোনা বেশি। এই পথেই 'লাদাক' ও 'লে' যেতে হয় এবং এই রাস্তা দিয়েই 'বালতাল' হয়ে অমরনাথ যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ আছে।

কিছুদূর এসে দেখি সারি সারি এদেশি মানুষ পথের ওপর দিয়ে জিনিসপত্র গরু-ভেড়া নিয়ে হেঁটে চলেছে। কেউ বা ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে হাঁটছে। বেশির ভাগ নিজেরাই বহন করছে। এদের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আছে। সংসার গুটিয়ে নিয়ে এরা কোথায় চলেছে? জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ওরা যাযাবর। বাস উঠিয়ে ওরা চলেছে 'লাদাক'— জীবিকার অন্বেষণে। ওদের গতি মন্থর, উদ্বেগশূন্য। আমাদের কাছে ওদের জীবন অনাস্বাদিত।

হঠাৎ একটা পথের বাঁক ঘুরতেই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নদীর ওপারের সমস্ত পাহাড়টার গা বেয়ে হিমবাহ নেমে এসেছে। আরও একটু এগিয়ে দেখি সিন্ধুনালা সফেন কলগর্জনে বিরাট বিস্তৃত হয়ে ছুটে চলেছে। সে সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। বেলা চারটে নাগাদ আমরা ফেরার পথ ধরেছিলাম। পথে পেয়েছিলাম তুলামুল্লা গ্রাম। এই গ্রামেই ক্ষীরভবানীর মন্দির। আমরা জুতো খুলে প্রবেশ করলাম। কুণ্ডের মধ্যে ক্ষীরভবানীর মন্দির। কুণ্ডে দুধ ঢেলে পুজো দেওয়া হল। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন। সে কথা পড়েছি। কাশ্মীরের মোটামুটি সব দেখে পরদিন 'শ্রীনগর' থেকে কাটরার বাসে আমরা যাত্রা করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল গুহামাতা বৈষ্ণোদেবীর দর্শন।

কাটরায় আমরা সরকারি রেস্ট হাউসে উঠেছিলাম। ওখানে একদল বাঙালি যাত্রী রাত্রেই বৈষ্ণোদেবী দর্শনে যাত্রা করেছেন। সেই শুনে প্রীতি ও আমার তর সইল না, বড়ঠাকুরপোকে রাত্রে যাওয়ার জন্য রাজি করানো হল। প্রথমে বড়ঠাকুরপো রাত্রে যেতে রাজি হচ্ছিল না। কারণ সেদিন বিকেলে মাত্র আমরা শ্রীনগর থেকে কাটরা বাসে করে এসেছি। তাই রাত্রিটায় রেস্ট নেওয়ার ইচ্ছা ছিল।

যাই হোক, ওখান থেকে বৈষ্ণোদেবীর টিকিট কেনা হল। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। প্রথমত কিছু খেতে হবে, তারপর লাঠিসংগ্রহ, পুজোর জিনিস কেনা আছে। রাস্তায় বেরিয়ে বড়ঠাকুরপো বললে, 'বৌদি, এদিকটা একবার দেখুন।' সেদিকে তাকিয়ে দেখি সামনে পাহাড় মন্দিরের চূড়ার মতো উঠে গেছে, তারই গায়ে গায়ে অসংখ্য প্রদীপমালার মতো আলো জ্বলছে। বড়ঠাকুরপো বললে, 'ওই বৈষ্ণোদেবীর পাহাড়। আলোগুলো রাস্তার আলো।'

দূর থেকে মনে হচ্ছে কে যেন বিরাট ঝাড়প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্বদেবতার আরতি করছে। অন্ধকার রাত্রি। মাথার ওপর বিরাট বিস্তৃত মেঘমুক্ত অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ। আমরা স্বল্পপরিচিত একটি ছোট্ট শহরে দাঁড়িয়ে আছি। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা কত ক্ষুদ্র, তবুও তাঁর এই সৃষ্টি দেখছি, উপভোগ করছি। সুখ-দুঃখের বিচিত্র অনুভূতির দোলা অনুভব করছি। তাঁরই কৃপায়, করুণায় আমরা

আপ্লুত। তখন মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যেন তাঁর সৃষ্টির অমৃতভাণ্ড হতে এককণা অমৃত পান করে ধন্য হতে পারি। আমার দৃষ্টি যেন তাঁরই মাধুর্য অবলোকন করে, আমার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন তাঁরই নাম তাঁরই মহিমা শ্রুত হয়, আমার কণ্ঠে যেন তাঁরই সংগীত ঝংকৃত হয়ে ওঠে। আমার ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় যেন তৃপ্ত হয় তাঁরই অঙ্গ সৌরভে, আমার জিহ্বায় যেন তাঁরই গুণগান ধ্বনিত হয়, আমার হৃদয়ে যেন তাঁরই মূর্তি প্রতিভাত হয়।

মনে মনে তাঁরই নাম স্মরণ করে আমরা এগিয়ে চলি। মেলা খাবারের দোকান। আমরা একটি দোকানে খেয়ে, লাঠি ও পুজো দেওয়ার জিনিসপত্র কিনে আস্তানায় ফিরি।

রাত্রি দশটায় আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। বাজারের মধ্যে দিয়ে আলোকিত পথ। প্রথমে একটা ব্রিজ পার হয়ে বাণগঙ্গায় পৌঁছলাম। বৈষ্ণোদেবীকে নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। বাণগঙ্গা থেকেই শুরু হল চড়াই এবং এখান থেকেই পথ দুভাগ হয়ে গেছে, একটি সিঁড়িপথ আর একটি ঘোড়ায় চলার পথ। প্রথম দিকে রাস্তায় আলো ছিল, কিন্তু যতই উপরে উঠছি দেখি আলো নিভে গেছে। ক্লান্ত শরীর। অন্ধকার রাত্রি। লাঠি ঠকঠক করতে করতে চলেছি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর 'চরণপাদুকা'য় পৌঁছলাম। ওখান থেকে 'আধকুমারী' জায়গাটি বড়। আলো রয়েছে। খাবারের দোকান। ওখানে জিলিপি খেয়েছিলাম।

আবার হাঁটা। চড়াই শুধু চড়াই। কখনও সিঁড়ি দিয়ে কখনও বা ঘোড়ায়-চলা পথের উপর দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা এত খারাপ, বলার নয়। শুধু চড়াই। একটু গিয়েই হাঁপিয়ে পড়ছি। স্মরণ করছি বৈষ্ণোদেবীকে, 'জয় মাতাজি, দর্শন দিয়ো।' এত কষ্টের মধ্যেও রাত্রের পর্বতারোহণে একটা চমক লাগছিল। চারদিক তরল অন্ধকারে আবৃত। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমতল ক্ষেত্রকে যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমি তো তাঁকে দেখিনি। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ ক্ষণিকের জন্যে একটা প্রসন্নতার অনুভূতি উপলব্ধি করি। তাকেই আমি ঈশ্বরের করুণা বলে মনে করি।

আস্তে আস্তে রাত্রির ঘন স্তব্ধতা কেটে আসতে লাগল। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে নিয়ে এল আসন্ন প্রভাতের বার্তা। আকাশের বুকে নক্ষত্রের দীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন উদ্যম ফিরে এল। সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি। এত খাড়া আর লম্বা সিঁড়ি ভারতবর্ষের আর কোনো তীর্থে আছে কি না জানি না। সাবিত্রী গেছি, সেখানেও সিঁড়ি ভেঙেছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক সিঁড়িপথ কোথাও পাইনি। এখন ভাবলে ভয় লাগে।

হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছলাম বৈষ্ণোদেবীর স্থানে। গ্রুপ নাম্বার দেখিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। বহুক্ষণ চলে গেল। পথশ্রম ও রাত্রি-জাগরণে আমরা ক্লান্ত, তবুও দাঁড়িয়ে আছি। অবশেষে দোতলায় পৌঁছলাম। সেখানেও বহু যাত্রী। সামনে একটু খোলা ছাদ। তার সামনেই গুহামুখ। ওখান থেকে দল করে ভিতরে যাত্রী পাঠানো হচ্ছে। মুখের কাছে দুজন বসে আছেন। তাঁদের হাতে পুজোর জিনিস দিয়ে আমরা সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। ঘাড় হেঁট করে হাঁটুদুটো বুকের কাছে নিয়ে পিছল পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো পথ বেয়ে একপা একপা করে এগিয়ে চলেছি। পায়ের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত হিমশীতল জলের একটা প্রবাহ কোথা থেকে আসছে। এর নাম 'চরণগঙ্গা'।

প্রথম দিকে গুহা অন্ধকার ছিল। পরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল। আলো এলেও বাতাস নেই। যাত্রীরা সব ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছি। আর মায়ের জয়ধ্বনি দিচ্ছি। অনেকে ছোট বাচ্চাদের সেই জলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। গুহার শেষে কয়েকটা সিঁড়ি। তার উপর আর একটা গুহা। সেখানে মাথা নিচু করে ঢুকলাম। দুজন পুরোহিত বসে আছেন। উজ্জ্বল আলোয় মা বৈষ্ণোদেবীর মূর্তি। তাঁর দুপাশে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মূর্তি দেখলাম। তাঁদের প্রণাম করলাম। পাশেই বেরোবার রাস্তা রয়েছে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা। একটুকরো লাল চেলি, খই, এলাচদানা আর একটা পাঁচ নয়া পয়সা, এই চেলির কাপড়ে বেঁধে দিয়ে পুরোহিত বললেন, 'এটি বাক্সে রেখে দেবেন।'

বাইরে বহু খাবারের দোকান, একটা দোকানে খেয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সেদিন রাত কাটল কাটরায়। পরদিন ন'টার বাসে রওনা হয়েছিলাম অমৃতসর শহরের উদ্দেশে।

বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা বাসে বসে ঘুরছি, মন্দ লাগছিল না। কত দেশদেশান্তরের ওপর দিয়ে চলেছি। পথে পড়ল 'ধারিয়াল', 'গুরুদাসপুর', 'পাঠানকোট' এইসব। বিকেলে অমৃতসর শহরে পৌঁছলাম। কাছেই 'রাজ' হোটেল। ওখানে ওঠা হয়েছিল। রাত্রেই 'স্বর্ণমন্দির' দেখতে গিয়েছিলাম। বিরাট বড় শহর। মন্দিরও বিরাট। প্রবেশদ্বারে মোটা এবং বড় তারের পাপোশ পাতা। তার নীচ দিয়ে জল যাচ্ছে। পা দিলেই পা ধুয়ে যাচ্ছে। আমরা জুতো খুলে ঢুকলাম। ঢুকতেই কানে এল একটি মিষ্টি ভজনের সুর।

সমস্ত চত্বর মোজেক করা। স্বর্ণমন্দির শ্বেতপাথরের। তার মাথা, গা, সোনা না কী জানি না. তা দিয়ে মোড়া। সমস্ত পথ গালিচা পাতা। স্বর্ণমন্দিরের দুপাশে জল।

আমরা রেলিং-ঘেরা রাস্তা দিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢুকলাম। দেখি উঁচুমতো বেদি। সেটি সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। সামনের দিকে গদির উপরে গালচে পাতা। তার ওপর বসে কয়েকজন। শিখগুরু বোধ হয় কী সব পাঠ করছেন। ওপরে, মধ্যিখানে ও চারপাশে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে।

ওপরের অলিন্দপথে বহু যাত্রীকে দেখা গেল। আমরা প্রণাম করে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছিলাম। দেখতে খুবই সুন্দর। বেরিয়ে আসছি, দেখি দরজার পাশে একজন একটি টুলের ওপর মস্ত বড় একটা কানাউঁচু থালায় গরম সুস্বাদু হালুয়া প্রসাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে যাঁরা বেরিয়ে আসছেন সবার হাতে তার থেকে একটু একটু দিচ্ছেন। আমরাও পেলাম। সবসময় মাইকে ভজনগান বাজানো হচ্ছে। শুনতে ভারী ভালো লাগল।

পরদিন সকালে দিবালোকেও একবার স্বর্ণমন্দির দেখলাম। তারপর ওখান থেকে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ফটক লাগানো। মধ্যে সুন্দর বাগান। খানিকটা জায়গা লোহার শিকল দিয়ে গোল করে ঘেরা। ওই জায়গায় ইংরেজরা ভারতীয়দের বীভৎসভাবে হত্যা করেছিল। আমরা ওখানে একটু বসলাম। মনের মধ্যে কত কথাই উঠছিল। যাই হোক, ওইদিন রাত্রে আমরা সিমলা যাত্রা করি।

সন্ধ্যা ছ'টায় বাস ধরেছি। রাত বাড়ছে, ঘুম আসছে, তবুও যখনই বড় বড় জায়গায় বাস থামছে, আমরা নেমে একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি। এইভাবে লুধিয়ানা, জলন্ধর, চণ্ডীগড় ইত্যাদির ওপর দিয়ে বাস চলছে। ঠিক কাকভোরে সিমলায় পৌঁছেছিলাম। কুলির মাথায় মালপত্র দিয়ে বড়ঠাকুরপো আগে আগে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কালীবাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

প্রীতি আর আমি আস্তে আস্তে চলেছি। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। দেখি পথের ধারে একটি ছোট চায়ের দোকানে একজন উনুনে হাওয়া দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চা হবে?' ওরা চা করছিল। চা খেয়ে একটু শক্তি হল।

কালীবাড়িতেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। মায়ের মূর্তিটি খুবই সুন্দর। মন্দিরের সামনে খোলা ছাদ। সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দিগন্তরেখায় পর্বতশ্রেণি। সেদিন মন্দিরে সিন্নি ছিল, প্রসাদ পেলাম। রাত্রে দেখেছিলাম সুন্দর আরতি। তার পরদিন ম্যাল ইত্যাদি দেখা হল। এবার আমাদের ফেরার পালা। কালীবাড়ি থেকে একটু নেমেই স্টেশন। প্রচণ্ড ভিড়। আমরা কালকা যাচ্ছি। ওখান থেকে কালকা মেল ধরে হাওড়া।

২০

আবার শুরু হল 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।' দীর্ঘদিন ধরে বৌমা (সন্ধ্যা) অন্নপূর্ণার মতো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসছে। ভার তো কম নয়! বেচারি নীরবেই তা বহন করে আসছে। এ জন্মে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সবার কাছ থেকে ভালোবাসার দান গ্রহণ করে ঋণী হয়ে রইলাম। শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করা ছাড়া আর কোনো সাধ্য আমার নেই।

মার কথা মনে পড়ছে। মা হলেন আমার ছোটো মামিশাশুড়ি। ওঁকে আমি মা বলে ডাকতাম। শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। মামা নেই, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। একদিন বিকেলে মা বেড়াতে এলেন। আমি স্কুল থেকে এসে দেখি মেজদি, মা, বৌমারা গল্প করছেন। একটু পরে মা বললেন, 'চলো বৌমা, কালীমন্দির ঘুরে আসি।'

মাকে নিয়ে কালীমন্দির গেলাম। ফেরার সময় মার হাতটা ধরে নিয়ে আসছি, মা বললেন, 'বৌমা, আজ যাই।' শুনে কেমন মন কেমন করে উঠল। মার হাত ধরে যখন আনছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল মা কত রোগা হয়ে গেছেন, কেমন একটা অসহায় ভাব। মনে বড় মায়া হল। যেন ছোট্ট মেয়ে। আমার মাকেও শেষের দিকে মনে হত মা যেন কত ছোট হয়ে গেছেন। মেজদিও তাই। বার্ধক্য মানুষকে বড় অসহায় করে দেয়। মেজদাকে দেখেও কষ্ট হয়, মায়া হয়। রোগজীর্ণ অশক্ত শরীর। কানে শুনতে পান না। সারাদিন একা, বড় একা। জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী।

এইভাবে পায়ে পায়ে দিন এগিয়ে চলে। বেলঘরিয়ায় আমার বোন থাকুর বাড়ি যাই। ওর ছেলে বাবুল, পিঙ্কু। কখনও বা মেয়ে-বৌদের নিয়ে আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর ঘুরে আসি। স্ত্রীলোক, তাই যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর কিছুটা অসুবিধা আছে। তা না হলে মন শুধু ছুটছে স্থান হতে স্থানান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে।

একদিন ভাটপাড়া রায় স্টুডিয়োর কাছ থেকে বাসে উঠে বসলাম সেজদির বাড়ি ব্যারাকপুর মণিরামপুরে যাব বলে। দুপুরবেলা। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। সবাই চলেছে তারকেশ্বর। আমি মিস্ত্রিঘাটে নামলাম। দেখি সবাই মিস্ত্রিঘাটে নামল। এরা মিস্ত্রিঘাটে খেয়া পার হয়ে নিমাইতীর্থের ঘাটে উঠবে এবং সেখান থেকে হাঁটা শুরু করবে— তারকেশ্বরের উদ্দেশে।

আমি সেজদির বাড়ি গিয়ে দেখি রনু রয়েছে। আমাকে দেখে সেজদির মেয়ে ঝুনু বুতু এবং ছেলেরা, বাবু বাচ্চু, বলল, 'মাসিমা, আজ আমরা হেঁটে তারকেশ্বর

যাচ্ছি। আপনি যাবেন বলেছিলেন। চলুন আমাদের সঙ্গে।' আমি চুপ করে আছি কারণ যাব বলে তৈরি হয়ে তো আসিনি। যদিও যেতে খুবই ইচ্ছা করছে। সেজদি বলল, 'কী অত ভাবছিস? চলে যা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নতুন কাপড় গামছা জোগাড় হয়ে গেল। 'জয় বাবা তারকনাথ' বলে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। মণিরামপুরের তিন পয়সার খেয়াঘাট থেকে নিমাইতীর্থের ঘাটে নামব। ভরা গঙ্গা। অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেছে। আমাদের নৌকো নিমাইতীর্থের ঘাটে এসে ভিড়ল। লোকে লোকারণ্য। ঘাটের উপর জলের ভাঁড়, কলসি, বাঁক, ফুল সবকিছু বিক্রি হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত। আমরা নতুন কাপড় পরেই ছিলাম। কেবল একটা করে ছোট কলসি কিনে নিয়ে জলে নামলাম। একডুবে কলসি ভরে নিয়ে উঠতে হবে। তাই করা হল। ঘাটে উঠে কলসির মুখে খুরি দিয়ে তার উপর মাটি লেপে দিলাম।

বাঁধানো ঘাট, ঘাটের উপর বড় বড় আলো জ্বলছে। দুধারে দোকান। ফল, ফুল, মালা ইত্যাদি অজস্র বিক্রি হচ্ছে। এত ফুলের দোকান আমি কখনও দেখিনি। তেমনি ফুলের গন্ধ আর তার সঙ্গে ধূপ-ধুনোর গন্ধ মিলে সে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যে এসেছি। এখানে মনের মালিন্য নেই, হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, প্রতিযোগিতা নেই, অনুতাপ নেই। নেই আশা-নিরাশার দোলা। শোক-দুঃখ এখানে অর্ঘ্যরূপে দেবতার পায়ে নিবেদিত। আনন্দ এখানে ক্লান্তি আনে না, স্নিগ্ধ পবিত্রতায় ভরিয়ে দেয়। সবাইকে ভালো লাগে।

যে যার চেনা পরিচিত আপনজন নিয়ে এক-একটা দল করেছে। সকলেই হাসিখুশি। ছেলেদের নতুন গেঞ্জি, প্যান্টের ওপর কোমরে নতুন গামছা বাঁধা। মেয়েদের কোমরে কাপড় জড়ানো। কাঁকালে কলসি। ছেলেদের কাঁধে বাঁক। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই চলেছে। আমরাও চলেছি। আমাদের সামনে দিয়ে দলে দলে কত দল চলে গেল। উৎসাহ উদ্দীপনার দ্রুত ছন্দ তাদের পায়ে। ওদের কাঁধে ফুলে-সাজানো বাঁক। বাঁকের দু-দিকে জলপূর্ণ মাটিলেপা ঘটের মুখে গোল করে ঘিরে ধূপ জ্বলছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন জোনাকির মণ্ডল।

সোজা প্রশস্ত রাস্তা। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শহর ছাড়িয়ে জনহীন প্রান্তরের বুকে পড়লাম। খুব আনন্দ হচ্ছে। ভাটপাড়া থেকে এমনই বা কী দূরে এসেছি, অথচ মনটা কেমন পালটে যাচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনের কোনো গ্লানি নেই। একটা মুক্তির স্বাদ মন ভরিয়ে দিচ্ছে। পথের ধারে কখনও জনবিরল প্রান্তর, কখনও বা ছোট ছোট গ্রাম। দু-একটা গ্রামের কাছাকাছি কয়েকটা করে দোকান ও কিছু লোকজন। অবশ্য সেটা প্রথম রাত্রের দিকে। দূরে দূরে জ্যোৎস্নাস্নাত তালগাছের সারি দেখা যাচ্ছে।

পথ কখনও জনবিরল হয়নি। কোথাও একটুকুও ভয়ের লেশ নেই। সবার এক উদ্দেশ্য— পথের শেষে দেবদর্শন। সবার মুখে যেতে যেতে একই তালে একই সুরে শোনা যাচ্ছে, 'ভোলে বাবা পার করেগা', 'ত্রিশূলধারী পার করেগা' ইত্যাদি।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। রাত্রিও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির মধ্যে কেমন একটা স্তব্ধতা। গ্রামের কাছাকাছি এলে কুকুরগুলো চিৎকার করে উঠছে। মানুষের চলার বিরাম নেই। অনেকের চলার গতি মন্থর হয়ে এসেছে। কেউ বা ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়েছে। কারও বা ভাঁড় ভেঙে গেছে। ছোটরা কিন্তু তরতর করে হেঁটে যাচ্ছে। কয়েকটা রেলগেট পার হলাম। মাঝে মাঝে কয়েকখানা চটি পড়ল। যেমন 'নন্দনচটি', 'কাশী বিশ্বনাথ'। আমরা 'মাড়োয়ারি চটি'তে একটু বিশ্রাম করেছিলাম। চটিগুলিতে আলোর ব্যবস্থা, খাবারের দোকান, জলের কল— সব ব্যবস্থা ছিল। যেতে যেতে এক জায়গায় দূর থেকে দেখলাম বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল করে জ্বলছে। শুনলাম কীসের যেন ফ্যাক্টরি। পথের মাঝে এক জায়গায় দেখলাম ইংরেজ আমলের তৈরি বেশ উঁচু পাকা গাঁথুনির মস্ত বড় গম্বুজ।

চলতে চলতে পথ শেষ করছি। আমাদের সঙ্গে আকাশের চাঁদও এগিয়ে চলেছে। রাত্রি গভীর হচ্ছে। জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতাও বাড়ছে। আমি ইচ্ছা করে ওদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছি। রনু, বাবু, বুতু, ওরা ছেলেমানুষ, বেশ হেঁটে চলেছে। কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি বুড়োমানুষ, একটু একটু কষ্ট হচ্ছিল। যাই হোক, ভালো লাগছে। দূরে একখানা জ্যোৎস্নাধোয়া গ্রাম দেখা যাচ্ছে। বিরাট বিস্তৃত নীল আকাশের নীচে কেবলমাত্র আমি একা, কেউ কোথাও নেই। আমার ঘর নেই, পরিচয় নেই। আমি যেন একটি অচেনা গ্রহচ্যুত প্রাণী। কিছুক্ষণ পরে দেখি বুতু, রনু, বাবু, তিনজনে চিৎকার করে আমায় ডাকছে। ওরা ভয় পেয়ে ভেবেছে আমি বোধহয় হাঁটতে পারছি না। উত্তর দিলাম। তখন থামল।

ডাকাতে কালীর কাছে যখন পৌঁছলাম তখন বোধহয় মধ্যরাত্রি। বিরাট কালীমূর্তি। কথিত আছে, এটি নাকি ডাকাতদের প্রতিষ্ঠিত। প্রচুর যাত্রী। সকলেই বিশ্রাম করছে। কেউ বা খেয়ে নিচ্ছে। একদিকে প্রচুর ডাবের খোলা জমা হয়ে স্তূপাকার হয়ে আছে। দেখলাম চায়ের দোকান আছে বটে, কিন্তু চা-বিস্কুট নিঃশেষিত। আমরা চা কিনতে গিয়ে শূন্যহাতে ফিরে এলাম। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে পারছে না।

কালীমন্দিরের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাউনি। সেখানে বসে যাত্রীরা যে যার পুঁটুলি খুলে খাবার বার করে খাচ্ছে। কথা বলছে। একদল ঝগড়া বাধিয়ে

দিয়েছে। একটি বৌ হাপুস নয়নে কাঁদছে। তার মেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। আমি বললাম, 'কেঁদো না, তোমার মেয়ে এখুনি এসে পড়বে। বাবার কাছে যাচ্ছ, পথে কোনো বিপদই হবে না।'

কাশী, গয়া, বৃন্দাবন গিয়েছি। কেদারনাথ, বদরিনাথ, দ্বারকানাথ, সোমনাথ ইত্যাদি দর্শন করেছি, কিন্তু কোথাও কোমল জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এমন অভিযান করিনি। এটা অভিযান না অভিসার? কোথাও দেখিনি এত দীর্ঘপথ ধরে যাত্রীদের দেবদর্শন যাত্রার এত আনন্দ, এত প্রাণপ্রাচুর্য, এত ফুলের সমারোহ। শুনেছি বৃন্দাবনে গোপিনীরা ফুলসাজে সজ্জিত হয়ে বীথিপথ বেয়ে কৃষ্ণাভিসারে গমন করতেন। ভগবানের জন্য ভক্তের এই অভিসার অনন্তকালের। আমরাও চলেছি, জানি না আমাদের ভক্তি কতটুকু, পথের শেষে প্রিয়মিলন হবে কি না।

যেতে যেতে পথের পাশে একটা সাঁকোর ওপর দেখি একটি ছোট ছেলে বাঁক নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবলাম ডেকে দিই। কিন্তু এত অকাতরে ঘুমোচ্ছে, মায়া হল, ডাকলাম না। আপনিই ঘুম ভাঙলে উঠে হাঁটা দেবে।

সামনে একটা আমবাগান পড়ল। তার পাশ দিয়ে অন্ধকার রাস্তা। একটু ভয় ভয় করতে লাগল। দ্রুত হেঁটে রাস্তাটুকু পার হলাম। এবার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ছি। দু-একটা মালবোঝাই লরি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। গরুর গাড়ি কখনো ক্যাঁচক্যাঁচ করতে করতে চলেছে। মাঝেমাঝে রিকশার প্যাঁকপ্যাঁক আওয়াজে চমকে উঠছি। খালি রিকশাও দেখা যাচ্ছে। যারা আর হাঁটতে পারছে না, তারা রিকশা ধরে নিচ্ছে।

যেতে যেতে একটি ছোট পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল। পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, ঠাকুরদা। এঁরা গ্রামের লোক। প্রতি বছর হেঁটে তারকেশ্বর যান। শ্বশুর চোখে ভালো দেখতে পান না। নাতির হাত ধরে যাচ্ছেন। গাড়ি এলে পুত্র ও পুত্রবধূ বারবার ওঁদের সাবধান করছেন। দেখে ভারী ভালো লাগল। এই তো আমাদের ভারতবর্ষের চিরন্তন ছবি।

ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। চাঁদও পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। জ্যোৎস্না হয়ে এসেছে ম্লান। সবাই ক্লান্ত। তবুও সবার মুখে 'ভোলে বাবা পার করেগা।' একজন জিজ্ঞেস করল, 'আর কতদূর?' অপরজন বলল, 'এই তো এসে গেছি।' লোকনাথের মন্দির দেখা যাচ্ছে। আমরা লোকনাথকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলেছি।

প্রভাতী বাতাস বইতে শুরু করেছে। পাখিদের প্রভাতী বন্দনা শুনতে পাচ্ছি। কোন গাছের পাতার আড়াল থেকে কোকিলের কুহুতান ভেসে আসছে। দূর থেকে তারকেশ্বরের মন্দিরচূড়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস

পড়ল। তা হলে এসেছি? তবু আরও একটু হাঁটতে হচ্ছে! পথশ্রম, রাত্রিজাগরণে পা যেন আর চলছে না।

সূর্য উঠল। আমরা এসে পৌঁছলাম মন্দিরদ্বারে। ছোট মন্দির। অগণিত মানুষ। বাবার মাথায় জল দেওয়া হল। এইটুকুর জন্যে মানুষ এত পথক্লেশ বরণ করে নিচ্ছে। তার বিনিময়ে পাচ্ছে আনন্দ, তৃপ্তি, সান্ত্বনা ও আশ্রয়।

আমার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। হল পথের অভিজ্ঞতা। অনেক দেখলাম, অনেক জানলাম। ঈশ্বর কেমন জানি না। তবে পথ-চলার যে আনন্দ তার তুলনা নেই। চলার পথে যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন। তৃপ্তির আবেশটুকু নিয়ে ফিরে এলাম মেজদির বাড়ি। জীবনের বেশি সময়টুকু কাটল এখানে। চিরঋণী হয়ে রইলাম মেজদিদের সবার কাছে।

২১

জীবনসায়াহ্নে স্মৃতি রোমন্থন করতে বসেছি। কোনো স্মৃতি আনন্দদায়ক, কোনোটা-বা বেদনাজড়িত। কিন্তু সকল স্মৃতির মাঝেই আমার স্বামীর কালো ফ্রেমের চশমা-পরা হাসিমুখটাই আমাকে হাতছানি দেয়।

মনে পড়ে গুলুকাকার কথা। ইনি মেজদির সম্পর্কিত শ্বশুর। খুব স্নেহ করতেন। ছোটখাটো মানুষটি। পরনে খাটো কাপড়, কখনো গায়ে জামা দিতেন। দারুণ বুদ্ধিমান, তেমনি সামাজিক ও রসিক। ভাটপাড়ার ইতিহাস ওঁর কণ্ঠস্থ। ওঁর কাছে বসে কত গল্পই শুনেছি।

বোঁচাদার কাছ থেকেও অপার স্নেহ পেয়েছি। আমার মেজদাদাবাবুর ছোটভাই বোঁচাদা। সন্ন্যাসী ছিলেন। পাশেই ওঁর আশ্রম ছিল। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি ওই আশ্রমে কুস্তির আখড়া ছিল। বহু ছেলে কুস্তি শিখতে আসতেন। এটি শরীরচর্চার একটা নামকরা জায়গা ছিল। বোঁচাদা অপূর্ব গান করতেন। মেজদাদাবাবুও ভালো গান করতেন। অর্গ্যান, পিয়ানো, এসরাজ এসবই ছিল মেজদাদাবাবুর শখ। বোঁচাদার আশ্রমে পুজো হত। আয়োজন ছিল প্রচুর। যাঁরা আসতেন তাঁরাই প্রসাদ গ্রহণ করে যেতেন। বোঁচাদা মানুষকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন। উনি রামকৃষ্ণ মিশনের মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষিত ছিলেন।

অনেকের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'। যা হারিয়েছি তার অভাব অহরহ বেদনা দিত। মনে পড়ে কতদিন বিকেলে বকুলতলার ঘাটে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম, মনে হত এমনি বিকেলে উনি চা

খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। চোখের সামনে ভেসে উঠত ওঁর হাসিভরা মুখ। চোখের জল বাঁধ মানত না। মন ছটফট করে উঠত। ওঁর এভাবে মৃত্যু আমি কোনোমতেই মেনে নিতে পারছি না। উনি যদি সময়ে এবং রোগে যেতেন, জানতাম অবধারিত মৃত্যু, সে সময় হলেই আসবে। তাতে কষ্ট হত, তীব্রভাবে ওঁর অভাব অনুভব করতাম, তবুও ভাববার চেষ্টা করতাম, ডাক্তার দেখিয়েছি, কিন্তু নিয়তিকে এড়ানো যায় না। কিন্তু এতে যে আমি তিলতিল করে দগ্ধ হচ্ছি।

স্কুলে যাই আসি, বাপের বাড়ি যাই, রনু-বলরাম-জগন্নাথ-দীপু ওদের সঙ্গে দেখা হয়। প্রায়ই মামাশ্বশুরবাড়ি যাই। কোনোদিন বা দিদি-বাবলু-বৌমাদের কাছে।

এই করতে করতে এগিয়ে এল চাকরিজীবনের অবসরের দিন। স্কুলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হল। মনে পড়ে কত গ্রীষ্মের দুপুরে গলদঘর্ম হয়ে ক্লাস করেছি। যখন বর্ষা নামত, বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে স্কুলে যেতাম, উমাদি হেডমিসট্রেস, বর্ষার জন্য নিজের কয়েকটা কাপড় স্কুলে রেখে দিতেন, তার একটা পরে ক্লাস করেছি। অদ্ভুত ভালো লাগত, ঝমঝমে বৃষ্টিতে গাছপালা নুয়ে পড়েছে, পাশের পুকুর ছাপিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডে জল ঢুকে প্রায় পুকুর হয়ে গেছে। প্রতি বছর এমনি হত। কত মাছ ভেসে আসত। একবার মিহির আর অমূল্য মস্ত বড় একটা মাগুর মাছ ধরেছিল।

ক্লাসঘরে বসে ক্লাস নিতে নিতে জানালাহীন ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে বাইরের ঝরাবর্ষণ দেখতাম, কানে আসত বৃষ্টির নূপুরধ্বনি। বৃষ্টিতে ছাত্রীসংখ্যা কম হত, কোনোদিন বা হয়ে যেত রেনিডে। আশ্বিন এলে আকাশে বাতাসে আগমনির সুর, পীতাভ রৌদ্র ছড়িয়ে পড়ত দিকবিদিকে, কাশের বনে হাওয়ার কাঁপন। ক্লাস পুরোদমে চলত, তার মধ্যে শুরু হয়ে যেত ছাত্রীদের পুজোর জামাকাপড় কেনার গল্প। ইদানীংকালে তো স্কুলে অনেকই কাপড় নিয়ে আসতেন দিদিমণিদের কাছে বিক্রি করতে। শীতের সময় উত্তুরে হাওয়ায় কিন্তু হাড় কাঁপিয়ে দিত। তখন ক্লাস শেষ হলেই বাইরের রৌদ্রে এসে দাঁড়াতাম। অফ পিরিয়ডে হাতে থাকত উল-কাঁটা। তখন সব দিদিমণিদের হাতেই থাকত উলবোনা। ছাত্রীরাও কম যায় না। তারাও বুনত। প্রায়ই অফিস রুমে বসে উমাদির সঙ্গে সবাই মিলে গল্প করতাম, তর্ক বাদ যেত না। পাতাঝরার পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম, গাছে গাছে নতুন পাতার সমারোহ। ঝরাপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে স্কুলে ঢুকতাম। বেশ লাগত।

জীবনের অনেকগুলো অধ্যায় কাটিয়ে এলাম। যখন পিছন ফিরে দেখি, তখন অবাক হয়ে ভাবি আমি কি সত্যিই এতগুলো দিন ক্লান্তপদে পার হয়ে এসেছি?

সামনের দিকে তাকালে দেখি নিঃসীম অন্ধকার। সবার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে মিলেমিশে জীবনটা কোনোরকম কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু যা হয় না তা হল না। এক এক তরঙ্গাঘাতে সবার কাছ থেকে সরে এসেছি। কখন কোন ছোট্ট আঘাতে, হৃদয়ের কোন সূক্ষ্মতন্ত্রীতে যে আঘাত লাগে তা বুঝিয়ে বলা যায় না। মানুষকে আমি দিইনি কিছুই, কিন্তু আশা করছি, তাও কি হয়! তাই নিজেকে এবার গুটিয়ে নেওয়ার পালা।

এখন মনের মাঝে একটি প্রার্থনাই গুনগুনিয়ে উঠছে—

'দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে।'

বৃদ্ধা আমি দূরাগত দাঁড়ের ধ্বনি যেন শুনতে পাচ্ছি। কানে কানে কে যেন বলছে, 'শেষের সুর যে বাজাবে তার আসার সময় হল।' কিন্তু ভাবলে হতবাক হয়ে যাই, কী অমোঘ মায়ার শক্তি, যতই এগিয়ে যাই না কেন, পিছন থেকে আমার হারানো পাওয়া সবসময় যেন টানছে, সে ভুলতে দেয় না আমার সংসার, আমার স্বামী, তাঁর পালিয়ে যাওয়া।

মনে পড়ে দিদির মুখে শুনেছিলাম, বড়ঠাকুর এবং আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর পাকুড় থেকে কে একজন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ঘাটশিলা থানায় একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত। তাতে লিখেছিলেন, 'বিভূতিভূষণের পরিবার, সাবধান। আরও বিপদ আসছে।' কিন্তু সে চিঠি থানায় পৌঁছয় বড়ঠাকুরের মৃত্যুর আট দিনের দিনে, আমার স্বামীর মৃত্যুর ঠিক পরে। তখন সব শেষ। থানা থেকে এ ব্যাপার নিয়ে কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল কি না জানি না। তখন অন্য কোনোদিকে মন দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। পরে দিদির কাছে এই ঘটনা শুনেছিলাম। তবে এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। কে সেই বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়? তাঁর আমাদের প্রতি অসীম করুণা, তিনি যদি দয়াপরবশ হয়েই আমাদের সাবধান করে দিয়ে থাকেন, তাহলে ওঁরা দু-ভাই বেঁচে থাকতে কেন সাবধান করলেন না? যদি করতেন তা হলে আমাদের পরিবারের ইতিহাস অন্যরকম হত।

২২

প্রায়ই গঙ্গার ধারে গিয়ে বসতাম। মনে হত গঙ্গার স্রোতোধারার মতো আমার জীবনস্রোতও বয়ে চলেছে, শেষে কোন মহাসমুদ্রে গিয়ে মিলিত হবে কে জানে। বদ্ধ জীব আমি, এ জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারছি না। কিছুতেই বোধের মধ্যে আসছে না এ জগত ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র মাত্র। ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে ভেসে উঠল আমাদেব দুজনের জীবনের সেই পুষ্পিত হেমন্ত দিনের কথা। মনে পড়ছে হেমন্তের শিশিরসিক্ত প্রভাতের নির্মলতার মতোই শুরু হয়েছিল আনন্দের জীবন। সেখানে কোনো মালিন্য ছিল না। মাঝেমধ্যে দুজনের ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, কিন্তু সেখানে রাগ-বিদ্বেষের কোনো ঠাঁই ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঠিক হয়ে যেত। এইসব ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যেতাম। খেয়াল থাকত না, একটু একটু করে ঘাট খালি হয়ে আসত। পাড়ার কেউ হয়তো যাওয়ার সময় বলত 'বাড়ি যাবি না, যমুনা?' তখন খেয়াল হত, ফিরতে হবে। উনি নেই, আমার বাড়ি নেই, সন্তান নেই, কেউ নেই। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হত। আজও লিখতে বসে চোখে জল আসছে।

মনে পড়ে আমার বিয়ের কথা। বিয়ের দিন ভোরবেলা মেজদির ডাকে ঘুম ভাঙল, 'ওঠ যমুনা, এবার দধিমঙ্গল হবে।' বিছানা থেকে উঠে দক্ষিণদিকের জানালায় গিয়ে বসলাম। ভালো লাগছে না, সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই সুরটা যেন মনের মধ্যে বড় বাজছে। তখনও রাত্রির রেশ ছুঁয়ে আছে পৃথিবীর গায়ে, ছড়িয়ে আছে শেষরাত্রির জ্যোৎস্না। আবার কে যে ডাকল, তাড়াতাড়ি করে মুখ ধুয়ে দালানে গিয়ে আসনে বসলাম। মা, দিদিরা, জামাইবাবুরা সবাই ঘিরে বসেছে। রেণুদি চা করে সবাইকে দিল। আমি ফলার মুখে দিলাম, শাঁখ বাজল, উলুধ্বনি হল। মন কেমন করছে। মার বিছানার এককোণে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম আর আসছে না। একবার ছোড়দা এসে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়। রাত্রে বাসর জাগতে হবে।'

চুপ করে বিছানায় শুয়েছিলাম। মনে হল সত্যিই আমার বিয়ে হচ্ছে! এই তো সেদিন কালীদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ওদের ছাদে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি দেখছিলাম, গল্প করছিলাম। একসময় কালী আঙুল তুলে পাশের বাড়ি দেখিয়ে বললে, 'যমুনা, ও বাড়ির কাকিমা আমাকে ডেকেছেন, একবার দেখা করে আসব, আমার সঙ্গে একটু যাবি? এক্ষুনি চলে আসব।' আমি বলেছিলাম, 'না রে, মাকে বলা হয়নি তো।' ও বললে, 'না না। জেঠিমা কিছু বলবে না, চল না যাই।' ও বারবার বলাতে ওর সঙ্গে

গিয়েছিলাম। ও কাকিমার সঙ্গে কী কথা বললে, তারপর বললে, 'যাবি যমুনা, ছাদে? এদের ছাদ থেকে খুব ভালো রেলগাড়ি দেখা যায়।'

দুজনে ছাদে উঠেছিলাম। কাকিমাও (পরে আমার ছোট মামিশাশুড়ি) আমাদের সঙ্গে ছাদে গিয়েছিলেন। তারপর বাড়ি এসেছি।

কয়েকদিন পরে কালীর দিদি বোঁচাদি এসে আমার মাকে বললেন, 'জ্যাঠাইমা, বসন্তবাবুর ছোট ভাগ্নে এবার ডাক্তারি পাশ করেছে। বড় ভাগ্নে তো সাহিত্যিক, বিয়ে করবেন না। ছোট ভায়ের বিয়ে দেবেন। আপনারা একবার যমুনার সঙ্গে ছোট ভাগ্নের বিয়ের কথা পাড়ুন না।' মা বললেন, 'ডাক্তার-ছেলে, হবে কি?' বোঁচাদি বললেন, 'ছেলেমেয়ে থাকলেই বিয়ের কথা ওঠে; কথা পেড়েই দেখুন না।' ক'দিন পরে বাবা মামার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মামা বলেছিলেন, 'একদিন গিয়ে মেয়ে দেখে আসব।'

কালী, লীলা ও অন্য বন্ধুরা আসে, খেলি। কালী গল্প করে আর প্রায়ই বলে, 'জানিস যমুনা, তোর সঙ্গে যাঁর বিয়ের কথা হচ্ছে তাঁর বড় ভাই মস্ত বড় সাহিত্যিক। অনেক বই লিখেছেন, 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' কত কী, বড় বড় সভা করেন।'

সাহিত্যিক কখনও দেখিনি, তা ছাড়া ওঁর 'পথের পাঁচালী'ও পড়িনি। মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমমিশ্রিত শ্রদ্ধা হল, তার সঙ্গে ভয়ও করছে। কালী বলত, 'তোর সঙ্গে যার বিয়ের কথা হচ্ছে, সে ডাক্তার। গান জানে, দেখতেও ভালো রে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা পরে। আমি দেখেছি, প্রায়ই আসেন তো!' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোন বাড়িটা রে?' ও বললে, 'ও তুই চিনবি না, অন্যদিকে।'

একদিন ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সিল্কের হাফশার্ট পরে, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা একজনকে। দেখতে ভালো লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। বড় বিছানার একধারে জানালার কাছে আমি শুতাম। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার রাত্রিকে। নারকেল গাছের মাথায় জ্বলজ্বল করছে তারা। আকাশের বুকে যেন আমার স্বপ্নে দেখা সেই মুখখানা। খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলাম। পাশে মা ও বোনেরা ঘুমোচ্ছে। বাবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বড়ঘড়িটার পেন্ডুলামের টিকটিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নৈশ সমীরণে শীতলতার স্পর্শ। গায়ে কাপড়টা টেনে নিয়ে পাশ ফিরলাম। কেমন একটা অপার্থিব পরিবেশ। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নের কথা লজ্জায় কাউকে বলিনি।

একদিন আমার মামাশ্বশুর ও ভাশুর প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে এসেছিলেন। আর একদিন ওঁর ভাই বন্ধু নিয়ে এসেছিলেন। বন্ধুটি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার নাম কী?' আর কিছু নয়। কালীর কাছে ছেলের অনেক গুণবচন শুনেছি তাই কৌতূহলবশে একবার চেয়ে দেখলাম।

একজনের চশমা আছে। আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। মনে আছে, খবর এল—পাত্রের মত আছে।

বাড়িতে একটা আনন্দের ঢেউ এসে লাগল। কাশী দাদামশাই, অক্ষয়দাদামশাই (পাড়ার) শুনে আমার বাবাকে বলেছিলেন, 'ভাগ্নে, নুটু ছেলে খুবই ভালো। বিভূতি নামকরা সাহিত্যিক, অমন ছেলে হয় না। এদের অনেক দিন ধরে তো দেখছি।' এঁরা অনেকেই আমার স্বামী ও ভাশুরকে চিনতেন। কারণ আমার ছোট মামাশ্বশুর প্রথমে মুরাতিপুর থেকে ভাটপাড়ায় এসে আমাদের বাবুপাড়ায় অনাথ চক্রবর্তী মশায়ের বাড়িতে কিছুদিন ভাড়া ছিলেন। তখন ওঁরা দু'ভাই মামার বাড়ি আসা-যাওয়া করতেন, তাই পাড়ায় অনেকের সঙ্গেই এঁদের পরিচয় ছিল। পরে মামা বাড়ি করে চলে আসেন গোপীকৃষ্ণ রোডের বাড়িতে।

বিয়ের কথা এগিয়ে চলেছে। একদিন বোঁচাদি এসে হাসতে হাসতে মাকে বলেছিলেন, 'জ্যেঠিমা, যমুনা জানে না, আপনাদেরও বলিনি। যমুনাকে কিন্তু একদিন কালীর সঙ্গে ওদের বাড়ি পাঠিয়েছিলাম।' কাকিমা, অর্থাৎ আমার মামিশাশুড়ি নাকি বলেছিলেন, 'একদিন মেয়েটিকে দেখাতে পারো?' শুনে সবাই হাসছে। আমাকে খ্যাপাচ্ছে। সেদিন কালীর ওপর খুব রাগ হয়েছিল, আমাকে কিছু না বলে এইসব করা হয়েছে। ওকে বলাতে ও বললে, 'আমি কী করব বল, বড়দি বলেছে তাই—।' রাগটা একটু পড়তে, ভাবতে ভালো লাগছিল, ওই বাড়িতেই তাহলে আমার বিয়ে হচ্ছে।

বাবা বাড়ির স্যাকরা পাঁচুদাকে ডেকে পাঠালেন, গহনা গড়তে গেল, মা কাঁসারি ডেকে বাসন কিনলেন। জামাকাপড় ইত্যাদি কেনা হল নৈহাটি থেকে। মেজজামাইবাবু কলকাতা থেকে বেনারসি আনলেন। তা ছাড়া দিদিদের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন, পাড়ার অনেকের কাছ থেকেই ভালো ভালো শাড়ি পেয়েছিলাম। মন্দ লাগছিল না, পেলে কার না ভালো লাগে। এঁদের দাবিদাওয়া বিশেষ ছিল না, তবু যা দিতে হয় সবকিছু বাবা দিয়েছিলেন।

মনে পড়ল এই তো সেদিন আশীর্বাদ হল, বাবা কেষ্টঠাকুরের কাছে গিয়ে দিন ঠিক করে এলেন। একই দিনে আমাদের আশীর্বাদ হয়েছিল। বাবা, দাদা ও মেজদাদাবাবু বেলা চারটের সময় ছেলে আশীর্বাদ করে এলেন। ওইদিন সন্ধ্যায় হয়েছিল আমার আশীর্বাদ। বাড়িময় আলো জ্বলছে, বাইরের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরজোড়া শতরঞ্চি পাতা, তার ওপর দুখানা আসন মুখোমুখি পাতা রয়েছে, তার মাঝখানে গঙ্গাজলভর্তি কোশাকুশি। একটা রুপোর ডিশে ধান, দূর্বা, চন্দন, ফুল রাখা

হয়েছে। ওঁরা সন্ধ্যার একটু আগে এলেন, তখনও গোধূলির আলো ম্লান হয়ে যায় নি। দিদিরা সবাই এসেছে। বাড়ি ভর্তি। আমাকে পরিয়ে দিয়েছিল ময়ূরকণ্ঠি বেনারসি। আশীর্বাদের সময় মেজদির সঙ্গে গিয়ে আস্তে আস্তে আসনে বসলাম। বাড়ির পুরোহিত তারাপদদা প্রথমে কী সব মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করলেন, তারপর মামা। পরে বড়ঠাকুর এসে আসনে বসে আমাকে একটি সুন্দর পেনডেন্ট দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। ওইদিন বড়ঠাকুর ধুতি পাঞ্জাবি পরেছিলেন। তারপর বাবা আশীর্বাদ করলেন। কিছু খাওয়ার আয়োজন ছিল। কানে এল বড়ঠাকুর যেন কাকে বলছেন, 'আমার একটা মিটিং আছে, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।' সেদিন কী খুশিভরা মন ছিল, আশীর্বাদের পেনডেন্টটা গলায় দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছি, সবাই ডেকে ডেকে দেখছে।

২৩

কত তাড়াতাড়ি দিনগুলো এগিয়ে আসছে। সারা বাড়িতে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, বড় বড় জানালা, পিতলের বালতি-জগ-হাতা ইত্যাদি চৌবাচ্চার কলের কাছে মাজা হচ্ছে। বড় বড় জলের ড্রাম ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হচ্ছে। বিয়ের দিন ভিয়েন হল, দাদারা কত রাত পর্যন্ত জেগে মিষ্টি করেছিল। দুপুর থেকে নাড়ুভাজা শুরু হল। মা হাঁড়ি ভর্তি করে নাড়ু ভেজে নিয়ে যাওয়ার পর মেজবৌদি আর সেজবৌদি দুজনে মিলে নাড়ু ভেজে তুলেছিল।

সন্ধ্যায় জল-সওয়ার পালা। দিদিরা, পাড়ার কাকিমারা বৌদিরা পাড়ার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সবাই সেজেগুজে এসে, হাতে হাতে শ্রী, কুলো, বরণডালা নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে জল সয়ে এল। পিসিমার হাতে ছিল তেলের বালতি আর পেনেটির বড়মার কাছে মিষ্টির বালতি। শাঁখ বাজছে, তার সঙ্গে উলুধ্বনি। বাচ্চাদের বায়না, কান্না, বড়দের হাসি, গল্প, ঠাট্টা সবমিলিয়ে হুলুস্থুল ব্যাপার। আমি দর্শকমাত্র।

আমি ছোট থেকে একটু অন্য প্রকৃতির ছিলাম। যেটা ভালো মনে করতাম সেটা করার চেষ্টা করতাম। মেয়েলি গালগল্পের মধ্যে বিশেষ অংশ নিতাম না। অবশ্য তার একটা কারণ ছিল। আমার সেজদি ও আমি, আড়াই বছরের ছোট-বড় ছিলাম, কিন্তু খেলতাম বেড়াতাম একসঙ্গে। আমাদের জামা হত দুজনের একরকম। মা চুল বেঁধে দিত একরকম। অনেকে ভাবত যমজ। দুজনের ঝগড়াও যত ছিল, ভাবও ছিল তত। ওর বন্ধুরাই ছিল আমার বন্ধু। ওরা আমার চেয়ে একটু বয়সে বড়। অনেক সময় দেখতাম ওরা নিজেরা যেন কীসব কথা বলছে, আমি গেলে হয় থেমে যেত, নয়তো

আমাকে বলত, 'তুমি ছোট এখন, এখান থেকে যাও।' এতে আমার দুঃখ ছিল না, আমি নিজের মনে থাকতাম। রেকর্ড বাজিয়ে গান তোলা আমার নেশা ছিল। বেশ ছিলাম নিজের মনে, সবাই ভালোবাসত।

ঘাটশিলার একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। দিদি (আমার জা), উমা, আমি বাঁধে স্নান করছি, দিদি আমায় সাঁতার শেখাচ্ছে। পারছি না। তাই নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করছি। ধরবাবুর ছেলের বউ স্নান করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'দিদি, আপনি বুঝি খুব আদুরে মেয়ে, না?' আমি হেসে বলেছিলাম, 'কেন বলুন তো?' বললে, 'আপনাকে দেখে তাই মনে হয়।' আমি বলেছিলাম, 'না ভাই, আমি নিজের আদরে নিজেই ভরপুর। আমরা নয় ভাইবোন, আদর সব ভাগ হয়ে গেছে।' শুনে দিদি বললে, 'নাগো। ও আমাদের বাড়ির খুব আদরের ছোট বৌ।' লিখতে লিখতে দিদির কথা বড় মনে পড়ছে।

বিয়ের দিনের সবকিছু যেন চোখের সামনে ভাসছে। আমাদের কার্ড ছাপানো হয়নি। ও বাড়িতে বড়ঠাকুরের নামে কার্ড ছাপানো হয়েছিল। তারিখটা ছিল ২১শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, তিথি ছিল পূর্ণিমা। বাবা আভ্যুতিতে বসেছেন, পিসিমা, মা জোগাড় দিচ্ছে। আমি লালপাড় শাড়ি পরেছি, পরেছি নতুন গয়না। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিয়েছেন। একটু বেলায় আভ্যুতি শেষ হল, গায়ে-হলুদ এল। আমাদের চেনা নাপিত, তার হাতে রুপোর ছোট বাটিতে তেল হলুদ আর কাজললতা। অন্যদের হাতে কাপড়, বাক্স, মিষ্টি, পান-সুপারি ইত্যাদির তত্ত্ব। ঘরের মেঝেতে ওঁরা সাজিয়ে দিলেন। মা, দিদিরা সবাই বারবার বললেন, 'তত্ত্ব খুব ভালো হয়েছে।' সত্যিই ভালো ভালো অনেকগুলো কাপড়, সায়া ব্লাউজ, বিশেষ করে বেনারসিটি ছিল খুব ভালো। ফিকে বেগুনি রং, আর রুপোলি জরির পাড়, আঁচল এবং খোলেও সেইরকমই ফুল! সবাই দেখছে, ভালো বলছে, আমিও দেখলাম। বাঃ বাঃ, অনেকগুলো কাপড়! বেশ ভালোই লেগেছিল।

নতুন শতরঞ্চিতে বসে গায়ে-হলুদ দিলে। কী প্রচণ্ড হুল্লোড় করল দিদি-বৌদিরা। তারপর কলাতলায় স্নান ইত্যাদি সব মনে আছে। নতুন শাড়ি, গহনা পরে ঘুরছি, কোনো কাজ নেই, বাড়ির লোকেরা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। আমি বাবার বিছানায় শুয়ে আছি। আজ আমার বিয়ে, ভাবাই যাচ্ছে না। মনে কোনো অনুভূতি নেই, একটা চিন্তাশূন্য অবস্থা। বাবা একবার এসে ঘুরে গেলেন। বাবা বিশেষ কাজ কিছু করছেন না, কিন্তু খড়ম পায়ে দিয়ে সারা বাড়ি খটখট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছুই ভাবছি না, অথচ ঘুম এল না। একবার বাইরে গিয়ে দেখি হাবির ঘরে মেঝেতে কলার পাতা পেতে বৌদিরা, পাড়ার দুটি মেয়ে পান সাজতে বসেছে। একজন সাজা-পান গুনে

চুপড়ি করে তুলে ভিজে ন্যাকড়া ঢাকা দিচ্ছে। সেখানে বেশ একটা গল্পের আসর বসেছে। আমাকে দেখে একজন বললে, 'দেখ যমুনা, তোর বিয়েতে আমরা কত কাজ করছি।' পাশের ঘরে মেজদি খোকনকে নিয়ে শুয়ে আছে।

কত দিনের কথা। কিন্তু একটুও ভুলিনি। মনের গভীরে ডুব দিয়ে দেখছি সবই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, অগ্রহায়ণের গায়ে ঈষৎ শীতের পরশ। কাজের বাড়ি, লোকজন, আলো, এসবের জন্য অবশ্য শীত ততটা বোঝা যাচ্ছে না। মনে আছে সেজদি আর মেজদির ভাগ্নি মলিনা আমাকে সাজিয়েছিল। জরি ও লালফিতে দিয়ে চুল বেঁধে মুখে কত কিছু মাখিয়ে প্রসাধন সাঙ্গ হল। শেষে বেনারসি পরিয়ে ওরা নিজেরা সাজতে চলে গেল। আর বড় মাসিমা মার ঘরে একটা পিঁড়িতে আমাকে বসিয়ে একটা সুপুরি দিয়ে বললে, 'মুখে রাখ। কোথাও যাসনে। বসে থাক।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সকলেই সেজেগুজে ওই ঘরে এসে জড়ো হচ্ছে, ছোটরা ছুটোছুটি করছে। বাড়িময় আলো, একদিকে রান্না হচ্ছে, বেলতলায় চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। শানবাঁধানো উঠোনে আলপনা দিয়ে ছাদনাতলা করা হয়েছে। সন্ধ্যার কিছুটা পরে বর এল। শোনামাত্র সবাই ছুটল বর দেখতে। ছোট বোনেরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলুও শোনা যাচ্ছে। আমি একলা চুপ করে বসে আছি। মন ছটফট করছে। অন্য কারওর বর হলে দেখতে ছুটতাম, এখন নিজের বরকে দেখতে গেলে সবাই হাসবে। মনের কোণে একবার ভেসে উঠল একটা চশমাপরা মুখ।

বসে বসে শুনছি বড় দরজায় হইচই। বর নামানো হচ্ছে। সেজদি, কালী, লীলা, আর সকলে ছুটে এসে আমাকে বললে, 'যমুনা, তোর বর দেখে এলাম।' তখন আমার মনে আছে কেমন ভয় করছিল, আবার ভালোও লাগছিল। শুনলাম বড়ঠাকুর আর মামা বরের সঙ্গে এসেছেন।

বড় সাহিত্যিককে দেখার জন্যে অনেকে উদগ্রীব হয়েছিলেন। তারা বড়ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে এলেন। আমার দাদামশাই যতীন ব্যানার্জি বড়ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। আমার মামার বাড়ি রাণাঘাটে। দাদামশাই রাণাঘাটের রাধাবল্লভতলায় আমার শ্বশুরমশাই মহানন্দ কথকঠাকুরকে কথকতা করতে দেখেছেন এবং শুনেছিলেন। সেইসব গল্প বড়ঠাকুরের সঙ্গে হয়েছিল, শুনেছি।

বিয়ের দিন আমি বড়ঠাকুরকে দেখিনি, কিন্তু সবার মুখে ওঁর কথা শুনেছিলাম। বরের ডাক্তারবন্ধুরা অনেকে এসেছিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী মিলে হইহই ব্যাপার। বেশ মনে আছে, ছাদনাতলায় বর এসেছে, মা, মাসিমা, দিদি, বৌদিরা

কলবল করছে। তখন আমার ঘর ফাঁকা। কানে এল, 'এবার কনে নিয়ে এসো।' শুনে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। এতক্ষণ বেশ ছিলাম। উৎসব আমাকে নিয়ে, কিন্তু আমাকে কোনো কিছুরই মুখোমুখি হতে হয়নি। জামাইবাবুরা এবং আমার মাসতুতো দাদা (হরিদাস মুখার্জি) পিঁড়ি ধরে আমাকে নিয়ে গেলেন। ঘোরানো এবং মালা বদল হল। শুভদৃষ্টির সময় মেজদি কোথা থেকে এসে বরের চশমা খুলে দিয়ে বললে, 'কাচের মধ্যে দিয়ে শুভদৃষ্টি চলবে না।' সবাই চেঁচিয়ে উঠতে আবার দিয়ে দিয়েছিল। তখন মনে মনে কী ভাবছিলাম জানি না, কারণ নিজেকে অনুশীলন করার বয়স ও বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই ছিল না।

নারায়ণকে সামনে রেখে বাবা সম্প্রদান করলেন। গাঁটছড়া বাঁধা হল। অনেক বেদমন্ত্র উচ্চারিত হল। তার অর্থ আমার বোধগম্য হল না। কিন্তু নারায়ণের সামনে বসে আমাব আবাল্য বিশ্বাসে ও ভক্তির অর্ঘ্যে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, 'ঠাকুর, জীবন যেন সুন্দর হয়ে ওঠে।' তখনকার মনের ভাব ভাষার দৈন্যে নীরব নিবেদনে পরিণত হয়েছিল।

মনে আছে বাসরে সবাই খুব আনন্দ করেছিল। খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে সবাই বাসরে এসে বসল। জামাইবাবুরা, দিদিরা, রেণুদি, মাসতুতো দাদাবৌদি, ছোটভাইরা, মাসতুতো দিদি ঘোতনদি (এটা ওর ডাক নাম), পাড়ার বৌদিরা বাসর গুলজার করে রেখেছিল। রেণুদি আর মেজদাদাবাবু দুজনেই দুশো। একসময় রেণুদি ঘোতনদিকে বললে, 'ঘোতন, তুই একটা গান কর।' ঘোতনদিকে অনেক পীড়াপীড়ির পর ঘোতনদি গান ধরল, 'আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে।' বেচারি বহুকাল গায়নি. গলা গেল কেঁপে। তখন সবাইয়ের হো হো করে হাসি, বর পর্যন্ত। রেণুদি বললে, 'নুটু, তুমি ভাই ডাক্তার, ওর চিকিৎসা করো, সদ্য ম্যালেরিয়া থেকে উঠে এসেছে। ওর গলার কাঁপুনিতে বোঝা যাচ্ছে।' ঘোতনদির লজ্জা। রেণুদি মাঝে মাঝে সবাইকে চা করে খাওয়াচ্ছে। তিথি ছিল পূর্ণিমা, আকাশের বুকে নিটোল চাঁদ। দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাগানের গাছপালার নীচেয় নীচেয় আলোকসজ্জার আনাগোনা। অগ্রহায়ণের রাত্রি, ঠাণ্ডা। ঘুম আসছে, সবাই জেগে আছে, সুতরাং আমাকেও জাগতে হবে। অবশ্য জেগে আছি বলেই দেখতে পেলাম— রাত্রি-কোরক থেকে দিনের উন্মেষ।

বাসররজনী প্রভাত হল, এবার কন্যাবিদায়ের পালা। বাবা বললেন, 'বসন্ত বলেছে সকাল সকাল পাঠিয়ে দিতে, কারণ তা না হলে ওখানে কুসুমডিঙায় বসতে দেরি হবে।' রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি আর আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় কেউই কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না। সেজদি আমায় সাজিয়ে দিলে। আশীর্বাদ হল। তখন কান্নায় যেন

আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। সবাই কাঁদছে। মা, বাবা, দাদারা, দিদিরা, বোনেরা। সবার ভালোবাসার অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে এবং তাদের আশীর্বাদ পাথেয় করে আমি আমার পরিচিত গৃহ, বাবা, মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম নবজীবনের সিংহদ্বারের দিকে।

মোটরে এপাড়া থেকে ওপাড়া কতটুকুই বা পথ। পথ আমার চেনা, বাড়িও আমার একবার দেখা। অল্প সময়ের মধ্যেই এসে পৌঁছলাম রেলধারে গোপীকৃষ্ণ রোডে মামাশ্বশুরবাড়ি। শাঁখ বাজল, উলুধ্বনি পড়ল। মা (আমার ছোট মামিশাশুড়ি) এসে আমাকে নামিয়ে নিলেন। বেশ মনে আছে ওই উঠোনে দুধে-আলতার পাথরের থালায় দাঁড়িয়েছিলাম। মায়েরা বরণ করলেন। মাথার ওপর ধানের পালি, স্বামীর সঙ্গে পেতে দেওয়া নতুন কাপড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে ঠাকুরঘরে এসে বসেছিলাম। ওইখানেই বৌ-এর মুখ দেখা এবং আশীর্বাদ সারা হল। মা মাথার টায়রা দিয়ে মুখ দেখেছিলেন, মেজ মাসিমা সোনার লোহা বাঁধানো দিয়ে। আশীর্বাদের সময় দেখলাম, বোঁচাদি, কালী, লীলা ওরা রয়েছে। ওরা প্রায় সময়ই আমার কাছে-কাছে ছিল।

কুসুমডিঙার সময় দেখলাম, আমার বাপের বাড়ির পুরোহিত তারাপদদা, এখানেও তিনি আমার কুসুমডিঙা করাচ্ছেন। পণ্ডিতমানুষ, আমার স্বামীও শিক্ষিত। ওঁদের সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ইত্যাদি খুব ভালো লাগছিল। আমি ওঁর পাশে পিঁড়িতে বসে আছি। যজ্ঞের ধোঁয়ায় চোখে জল আসছে। আমার স্বামী খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, না?' আমি চুপ, লজ্জা করছে। মনে হচ্ছিল কেউ শুনে ফেলেনি তো? তখন ঘরে এক পুরোহিত ছাড়া কেউ ছিল না। সবাই রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। শেষে সপ্তপদীর সময় যজ্ঞে আমরা দুজনে লাজাঞ্জলি দিলাম। বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার জন্য সবকিছুর অর্থ না বুঝলেও নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হল, তার শুদ্ধ পবিত্রতা মনকে অভিভূত করেছিল। যখন আমার স্বামী মাথায় সিঁদুর পরাচ্ছিলেন, তখন আপনা হতেই মনে মনে ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়েছিলাম। যে মানুষটি আমায় গ্রহণ করলেন তাঁর সহানুভূতিশীল হৃদয়ের উত্তাপ আমি যেন অনুভব করেছিলাম। অবশ্য এতটা কথা এখন গুছিয়ে লিখছি বটে, তখন হলে হয়তো পারতাম না। কারণ তখন ভাষা ছিল না, ছিল অনুভূতির তীব্রতা।

হাতে ভাত দেওয়ার সময় মা ডাকলেন, 'নুটু, বৌমার হাতে ভাতটা দিয়ে যাও।' উনি সাজানো ভাতের থালা ও কাপড় হাতে নিয়েছেন। মা বললেন, 'বলো, আজ থেকে ভাত-কাপড়ের ভার নিলাম।' উনি হেসে বলেছিলেন, 'রোজ এতকিছু দিতে হবে!'

বিবাহের কাজ মিটেছে। সবাই বড়ঘরে খেতে বসেছেন, আমি একবার ওখানে গেলাম। দেখি আমার স্বামী, বড়ঠাকুর, মামা, ঠাকুরপোরা, আমার ভাগ্নে শান্ত ও ভাগ্নি উমা খেতে বসেছে। নতুন বৌ আমি, আমাকে ঘিরে ছোট-র দল ঘুরঘুর করছে। ওখানে একটু দেখে চলে এলাম। একসময় মা বললেন, 'ওপরে গিয়ে একটু শুয়ে নাও।' আমার চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। ওপরে গিয়ে খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

বিকেলে ঘুম ভাঙল। মনে পড়ল বাড়ির কথা। মা. বাবা, ছোড়দা, দিদিরা এখন সব কী করছে? এই প্রথম আমি ওদের ছেড়ে এসেছি। মন কেমন করতে লাগল। একবার মা এসে চুল বেঁধে নতুন কাপড় দিলেন পরতে। ওপরের ঘরে বসে আছি, জাহ্নবীদি, আমার বড় ননদ, এসে বসলেন। মা, বাবা, বৌদি গৌরীদির কথা বলতে বলতে দেখলাম চোখে জল এসে গেল। জাহ্নবীদিকে আমার বেশ ভালো লাগছিল। সহজ সরল মানুষ।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঘরে ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলছে। ওই দিনটা ছিল কালরাত্রি। বরবধূ কেউ কাউকে দেখবে না। সুতরাং যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হল, তাঁকে সে রাত্রে আর দেখিনি।

পরের দিন শুক্রবার আমার বৌভাত হয়েছিল। মনে আছে বাড়িভর্তি লোকজন। সবাই ব্যস্ত। আমি ওপরের ঘরে বসে আছি, কখনও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। সামনে বিস্তৃত রেললাইন, দিগন্তরেখায় সবুজ বৃক্ষলতার হাতছানি। কিছুক্ষণ অন্তর বাড়ি কাঁপিয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলেছে। ছোটরা অনেকেই আমার কাছে। একসময় জাহ্নবীদি বাটি করে মটরশুঁটি দিয়ে মুড়িমাখা নিয়ে এসে আমার পাশে বসে বললেন, 'যমুনা, একগাল খাও না।' আমি বলেছিলাম, 'না দিদি, আপনি খান, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।' খেতে খেতে বললেন, 'জানো যমুনা, দাদা আমায় খুব ভালোবাসেন। নুটুও বাসে। আমি বনগাঁ থাকি। দাদাকে বলে তোমায় একবার নিয়ে যাব। দাদা কলকাতা থাকেন, প্রত্যেক সপ্তাহে বনগাঁ আসেন। সেখানে তো দাদার অনেক বন্ধু। লিচুতলার ক্লাব, মিতেদা, আরোও কতসব আছে। খুকুরা এখন বনগাঁ এসেছে। দাদার বনগাঁ না এলে ভালোই লাগে না। নুটু তো এতদিন কলকাতা থেকে পড়াশোনা করত, ও বেশি আমার কাছে আসতে পারে না। তুমি বনগাঁ গেলে সব ঘুরে দেখাব। চালকি আমার বাড়ি। তোমাদের চাটুজ্জ্যেমশাই থাকলে আজ কত আনন্দ করতেন।'

২৪

এ বাড়িতে এসেছি, কিন্তু বড়ঠাকুরকে দেখিনি, শুধু ওঁর আপনভোলা স্বভাবের কথা সবার মুখে শুনছি। কথায় কথায় জাহ্নবীদি বললেন, 'জানো যমুনা, তোমার বিয়েতে তো নাড়ুভাজা হয়নি, দাদার বিয়েতে অনেক আনন্দ-নাড়ু ভাজা হয়েছিল। দাদার খুব নাড়ু খেতে ইচ্ছে করছে, নিজের বিয়ে, লজ্জায় চাইতে পারছেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, যা তো জাহ্নবী, দু-চারটে নাড়ু নিয়ে আয়। আমি নাড়ু নিয়ে গিয়ে দিই। দাদা নাড়ু খেতে খুব ভালোবাসেন।' আমি চুপ করে শুনছি।

ভাবলে কষ্ট হয় জাহ্নবীদির কাছে আমার যাওয়া হয়নি। উনি কিছুদিন পরে মারা যান। জাহ্নবীদি আমার সঙ্গে গল্প করছেন, আমার স্বামী একবার ঘরে এসে দিদিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী গল্প করছিস রে দিদি?' জাহ্নবীদি বলেছিলেন, 'এই বাড়ির কথা বলছি।' উনি একবার এদিক-ওদিক করে রান্নাঘরের ছাদের দিকের দরজা দিয়ে নীচেয় নেমে গেলেন।

আমরা খাটে বসে কথা কইছি। পশ্চিমদিকের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পালপুকুরের টলটলে জলে কেউ স্নান করছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ কাপড় কাচছে। এদিকটা বেশ গ্রাম-গ্রাম মতো। আম, জাম, নারকেল আরও কী সব গাছ জায়গাটিকে ছায়াছন্ন করেছে। দূরের একটা বাড়িতে একগাছভর্তি গোলাপি ফুল ফুটে আছে। কাজের লোক তারার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওগুলো কী ফুল গো, তারার মা?' বললে, 'করবী।'

রৌদ্রভরা নীল আকাশ। বেশ লাগছিল। ঠিক যেন একটা ছবি। পাশে জাহ্নবীদি বসে গল্প করছেন। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে মানুষটি। মুখটি একটু লম্বা ছাঁদের। পরনে ধুতি, হাতে দু'গাছি সরু চুড়ি। হাত দিয়ে আমার কানের পাশের চুলগুলো সরাতে সরাতে বললেন, 'আজ আমার মার কথা মনে পড়ছে। সেই ছোট নুটুর আজ বিয়ে হল। দাদা সেই কবে বিয়ে করেছিলেন। বৌদি মারা গেলেন, মণি মারা গেল। বাবা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন, মার অবস্থা একবার বোঝো। সেসব কী দিন গেছে। মা চলে গেলেন, তোমাদের চাটুজ্জ্যেমশাই গেলেন। আমার তারপর কী অসুখ। খোকা-খুকি ছোট, আমার ছোট মেয়েটা মারা গেল। সে সব অনেক কথা ভাই, তখন দাদা আমার কী সেবাই করেছে! বেঁহুশে কাপড়-চোপড় নোংরা করে ফেলেছি, দাদা পুকুরে গিয়ে সব কেচে এনেছেন। তখন আমাকে দেখার কেউ ছিল না, মেয়েটা আমার বেঘোরে মারা গেল। নুটু তখন বোর্ডিং-এ।' বললেন, 'অনেক কথা ভাই, পরে শুনবে।' তারপর কার ডাক শুনে বললেন, 'যাই, দাদা বোধহয় ডাকছেন।'

ভারী অদ্ভুত লাগছিল। এঁদের সংসার বলে কিছু নেই। মা নেই, বাবা নেই। মেসেই এঁদের গৃহস্থালি। এঁদের জন্য কেমন একটা কষ্ট হল। আমি বড়দের আঁচলের ছায়ায় বড় হয়েছি। দুঃখ-দ্বন্দ্বের বার্তা তখনও আমার অজানা, মৃত্যুর হিমশীতল বেদনার উপস্থিতি আমার ক্ষুদ্র জীবনে তখনও কল্পনার বাইরে ছিল। জাহ্নবীদি নীচে থেকে এসে বললেন, 'দাদা ডাকছিলেন। বললাম, যমুনার সঙ্গে গল্প করছি। বললেন, যা, বৌমার সঙ্গে গল্প করগে। যমুনা, তুমি আজ এসেছ, আজ আমাদের কত আনন্দের দিন, কিন্তু কেউ তোমাকে দেখল না।' কিছুক্ষণ বসে উনি চলে গেলেন।

আমাদের জীবনে আনন্দের মুহূর্তগুলি বড় তাড়াতাড়ি কাটে। সূর্যদেবের পরিক্রমণের বিরামহীন গতির আবর্তে সকাল কেটে গেল। দুপুরও গেল কেটে, এল অপরাহ্ণ। ইতিমধ্যে আমার স্বামীকে দুএকবার দেখেছি। দেখেছি বড়ঠাকুর, মামা ও ঠাকুরপোদের ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে। সবাই ব্যস্ত অতিথি-অভ্যাগতদের যথেষ্ট আপ্যায়নের জন্য। আমাকে সাজাবার জন্য বোঁচাদি নীচের কোণের ঘরে নিয়ে গিয়ে খিল দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক সময় ব্যয় করে আমাকে সাজানো হল। কেমন দেখাচ্ছিল ভগবান জানেন। বেশি সাজগোজ আমার একটুও পছন্দ নয়। তথাপি বিয়ের কনে, নীরবতাই বাঞ্ছনীয়। আমাকে গায়ে-হলুদের ফিকে বেগুনি রঙের বেনারসিটা পরানো হয়েছিল। মাথায় ঘোমটা ও কপালে চন্দন, গলায় রজনীগন্ধার মালা।

দরজা খুলে যখন বেরুলাম দেখি কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাড়িময় আলো। বাইরের রক সাজানো হয়েছে। মনে আছে ওপরের ছোটঘরে আমাকে বসানো হয়েছিল। মেয়েরা সব ঘরে এসে বসেছিলেন। আমার ছোট ননদ মণির সতিন, যার নাম নন্দরানি, তিনিও মেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন। নন্দরানিদিদিকে বড়ঠাকুর এবং আমার স্বামী নিজের বোনের মতোই স্নেহ করতেন।

কলকাতা থেকে অনেকে এসেছিলেন। নৃত্যশিল্পী মণি বর্ধন এসেছিলেন। গায়ক বিভূতি দত্ত, শচীনদাস মতিলাল আসতে পারেনি। বড়ঠাকুরের সাহিত্যিক বন্ধুরা আসেননি। আমার স্বামীর ডাক্তার বন্ধুরা অনেকেই এসেছিলেন। আর এসেছিলেন বনগাঁ থেকে আমার স্বামীর বন্ধু ড. সলিল মুখার্জি (বলু)। ইনি মিতেদার ভাই, মাকে নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মাকে আমার স্বামী 'মা' বলতেন। এই মা আমাকে আশীর্বাদ করে একটি দুল দিয়েছিলেন। আরও অনেকে এসেছিলেন, আমি তো তাঁদের চিনি না।

অগ্রহায়ণ মাস, অল্প অল্প শীত, এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে আমার বাপের বাড়ি থেকে ফুলশয্যার তত্ত্ব এল।

মেজদি, সেজদি, বোনেরা, মেজদাদাবাবু খোকন তখন ছোট। ও গিয়েছিল ছোড়দার হাত ধরে। ওদের দেখে কী যে আনন্দ হয়েছিল! ছোড়দা বললে, 'কী রে, কাঁদিসনি তো?' বহুদিনের বিস্মৃত কাহিনি যেন হু হু করে মনে পড়ে যাচ্ছে। একটুও ভুলিনি। ভাবি এতদিন এরা মনের কোন মণিময় কক্ষে অক্ষয় হয়ে ছিল?

ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়ছে। একসময় ওঁর বন্ধুরা এলেন। ঘরে কন্যাযাত্রী যাঁরা ছিলেন পালালেন। আমার বুক দুরদুর করে উঠল! সবাই সুটবুট-পরা হোমরাচোমরা ব্যক্তি। অনেক সুন্দর সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিলেন। তার মধ্যে একটা টি-সেট ছিল। ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'যমুনা, আমরা যখন তোমাদের কাছে যাব এই কাপ-ডিশে চা করে দেবে।' উনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'শৈলেনবাবু।' শৈলেনবাবু বললেন, 'যমুনা, তোমাকে আজ একটা গান করতে হবে। বাসরে তো গেয়েছিলে শুনলাম।' আমি চুপ করে আছি। আমি তো জানি এঁদের সামনে গাইবার মতো গান আমি জানি না। হঠাৎ আমার বন্ধু কালী জানলা দিয়ে বললে, 'যমুনা, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে গানটা কর না, ওটা ভালোই গাস।' আর রক্ষে নেই। আমার স্বামী হাসতে হাসতে বললেন, 'গাও।' হারমোনিয়াম এল। আমি নিজে খুব সাহসী হয়ে উঠে গানটা গেয়ে ফেললাম। হেমন্তের এক মাধবীরাত্রে গাইলাম বর্ষার গান। বোধহয় ভালোই গেয়েছিলাম। কারণ পরে মার কাছে শুনেছিলাম বড়ঠাকুরও নীচে থেকে আমার গান শুনেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'বৌমার গলাটি ভালো।' আমার স্বামী গায়ক-মানুষ, শুনে শুধু হেসেছিলেন।

আস্তে আস্তে উৎসবের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। আমাকে একটা ধূপ-ছায়া রঙের শাড়ি পরতে দেওয়া হয়েছিল। অনেক রাত্রে ওপরের ঘরেই আমাদের ফুলশয্যার অনুষ্ঠান করানো হল। ফলার খাওয়া, হাতের সুতো খোলা ইত্যাদি। তারপর সবাই চলে গেলেন। মাত্র আমরা দুজনে। আমার স্বামী দরজা বন্ধ করলেন। খাটে সুন্দর করে বিছানা পাতা, ঘরে উজ্জ্বল আলো, ওঁর পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন। লজ্জা, সংকাচ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকালাম। আমাদের ফুলশয্যার রাত্রি মধুময় হয়েছিল।

মনে পড়ে পরদিন সকাল হল, পাশে আমার নিদ্রিত স্বামী। আস্তে আস্তে উঠে যাব, উনি বললেন, 'একটু থাকো। এখনো কেউ ওঠেনি।' সেদিন সারাদিন একটা মধুরতার আবেশ অনুভব করছিলাম, যেন সব কিছুই ভালো লাগছিল। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। সত্যিই আমার বিয়ে হল, আমার স্বামী,

আমার শ্বশুরবাড়ি। ভাবতে ভাবতে আমি যেন বেশ একটু বড় হয়ে গেলাম। একটা স্নিগ্ধ শান্ত চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

ওইদিনই বড়ঠাকুর জাহ্নবীদিদের নিয়ে বনগাঁ যাবেন। বড়ঠাকুরকে প্রণাম করতে উনি বললেন, 'এখন আমরা বনগাঁ যাচ্ছি। পরে তোমাকে নিয়ে যাব, বৌমা।' জাহ্নবীদি যাওয়ার সময় আদর করে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'দাদাকে বলে তোমাকে বনগাঁ নিয়ে যাব।' ওইদিন দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও চলে যান। আমার বৌভাতে বড়ঠাকুর বনগাঁ থেকে কাঁচাগোল্লা আনিয়েছিলেন।

যে মানুষটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সেদিন তাঁকে অনেকবার দেখেছিলাম। দেখেছিলাম ভাইদের সঙ্গে হইহই করছেন, হাসছেন, গল্প করছেন, মার সঙ্গে গল্প করছেন। বেশ আনন্দময় মানুষ। ভালো লাগল। কতকিছু জানেন, কত বিদ্বান। আর আমি মুখ্যু, কিচ্ছু জানি না। নিজেকে বড় দীন মনে হল। সেদিন রাত্রে উনি বলেছিলেন, 'যমুনা, আমার দাদাকে দেখেছ?' আমি বলেছিলাম 'দেখেছি, কথা তো বলিনি।' বললেন, 'দাদার সঙ্গে কথা বলবে, যত্ন করবে, দেখবে আমার দাদা কত ভালো। দাদা কত ভালো ভালো বই লিখেছেন, আস্তে আস্তে সেইসব বই পড়বে, তোমার ভালো লাগবে। খুব বড় সাহিত্যিক, কিন্তু এমন সাদাসিধে মানুষ খুব কম দেখা যায়। জীবনে অনেক কষ্ট করে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে মানুষ করেছেন। দাদা আমার বাবার মতো। ছোটমামা আর দাদা আমাকে খুব ভালোবাসেন।'

পরের দিন আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গায়ক বিভূতি দত্তের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওঁরা আমাকে মুর্শিদাবাদ সিল্কের একটা শাড়ি দিয়েছিলেন। সেটা পরেই ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী খুব যত্ন করেছিলেন। ওখান থেকে মেট্রোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ওঁর বন্ধু শৈলেনবাবু টিকিট কেটে রেখেছিলেন। ইংরেজি বই, কিছুই বুঝি না। উনি গল্পটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, বুঝি আর না বুঝি সবই নতুন, মন্দ লাগছিল না। একটু রাত হয়ে গিয়েছিল ভাটপাড়ায় ফিরতে।

পরদিন জোড়ে বাপের বাড়ি এসেছিলাম। সত্যনারায়ণ সুবচনি পুজো হল। নতুন জামাই এসেছে, রান্নাঘরে বিশেষ আয়োজন। বাড়িতে দিদিরা, জামাইবাবুরা, বেণুদি, আমার স্বামী হাসি-গল্পে মাতিয়ে রেখেছেন। আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা চলছে। আমার স্বামী একটি একটি করে আমার এ ক'দিনের সব কথা বোধহয় বলছেন, আর ওরা হাসছে। উনি হাসিমুখে আমার দুর্দশা উপভোগ করছেন। সেইসব দিনের কথা ভাবলে এখন লজ্জা করে। কত বোকা ছিলাম, অনেক কিছুই বুঝতাম না। ঠাট্টা করলে লজ্জা করত, রাগ হত। আর উনি সেই দেখে মজা পেতেন।

সেদিন আনন্দে কাটল। পরদিন এলাম মামাশ্বশুরবাড়ি। ওইদিন বিকেলে ওঁকে চলে যেতে হবে বেলডাঙায়। আমার বিয়ের ক'মাস আগে উনি বেলডাঙার সুগার-মিলে চাকরি পেয়েছিলেন, তাই ছুটিশেষে ফিরতে হবে। দুপুরবেলা মা আমার হাতে একটা বই দিয়ে বললেন, 'যাও, নীচের ওই কোণের ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ো গে।' বইটা নিয়ে দেখলাম শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা।' পড়তে পড়তে তন্দ্রা এসেছে, দেখি আমার স্বামী পাশে এসে বসেছেন, বললেন, 'আজ চলে যাচ্ছি। ইচ্ছা করছে না যেতে। শিগগিরই কিন্তু তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। যাবে তো?' আমি চুপ করে আছি। বললেন, 'তোমাকে আর একটু পড়াশোনা করতে হবে। খোকা মনুর কাছে ইংরেজি পড়া শুরু করো, কেমন? কথা-কাহিনী পড়বে ভালো করে। ভালো করে পড়াশোনা করবে। মনে থাকবে তো? আমি লেখাপড়া দারুণ ভালোবাসি। চিঠি দিয়ো।'

বিকেলের গাড়িতে চলে গেলেন। মা-ঠাকুরপোরা ছাদে উঠে দেখলেন। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু লজ্জায় যেতে পারিনি।

আজকালকার সঙ্গে তখনকার দিনের কত তফাত তাই ভাবি। আগে লজ্জা ছিল, গুরুজনদের সমীহ ছিল, নিন্দার ভয় ছিল। কিন্তু মনের চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছাকে তো আর দমন করা যেত না, সে ঠিকই প্রিয়সান্নিধ্য কামনা করত। অবশ্য ঘোমটার আড়ালে-আবডালে ক্ষণিক দেখা, টুকরো কথা, হাসির রেখা এবং গভীর রাত্রে স্বামীর সান্নিধ্যের মধ্যে একটা আলাদা মাধুর্য ছিল, ছিল মননের আনন্দময় উপলব্ধি আর ক্ষণিকের পাওয়ার সুগভীর আনন্দ। আজকাল অহেতুক লজ্জা চলে গেছে। ভালোই হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। মনের চাওয়াকে অযথা দমন করে কষ্ট না পাওয়াই ভালো।

বেশ মনে পড়ছে উনি চলে গেলেন বেলডাঙায়, আমি রইলাম ভাটপাড়ায়। কখনও কখনও বাপের বাড়ি, কখনও মামাশ্বশুরবাড়ি। পড়াশোনা শুরু হল। আমি তখন বাপের বাড়ি। ওঁর চিঠি এল। শোনামাত্রই মনে একটা শিহরন খেলে গেল। ছোড়দা খামটা এনে আমার হাতে দিলে। তখন আমার খুব লজ্জা করছে, মনে হচ্ছিল সবাই বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। একবার বেণুদি এসে বললে, 'নুটু কী লিখেছে রে?' আমি বললাম, 'পড়িনি।' চিঠিখানা নিয়ে ঘরে গিয়ে পড়লাম। একটি তরুণ হৃদয়ের উজাড়-করা ভালোবাসা, আবেগ, অভিমান, বিরহী হৃদয়ের কাতরতা, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, মিষ্টি ভাষায় চিঠিখানি ভরা। তারই মাঝে লিখেছেন, 'পড়াশোনা করছ তো? আমি কিন্তু পড়াশোনা খুব ভালোবাসি।'

পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে যাই। সাহিত্যিকের ভাই, ভাষার ছটায়, প্রকাশের ভঙ্গিতে অপূর্ব মাদকতা। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার হৃদয় ওঁর পায়ে নত হয়ে পড়ল। আজ সেদিনের সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি, সেদিন কিন্তু তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারিনি, ভাষার দৈন্য আমাকে পীড়া দিত। ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল। আমারই জন্য এক তরুণ দেবতার এত আর্তি, ভালোবাসা, এত ব্যাকুলতা। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর জন্য একটা গভীর ভালোবাসায় মন আমার আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন চলা, ফেরা, শোয়া, বসা— সবার মাঝে যেন একটা দূরাগত নূপুরধ্বনির মতো হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে চলেছে সেই ভালোবাসার রাগিণী।

মেজদাদাবাবু বিকেলে এসে বললেন, 'হ্যাঁরে যমুনা, নুটুর চিঠি এসেছে? আমাকেও একটা দিয়েছে, এই নে পড়।' পড়লাম। বড় বড় চারপৃষ্ঠায় ভরা চিঠি, এক জায়গায় লিখেছেন, 'যমুনাকে বলবেন, ওকে পড়াশোনা করতে হবে।' লিখেছেন, 'যমুনার কাছে আমার লেখা চিঠি দেখতে চাইবেন, কী মজা করে শুনব।' আর আমাকে চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার চিঠি কাউকে দেখিয়ো না কিন্তু।' ওঁর চিঠি পড়ে ওঁর এই ছেলেমানুষিতে আমারই মজা লেগেছিল। সারা পৌষ মাস আমাদের চিঠি দেওয়া-নেওয়াই যোগসূত্র হল। যেমন পারি তেমন লিখতাম, উত্তর আসত সুন্দরতর রূপে।

ইতিমধ্যে পৌষের তত্ত্ব এসে গেল। এঁরা আমাকে একটা লাল শালের শাড়ি দিয়েছিলেন, আর একটা শাল ও গরমের জামা। বাবাও তত্ত্ব দিয়েছিলেন। যাই হোক, প্রিয়তমের সংবাদ নিয়ে চিঠি আসে, কত আবেগ, কত নতুন নামে সম্বোধন করে। প্রতি চিঠিতেই লিখতেন, 'একলা ভালো লাগছে না' ইত্যাদি। আর জরুরি সংবাদ ছিল, 'পড়ছ তো?'

২৫

এইভাবেই চলছে জীবনের সুন্দরতম দিনগুলো। কীভাবে আমাকে নিয়ে যাবেন তারই জল্পনা চলছে। অথচ লজ্জা কাটিয়ে গুরুজনদের বলতে পারছেন না আমাকে নিয়ে যাবেন। প্রত্যাশিত ফাল্গুন মাস আসছে। এরই মাঝে আমার স্বামী মামিমাকে লিখেছিলেন, 'মামিমা, তোমরা এখানে এসে একবার বেড়িয়ে যাও। জায়গাটা ভালো।' মা দিনস্থির করে লিখলেন, 'নুটু, ওইদিন এসে আমাদের নিয়ে যাও।'

যেতে হবে শুনে মনটা কেমন হয়ে গেল। আবার ভালোও লাগছে, ওঁর কাছে যাব। আমার বিয়ের আগে বোনেদের শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখেছি। যাওয়ার সময় ওরা

কেঁদেছে, আমিও কেঁদেছি, মনে মনে ভাবতাম মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। কিন্তু বিয়ে হল, মামাশ্বশুরবাড়ি এলাম। এ বাড়ি আমার পিতৃগৃহের সমতুল, কিন্তু এবার সব ছেড়ে, দেশ ছেড়ে স্বামীর গৃহে যেতে হবে। একদিকে আনন্দ, অপরদিকে বেদনা, একদিকে 'যেতে নাহি দিব', অন্যদিকে 'তবু যেতে দিতে হয়'। এই তো জীবন। একদিকে বন্ধন, অন্যদিকে মুক্তি, ভালোলাগা আর ছেড়ে যাওয়ার দ্বন্দ্ব।

যাই হোক, শীত বিদায় নিল, ঘটল বসন্তের আগমন। পৃথিবীর রূপ-রং গেল পালটে। এল কোকিল-ডাকা ফাল্গুন মাস। আমার স্বামী এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। মা. মাসিমণি, আমার মামাতো ননদ খুকু, পুতু, আরতি এই ক'জন। খোকন বাড়ি ছিল। তখনকার দিনে ট্রেনে এখনকার মতো প্রচণ্ড ভিড় ছিল না। যখন তখন বন্‌ধ ছিল না।

গাড়িতে যেতে যেতে মা বললেন, 'বৌমা, গান করো।' মনের আনন্দে অনেকগুলো গান করেছিলাম। মা খুব গান ভালোবাসতেন। ভাটপাড়ায় কতদিন সন্ধ্যায় কাজকর্ম সেরে মা বলতেন, 'চলো বৌমা, তেতলার ছাদে যাই।' ছোট ননদরা সঙ্গে থাকত। মাদুর পেতে বসতাম। জ্যোৎস্নায় ভরে যেত চতুর্দিক, কখনও বা অন্ধকারে ঢেকে থাকত পৃথিবী। মিষ্টি বাতাস বইত। মা শুয়ে শুয়ে বলতেন, 'গান করো বৌমা।' পরে মা চিঠিতে কত গান লিখে পাঠাতেন। ঘাটশিলায় সিনেমা দেখতে পেতাম না, মা কিন্তু যখন যে বই দেখতেন তার গানগুলি লিখে পাঠাতেন। মার বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান ছিল প্রচুর।

মার অপার স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। মার সান্নিধ্যে দুঃখের দিনে অনেক সান্ত্বনা পেয়েছি। মার আশীর্বাদ আমার দুঃখ দিনের পাথেয়। একবার একজন আমার সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করলে মা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে তাকে বলেছিলেন, 'মেজ বৌমা সম্বন্ধে তোমাকে কোনোদিন যেন কিছু বলতে না শুনি। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের দেশের প্রতি ঘরে ঘরে যেন মেজ বৌমার মতো মেয়ে জন্মায়।' শুনে তিনি আর কিছু বলার চেষ্টা করেননি। একথা একজন আমাকে বলেছিল। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, বলেছি।' মার যখন একটু বয়স হয়েছে তখন শরীর খারাপ হলে অথবা বাড়িতে কোনো আনন্দ সংবাদ থাকলে মা বলতেন, 'আগে মেজ বৌমাকে খবর দাও।' তখন মেজ ঠাকুরপো অথবা নেপি এসে খবর দিত। আমি মার 'মেজ বৌমা,' দিদি কল্যাণী দেবী 'বড় বৌমা।'

লিখতে লিখতে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। এবার পতিগৃহে যাত্রা করি। বেশ মনে আছে, প্রথম স্বামীর কাছে যাচ্ছি, মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি। মা সঙ্গে যাচ্ছেন, কোনো চিন্তা নেই। আছে শুধু প্রিয়-মিলনের অনাবিল আনন্দ। আমরা প্রায় সন্ধ্যার

সময় পৌঁছেছিলাম। তখন ইলেকট্রিক ট্রেন হয়নি। কয়লার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রেলগাড়ি ছোট একটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। আগে আমার স্বামী প্ল্যাটফর্মে নেমে পরে আমাদের সবাইকে হাত ধরে নামিয়ে নিলেন। প্ল্যাটফর্ম ছিল অনেক নীচেয়।

ওঁর কোয়ার্টার বেশ ভালোই। তিনখানা শোয়ার ঘর, রান্নাঘর, বেশ সুবন্দোবস্ত। পরদিন সকালে একটি বৌ এল কাজ করতে, নাম শিশুমতী। একটু বেলায় কমবয়সি একটি ছেলে এসে বললে, 'কিছু কেনাকাটার দরকার আছে কি, তা হলে আমি কিনে দিয়ে যাব।' ছেলেটি হসপিটালে কাজ করে।

ওইদিনই মা, মাসিমণি, সব গুছিয়ে ফেললেন। আমি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। একটু বেলায় একটি মেয়ে এল। নাম ডলি। সালোয়ার কামিজ পরা, দেখতে বেশ সুন্দর। বললে, 'আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলাম।' বেশ হাসিখুশি, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের জমিয়ে নিয়েছিল। আমাকে বৌদি, মায়েদের মাসিমা। আমার স্বামী বাড়ি এলে মা বললেন, 'ডলি এসেছিল।' উনি বললেন, 'হ্যাঁ, সাগরচাঁদ সকালে আমায় জিজ্ঞেস করছিল, বৌদিরা এসেছেন, তাই ডলিকে পাঠিয়ে দিয়েছি।' ডলি বাঙালি, সাগরচাঁদ পাঞ্জাবি। লিখতে বসে ওর কথা মনে পড়ল। ভারি মিশুকে মেয়ে।

ওইদিন ওঁর ঘরের টেবিল গোছাতে গিয়ে বড়ঠাকুরের একটা চিঠি পেলাম। বড়ঠাকুর ভাইকে লিখেছেন—

১৭.০১.৩৯

কল্যাণবরেষু নুটু,

তোমার প্রেরিত খাবারগুলি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমি মধ্যে মামাব বাড়ী গিয়েছিলাম। ছোটমামা মাজার বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন। তন্ত্রের ব্যবস্থা করে এসেছি এবং পাঠানোও হয়ে গেছে। তোমার জন্য ছোটমামা ভাল শাল একখানি কিনেচেন। পুজোর সময় দেশে যাব। এরপরে একটা শনিবার বেলডাঙায় যাবার খুব ইচ্ছা আছে। বইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি। পেয়েছ বোধহয়। Science and Cultureটা তোমার ঠিকানাতেই পাঠাবো এবং এখন থেকে বঙ্গশ্রীও তাই করবো।

আশীর্ব্বাদ জেনো। আশা করি কুশলে আছ। আজ দুইটি সভায় শরৎ স্মৃতিবার্ষিকীতে preside করবো। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন রাত্রে ওঁকে বলেছিলাম, 'তোমার টেবিল গোছাতে গিয়ে দাদার একটা চিঠি পেয়েছি।' দেখি দাদার কথায় ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, 'চিঠিটা

পড়েছ? দাদার জন্যে খাবার পাঠিয়েছিলাম, পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। আসবেন লিখেছেন। এলে বেশ ভালো হয়, না? এলে কথা বলবে, দেখবে দাদা কত ভালো।' মনে মনে ভাবছি কথা কী করে বলব। মাসিমণি রয়েছেন, ভাশুরের সঙ্গে কথা-বলা নিষেধ। মনে একটা দ্বিধা। কথা বলব না সে কেমন হবে, অথচ উনি বলছেন, 'কথা বলো, দেখবে দাদা কত ভালো।' ওঁর ওপর কেমন একটা মায়া হল। দাদা ছাড়া ওঁর কেউ নেই, দাদাকে উনি বড় ভালোবাসেন। মনে পড়ে এমন দিন একটিও যায়নি যেদিন উনি দাদার কথা একবারও বলেননি।

২৬

আরও একজনের কথা মনে পড়ছে। স্নেহদি। দক্ষিণ ভারতের মেয়ে। দেখতে রোগা লম্বা, মুখটি ভালো, রং চাপা। আমাদের ওঁর বাসায় নিয়ে একদিন খুব খাওয়ালেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি ওখানে থাকতেই স্নেহদিরা অর্থাৎ ওঁর স্বামী চাকরি পেয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার দিন ওঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মা তখন ভাটপাড়ায় চলে এসেছেন। আমি রান্না করতে পটু নয় বলে নিজেই সব করলেন। লুচি ভাজলেন। যাবার সময় বলেছিলেন, 'তুমি আমার ছোট বোনের মতো।' আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

রোজ মা আমরা বেড়াতে যেতাম। মস্ত জায়গা জুড়ে কোয়ার্টার, তা ছাড়া গ্রামের মধ্যেও বহু লোকের বাস। আমার স্বামী গানপাগল মানুষ, তাই যেখানেই থাকুন না কেন, গানের সমঝদার ও তবলচির ঠিক জোগাড় হয়ে যাবেই। বেলডাঙাতেও অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। প্রথমত ডাক্তার, সর্বোপরি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের ভাই। ভক্তের অভাব নেই। প্রায়ই অনেকে বেড়াতে আসতেন, আমাকে নিয়েও দু-একজনের বাড়ি গিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ-পলাশীর আম বিখ্যাত। ওখানে বিরাট বিরাট আমবাগান দেখেছি। কতদিন ওই আমবাগানে মা আমরা বেড়াতে গেছি, গাছের তলায় বসে গল্প করেছি। সে সব দিনের কথা মনে পড়লে আনন্দ হয়।

বাবার চিঠি আসে, বড়ঠাকুর চিঠি লেখেন। একবার বড়ঠাকুর লিখলেন, 'নুটু, আমি যাচ্ছি।' চিঠি পেয়ে ওঁর খুব আনন্দ। শুনে আমরা সবাই খুশি। বড়ঠাকুরও এসে খুব আনন্দ করেছিলেন। মা কতরকম রান্না করে খাওয়ালেন।

একদিন বেশ মজা হয়েছিল। রান্না হয়ে গেছে, বড়ঠাকুর লিখছেন, মা বললেন, 'বৌমা, বিভূতিকে স্নান করার তেল দিয়ে এসো।' আমি তেল নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বললেন, 'কী তেল, বৌমা?' একবার মনের মধ্যে হল কথা বলব,

তারপর বললাম, 'নারকোল তেল। আপনি স্নান করে আসুন।' ভয় করছে মাসিমণি কিছু বলবেন না তো!

সেবার বড়ঠাকুরের সঙ্গে বহরমপুর গিয়েছিলাম। তখন মার বাবা কালাচাঁদ রায়মশাই জীবিত। মা বাপের বাড়ি গিয়ে খুব খুশি। বহরমপুর থেকে ফিরে বড়ঠাকুর আরও দু-দিন থেকে মায়েদের সঙ্গে নিয়ে ভাটপাড়ায় চলে এলেন। আমি রইলাম ওঁর কাছে। মায়েদের যাওয়ার দিন আমরা ওঁদের গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। বড়ঠাকুরকে প্রণাম করলাম। বললেন, 'সাবধানে থাকবে। এরপর তোমায় বনগাঁ নিয়ে যাব।'

গ্রাম জায়গা। স্টেশন ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে রেললাইন। আমরা স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ট্রেন আস্তে আস্তে চলে গেল, মা জানলা দিয়ে হাত নাড়ছিলেন, তাও মিলিয়ে গেল। খুব মন খারাপ লাগছিল। উনি আমার একটা হাত ধরে বলেছিলেন, 'খুব মন কেমন করছে, না? চলো একটু বেড়িয়ে আসি।' সেদিন অনেকক্ষণ বেড়িয়েছিলাম।

এবার দুজন অনেক কাছাকাছি এসেছি। সবসময় কাছে-কাছে থাকি। কথা বলি, উনি গান করেন। আমিও গাই। কখনও দুপুরে অথবা রাত্রে। কবিতা পড়েন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি। আমাকেও পড়তে বলেন, আমার লজ্জা করছিল, আমি তো ভালো পারি না। উনি বলতেন, 'যা পারো করো, করতে করতে হবে।' অনেক সময় গল্প বলতেন, শুয়ে শুয়ে শুনতাম। সুন্দর গল্প বলতে পারতেন। কখনও সিনেমার কখনওবা ইংরেজি বইয়ের কোনো গল্প। কোথা দিয়ে দিন কেটে যেত। মনে হত দিনটা বড় ছোট, আরও একটু বড় হলে ক্ষতি কী ছিল?

উনি বেরিয়ে গেলে আমি রান্না বা অন্য কাজ সেরে নিতাম। আনাড়ি হাতের রান্না কেমন লাগত কিছু বলতেন না। খাওয়াটা তখন ছিল গৌণ। গানে, গল্পে, কবিতায়, ওঁর প্রাণখোলা হাসিতে সময় কাটছে। এক-একদিন বাবা-মার কথা, ছোড়দি ও বৌদি গৌরীদির কথা, নিজের দেশ বারাকপুর গ্রামের কথা বলতেন। শুনতে শুনতে কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে।

কোনো কোনো দিন বিকেলে বেড়াতে যেতাম। রেললাইন পার হয়ে, ঘন আম্রবনের মধ্য দিয়ে, যেখানে দিগন্তপ্রসারী মাঠ অনেক অনেক দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। কতদিন বেড়াতে বেড়াতে রাত হয়ে গেছে। কখনও জ্যোৎস্না নেমেছে, কখনও বা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চরাচর। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকির আলো। দূর থেকে দেখা যেত স্টেশনের আলোর সারি। আমরা আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরতাম।

একদিন বাড়ি এসে উনি বললেন, 'মিনু—' এটি ওঁর দেওয়া নাম। সবার সামনে আমাকে যমুনা বলেই ডাকতেন। যাই হোক, বললেন, 'সঞ্চয়িতাটা নিয়ে এসো, পড়ি।' পড়তে পড়তে 'দুর্বোধ' কবিতাটি বার করে আমায় বললেন, 'এই কবিতাটা মুখস্ত করে ফেলবে, কেমন?' বলে নিজে আবৃত্তি করলেন—

"তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্ত বিষাদভরে দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমনভাবে স্থির নতমুখে
চেয়ে থাকে সমুদ্রের বুকে।
কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা
তাই মোরে বুঝিতে পার না?" ইত্যাদি।

আমি চুপ করে শুনলাম ওঁর ভাবগম্ভীর কণ্ঠের সেই পাঠ। শেষে বললেন, 'কিছু বুঝলে?' আমি চুপ করে আছি। তখন বলেছিলেন, 'এখন হয়তো বুঝছ না। পরে ঠিক বুঝতে পারবে। এই কবিতা আমার অন্তরের কথা বলবে। যখন আমি থাকব না, এই কবিতা আমার কথা তোমায় মনে করিয়ে দেবে।' শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'অমন করে বলছ কেন?' উনি তখন হেসে বলেছিলেন, 'আরে, আমি কি এখুনি মরে যাচ্ছি? তুমি ভারী ছেলেমানুষ। জানো, রেণুদি (আমার সম্পর্কিত দিদি) একদিন ভাটপাড়ায় বলেছিলেন, নুটু, তুমি যমুনাকে যেমনভাবে চাইছ ওকে এখন তেমনভাবে পাবে না, ও বড় ছেলেমানুষ। একটু বড় হলে সব বুঝতে পারবে। তাই বলছি।'

এখন আমার জানার পরিধি বেড়েছে। তখন বুঝতাম না প্রেম কী। কাকে বলে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কত পবিত্র কত গভীর। আমার প্রতি ওঁর ভালোবাসার গভীরতা আমি বুঝতাম, অনুভব করতাম। আমিও তো ভালোবেসেছি। কিন্তু তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার সাধ্য ছিল না। ওঁর প্রকাশে ছিল আনন্দ। তখন কবিতাটি পড়েছি, পরবর্তীকালে ঘাটশিলাতেও পড়তাম। এখন পড়ি। প্রেমিক-হৃদয়ের চিরন্তন আকুতি আবহমানকাল ধরেই চলে আসছে। চলে আসছে এই বোঝা-না-বোঝার দ্বন্দ্ব। এখনও কবিতাটি পড়তে গেলে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। ওঁর সেই ব্যথাভরা কণ্ঠস্বর আজও আমাকে উন্মনা করে তোলে। মনে হয় যদি আমার হৃদয়ের

সমস্ত ভালোবাসাটুকু দিয়ে ওঁর বেদনাকে মুছিয়ে দিতে পারতাম, পারতাম যদি আমার অশ্রুজলে ওঁর চরণদুটি ধুইয়ে দিতে, তা হলে কি আমার দেবতা খুশি হতেন?

কিন্তু আজ আমাদের দুজনের মধ্যে এক অপার্থিব ব্যবধান। জানি না আমার এই অশান্ত হৃদয়ের কল্লোল ওঁর কানে পৌঁছবে কি না। তাই ঈশ্বরকে প্রণতি জানাই। এমন একজন প্রাণবান মানুষকে একান্তভাবে পেয়েছিলাম যিনি আমার জীবনের আদর্শ, চলার পথের পাথেয় ও প্রেরণা।

আর একটা কবিতা বলতেন পড়তে। রবীন্দ্রনাথের 'অনাবশ্যক'—

"কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে,
আমি এসে শুধাই তারে ডেকে,
একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।" ইত্যাদি।

উনি ক্লাসিক গান করতেন। গলা ছিল যেমন চড়া তেমনি সুরেলা। গান ছিল ওঁর প্রাণের জিনিস। উনি বলতেন, 'গান আর সাহিত্য আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। অবশ্য আমার ঠাকুরদা তারিণী বাঁড়ুজ্জে ছিলেন কবিরাজ, আমি ডাক্তার হয়েছি।' আমার শ্বশুরমশায়ের গলাও নাকি খুব চড়া ছিল। সইমা, আমার শাশুড়ির সই, বলতেন, 'তোমাদের শ্বশুরমশাই যখন বাড়ি আসতেন তখন আমরা বুঝতে পারতাম, কারণ অনেক দূর থেকে ওঁর গান আমরা শুনতে পেতাম। কথক মানুষ, গলা ছিল খুব চড়া।'

বড়ঠাকুরও গান করতেন। তবে শাস্ত্রীয়সংগীত নয়, রবীন্দ্রসংগীত ও অন্য সব গান। দিদির মুখে শুনেছি, দেশে থাকতে ওরা দুজন অনেক সময় নদীর ধারে, কোনো পুষ্পিত ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে গলা ছেড়ে গান করতেন। সামনে বয়ে যেত চলচঞ্চলা ইছামতী। প্রকৃতির একেবারে কোলের কাছে বসে একটার পর একটা গান করতেন। দুই ভায়ের মধ্যেই ছিল সাহিত্য ও সংগীতের ফল্গুধারা।

উনি বলেছিলেন, 'দাদা বাবার সাহিত্যপ্রতিভা পেয়েছে। সাহিত্য আমার নেই। আমি পেয়েছি গান।' আমি বলেছিলাম, 'সাহিত্যপ্রীতি তোমরাও তো কিছু কম নয়। কী সুন্দর চিঠি লেখো। জ্যোৎস্না দেখলে মুগ্ধ হয়ে পড়ো। বর্ষায় যত রাজ্যের বেদনা তোমার মনে পড়ে। অন্ধকারকে নিয়ে কবিত্ব করো।' উনি বলেছিলেন, 'কী করে জানলে?' 'কেন তোমার সেই ছোট ডায়েরিটাতে কতকিছু লেখা রয়েছে।' উনি হেসে ফেলে বলেছিলেন, 'ওরে বাবা! এর মধ্যে ডায়েরিও পড়া হয়ে গেছে। তা হলে বুঝে

দেখ চেষ্টা করলে আমিও একটুআধটু লিখতে পারতাম! কখনও চেষ্টা করিনি।' ওঁর হাসি ছিল প্রাণখোলা, অপরকে হাসাতেও পারতেন খুব।

একদিন সকালে স্টেথস্কোপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখলাম। ওঁর দুপুরে ফেরার কথা, সেদিন দশটায় এসে বললেন, 'কিছু খেতে দাও, বহরমপুর যাব।' বললেন, 'আচ্ছা, তোমার একলাটি থাকতে অসুবিধা হবে না তো? দরজা বন্ধ করে রেখো, আমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব।'

উনি চলে গেলে খালি বাড়ি, খুব খারাপ লাগছিল। কখনও একলা এমনভাবে থাকিনি। উনি সন্ধ্যায় ফিরে এলেন। এসে বলেছিলেন, 'কী, খুব মনখারাপ লাগছিল? নিশ্চয়ই কেঁদেছ?' আমি বলেছিলাম, 'না না, কাঁদিনি।' বলেছিলেন, 'এই দেখ, তোমার জন্যে দুখানা শাড়ি এনেছি। এই আমার প্রথম শাড়ি কেনা।' বলে একটা প্যাকেট থেকে দুখানা শাড়ি বার করলেন। একটা লাল, একটা কালো। 'দুটো রংই তোমাকে মানাবে।' শাড়িদুটি পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছিল। তখন একটির পর একটি দিন আসছিল আনন্দের পসরা নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভাটপাড়া থেকে একদিন মেজদাদাবাবু এলেন। আমাদের খুব আনন্দ। ওই সময় ওঁর বন্ধু শৈলেনবাবুও এসে পড়েছিলেন। ওঁর তো প্রচণ্ড আনন্দ— শৈলেন এসেছে। সেইদিনই মেজদাদাবাবু চলে গেলেন। শৈলেনবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'যমুনা, আমি তো চলে এলাম। রান্না করতে পারবে তো? আমি কিন্তু খুব খাই। আজ রাত্রে পরোটা আলুচচ্চড়ি করো।' সেদিন অনেকগুলো পরোটা ভেজেছি। বুঝতে পারিনি। ওঁরা দুই বন্ধু খেতে বসেছেন, অতগুলো পরোটা দেখে সে কী হাসি ওদের। হাসি দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। কিছু জানি না, করেছি এই না কত, তা না, শুধু হাসছে।

ফাল্গুন-চৈত্র গেল, বৈশাখ প্রায় শেষ হয়ে এল, বাবা লিখলেন আমাকে নিয়ে আসার জন্যে। চিঠি পড়ে ওঁর মন খুব খারাপ। একলা থাকতে হবে। বললেন, 'অবশ্য এ ক'টাদিন। জামাইষষ্ঠীতে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।' এইভাবে দিন মধুর ছন্দে কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন বাড়ি এসে বললেন, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম। এখানে আমার পোষাবে না। চল, আজই তোমায় ভাটপাড়ায় রেখে আসি।' শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। বললেন, 'মন খারাপের কী আছে। আমি ডাক্তার, যেখানেই থাকি কিছু রোজগার করবই।' দেখলাম নিজেও একটু চিন্তিত। গুছিয়ে নিলাম। আমার বিবাহিত

জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে সুখস্মৃতিতে পরিণত হল। কত বিনিদ্র রজনীর প্রলাপকথন, কত আলোকিত দীর্ঘ দিনমান, কত হাসি-অশ্রুর খেলা রেখে এলাম আমাদের দুজনের সেই প্রথম আবাসে।

রাত্রে ভাটপাড়া এলাম। সব শুনে মামা বললেন, 'হুট করে চাকরি ছেড়ে দিলে?' উনি বলেছিলেন, 'যা হয় একটা কিছু হবে।' পরদিন বেলডাঙা চলে গেলেন জিনিসপত্র আনতে। ওখান থেকে এসে আমাকে বলেছিলেন, 'জানো, তোমার রান্নাঘরের যা কিছু শিশুমতীকে দিয়ে এসেছি। ওই সব নাড়াচাড়া করতে করতে, তোমার জন্য খুব মন খারাপ লাগছিল, সব কিছুতেই তোমার হাতের স্পর্শ।' শুনে আমি বলেছিলাম, 'মন খারাপ করছ কেন? আমরা অন্য কোথাও দুজনে থাকব তো।' সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না। দেখলাম মন খুবই খারাপ হয়েছে।

মনে পড়ছে, আমি ভাটপাড়া রইলাম, উনি কলকাতা গেলেন। এবার কী করবেন? চাকরি না নিজস্ব প্র্যাকটিস? চাকরিতে ওঁর দারুণ অনীহা। যাই হোক, টাকা রোজগার তো করতে হবে, স্বপ্ন নিয়ে জগৎ চলে না। বড়ঠাকুর বলেছিলেন, 'উপস্থিত কিছুদিন মামার বাড়ি মুরাতিপুরে দেখ না। এখন গ্রামে-গঞ্জে ডাক্তারের খুব প্রয়োজন।'

মুরাতিপুর ঘোষপাড়া প্রায় একই। এখানে বিখ্যাত সতীমার দোল হয়। দোলে দিগ্‌বিদিক থেকে যাত্রী আসেন, সতীমার ঘরে পুজো দেন। কথিত আছে, সতীমার পুকুরে স্নান করে কত অন্ধ আতুর কত কঠিন কঠিন রোগী রোগমুক্ত হয়েছেন। চক্ষুহীন চক্ষুলাভ করেছেন। তৃপ্ত হয়ে বাড়ি গেছেন। এটি বহু যুগ ধরেই আউল-বাউলদের সাধনপীঠ বলে খ্যাত। মুরাতিপুর তাই সতীমার স্থান।

দাদার আদেশ মাথায় নিয়ে উনি গেলেন দাদুর ভাঙাবাড়ি মুরাতিপুরে। মনে পড়ল, এই দাদুর তৎকালীন মুরাতিপুরের জমিদারকে লেখা একটি আবেদনপত্র আমার কাছে রয়েছে। এই বাড়িতে বড়ঠাকুর ও আমার স্বামীর জন্ম হয়। তা ছাড়া বড়ঠাকুরের প্রথম বিয়ে, বৌভাত, গৌরীদির বধূবরণ সব এবাড়িতেই হয়েছিল। দাদু-দিদিমা, মা-মাসিমা, মামাদের নিয়ে বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি। তখন বাড়ির এক অবস্থা ছিল। এখন পরিত্যক্ত, ভগ্ন জরাজীর্ণ। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। শূন্য বাড়ি, গ্রাম দেশ দু-একঘর দরিদ্র পড়শি। আশপাশের অনেকেই শহরবাসী হয়েছেন। নেহাতই যাঁরা আছেন, কোনোরকমে তাঁদের দিন চলে। ছোটবেলায় মা-দিদিমাদের সঙ্গে এবাড়িতে কাটিয়েছেন উনি। তারপর বহু বৎসর চলে গেছে, এই দীর্ঘদিন পরে এসে আর ভালো লাগছে না। পৈতৃকভূমি ব্যারাকপুর, ওখানে কেটেছে বাল্যকাল, তারপর বনগাঁ বোর্ডিং। ওইখানকার হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

বড়ঠাকুর বলতেন, 'নুটু শ্রীরামপুর কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়, তখন থেকেই আমরা দু ভাই ৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে কাটিয়েছি।' মনে হয় মাত্র কিছুদিনের জন্য আমার স্বামী অন্য একটি মেসে ছিলেন, কারণ বড়ঠাকুরের একটি ডায়েরি দেখেছিলাম, লিখেছেন: 'নুটুর মেস থেকে বেরিয়ে দুজনে গল্প করতে করতে অনেকখানি রাস্তা এলাম।' এরপর দুজনে একই মেসে ছিলেন। আমার বিয়ের মাত্র কয়েক মাস আগে উনি বেলডাঙায় চাকরি পেয়ে দাদার কাছ ছেড়ে সেখানে যান।

২৭

মুরাতিপুরে নতুন অধ্যায় শুরু হল। কিছু ওষুধপত্র নিয়ে ওখানে গেলেন। উনি বলতেন, 'এ আমার নির্বাসন।' ইতিমধ্যে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে বাবা নিমন্ত্রণ করেছেন। আমার অন্যান্য বোন-ভগ্নীপতিরা সব আসবেন, আনন্দ হবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। ওই সময় আমার ছোটদাদা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। স্থানীয় ডাক্তার চিকিৎসা করছেন, আমার স্বামী খবর পেয়ে এলেন। রাতদিন জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছোড়দার চিকিৎসায় সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মাত্র উনিশ বছর বয়সে আমার ছোড়দা মারা গেলেন। সেই দিনটি ছিল জামাইষষ্ঠী। বাড়িতে প্রথম মৃত্যুর হানা, সবাই কাতর। দাদা-মেজদাকে আমরা ভয় করতাম। ছোড়দা ছিল আমাদের বন্ধুর মতো। বাইরের দীপবর্তিকা নিয়ে ছোড়দাই আসত আমাদের বোনেদের দলে। কোথায় কী হচ্ছে বলবে ছোড়দা, প্রয়োজনে ছোড়দা। হাসি আনন্দে ছোড়দা। সেই চলে গেল ঘর ও মন শূন্য করে। চিরদিনের মতো উঠে গেল বাড়ির জামাইষষ্ঠী। আমাদের জামাইষষ্ঠী হল না।

মা ভেঙে পড়েছেন, সংসার অচল। আষাঢ় মাসে দাদার বিয়ে হল। ঘটা হল, লোকজন খেল. অনুষ্ঠানের ত্রুটি হল না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই নিমন্ত্রিত হলেন। আমার স্বামী বরযাত্রী গেলেন, আনন্দ করলেন। সত্যি বলতে কী, আমার একটুও আনন্দ হয়নি। ছোড়দা নেই। বৌভাতে উনি এলেন না, বাড়ির সবাই বলছে, 'নুটু কেন এল না!' আমার ভাবনা হচ্ছে, অসুখ করেনি তো? একলা আছেন। বেলডাঙায় যে মানুষটিকে একান্ত কাছে পেয়েছিলাম, তাঁকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এইটুকু বুঝেছিলাম, ওঁর মন অত্যন্ত নরম। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছেন, গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাননি। একমাত্র দাদা, হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা বোধ হয় উনি দাদার চরণে নিবেদন করেছিলেন।

মামাতো ভাইবোনেরা ছিল ওঁর খুবই স্নেহের পাত্র। ঠাকুরপোরা আজও বড়দা ও মেজদার কথায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, ওদের মেজদা ছিল স্বাস্থ্যবান আনন্দময় মানুষ। রাগও ছিল খুব, অন্যায় বরদাস্ত করা ওঁর ধাতে সইত না। তখন বয়স ছিল অল্প, মন ও চোখ ছিল তাজা। মা, অর্থাৎ মামিমা বলতেন, 'নুটুকে নিয়ে ট্রেনে কোথাও যেতে হলে ভয় করত। গাড়িতে উঠেই কারওর সঙ্গে না ঝগড়া বাধিয়ে দেয়।' ওরা মেজদার সঙ্গে খোলাখুলি মিশত, যদিও ওরা বয়সে অনেক ছোট ছিল।

বড়দাকে ওরা ভালোবাসত, বড়দার ছেলেমানুষিতে হাসত। এলে গল্প শুনতে বসত। মেজদা এলে, কখনো বল-খেলা, কখনও হইহই, গল্প, তর্ক, বকুনি, হাসি-গান চলত। আজও মেজদা ওদের কাছে গল্পের একটা অংশ হয়ে আছে। ওদের মেজদার হাসি সত্যি অপূর্ব ছিল। সর্বোপরি প্রশস্ত বুকের মধ্যে ছিল একটি স্নেহকোমল মন। মা দুই ভাগ্নেকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। ওঁরাও মাকে ভক্তি করতেন। শ্রদ্ধা করতেন, ওঁরা মামিমার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। মার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর ওঁদের খুবই আস্থা ছিল। মার আদেশ ওঁরা কোনো সময়ই অমান্য করতেন না।

আমার ছোট মামাশ্বশুর ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। বেশ মনে আছে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘ সুস্থদেহী ব্যক্তি, মুখশ্রী ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। এমন কর্তব্যপরায়ণ মানুষ খুব কমই দেখা যায়। সবার প্রতি সমান দৃষ্টি। ভাগ্নেদের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও স্নেহ ছিল। কিছুদিন চিঠি না পেলেই উতলা হয়ে দুই ভাইকে চিঠি লিখতেন— 'কেমন আছো সব? চিঠি দাও না কেন?'

সকাল হচ্ছে, রাত্রি আসছে, দিন গড়িয়ে যাচ্ছে বিশ্বদেবতার চরণতলে। নামল ঘনঘোর শ্রাবণের বর্ষণ। আমাদের জীবনে এল দুর্দিন। দীর্ঘ চার মাস আমরা রইলাম দূরে দূরে। উনি একা নির্জন ভাঙাবাড়িতে আছেন। একটিও কথা কওয়ার লোক নেই। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে, জনবিরল পথঘাট কাদায় পূর্ণ। পল্লির বর্ষণমুখর নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে একটানা ঝিল্লিরব, ভেক ও শিয়ালের ডাক। উনি অস্থির হয়ে উঠেছেন, 'একটুও ভালো লাগছে না।' চিঠি আসে বিরহকাতর অন্তরের যন্ত্রণার বার্তা নিয়ে। লেখেন, 'তুমি এসো।'

আমার ওপর প্রচণ্ড অভিমান। আমি নাকি ওঁর কাছে যেতে চাই না। এটা যে সত্য নয় সেটা উনি বুঝেও বুঝতে চাইতেন না। মাথার ওপর বড়ঠাকুর, মামা, মা এঁরা রয়েছেন। এঁরা যদি ব্যাপারটা না বোঝেন। আমি আপনা থেকে কি বলতে পারি, আমি ওঁর কাছে যাব। উনি নিজে কিন্তু কাউকে বলছেন না, যমুনাকে পাঠিয়ে দিন। গুরুজনেরা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন আমি গেলে অসুবিধা হবে। তখন অল্প বয়স, তার

উপর মুখ্যু মানুষ, বুঝতে পারছি না কী করব। ঘনঘন চিঠি আসে। দিনলিপির পাতা ভরে ওঠে বর্ষার বর্ণনায় আর বিরহ কাতরতায়।

জানি না আমাদের ভাগ্যদেবতার এ কী খেলা। যখন দুটি প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাওয়ার জন্য উন্মুখ, তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যে তাঁর কী আনন্দ, কী মাধুর্য লুকিয়ে থাকতে পারে? দুঃখের অভিনয় দেখতে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু যাদের জীবনে সেই দুঃখ নেমে আসে, তাদের যন্ত্রণা যে দুঃসহ! জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি বৃথা বয়ে যাচ্ছে।

আক্ষেপ করে চিঠি আসে। সেইসব চিঠির লেখাগুলি কালের স্পর্শে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কাগজ হয়ে এসেছে জীর্ণ। পোকায় কোনো কোনো জায়গা কেটে দিয়েছে, একদিন মহাকালের অনন্তধারায় কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভাবলে খারাপ লাগে। ভালোবাসা ও মায়ায় জড়ানো এই মর্ত্যজীবন বড় মধুর। ভুলতে গেলেও ব্যথা বাজে।

আজ মনে হয় কেন তখন সকল লজ্জা সকল সংকোচ কাটিয়ে ওঁর কাছে যাইনি। 'কেন তখন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।' আজও সেসব কথা ভাবলে চোখে জল আসে। ওঁর সেই একাকিত্ব আমি আমার উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারলে উনি খুশি হতেন। কিন্তু আমি তা পারিনি। আমার চিঠির জন্যে ওঁর ব্যাকুলতা মনে পড়ছে। তেমনি ব্যাকুলতা এখন আমি শতগুণ অনুভব করছি। মনে হত এখনই ওর চিঠি আসবে, খুলে পড়ব। 'মিনু, কেমন আছো? অনেকদিন দূরে আছো, কবে আসবে বলো। তুমি আবার আসতে চাও না।' এমনি কতকিছু। সে প্রতীক্ষা আমার ব্যর্থ হয়, প্রিয়তমের বার্তা নিয়ে চিঠি আসে না। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় চোখে জল ভরে আসে। আমার এই ব্যথিত চোখের জল কি ওঁর চরণতলে পৌঁছোয়? আজ তিনি আমার কাছ থেকে বহু দূরে জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে চলে গেছেন। আমার কাতরকণ্ঠের ক্ষমাভিক্ষা তিনি কি শুনতে পাবেন? আজও যে আমি তাঁর বিরহের প্রদীপ জ্বেলে নিত্য প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছি। এতেও কি আমার জীবনদেবতা আমাকে ক্ষমা করবেন না?

বর্ষাকাল। ঝড়বৃষ্টি লেগেই আছে। উনি এক-আধদিন ভাটপাড়ায় আসেন, সবার সঙ্গে কথা বলেন। আমি ঘুরি ফিরি দেখি, কিন্তু কাছে গিয়ে কথা বলা আর হয় না। রাত্রে দেখা হলে বলেন, 'কতদিন পরে এলাম, তুমি আমার কাছে এসে একবার দেখাও করলে না? জিজ্ঞেস করলে না কেমন আছি? জানো সেখানে একলা কেমন করে আমার দিন কাটে।'

সেদিন রাত্রে খুব কেঁদেছিলাম, উনি শুধু আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন, কিছু বলেননি। তখনকার দিনে স্বামীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলার চল ছিল না। তা ছাড়া আমার নির্দিষ্ট কোনো ঘর ছিল না। যেখানে স্বামী এলে সেই ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎ

হবে। ঘরের কথা বললে যদি ওঁর মনে আঘাত লাগে, ভাবেন যদি আমার বাড়ি নেই, তাই আমি বলছি। তাই নীরবে সব অনুরাগ শুনেছি।

আজকাল দেখি নতুন স্বামী-স্ত্রী কত সহজে অল্পদিনেই দুজনকে জেনে ফেলে। বুঝে ফেলে। সহজেই স্বামীর ওপর অধিকার বিস্তার করে। বিয়ের দিন মধুচন্দ্রিমা তো অবশ্যকর্তব্য। বিয়ের আগেই টিকিট বুক করা থাকে। ভালো নামিদামি হোটেলে ওঠা, রেস্টুরেন্টে গালভরা নামের মেনু চয়েস করা, সিনেমা দেখা— এসব যেন বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যেই পড়ে গেছে। বড়দের প্রতি অযথা সমীহ নেই, ভয়ও নেই। অযথা সংকোচ বা লজ্জা তো নিজেরই অপমান। তাই দুজনের সম্পর্ক কেমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মনে হয় আজকাল একটু বড় হয়ে এবং লেখাপড়া শিখে মেয়েদের বিয়ে হয়, সেইজন্য। এটা সত্যিই ভালো।

তবে অবশ্য ছোট বয়সের বিয়ের একটা ভালো দিক আছে। ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলেই শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নিতে পেরেছি। নিজের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে স্বামীর ভালো লাগাকে উপলব্ধি করেছি। এবং সেটাই জীবনের আদর্শ ও আনন্দ বলে মেনে নিয়েছি। উনি প্রায়ই বলতেন, 'লেখাপড়া করবে, সাহিত্য পড়বে এবং চর্চা করবে।' বড়ঠাকুর বলতেন, 'তোমরা শুধু রান্নাঘর নিয়ে পড়ে থেকো না। জীবনে অনেক কিছু জানার আছে, অবসরমতো পড়াশুনো করবে।' দিদি লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়াতে বড়ঠাকুর দুঃখিত হয়েছিলেন।

এঁদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল একটু অন্য ধরনের। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এঁদের রক্তের সঙ্গে মিশেছিল। দাদা লেখক, তৎকালীন শিক্ষিত ও গুণীসমাজের মধ্যে ছিল ওঁদের আনাগোনা। দাদার পরিচয়ে উনি ছিলেন তাঁদের ছোটভাই। নিজে ডাক্তার, সাহিত্যানুরাগী, উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভক্ত এবং গায়ক। উনি ইংরেজি সাহিত্য ভালোবাসতেন, পড়তেনও খুব। দাদার বই-এর পাহাড়ের মধ্যে বাস, তাই ভালো বই ওঁকে অন্বেষণ করে আনতে হয়নি, হাতের কাছেই পেয়েছেন। কখনও বা দাদা নিজেই বলেছেন, 'এ বইটা পড়ো, ভালো লাগবে।' বড়ঠাকুর ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের ও বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পাঠক। কোনোদিকেই ওঁর জ্ঞান কম ছিল না।

আমরা স্বামী খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারতেন। ওঁর প্রকৃতিটা ছিল একটু রোমান্টিক ধরনের। কতদিন গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি গভীর হয়ে যেত। উনি বলতেন, 'না, আর নয়, এবার ঘুমোনো যাক।' ওঁর চিঠি পড়ে এবং ওঁর সংস্পর্শে থেকে ভাষার প্রতি আমার একটা ভালোবাসা জন্মেছিল। বলতেন, 'পড়তে পড়তে দেখবে ভাষার ওপর তোমার একটা দখল এসে গেছে।' লেখাও যে একটা শিল্প এ আমি ওঁর কাছেই শিখেছি। শিক্ষার মতো শিক্ষা দিয়েছেন, স্নেহ করেছেন, ভালোবেসেছেন ও ক্ষমা করেছেন। বয়সের স্বল্পতা, শিক্ষার অজ্ঞতা. হয়তো ওঁর

চাওয়া-পাওয়া সবটুকু বুঝতে পারিনি, বা ঠিকমতো নিজেকে প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু উনি জানতেন আমার মধ্যে কোনো কপটতা নেই। ছোট বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে বোধ হয় ওঁর মায়া-মমতাকে বেশি করে আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম।

সেবার প্রচণ্ড বর্ষার দিনগুলি উনি একলা মুরাতিপুরে কাটাচ্ছেন। সে বছর একনাগাড়ে আটদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছিল। দরিদ্র গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, উনিও ততোধিক কাতর হয়ে পড়েছেন। তেমনি সাপের উপদ্রব, রোগীপত্র নেই বললেই হয়। সঙ্গীহীন অবসরে একমাত্র সঙ্গী ছিল বই। এর কিছুদিন আগে বড়ঠাকুরের 'আরণ্যক' প্রকাশিত হয়েছে। উনি আমাকে লিখেছিলেন, 'এখন দাদার 'আরণ্যক' পড়ছি।' পরবর্তীকালে আমি দেখেছি, সুখে-দুঃখে, আনন্দ-সংকটে উনি সবসময়ই দাদার কাছে আশ্রয় খুঁজেছেন। হয় দাদার কাছে গেছেন, নয় দাদার চিঠি এসেছে, হয়তো বা দাদা এসেছেন। এর কোনোটাই না হলে উনি তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে দাদার উপস্থিতি অনুভব করেছেন, সান্ত্বনা পেয়েছেন, কাছে পেয়েছেন।

এইভাবে দুঃখময় আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র কাটল। এল অরুণ আলোয় ভরা শরৎ। আকাশের রং গেল বদলে, বাতাসে আগমণির বার্তা, কাশের গুচ্ছে হাওয়ার কাঁপন। পৃথিবীর অঞ্চল ভরে উঠেছে শিউলি ফুলে, তারই সুবাসে বাতাস মন্থর। এল আশ্বিন। মহামায়ার আগমনে ধন্য হল চরাচর। মনে আছে আমার বিয়ের প্রথম বছর উভয় পক্ষই তত্ত্ব করলেন। এঁরা আমাকে একটা নীলরঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক দিয়েছিলেন, মা দিয়েছিলেন একটা সবুজ রঙের ঢাকাই। উনি পুজোর একটা দিন ভাটপাড়ায় থেকে পরদিন কলকাতা চলে গেলেন।

মুরাতিপুর ভালো লাগছে না। ওখানকার দরিদ্র মানুষগুলির কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিতে ওঁর মনে বাধছিল। বড়ঠাকুর বললেন, 'ঘাটশিলায় বাড়িটা পাওয়া গেছে, ওখানে গিয়ে দেখ কেমন হয়।' বড়ঠাকুরের বন্ধু অশোক গুপ্ত একসময় বড়ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলেন, তিনি বিলেত চলে যাওয়ার সময় ওই বাড়িটা বড়ঠাকুরকে দিয়ে ঋণমুক্ত হয়ে এদেশ থেকে চলে যান।

২৮

ইতিমধ্যে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে এল অগ্রহায়ণ। হঠাৎ সংবাদ এল জাহ্নবীদি জলে ডুবে মারা গেছেন। বড়ঠাকুর উমা-শান্তর পড়াশুনোর জন্যে ওদের বনগ্রামে বাসা করে রেখেছিলেন। একদিন জাহ্নবীদি ছেলেমেয়েকে খাইয়ে ইছামতীতে স্নান করতে

গেছেন, আর ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। বড়ঠাকুর কলকাতা থেকে গেলেন। উনি মুরাতিপুর থেকে। কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে উনি ভাটপাড়া এলেন। মন খুব খারাপ। আমাকে বলেছিলেন, তোমার বোধহয় দিদিকে মনে নেই, না?

আমি বলেছিলাম, খুব মনে আছে।

বললেন, একটা দিদি ছিল, তাও চলে গেল।

উনি কলকাতা চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে লিখেছিলেন, 'মিনু, অনেক দূর চলে যাচ্ছি। এবার আমার ভাগ্য-অন্বেষণের জন্য যাত্রা, শ্যামল সমতল থেকে উষর পাহাড়ে।' ইত্যাদি।

এবার সঙ্গে যাচ্ছেন দাদা স্বয়ং। ছোটখাটো পাহাড়ি দেশ। তার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা উপলমুখরা সুবর্ণরেখা। শাল, পিয়াল, মহুয়া, কেঁদগাছে ভরা অরণ্যানী। শালমঞ্জরী আর মহুয়ার সুগন্ধে সেখানে বাতাস হয় ভারী। কয়েকদিন পরে চিঠি লিখলেন।

ঘাটশিলা পোঃ শশীকণা বাংলো
ডাহিগোড়া, জেলা সিংভূম

প্রিয় মিনু, তোমাকে চিঠি লিখতে দেরী হয়ে গেল, কিছু মনে করো না। এখানে এসে খুব ঘোরাঘুরি সুরু হয়েছে। ৪/৫ দিন আগে দাদা এসেছিলেন। এইমাত্র কলকাতা রওনা হলেন। ওঁর সঙ্গেও ঘুরতে হয়েছিল।

মিনু, আমার কথা এতদিনে নিশ্চয়ই ভুলে গেছ, না? পত্র দিচ্ছি সেইজন্যে, আবার কিছুটা সময়ের জন্যে নিশ্চয়ই মনে হবে। কেমন আছো মিনু জানিও বেশ...

ওষুধটা নিশ্চয়ই খাওনি, আমি বেশ বুঝতে পারছি। মনটা এত খারাপ হয়েছে তা লেখবার ভাষা নেই। তোমার দিনগুলো সুন্দরভাবে কাটুক এই আমি চাই। আমার চিন্তার বোঝা তোমার মাথায় চাপাব না। আজ আবার এখান থেকে ৭ মাইল দূরে গালুডি যাচ্ছি। দাদার সেই ব্যারিস্টার বন্ধু নিমন্ত্রণ করেছেন, তা রক্ষা করতে। এখনকার চারিদিক নির্জন পাহাড় আর বনজঙ্গলে ঘেরা। কমলরানী, দাদা, আমি, কলকাতা থেকে আর এক ডাক্তারবাবু এসেছেন তিনি— এইসব মিলে খুব পাহাড় বেড়ানো হয়েছে। আশা করি ভালোই আছো। ...আমার ভালোবাসা নাও। ইতি—

তোমার ডাক্তার

চিঠি পড়ে মন খারাপ লাগে। সত্যই ওঁর বড় কষ্ট হচ্ছে। একা একা কত চিন্তা-ভাবনা করছেন। আর আমি এমনি অপদার্থ বৌ ওঁকে একটুও সাহায্য করতে

পারছি না। কাছেও থাকতে পারছি না। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, অর্থ-উপার্জনের জন্য এত কষ্ট।

পরের চিঠি এল।

ঘাটশিলা পোঃ শশীকণা বাংলা
জেলা সিংভূম

কল্যাণীয়াসু,

মিনাগো, কয়েকদিন আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল, রাগ করো না, কেমন? এখানকার আলো বাতাস পথ জঙ্গল সবই নতুন নবীন আর প্রাণপূর্ণ বটে, কিন্তু, তবুও তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমার মনে মেঘ জমেছে, কেন আমি এমনি অন্ধকার। সত্যি আমি আর স্পষ্ট করে বলব না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি বুঝছ। আমার সেই ওষুধ খেয়ে রোগমুক্ত হয়েছ শুনে আনন্দিত হয়েছি। এইবার যদি সেই শিশির ওষুধটা একটু গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাও বেশ হয় কিন্তু। দু-ফোঁটামাত্র একটু জলে কিছু খাওয়ার পর, নয়তো সন্ধ্যায় খাবে। তোমার দিন কেমন কাটে তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, তাতেই আমার আনন্দ। সারাদিন ছেলেপিলেদের মধ্যে বেশ হাসি আনন্দে গল্পে কাটাও, দূর থেকে এতেই আমি খুশি।

আবার সেই অগ্রহায়ণ পড়েছে। এক এক করে সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত দিনগুলো এগিয়ে আসছে ঐ দূর পর্বতপাত্রে, ঘন জঙ্গলের মাথায় বিপুল জ্যোৎস্নার হাসির খেলা দেখি, মনে হয় ঐ জ্যোৎস্নার হাসির মধ্যে আর-একজনের হাসি মিশিয়ে আছে। মনে হয় ওকে ডাকি। আমি আর একা থাকতে পাচ্ছি না। কিন্তু মনে হয়— না না, ও কি আমার এই নিরালা নির্জন জীবনের সাথী হতে পারবে? অত বিপুল উৎসব, অত আয়োজন, অত কোলাহল ওসব ছেড়ে— না না, ও দূরের, ও ঐ দূরের পরিপূর্ণ প্রাণের মধ্যেই থাক। শান্তি আছে, রূপও আছে। কেমন আছো জানাবে। ইতি—

তোমার পথিক

পরের চিঠিতে লিখলেন—

আমি যাচ্ছি তোমার কাছে। এবার কিন্তু নিয়ে আসব। দাদা বলেছেন তোমাকে নিয়ে আসতে। মামাকেও লিখলাম।

চিঠি পড়ে মন আনন্দে কানায় কানায় ভরে গেল। কতদিন পরে আবার ওঁর কাছে যাব। উনি নিতে এলেন। বহুদিন পরে স্বামীর কাছে চলেছি। বাপের বাড়ি, মামাশ্বশুরবাড়ি, সবাই খুশি। খুশি আমিও।

লিখতে লিখতে তখনকার সেই খুশির জোয়ার আজও যেন আমার হৃদয়দুয়ারে এসে আছড়ে পড়ছে। এ যেন আমার নিভৃত নিঃসঙ্গ জীবনে বসে বসে স্মৃতি নিয়ে খেলা অথবা স্মৃতিই আমার বন্ধু।

মনে পড়ছে ওঁর সঙ্গে ঘাটশিলা যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশন।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়তেই উজ্জ্বল হাসিমুখে আমার স্বামী পাশে এসে বসলেন। মাঝারি লম্বা স্বাস্থ্যবান পুরুষ, একটু মোটার দিকে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, মাথার চুল ঘনকৃষ্ণ, চোখদুটি উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত, ভ্রূ টানা, বাঁকানো। বাঁ-চোখের কোণে একটি ক্ষতচিহ্ন। বলিষ্ঠ চেহারা। ওই ক্ষতচিহ্নটি ছোটবেলার দুষ্টুমির সাক্ষ্য। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার এই চোখের কোণের দাগটা কীসের দাগ গো?' হেসে বলেছিলেন, 'ছোটবেলায় দারুণ ডানপিটে ছিলাম, ভয়ডর ছিল না। দাদা কলকাতায়। বাবাকে কোন ছোটবেলায় হারিয়েছি। দাদাই আমার বাবার মতো। গ্রামে থাকি। গ্রামে একটা ঘোড়া ছিল, সেটাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ওর পিঠে চড়তাম। ভারী পাজি ছিল ঘোড়াটা। একদিন ওর পিঠে উঠে বসেছি, পা দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছি, নড়ে না। শুধু পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আমার প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। যেই মারতে শুরু করেছি, হঠাৎ ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। ঘোড়ার পায়ের একটা খুর আমার বাঁ-চোখের কোণে এসে লাগল। ব্যস! খুব রক্ত পড়ছে দেখে কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে গেলাম। মা বললেন, ভাগ্যিস চোখটা যায় নি। বকে বকে মা কীসব লাগিয়ে দিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত ঘা ছিল, আস্তে আস্তে শুকোল। দাদা বাড়ি এসে শুনে বকলেন, বললেন, আর ঘোড়ায় চড়বে না।'

উনি বলেছিলেন, 'দাদা যখন ইসমাইলপুরে ছিলেন তখন দুজনে দাদার কাছে গিয়ে আশ মিটিয়ে ঘোড়ায় চড়েছি। তখন আমি বড়। দাদা আমি দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে কতদূর যেতাম। এক একদিন একলাও যেতাম। ঘোড়া ছুটিয়ে যে কী আনন্দ, তুমি বুঝবে না।' একবার দেশ থেকে বড়ঠাকুর ভাইকে লিখেছিলেন, 'ইসমাইলপুর কাছারি থেকে গদাধর পাঁড়ে মুহুরি তোমাকে পত্র দিয়েছে।'

সেদিন উনি নেভি ব্লু রঙের একটা গরমের সুট পরেছিলেন, আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেমন লাগছে বলো।' বললাম, 'খুব ভালো।'

অগ্রহায়ণের প্রায় শেষ দিক। বেশ শীত পড়ে গেছে। যাচ্ছি পাহাড়ি দেশে, রাতের গাড়ি, তাই আমি লালরঙের শালের শাড়িটা পরেছিলাম, যেটা বড়ঠাকুর শীতের

তত্ত্বে দিয়েছিলেন। ঘাটশিলা যাব বলে কলকাতা থেকে আমার স্বামী একটা গরমের কোট আর একটা স্কার্ফ কিনে দিয়েছিলেন। কোট ছিল আমার গায়ে। স্কার্ফটা সঙ্গে নিয়েছি। উনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোট তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

সত্যি, দুটো জিনিসই আমার পছন্দ হয়েছিল। ট্রেনের কামরায় ভিড় ছিল না। আমাদের বেঞ্চের দিকে কয়েকজন অবাঙালি ভদ্রলোক ও একজন অল্পবয়সি মহিলা বসেছিলেন মাত্র। এখনকার ট্রেনযাত্রীরা ওরকম ফাঁকা ট্রেন কল্পনাই করতে পারবে না।

স্তব্ধ রাত্রি। গাড়ি ছুটে চলেছে। আমার এই প্রথম দূরের যাত্রা। বিয়ের আগে উত্তরদিকে রাণাঘাট ও দক্ষিণদিকে কলকাতা পর্যন্ত ছিল আমার ভ্রমণের পরিধি। এত দূর কখনও যাইনি, পাহাড় কি সমুদ্র কিছুই দেখিনি। নদীর মধ্যে দেখেছি গঙ্গা আব চূর্ণি। অসীম আগ্রহে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। ঈষৎ জ্যোৎস্নায় কেমন সব যেন মায়াময় লাগছে। ভারী ভালো লাগছিল। সঙ্গে স্বামী। একটুও ভয় করছে না, তাঁর ওপর অনন্ত নির্ভরতা। জানলার দিকে মুখ করে দুজনে মুখোমুখি বসেছি, উনি বললেন, 'দাদা ঘাটশিলায় এলে খুব যত্ন করবে। দাদা আমাকে বড় ভালোবাসেন। দেখলে না প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখছিলেন। দিদিরা, মা, বৌদি— সবাই চলে গেলেন, কে বা যত্ন করবে।'

আমি মন দিয়ে শুনছি। ওইসব কথা বলতে বলতে একসময় বললেন, 'আমার কাছে যেতে তোমার ভালো লাগছে তো?' তারপর বললেন, 'জানি সবাইকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে। চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে কত বেড়াব— নদী, পাহাড়, জঙ্গল। কয়েকদিন আগে দাদা ঘাটশিলায় এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে খুব জঙ্গলে বেড়িয়েছি। তোমাকেও ওইসব জায়গায় নিয়ে যাব। দাদা তো ভীষণ বেড়াতে ভালোবাসেন। ঘাটশিলা দাদার খুব ভালো লেগেছে। আমারও ভালো লেগেছে। তবে এখানে বসে প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছে করছে না। তোমাকে নিয়ে যদি এখানে বেড়াতে আসতাম তাহলে ভালো লাগত। থাকতে হবে ভাবলে আর ভালো লাগছে না। চলো, দেখবে। দাদা যখন বলেছেন দেখি কী হয়। কলকাতা ছেড়ে আমার কোথাও থাকতে ইচ্ছে করে না। ওখানে বন্ধুবান্ধব, বিভূতিদা, মতিলাল, আমার গান—। যাক, দুঃখ করে কী হবে? যা ভাগ্যে আছে তা হবে।'

বলে পাশে বসে-থাকা লোকগুলির সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। ওঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ডাক্তার? নতুন বিয়ে করে বৌ নিয়ে যাচ্ছেন বুঝি?' এমনি সব কথা।

এক সময় উনি আমার দিকে ফিরে গান ধরলেন। সেদিন ওঁর গান শুনতে খুব ভালো লাগছিল। গাড়ি ছুটে চলেছে, চোখের পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে অপরিচিত বনভূমি, প্রান্তর, বৃক্ষলতা। একসময়ে গাড়ি রূপনারায়ণের ব্রিজ পার হল। চেয়ে দেখছি রূপনারায়ণের জলের ওপর জ্যোৎস্না পড়ে অদ্ভুত ঝকমক করছে।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে কামরার সবাই তন্দ্রালু হয়ে পড়েছেন। আমার স্বামী বললেন, 'তুমি একটু শুয়ে নেবে নাকি?' আমি বললাম, 'না। বরং তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছ।' উনি রাজি হলেন না। বললেন, 'আমার পাশে জায়গা রয়েছে। তুমি শুয়ে নাও। আমি জেগে আছি।'

আমি ওঁর পাশে শুলাম। গাড়ির দুলুনি ও শীতের প্রভাবে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একসময় শুনি উনি আস্তে আস্তে ডাকছেন। উঠে দেখি গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে। দূর থেকে স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে।

ট্রেন এসে দাঁড়াল ঘাটশিলা স্টেশনে। তখন ইলেকট্রিক ছিল না। স্টেশনে টিমটিম করছে আলো। কুলি এসে জিনিসপত্তর নামিয়ে নিল। আমি নামতে গেলাম, উনি বললেন, 'দাঁড়াও।' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি ওঁর হাত ধরে নামলাম।

নিচু প্ল্যাটফর্ম। ওঁর হাত না ধরলে নামতে একটু অসুবিধা হত। নেমে দেখি রাত্রিশেষের ম্লান জ্যোৎস্না ভরে আছে চারিদিকে। স্টেশনে পাথরের গাঁথুনির দুখানি ঘর, দু-একজন লোক শুধু জেগে আছে। বেরোবার গেটের দিকে দুটো বেঞ্চে দুটি লোক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শীতে জড়সড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। কুলির মাথায় বাক্স সুটকেশ ইত্যাদি দিয়ে আমরা স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কনকনে শীত। তখন ওখানে একটি ভাড়াটে ট্যাক্সি চলছিল। উনি কী যেন একটা নাম ধরে ডাকলেন। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এল, গাড়িতে উঠে বসলাম। আজ দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও লিখতে বসে আমার সমগ্র সত্তা যেন সেদিনের সেই নৈশযাত্রার আবেশটুকু অনুভব করতে পারছি যে আমি ওঁর পাশে পরম নিশ্চিন্তে সম্পূর্ণ নির্ভরতায় চলেছি। স্বচ্ছ নীল আকাশ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে আছে। আমার অপরিচিত দেশ। বাতাসের শীতলতায় মধুর আহ্বান। উনি বললেন, 'চলো। এই আমাদের রাঙামাটির দেশ।' তারপর হাত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে দূরে দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে আছে— ওগুলো হচ্ছে পাহাড়।'

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। লাল কাঁকর মাটি মোরাম ও ছোট ছোট নুড়ি ছড়ানো উঁচুনিচু রাস্তা। একপাশে রেললাইন, অপরপার্শ্বে ছোট ছোট টিলা। খানিকটা এসে পুবদিকে হাতটা তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখ ফুলডুংরি পাহাড়। আর ওই যে দেখছ বড় বাড়িটা, ওটা হল লরিবাংলা। ওইখানে একসময় একজন সাহেব

থাকতেন, অবশ্য এখন আর নেই। আর ওই যে ভাঙা টিনের চালওয়ালা বাড়ি—ওটা টিনবাংলো। এই যে সোজা রাস্তা যাচ্ছে না, এটা মৌভাণ্ডার পর্যন্ত চলে গেছে, ওখানে কপার ফ্যাক্টরি।'

আমি আগ্রহভরে দেখছি ও শুনছি। এক জায়গায় এসে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। সোজা রাস্তা চলে গেছে মৌভাণ্ডারের দিকে আর বাঁদিকে বেঁকে গেছে যে রাস্তাটা সেটা আমাদের বাড়ি ডাহিগোড়ার দিকে। এই রাস্তায় ঢোকার মুখেই দু-দিকে দুটো বিশাল আমগাছ তার শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওই মোড়ের মাথায় বিশ্রামের মিষ্টির দোকান আর একটি ছোট্ট চালায় উদয়ের পানবিড়ির দোকান। ওই মোড় দিয়ে আমাদের গাড়ি ঢুকল শীলবাংলাকে রেখে।

ডানদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বিরাট নার্সারি। বাঁদিকে কুরচি ও শালপিয়ালের বাগানঘেরা রেখাবাংলা। তার ঠিক পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে আতাবাংলার দিকে। আমাদের বাড়ি সোজা পথের শেষে। অবশেষে গাড়ি আমাদের বাড়ি 'গৌরীকুঞ্জে' এসে থামল। পাশে 'মাতৃধাম', সামনে ওভারসিয়ারবাবুর বাড়ি।

আমার স্বামী গাড়ি থেকে নেমে হেসে বললেন, 'নেমে পড়ো, এসে গেছি। দেখ, এই আমাদের কুটির।'

দেখি খোলায় ছাওয়া একটি ছোট্ট কোঠাবাড়ি। গাড়ির শব্দ পেয়ে তিনুঠাকুরপো, আমাদের দেশের একটি ছেলে, হারিকেন হাতে বেরিয়ে এল। উনি বললেন, 'তিনু, তোর বৌদি এসেছে।' তিনুঠাকুরপো এসে প্রণাম করে জিনিসপত্র সব নামিয়ে নিল। বারান্দায় উঠে আমার স্বামী বললেন, 'দাঁড়াও, আগে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি দেখে নাও। ওই যে উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট উঁচু চূড়া আকাশের সঙ্গে মিশে আছে, ওটাই সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। বুঝলে?' বলে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী বুঝলে বলো?' আমি বললাম, 'খুব ভালো লাগছে।' বললেন, 'কাল সকালে দেখো, আরও ভালো লাগবে।'

পাশাপাশি দুটি বেশ বড় ঘর। একটি ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর। অপর পাশে একটা রান্নাঘর। বাথরুম, সবই লাগোয়া। ঘরের মধ্য দিয়ে সব ঘরে যাওয়ার জন্যে মাঝে দরজা ফোটানো হয়েছে। বড়ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। পরে দিদি, বড়ঠাকুর এলে বড়ঘরে থাকতেন। আমরা ছোটঘরে। উমা-শান্ত থাকত পাশের বড়ঘরে।

নতুন জায়গা, পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। বাইরের বারান্দায় এসে দেখি, রাতের দেখা পাহাড় দিনের আলোয় যেন পরিপূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভোরের আলোয় প্রথম দেখা দেশটি খুব ভালো লাগছিল। সামনে ওভারসিয়ারবাবুর বাড়ির প্রাচীর। এ ঘরে ছোট ছোট জানলার সারি। তার ওদিকে দূরে ইউক্যালিপটাস গাছ

অনবরত হাওয়ায় লম্বা লম্বা পাতা দুলিয়ে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির শীর্ষদেশে উজ্জ্বল আলোর আভা। নির্মেঘ নীল আকাশ। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, উনি এসে পাশে চুপ করে দাঁড়ালেন। বললেন, 'খুব ভালো লাগছে, না?' বলে বললেন, 'আমি কিন্তু একটু বেরুব। নতুন ডাক্তারখানা, বন্ধ রাখা ঠিক হবে না।'

একটু পরে, উনি তখনও বেরোননি, নার্সারির দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক মশাই এলেন। সঙ্গে মালির হাতে সুন্দর এবং মস্ত বড় একটি ফুলের তোড়া। তোড়াটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ফুলদানিতে রেখে দিয়ো। আর ফুলদানির জলে একটু নুন দিয়ো।' আমি তাড়াতাড়ি প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে বললেন, 'থাক, থাক।' তারপর আমার স্বামীকে বললেন, 'ডাক্তার, আজ তোমরা আমার ওখানে খাবে।' আমার স্বামী বললেন, 'এ বেলা নয়। বিকেলে যমুনাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে তারপর আপনার বাড়ি যাব।'

আমি বিয়েতে পাওয়া বেশ বড় ও এবং সুন্দর কাচের ফুলদানিতে ফুলগুলি সযত্নে সাজিয়ে রেখে ওঁকে চা করে দিলাম। খেয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'বিকেলে তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব। বেশি দেরি করব না। একটু ঘুরেই চলে আসছি।'

উনি বেরিয়ে গেলে আমি জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলাম। অনেকটা সময় গেল কিছুটা গোছাতে। স্টোভে রান্না কী করেছিলাম মনে নেই। বোধহয় মনে রাখার মতো কিছু নয়। বেলায় বাড়ি এসে ঘরে ঢুকেই বললেন, 'বাঃ! ঘরের চেহারা পালটে ফেলেছ দেখছি। এরই জন্যে বউয়ের দরকার।'

২৯

ওইদিন বিকেলে রেললাইন পার হয়ে রাঙামাটির পথ ধরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফুলডুংরির পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। ছোট পাহাড়। তার গায়ে শাল, মহুয়া, কেঁদ ও বন্যলতার সমারোহ। আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। পাকদণ্ডি পথ, মাঝে মাঝে নুড়িগুলোতে পা পড়ে হড়কে যাচ্ছে। উনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হাত ধরে ওঠো।'

পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপর বড় একটা শালগাছ। অনেক দূর থেকে গাছটা দেখা যায়। অনেকে একে বলত 'টিকি পাহাড়'। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। দূরে অনেকটা দূরে মৌভাণ্ডারের ফ্যাক্টরির সুউচ্চ চিমনিগুলো দিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে কালো ধোঁয়া ক্রমাগত ওপরে উঠছে। দূরে আরও দূরে দিক্‌চক্রবালে নীল শৈলমালার সারি। অনেকক্ষণ আমরা ওখানে বসে রইলাম। অনেকদিন পরে আবার

দুজনে বেরিয়েছি। সেই বেলডাঙায় দুজনে বিকেলে বেড়াতে যেতাম। আসন্ন সন্ধ্যায় আমরা নেমে এলাম। বললেন, 'চলো, দ্বিজেনবাবুর বাড়ি যেতে হবে। ওঁর মেজছেলের স্ত্রী এখানে আছেন।'

দ্বিজেনবাবুর বাড়ি বেশ বড় এবং পাথরের গাঁথুনি। বাড়ির সংলগ্ন বিরাট নার্সারি। নামকরা নার্সারি। দেশে বিদেশে ওঁরা বীজ ও চারা পাঠান। তখন এই নার্সারি একটি সুন্দর মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান ছিল। সেদিন রাত্রি হয়ে গিয়েছিল, তাই ভালো করে কিছু দেখা হল না। দ্বিজেনবাবুর পুত্র বনবিহারীবাবুর স্ত্রী আমাদের খুবই যত্ন আদর করলেন। খাওয়ালেন খুব। দ্বিজেনবাবুর পুত্রবধূ অনুদিকে আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। ওঁর কাছ থেকে অপার স্নেহ পেয়েছি। সেদিন দ্বিজেনবাবু নিজের লেখা পড়ে শোনালেন, তাই আমাদের বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়েছিল।

এঁরই বাড়িতে পরে বড়ঠাকুর, আমার স্বামী, ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (আমার ভাশুরের বন্ধু) 'সুবর্ণ সংঘের' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি পূর্ণিমায় এই সভার অধিবেশন হত। তখন কলকাতা বা অন্য কোনো জায়গার নামি গুণী ব্যক্তিরা যখনই ঘাটশিলায় আসতেন ওই সভায় তাঁদের সাদর আহ্বান করা হত। দ্বিজেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। প্রতি অধিবেশনের আগে আমন্ত্রণলিপি পাঠাতেন।

সুবর্ণ সংঘের অধিবেশন

সুবর্ণ সংঘ
কেন্দ্রপীঠ ঘাটশিলা
বি.এন.আর.
বিশেষ তিথি ৩/১১/৪২

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ব্যানার্জী ও পরিবারবর্গ
মহাশয় ও মহাশয়াগণ,

আগামী ৬ই নভেম্বর শুক্রবার বেলা ৫-৩০ মিনিটের সময় মদীয় উদ্যানভবনে সুবর্ণ সংঘের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। অতএব মহাশয় ও মহাশয়াগণ, ওই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্ধন করিবেন। ইহাই বিনীত অনুরোধ। ইতি—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক

পরদিন ভোরে উঠে উনি বললেন, 'চলো, তোমাকে নদী দেখিয়ে আনি। পরে হয়তো সময় পাব না।' বললাম, 'সুবর্ণরেখা! কী সুন্দর নাম, না? চলো দেখে আসি।'

আমার চোখে তখন ঘাটশিলার সবকিছু অপূর্ব লাগছে। ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ওভারসিয়ারবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, উনি একটা ছোট্ট অল্প উঁচু কচ্ছপের পিঠের মতো দেখতে টিলাকে দেখিয়ে বললেন, 'দাদা এটার নাম দিয়েছেন কূর্মকূট।' আমরা বাঁধের পাড় দিয়ে সরোজবাবুর বাগানের পাশ কাটিয়ে ছোট একটা শাল-মহুয়ার বনের মধ্য দিয়ে সুবর্ণরেখার ধারে এসে দাঁড়ালাম।

শীতের শীর্ণা খরস্রোতা নদী। জলের মধ্যে মধ্যে বিরাট বিরাট পাথরের চাং জেগে উঠেছে এবং তার চারপাশ দিয়ে জলধারা ঘুরে ঘুরে পাক খেতে খেতে বয়ে চলেছে। আমি একদম নেমে জলের কাছে গিয়ে জলে হাত দিলাম। উনি বললেন, 'নেমো না, নেমো না। এখানকার নদীতে নাকি চোরাবালি আছে শুনেছি। যেখানে সেখানে নামা ঠিক নয়। যেসব জায়গা দিয়ে সাঁওতালরা যায় সেইখান দিয়ে ওপারে যেতে হয়। সাঁওতালরা সব জানে জলের মধ্যে কোথায় কী আছে। আমি না থাকলে একলা এসে নেমো না যেন।'

আমি উঠে এসে ওঁর পাশে দাঁড়ালাম। সুন্দর প্রভাত। ওপারে দিগন্তরেখা জুড়ে পাহাড় আর পাহাড়, মাঝখানে বিস্তৃত প্রান্তর। তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দুটি শ্বেতপাথরের পাহাড়। তার বক্ষ জুড়ে শাল পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষরাজির অরণ্য। আর একটা নতুন জিনিস দেখলাম। নদীর ওপরে অনেক দূর থেকে লোহার তারের ওপর দিয়ে বড় বড় লোহার বাক্স মৌভাণ্ডারের কারখানায় আসছে। অপর একটি তারে ওইভাবে বাক্স ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওগুলো কী গো?' বললেন, 'ওগুলো মুসাবনি থেকে পাথরভর্তি হয়ে কারখানায় আসছে, অপরটা খালি হয়ে ফিরে যাচ্ছে।' সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছিল। আমি খুশিতে ভবপুর হয়ে উঠেছিলাম। উনি বললেন, 'তোমার খুব ভালো লাগছে, না? দাঁড়াও, দাদা আসুন, তখন কত নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে যাব।'

বাড়ি এসে দেখি দ্বিজেনবাবু ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন। কমলদি এবং কমলদির স্বামী অমরবাবু দুজনে এসেছেন। আমি ওঁদের নাম শুনেছি, কিন্তু পরিচিত নই। কমলদি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'এসো ভাই, বৌরানি। তুমি আমাকে চেনো না। আমি কিন্তু তোমার কথা বিভূতিবাবু ও ডাক্তারবাবুর মুখে শুনেছি।' আমি হেসে বললাম, 'আমিও আপনার নাম শুনেছি।' আমার স্বামী বললেন, 'চা করো।'

চা করার জন্য ভেতরে গেলাম, কমলদিও ভেতরে এলেন। লুচি আলুভাজা ও চা দুজনে মিলে করলাম। চা-পর্ব শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ওঁরা উঠলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আজ রাত্রে আপনারা আমাদের ওখানে খাবেন। সকাল সকাল

যাবেন কিন্তু।' উনি বললেন, 'কমলদি, আমি তো দোকানদারি করছি, আমি কখন যাব ঠিক বলতে পারছি না, আপনি বরং রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে যমুনাকে নিয়ে যাবেন।'

রামকৃষ্ণ কমলদির ছোটভাই। ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। গুণী ছেলে। কবিতা লিখত, গান লিখত। আর কমলদি তো কবি। তখনকার দিনে বহু পত্রপত্রিকায় কমলদির কবিতা প্রকাশিত হত। বড়ঠাকুর কমলদিকে বড় স্নেহ করতেন। বড়ঠাকুর এসেই কমলদির সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। গল্পগুজব, দু-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খুবই হত। কমলদি শোনাতেন কবিতা আর অমরবাবু শোনাতেন গান। আজও মনে আছে 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন' এই গানটি অমরবাবু প্রায়ই গাইতেন।

এই প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ল। বাবলু তখন ছোট। ওকে নিয়ে আমি, দিদি, বড়ঠাকুর, আমার স্বামী কমলদির বাড়ি গেছি। কমলদির সে কী আনন্দ! নিজে আমাদের সবার ফটো তুললেন। সে ফটো এখনও আছে। সেদিন উনি রাত্রি প্রায় আটটায় কমলদির বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি বিকেলে গিয়েছিলাম। কমলদির মা এবং ভাই সবাই একই বাড়িতে থাকতেন। সেদিন কমলদি কবিতা শোনালেন। অমরবাবুর গান হল। তারপর শুরু হল ওঁর গান। গানে বসলে ওঁর খেয়াল থাকে না। সেদিন খাওয়াদাওয়া সেরে অনেক রাত্রে জ্যোৎস্নাঢালা শালবনের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

মনে পড়ছে আর একটা দিনের কথা। যেদিন কমলদিরা ঘাটশিলা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। সেদিনের কথা একটুও ভুলিনি। কমলদির একটি ছেলে। নামটা ঠিক মনে নেই। তার পরদিন দেখা করতে এলেন। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমাকে বললেন, 'বৌরানি, কলকাতা গেলে আমার কাছ যেয়ো। আমিও মাঝেমাঝে আসব। ভাই তো রইল।'

কমলদি চলে গেলে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল। কিছুদিন পরে শুনি কমলদি হঠাৎ মারা গেছেন। তারপর একটিবারমাত্র অমরবাবু ঘাটশিলায় এসেছিলেন। তখন তিনি শোকে মুহ্যমান। আমরা তাঁকে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাইনি। ওঁদের সঙ্গে আর আমাদের দেখাও হয় নি।

পরদিন ওভারসিয়ারবাবুর বাড়ি থেকে মেয়েরা দেখা করতে এল। ওভারসিয়ারবাবু বিপত্নীক। একটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে। দুটি মেয়ের তখনও বিয়ে হয়নি— শোভা ও গীতা। এদের সঙ্গে খুবই মেলামেশা ও যাওয়া-আসা ছিল। আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। অচেনার অস্বস্তি একটু একটু করে চলে যাচ্ছে। এই পাড়াতে থাকত আর একটি পরিবার। তিন বোন— অঞ্জলি, আরতি, দীপালি এবং ওদের বাবা। মা ছিল না। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে মিত্র ও

ঘোষের বাড়ি, দুলো সাঁওতালের বাড়ি ও আরও কয়েকটি সাঁওতাল বাড়ি ছাড়িয়ে, মাঠের মধ্যে একটি ছোট বাড়িতে থাকত। বাবা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। আমি যখন ওদের দেখেছি, তখন ওদের বাবা দুরন্ত ক্যান্সার রোগে ভুগছেন। মুখে ক্যান্সার হয়েছিল। ফলে ক্রমশই ওদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। অঞ্জলি সেলাই করে উপার্জন করত। ভারী ভালো ছিল ওরা।

মনে পড়ে আমার ঘাটশিলায় আসার কয়েকদিন পরে একদিন সুবর্ণদি ঘাটশিলায় এলেন। সুবর্ণদি ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের স্ত্রী। ওঁদের গালুডিতে একটি বাড়ি ছিল। প্রায়ই ওঁরা গালুডিতে আসতেন। গালুডি জায়গাটা বেশ দেখতে। স্টেশন থেকে একটু এসেই পাশাপাশি দুটি টিলার ওপর দুটি বাড়ি। একটি সুবর্ণদির নামে 'সুবর্ণাচল', অপরটিও আমাদের একজন পরিচিত মহিলার। এঁদের বাড়ি থেকে একটু গিয়েই 'নেকড়েডুংরি'। পাহাড়, নদী ছিল একটি দূরে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। ছোটর মধ্যে ছিমছাম।

আমার বিয়ের কিছুদিন আগে আমার ছোটমামিশাশুড়ি ছেলেদের নিয়ে গালুডি চেঞ্জে এসেছিলেন। 'কলসী বাংলা'য় থাকতেন। ওই সময় বড়ঠাকুর ওঁদের সঙ্গে আসেন। সেই সময় থেকেই বড়ঠাকুরের এই অঞ্চলটা ভালো লাগে। বাদলবাবু বলে এক ভদ্রলোক ওখানে স্থায়ীভাবে থাকতেন। ওখানে মোহিনীবাবু বলে এক ভদ্রলোকের নার্সারি ছিল। এঁরা সবাই আমার ভাশুরের পরিচিত। ওই সময় সুবর্ণদি একাই গালুডি এসেছিলেন। আমি ঘাটশিলায় এসেছি শুনে একদিন সকালে দেখা করতে এলেন। আমি এই প্রথম ওঁকে দেখলাম। সুন্দর দেখতে, মুখশ্রী ভালো, চোখ দুটি বড় বড়। ব্যবহারও অত্যন্ত ভালো। আমার স্বামী বললেন, 'বৌদি, নীরদদা আসেননি তো, আপনি বরং থেকে যান। নীরদদা এলে যাবেন।' সুবর্ণদি রাজি হলেন না। বললেন, 'বরং যমুনাকে নিয়ে যাই। ওর গালুডি দেখা হবে। তুমি কাল গিয়ে নিয়ে এসো। কাল রাত্রে সাহেব আসবেন। পরশু আমরা আবার এখানে আসব।'

তাই ঠিক হল। আমাকে পাঠাতে ওঁর একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কী করবেন, সুবর্ণদি বলেছেন।

আমি এবং সুবর্ণদি বিকেলের গাড়িতে গালুডি এলাম। আমাকে সুবর্ণদি খুব যত্ন করেছিলেন। ওঁকে যখন আমি দেখলাম তখন ওঁর বেশ বয়স হয়েছে। ওঁর একটিই ছেলে। নাম আলো। উনি উচ্চশিক্ষিতা, বারকয়েক বিলেত ঘুরে এসেছেন। দেখলে বোঝা যাবে না। নিরহংকার, সাদাসিধে মানুষ। আমি তো মুখ্যু মানুষ। আমার সঙ্গে আমার মতো হয়েই কথা বলছিলেন। আমার বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস

করলেন। সেদিন রাত্রে সুবর্ণদির কাছে শুলাম। ভোরে সুবর্ণদির ডাকে ঘুম ভাঙল। বললেন, 'চলো, বেড়িয়ে আসি।'

আমি তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নিলাম। তারপরে দুজনে বেরোলাম। দেখি অনেকেই বেড়াতে বেরিয়েছেন। বাদলবাবুর স্ত্রী এবং আরও কয়েকজন মহিলা— সবাই ধনীর গৃহিণী— অবসর কাটাতে এসেছেন। আমি ওঁদের সবার অপরিচিত। ওঁরা সুবর্ণদিকে জিজ্ঞেস করে বললেন, 'এঁকে তো চিনলাম না?' সুবর্ণদি বললেন, 'বিভূতিবাবুর ভাই নুটুবাবুর স্ত্রী। নতুন বিয়ে হয়েছে। আমি ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি।' বলে হাসলেন। অন্য সবাইও হাসলেন। সবাই মিলে অনেকখানি হাঁটা হল। সেদিন বিকেলে আমার স্বামী এলেন। রাত্রে আমরা ঘাটশিলায় ফিরলাম।

পরদিন বিকেলে ওঁরা আমাদের বাড়ি এলেন। বড়ঘরে বসে কত গল্প হল। একসময় নীরদদা আমায় বললেন, 'যমুনা, বিভূতিবাবু তোমাকে বিয়েতে কী দিয়েছেন?' আমি বললাম, 'সুন্দর মিনে-করা একটা পেনডেন্ট দিয়ে আমায় আশীর্বাদ করেছেন। গায়ে-হলুদে বেনারসি এবং আরও কয়েকটা শাড়ি দিয়েছেন। তা ছাড়া আরও অনেক জিনিস— কেস-বক্স, এমনি সব।'

শুনে বললেন, 'আশ্চর্য! বিভূতিবাবু এসবও কিনতে পেরেছেন! আমরা তো জানি উনি এসব পারেন না।' আমি বললাম, 'বড়ঠাকুর একলা কেনেননি। মামা, মামিমা সকলে একসঙ্গে কিনেছেন।'

শুনে উনি বললেন, 'ও, তাই বলো।'

সেদিন রুটি আর মাংস রান্না করেছিলাম। অবশ্য সুবর্ণদি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সুবর্ণদির কাছে টোম্যাটোর চাটনি করা শিখেছিলাম। কাঁচালঙ্কা, আদা আর চিনি দিয়ে। তখন বিশেষ কিছু জানতাম না। সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা সুবর্ণদির দেখেছি। আমাদের অতি সাধারণ অবস্থা এবং ব্যবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু সেই অব্যবস্থার মধ্যেও সুবর্ণদি আমাদের কাছে এলে নিজেই সব ব্যবস্থা করে নিতেন।

পরদিন সকালে দ্বিজেনবাবু এলেন, সঙ্গে প্রচুর ফুল। নিজেই ফুলদানি সাজিয়ে দিলেন এবং নীরদদা, সুবর্ণদি ও আমাদের ওঁর বাড়ি দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। একটু বেলায় আমরা গেলাম। সেদিন ওঁর নার্সারি ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। খানিকটা করে জায়গা নিয়ে এক একরকমের ফুলের চাষ হয়েছে। জিনিয়া, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, সুইট পি। কতরকমের যে গোলাপ, তাদের আবার কত নাম, দ্বিজেনবাবুর নিজের দেওয়া। কোনোটার নাম— রবিরূপ, কোনোটার বা— রবিরশ্মি। নার্সারির মধ্যে একটা পুকুর। তার চারপাশ ঘিরে ফুলের গাছ।

চতুর্দিকে ফুল আর ফুল। তাদের মিলিত সুগন্ধে বাতাস ভরপুর। কত কুলি-কামিন কাজ করছে। ভোর ছ'টায় এদের কাজে লাগার ঘণ্টা বাজে, বারোটায় একটা ঘণ্টা পড়ে খাওয়ার আর বিকেল চারটেয় বাজে ছুটির ঘণ্টা। দেখলাম বেশ আনন্দের সঙ্গেই ওরা কাজ করছে। সেদিন বিকেলে সুবর্ণদিরা চলে গেলেন গালুডি। এরপর আমার স্বামী ডাক্তারিতে মন দিলেন। আমি হলাম সংসারী।

প্রাণপণে গোছাতে লাগলাম আমাদের ছোট্ট পুরোনো বাড়িটিকে। রান্না যা পারি করি। উনি কিছু বলেন না, খেয়ে নেন। হয়তো নতুন নতুন বলে অথবা রান্না করার অসুবিধা বুঝতে পারেন। কাঠের উনোন, খুব অসুবিধা হয়। ওখানে সবাই কাঠের উনোনে রান্না করে। কয়লার উনোন কেউ পাততেই জানে না। বেলডাঙায় এসব নিয়ে কোনো অসুবিধাই হয়নি। বাংলাদেশের কাজের লোক শিশুমতীই উনোন লেপে দিয়েছিল। তা ছাড়া তখন আমার মা অর্থাৎ ছোট মামিশাশুড়ি সঙ্গে ছিলেন। কোনো চিন্তাই ছিল না।

একদিন মাটি মেখে নিয়ে উনোন করতে বসলাম। আনাড়ি হাতে পারছি না। তখন কান্না পাচ্ছে— কেন মরতে বিয়ে করেছিলাম। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। উনি ডাক্তারখানা থেকে এসে দেখেন আমি মাটি-কাদা মেখে হিমসিম খাচ্ছি। বললেন, 'উনোন পাততে হবে না, ছেড়ে দাও। স্টোভে যা হয় করো।'

কিন্তু তা বললে তো হয় না। লোকজন আসছেন, বড়ঠাকুর আসবেন, উমা-শান্ত আসবে। যাই হোক, অনেকক্ষণ ভাঙাগড়ার পর একরকম একটা দাঁড়াল। তবে দেখতে খুবই কদাকার হল। উনি তো সেই দেখে হেসেই খুন। পরে বললেন, 'আমাকে বিয়ে করে তোমার শুধু কষ্টই হবে। কী আর করবে বলো।' আমি বলেছিলাম, 'তা কেন! রান্না করব আমি, আর উনোন কে পেতে দেবে বলো। দেখো, পরে আমি ঠিক শিখে নেব।'

সত্যি, পরে ভালো উনোন করতে শিখলাম, কিন্তু তখন সংসার করা শেষ হয়ে গেছে। আর তার প্রয়োজন রইল না।

৩০

উনি রোজ সকালে আটটার মধ্যে বেরিয়ে যান। অবশ্য তার ব্যতিক্রমও হত যেদিন সকালে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। সেদিন আর খেয়াল থাকত না। মনে করিয়ে দিতে হত, 'যাবে না ডাক্তারখানায়?' তখন হুঁশ হত। ক্ষুণ্ণমনে উঠে বলতেন, 'সুর

বড় দুষ্টু, সবসময় ধরা দেয় না। যেদিন ঠিক ঠিক সুর আসে সেদিন ছাড়তে ইচ্ছে করে না।'

ওঁর প্রকৃতি ছিল অন্য ধরনের, গান ভালোবাসতেন, কবিতা ভালোবাসতেন, সাহিত্য ছিল ওঁর প্রাণের জিনিস। আমাকে বলতেন, 'উনোনই করো আর যাই করো, সাহিত্যচর্চা করতে হবে। আর গান, এটা তো অবশ্য কর্তব্য। আমি এগুলো ভালোবাসি। তুমি ভালোবাসবে না? আমাকে যদি ভালোবাসো তা হলে এগুলোকে ভালোবাসতে হবে, কী বলো?'

আমি বলেছিলাম, 'চেষ্টা তো করছি। তবে রান্নাও তো করতে হবে।'

উনি শুনে খুব হেসে বলেছিলেন, 'ঠিকই তো। রান্না করতে হবে বইকী। কিন্তু সেটাই যেন তোমার ধ্যানজ্ঞান না হয়ে ওঠে।'

দুঃখ করে বলতেন, 'গান আর আমার হল না! কলকাতায় এই গানের পিছনে কম ঘুরেছি! আমি আর বিজু প্রায় সন্ধ্যার দিকে বেরিয়ে পড়তাম কোনো না কোনো ভালো গায়কের বাড়ি গান শুনতে। একদিন বেশ মজা হয়েছিল। আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, (রাস্তার নামও বলেছিলেন, আজ আর মনে করতে পারছি না) যেতে যেতে একটি বাড়ি থেকে কোনো একটি রাগের আলাপ কানে এল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, একজন গায়ক এখানে থাকেন। আমরা ঠিক করলাম এঁর কাছেই আমরা প্রথম গানের তালিম নেব। পরদিন দুজনে গেছি। দেখি একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক বসে গাইছেন। আমরা গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালাম। বললেন, 'কী চাই?' আমরা বললাম, 'আপনার কাছে গান শিখতে চাই। আপনি যদি দয়া করে আমাদের শেখান।' ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কোথাও গান শেখেন নাকি? আপনাদের কান তৈরি হয়েছে? উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখতে হলে আগে কান তৈরি করতে হয়।' অর্থাৎ শুনতে হয়, ভালো লাগলে তবে গান শেখা। প্রথমে কান তৈরি শুনে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। গানের সঙ্গে কানের কী সম্পর্ক? কিন্তু উনি যখন বুঝিয়ে দিলেন তখন মনে হল সত্যিই। বলেছিলেন, 'কান তৈরি করে এখানে আসবেন, শেখাব।' অবশ্য আমরা ওঁর কাছে আর যাইনি। পরে বিভূতিদার কাছে গান শিখি।'

তখন উনি ডাক্তারি পড়ছেন, আর ফাঁক পেলেই গড়পারে বিভূতিদার বাড়ি যান। গান শেখেন ও শোনেন। বৌদির কাছে খেয়ে মেসে ফেরেন। ওঁর তখনকার ছোট ডায়েরির পাতা ওইসব কত কথায় ভরে আছে।

গায়ক শচীনদাস মতিলালকে উনি দারুণ ভালোবাসতেন। ওঁদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব ছিল। মতিলালের গান ওঁকে জাদু করেছিল। সুযোগ পেলেই ওঁর গান

শুনতে যেতেন। কলকাতার জীবন ছিল আনন্দে ভরা। ওঁর ডায়েরি পড়তে পড়তে মনে হয় তখন যদি আমি ওঁর পাশে থাকতাম। দুজনে একসঙ্গে গান শুনতাম, শিখতাম, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরতাম। ওঁর ভালো-লাগা হত আমার ভালো-লাগা, ওঁর দুঃখে আমি কাতর হতাম, ওঁর জীবনের রুক্ষ দিনে বুলিয়ে দিতাম সান্ত্বনার প্রলেপ। কিন্তু তা তো হয়নি। যখন তাঁকে কাছে পেলাম তখনও তো তাঁকে ভালো করে বোঝা হয়নি, দিতে পারিনি তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখের সান্ত্বনা, পারিনি তো তাঁকে পক্ষপুটের মধ্যে ধরে রাখতে। কঠিন বাস্তবের রূঢ় আঘাত তাকে শিকারি বাজপাখির মতো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই ব্যর্থতার গ্লানি সারা জীবন আমাকে তিলতিল করে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে, আমাকে যে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সুবর্ণরেখার জলস্রোতের মতো আমার দিনগুলিও চঞ্চলগতিতে কেটে যাচ্ছিল। একদিন কী হল, ওঁর কী একটা দরকারি কাগজ কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না। চাইলেন, দিতে পারলাম না। আমাকে খুব বকে বেরিয়ে গেলেন। দুপুরে বাড়ি এসেছেন, আমি সামনে যাইওনি, কথাও বলিনি। ব্যাপারটা যে খারাপ হয়েছে বুঝেছেন, জামা-জুতো না খুলেই রান্নাঘরে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছেন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। ওঁকে দেখে আমার যত রাজ্যের কান্না কোথা থেকে এসে গেল। একটু কাছে এসে আস্তে আস্তে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করছ বলো তো! বাইরে ফুলমণি বসে আছে, তিনু রয়েছে, ওরা কী ভাববে। তোমাকে বকে গিয়ে মন এমন খারাপ হয়ে গেল কোনো কাজেই মন দিতে পারছিলাম না। সত্যি, তোমাকে বকে ফেলি তারপর নিজেই কষ্ট পাই। বিশ্বাস করো।'

আমি তখন চোখের জল মুছে পাশের ঘরে চলে গেলাম। উনি আর কিছু বললেন না, জামা-জুতো খুলে স্নান করতে গেলেন। অন্যদিন আমি জুতো খুলে দিই, কাপড় এগিয়ে দিই। সেদিন কিছুই করিনি। স্নান করে এসে বললেন, 'শোনো, আজ দুজনে একসঙ্গে খাব।' আমি বললাম, 'না-না, ফুলমণি তিনুঠাকুরপো কী ভাববে?'

'কী আর ভাববে, ওদের আগে দাও। আমরা একটু পরে খাব।' খেতে খেতে বললেন, 'জানো, আজ একটা অদ্ভুত রুগি পেয়েছি, ওকে ছুঁলেই ওর সারাদেহ কাঁপে আর কখনও কখনও হাসে। অনেক নাকি চিকিৎসা করেছে, কিছুই হয়নি, দেখি কিছু করা যায় না। না হলে কলকাতায় নিয়ে যাব।' পরে ওই রোগীটিকে নিয়ে উনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং রোগীটির একান্ত ইচ্ছায় তাকে গঙ্গাস্নান করিয়েছিলেন। রোগীটি বহুদিন পূর্বের বিহারপ্রবাসী বাঙালি, গঙ্গাস্নান করার একটা ইচ্ছা তার বহুদিন ধরেই ছিল। কলকাতা থেকে ফেরার কিছুদিন পরে সে মারা যায়।

প্রথম প্রথম রোগীপত্তর কম, বন্ধুবান্ধবও নেই, তাই বাড়ি এসেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। আমাকে বলতেন, 'তুমি তানপুরাটা ধরে আমার কাছে বোসো।' আমাকে তানপুরা বাজাতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তানপুরা বাজাতাম। হাত ব্যথা হয়ে যেত, তবুও থামার অবকাশ নেই, গান চলছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত কিছুই বুঝি না, গান শেষ হলে বলতেন, 'কেমন লাগল?' বলতাম 'খুব ভালো।' তখন হেসে ফেলে বলতেন, 'কিছু বোঝে না, শুধু খুব ভালো।' দুজনে হাসতাম।

মনে আছে একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, তার সঙ্গে মেঘগর্জন ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ-এর চমক। আমার স্বামী ও তিনু ঠাকুরপো আগেই উঠে পড়েছে। ওরা বারান্দায়। দেখি ঘরের মধ্যে দু-চার জায়গায় জল পড়ছে। সে জায়গাগুলোতে বালতি, হাঁড়ি এইসব বসিয়ে দিয়ে ওদের কাছে বারান্দায় গিয়ে দেখি চারদিক ঘন অন্ধকার, জলের ঝাপটায় বারান্দা ভেসে যাচ্ছে, ঝড়ের দাপটে ইউক্যালিপটাস গাছের মাথাগুলো নুয়ে পড়ছে। তিনুঠাকুরপো হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে কী কথা বলছে। আমি না দাঁড়িয়ে বিছানায় এসে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। বেশ মনে আছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা খোলার চালের ওপর পড়ে একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে, উনি বললেন, 'মন্দ লাগছে না। একটা নতুন অভিজ্ঞতা।'

পরদিন মিস্ত্রি ডাকা হল। পুরোনো সব কাঠ পালটে নতুন শালগাছের রলা লাগানো হল। আর কিছু ভাঙা খোলা পালটানো হল। ওখানে বাঁশের ব্যবহার ছিল না। বড় ঘরটাতে ছিল টিনের শেড। তার মধ্যে অসংখ্য গোলা পায়রার বাস। ওদের বকমবকমের ঠেলায় আমরা মাঝেমাঝে বিরক্ত হয়ে উঠতাম, কিন্তু ওরা আমাদের গ্রাহ্যই করত না। আমরা আসার অনেক আগে থেকেই ওরা ওখানে বাস করছে। সুতরাং ওদের দাবিই আগে।

প্রথমদিকে আমরা প্রায়ই বিকেলে বেড়াতে বেরুতাম। কোনোদিন নদীর ধারে কোনোদিন বা ফুলডুংরির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা এঁদেলবেড়ার জঙ্গলে চলে গেছে সেই পথটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেকের ধারে গিয়ে বসতাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসত, উনি বলতেন, 'আর নয়, ওঠো। বেশি অন্ধকার হয়ে যাবে।'

একদিন হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলেন, 'আমাদের জীবনটা কেমন অদ্ভুত ধরনের, নয়? মাত্র ক'মাস আমাদের বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে তিন জায়গায় ঘুরলাম— বেলডাঙা, মুরাতিপুর, ঘাটশিলা। দেখা যাক, এরপর কী আছে কপালে।' দূরে মৌভাণ্ডারের আলোগুলো দেখিয়ে বলতেন, 'কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, না? আমাদের ডাহিগোড়ায় ইলেকট্রিক এলেই নিয়ে নেব।'

অলসচরণে বাড়ি ফিরতাম। এসে চেয়ারে বসেই বলতেন, 'আগে এক কাপ চা খাওয়াও।' চা খেয়ে আমি রান্নাঘরে যেতাম, উনি বড়ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়তেন।

আমি ডিমের ডালনা আর রুটি করে ওঁর পাশে এসে বসতাম। হ্যারিকেনের মৃদু আলো। আধো-আলো আধো-অন্ধকার। তখন অবশ্য ওই আলোতেই বেশ দেখা যেত, পড়া যেত। এখন আর যায় না। উনি 'সঞ্চয়িতা' নিয়ে বসতেন। বলতেন, 'এমন কোনো ভাব নেই যা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।'

শীতের রাত শীঘ্রই নিশুতি হয়ে আসত। তাছাড়া ওই জায়গাটিও ছিল জনবিরল। গাড়িঘোড়ার কোনো শব্দই ওখানে কানে আসত না। মাঝে মাঝে শুধু নির্দিষ্ট সময়ে দূর থেকে ভেসে আসত রেলের বাঁশি আর কু ঝিকঝিক শব্দ। ঘরের জানলা দিয়ে দেখতাম দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে আলো জ্বলছে। অতবড় বাড়ি, থাকেন উনি একা। মাঝে মাঝে মেজপুত্রবধূ অনুদি থাকতেন, রেখাদিকেও থাকতে দেখেছি। নামেই 'রেখাবাংলো', শালবনটা দেখলে মন হত একখণ্ড জমাটবাঁধা অন্ধকার। চুপ করে ভয়ে ভয়ে দেখতাম আর ওঁর কবিতাপাঠ শুনতাম। ওঁর মুখে 'শাজাহান' কবিতাটা আমার বড় ভালো লাগত। বলতাম, 'শাজাহানটা পড়ো।'

স্বল্প চেনা জায়গা, শীতের অন্ধকার রাত্রি, একটুও ভয় করত না। কারণ উনি তো সঙ্গে আছেন। এই নির্ভরতা স্বামী ছাড়া বোধ হয় আর কারওর ওপর করা যায় না। শহর ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে এতদূরে ওঁর সঙ্গে থাকতে তো কই খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। আনন্দে ভরে উঠছে সমগ্র সত্তা। আমার স্বামী, আমার সংসার। অর্থের কষ্ট কোনোদিন হয়নি, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্যও ছিল না। তাতেই আমরা সুখী ছিলাম।

দিন কাটছে। বাবার চিঠি আসে, বড়ঠাকুর চিঠি দেন, মার চিঠি পাই। সবার জন্যে মন কেমন করে, দেখতে ইচ্ছে করে। ওঁর নতুন প্র্যাকটিস, খাটতে হচ্ছে প্রচুর। এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। বাবার অর্থ নেই, শ্বশুরেরও পাননি যে শহরে বসবেন। একা দাদা আর কত করবেন। নিজের আয়ে আস্তে আস্তে চলতে হয়েছে। ডাক্তারখানার ভাড়া, তার ফার্নিচার, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্তর, কম্পাউন্ডারের মাইনে, সংসার এবং আমি। উনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করেননি, বিয়ে করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চাকরিটা করলে কোনো অসুবিধে হত না। অবশ্য আমার কোনো অসুবিধা কোনোদিন হয়নি। কিন্তু আমি বুঝতাম ওঁর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হচ্ছে। গ্রামের মানুষ হলেও চিরকাল সমতল ও শহরে কাটিয়েছেন। এখন এই বন্ধুর পথে পাড়ি জমাতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। উঁচুনিচু রাস্তা সাইকেল করে দূরে দূরে রোগী দেখতে যেতে হত। কিন্তু উপায় কী। অর্থ থাকলে হয়তো কোনো শহরে বসতেন। সেকথা বললেই বলতেন, 'তোমার ওই ছোট্ট মাথায় এসব চিন্তা ঢুকিয়ো না তো।' বলে সস্নেহে হাসতেন।

কিন্তু আমার কোনো ত্রুটিই ওঁর চোখ এড়াত না, তখন আমাকে বকতেন, এবং বকার কিছুক্ষণ পরেই বলতেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, শিখে নাও। তৈরি হয়ে নাও।' আমার চোখে জল আসত, মনে হত শুধু শুধু বকছেন। এক-একদিন হেসে বলতেন, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। তোমারই জন্যে তোমাকে বকি, আর কাউকে তো বকি না। আমাকে একটু বোঝো, অন্তত বোঝার চেষ্টা করো।'

যাই হোক, এসব তো আছেই, তাই বলে আমাদের আনন্দ কিছু কম ছিল না। এক জায়গায় দুজনে আছি এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শান্তি।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে বারান্দায় এসে মেঘের মুকুটপরা সিদ্ধেশ্বর ডুংরিকে দেখা আমাদের দেবদর্শনের মতো ছিল। যেদিন আমি আগে ঘুম থেকে উঠতাম, চা করে ওঁকে ডাকতাম, উনি বলতেন, 'এখন উঠব না, একটু পরে। চা বিছানায় দাও।' আর যেদিন নিজে আগে উঠতেন সেদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঠাণ্ডা হাতটা আমার কপালে দিয়ে বলতেন, 'শিগগির ওঠো, বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

চা নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসা ওঁর একটা আরামদায়ক ব্যাপার ছিল। চা খেয়ে পরে খাবার খেয়ে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে জামা-প্যান্ট, মোজা-জুতো হাতের কাছে এগিয়ে দিতাম, স্টেথস্‌কোপটা গলায় ঝুলিয়ে ব্যাগটা সাইকেলে ঝোলাতে ঝোলাতে বলতেন, 'ভেবো না, যত তাড়াতাড়ি পারি আসব।' সাইকেলটা নিয়ে খানিকটা হেঁটে তারপর চড়তেন, আমি দেখতাম শালবাগানের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। খালি বাড়িতে একা একা ভালো লাগে না, মন খারাপ লাগে। একদিন বললেন, 'এমনি মন খারাপ করলে শরীর খারাপ হবে, তার চেয়ে তোমাকে কিছু কাজ দিই এসো।' বলে হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে আমাকে জৌনপুরী রাগ দিলেন এবং তার সঙ্গে কিছু তান দিয়ে বললেন, 'আমি বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে গলা সাধবে, গান করবে। তাহলে আর খারাপ লাগবে না।'

তখন থেকে উনি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে গলা সাধতাম, গান করতাম। তারপর ঘর গোছানো, রান্না এসব তো আছেই। ওঁর ফিরতে বেলা হত। সকালে সময় পেতাম অনেকটা।

গান শেখা শুরু হল বটে কিন্তু পড়াশুনো হচ্ছে না। ওঁর কাছে পড়তে বসলে বলতেন, 'এখন থাক। এসো গল্প করি।' একদিন হেসে বলেছিলেন, 'আমার কাছে তোমার পড়াশুনো হবে না, অন্য কারো কাছে পড়ো। পড়াতে গেলে অন্য গল্প এসে যাচ্ছে। আমি যখন বাইরে থাকব তখন পড়াশুনো কাজকর্ম যা ইচ্ছে করবে। আমি এলে ওসব বন্ধ।' দেখলাম ওঁর কাছে পড়াশুনো হবে না। তখন বাড়িতে যত বাংলা বই ছিল পড়তে শুরু করলাম। 'সঞ্চয়িতা' হল আমার প্রিয় সঙ্গী।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। আমার স্বামী নিয়মিত ডিসপেনসারি গিয়ে বসছেন। আমি একলাটি বাড়িতে থাকি। একদিন দুপুরে আমি বললাম, 'দেখ, তুমি বলেছিলে আমাকে নিয়ে খুব বেড়াবে। কিন্তু—।' উনি বললেন, 'কিন্তু যাচ্ছি না, এই তো? আচ্ছা, চলো। আজ তোমাকে হরিণধূপড়ির ওই দিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আসব। মৌভাণ্ডারেও একদিন নিয়ে যাব। তারপর আর নয়, দাদা এলে সবাই মিলে দাদার সঙ্গে বেড়াতে যাব, কেমন?'

সেদিন বিকেলে ওর সঙ্গে বেরুলাম। আমাদের পাড়া ডাহিগোড়া থেকে বেরিয়ে জোড়া-আমতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'কোনদিকে যাবে বলো?'

আমি বললাম, 'হরিণধূপড়ি চলো।'

আমরা সোজা স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। খানিকটা আসার পর দেখলাম ওঁর ডিসপেনসারি 'ঘাটশিলা ক্লিনিক'। ওই একই সারিতে আরও কয়েকটি ঘর। ওপরেও ঠিক অমনি কটা ঘর। মাত্র দুতিনটি দোকান, তারপর ফাঁকা জায়গায় স্টেশনের কাছাকাছি খোলা জায়গা। প্রচুর কাঠ জমা করা হয়েছে। এটা নাকি কাঠের ব্যবসার জায়গা।

স্টেশন ছাড়িয়ে বাঁহাতে কিছু দোকানপসার। বাসন, কাপড়, জুতো ইত্যাদির দোকান। একটু এগিয়ে গিয়ে ওই রাস্তার ডানদিকে একটি ঘর। ঘরটির বিশেষত্ব হল তিনদিকে জানলা নেই, সামনে দরজা, উনি বললেন, 'এটা মা রঙ্কিনী দেবীর মন্দির, চলো দেখে আসি।'

ঘরের সংলগ্ন একটু জমি, তার পাশে পুরোহিতের থাকার ঘর। মন্দিরে ঢুকে দেখলাম, দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো মায়ের মূর্তি, মুখমণ্ডল সিঁদুরে লেপা। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে। মাকে প্রণাম করলাম। কেমন ভয়ভয় করতে লাগল, মুখের মধ্যে যেন একটা কাঠিন্য অনুভব করলাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে হাঁটছি, রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। হরিণধূপড়ি জায়গাটা অনেকটা উঁচু এবং দুপাশে দুটি টিলা। মাঝখান দিয়ে পথ। রাস্তা পেরিয়ে বেশ খানিকটা উচ্চাবচ জমি নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছে। এখান থেকে সূর্যাস্ত খুব ভালো দেখা যায়। এই হরিণধূপড়ি পেরিয়ে রাজবাড়ি। এই রাজবাড়িতে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির আসা-যাওয়া ছিল। এখানেই সীতা দেবী শান্তা দেবীদের বাড়ি ছিল। পরে 'সুবর্ণ সংঘের' এক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং কালিদাস নাগ মহাশয়কে দেখেছিলাম। রাধারানি দেবী ও নরেন দেবকেও দেখেছিলাম এবং তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিন অনেকটা ঘুরে ওঁর ডাক্তারখানায় এসে বসলাম। কয়েকজন রুগি ছিল। তাদের দেখে নিয়ে বললেন, 'চলো, বাড়ি যাওয়া যাক।'

এইভাবে কিছুক্ষণের জন্য অবসর বার করে আমাকে নিয়ে একদিন মৌভাণ্ডার গিয়েছিলেন। এখানকার উঁচুনিচু রাস্তা, একটু হাঁটলেই হাঁপ ধরে যায়। যেতে যেতে পথে পড়লো 'হাতিজোবড়ার' খাল। এখানে নাকি আগে, যখন এসব অঞ্চল বনজঙ্গল ছিল, হাতিরা জল খেতে আসত। মৌভাণ্ডার বেশ জায়গা। বিরাট ফ্যাক্টরি, এখানে তামা তৈরি হয়, কর্মীদের কোয়ার্টার। সাহেবসুবোর বাংলো, সব জায়গায় পিচঢালা চওড়া রাস্তা, দোকানপসার জমজম করছে। নদীর ওপারে যাওয়ার ব্রিজ তখনও তৈরি হয়নি। ওপারে যেতে হলে একটা নদীর বুকের ওপর দিয়ে রাস্তা, অল্প জলে পা ভিজিয়ে ওপারে যেতে হত। গাড়িও যেত এই রাস্তা দিয়ে। পাঞ্জাবিদের গুরুদুয়ার, ওখানেই দুর্গাপুজো হত। একটি শিবমন্দির ছিল। তা ছাড়া রেডিয়ো, লাইট, জল-কল, খেলার মাঠ, সিনেমা। অবশ্য সিনেমা হল ছিল না, মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হত।

৩১

আমাদের ডাহিগোড়া ছোট্ট জায়গা। কাঁচা রাস্তা, দোকান নেই, লাইট নেই, কল নেই। ওঁর ইচ্ছা ছিল লাইট নিয়ে রেডিয়ো কিনবেন। শীতলকুটির আর সরোজবাবুর বাড়ির কাছেই ছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। প্রায় রাস্তার ওপর। মৌভাণ্ডার দেখে আমাকে নিয়ে উনি আশ্রমে এলেন। ঠাকুরঘরে প্রণাম করে, মহারাজকে প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করলেন। তখন থেকে আশ্রমের সকল উৎসবে গেছি, আনন্দ করেছি। তখন আশ্রম প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল না। আমার স্বামী, ভাশুর এঁরা প্রায়ই আশ্রমের ওপর দিয়ে রাস্তা শর্টকাট করে বাড়ি আসতেন। এখন আশ্রম অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু আমরা নেই।

সময়ের চক্র ঘুরে ঘুরে চলেছে। আজ কত কথাই মনে পড়ছে। আমাদের ঘাটশিলা আর এখনকার ঘাটশিলার আকাশপাতাল তফাত। তখন সপ্তাহে একদিন করে হাট বসত, রোজকার বাজার ছিলই না। বাংলাদেশের মতো তরিতরকারি পাওয়া যেত না। কপি, পটল— এসব দুর্লভ ছিল। আলু পিঁয়াজ ছিল প্রধান সবজি, কুমড়ো বেগুন তাও কম। একটা জিনিস পাওয়া যেত— কুঁদরি। তেলাকুচোর মতো দেখতে। মাংসের দোকান ছিল, অনেক সময় বাড়িতেও বিক্রি করতে আসত। মাছ ছিল বিরল বস্তু। মাঝে মাঝে বড়বড় রুই পাওয়া যেত। তখন কয়েকজন মিলে ভাগ করে নেওয়া হত। ছোটছোট বাটা মাছ সাঁওতালরা বাড়িতে নিয়ে আসত। আর একরকম মাছ বিক্রি করতে আসত— গায়ে আঁশ নেই, সাদা চকচক করছে। খেতে দারুণ স্বাদ। অবশ্য ইলিশ মাছের সময় 'সুবর্ণরেখায়' বেশ মাছ পড়ত। তখন দিদি, আমি, উমা নদীর ধারে গিয়ে মাছ কিনে আনতাম। কখনও কখনও চিংড়ি মাছ পাওয়া যেত। তখন আমাদের

খুব আনন্দ হত। দাম খুবই সস্তা, ছ আনা, সাত আনা সের, মাংসও তাই। চালটা খুব ভালো পাওয়া যেত, হাটে দোকানে সব জায়গাতে। অনেক সময় সাঁওতাল মেয়েরা বাড়িতে চাল নিয়ে আসত। 'সীতাশাল' খুব ভালো চাল ছিল, 'মকড়কোঁদ' ছিল মাঝারি। তখন ডাল, তেল, ঘি ইত্যাদি এত সস্তা ছিল আজ ভাবলে অবাক হতে হয়, শুনলে মনে হবে গল্পকথা। আমার স্বামী এবং আমরা মাছ খেতে ভালোবাসতাম। কিন্তু মাছ তো রোজ পাওয়া যেত না, তাই মাংস ছিল নিত্যকার ব্যাপার।

উমার ছোটমামা উমার হাতের কপির ডালনা খেতে ভালোবাসতেন। আমাদের বলতেন, 'খুকির মতো কপির ডালনা তোমরা পারো না।' উনি আমিষের ভক্ত ছিলেন। ভাবলে কষ্ট হয় ওঁকে ইচ্ছামতো খাওয়াতেও পারিনি। বাড়িতে পানতুয়া কি সন্দেশ করলে গোটাকতক খেয়ে নিতেন, আমাকে বলতেন, 'নিজে খাবে না, শুধু আমাকে খাওয়াবে!' বড়ঠাকুর সবকিছুই খেতেন, কিন্তু অল্প।

একবার ব্রজেশ্বরবাবু, ওঁর বন্ধু, ঘাটশিলায় এসেছেন, আমি পানতুয়া করেছি। দুই বন্ধু বেশ কয়েকটা খেলেন, তারপর উনি বললেন, 'দেখ ব্রজেশ্বর, যমুনা আমাকে মিষ্টি খাইয়ে মোটা করে তুলেছে। তুই আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে বারণ করো তো।' ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, 'যা পারিস খেয়ে নে।' পরে অবশ্য মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। অল্প ডায়াবিটিস ধরা পড়েছিল। খেতে ভালোবাসতেন বটে কিন্তু ছাড়তেও দ্বিধা করেননি। বলতেন, 'যখন ডাক্তারি পড়ি তখন মোটা হয়ে যাচ্ছি বলে একুশ দিন জল খেয়ে ছিলাম, এক্সারসাইজ করতাম। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিলাম।'

ওর মুখে শুনেছিলাম ওঁর একবার বেরিবেরি হয়েছিল, সেই সময় হার্টের একটু কষ্টও হয়েছিল। সেই শোনা অবধি আমার ভয় করত, সাইকেল নিয়ে দূর-দূর গ্রামে ওঁকে যেতে হয়, পথেঘাটে হার্টের কোনও অসুবিধা হবে না তো— যা আপ-ডাউন রাস্তা। আজকাল ঘাটশিলায় সবকিছু পাওয়া যায়, রাস্তা ভালো হয়েছে, যানবাহন বেড়েছে, লাইট, রেডিয়ো, টিভি, ভি-সি-আর শুনি কিছুরই অভাব নেই। তখন এসব ছিল স্বপ্ন।

একদিন বিকেলে উনি বেরুবার জন্য তোড়জোড় করছেন, সেইসময় অনুদির (দ্বিজেনবাবুর পুত্রবধূ) সঙ্গে একজন বিধবা বয়স্কা মহিলা এবং তাঁর পুত্রবধূ এলেন। নাম হাসি। আমার চেয়ে কিছু বড় হবেন। ময়মনসিংহ-এর মেয়ে। অনুদি ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সলিলবাবু ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, তাঁর মা এবং স্ত্রী। ওঁদের আমার খুব ভালো লেগেছিল। উনি অনুদিকে বৌঠান বলতেন, আমাকে বললেন, 'বৌঠানদের চা করে দাও, আমি বেরুচ্ছি।' আমরা বসে গল্প করলাম। অনুদি এঘর

ওঘর ঘুরে দেখে আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন, 'এই করবি যমুনা, ওই করবি।' সন্ধ্যার পর ওঁরা গেলেন। তখন শাঁখ ইত্যাদি সন্ধ্যা-জ্বালার ব্যবস্থা ছিল না। পরে অবশ্য লক্ষ্মীর আসন পেতেছিলাম, প্রতিদিন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যাবন্দনা করেছি।

ইতিমধ্যে বড়ঠাকুরের নিয়মিত চিঠি আসছে। উনি উত্তর দিচ্ছেন। কিছুদিন পরে বড়ঠাকুরের একটা চিঠি এল— 'নুটু, উমা-শান্তকে নিয়ে অমুকদিন আমি যাচ্ছি।'

রাতের গাড়িতে ওঁরা এলেন। আমি প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন, 'বৌমা, উমা-শান্তকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম, ওদের দেখবে।' আমি খুশি হয়ে বলেছিলাম, 'আচ্ছা।'

উমা-শান্তকে পেয়ে সত্যিই আমি খুশি হয়েছিলাম। একলাটি ভালো লাগছিল না। উনি তো বাইরে বাইরেই থাকছেন, মুসাবনি ও দূরের একটি গ্রামে সপ্তাহে দু-দিন করে বসার ব্যবস্থা করছেন। কষ্ট করেছেন খুব। পাহাড়ি পথ। একমাত্র সাইকেল ভরসা। অবশ্য অনেক পরে মোটর সাইকেল কিনেছিলেন। মাঝে মাঝে আমার আশঙ্কা হত, এত কষ্ট করছেন, দেহে সইবে তো! উনি কিন্তু ওই কঠিন জীবনযুদ্ধে পরাজিত হননি বা পিছিয়ে আসেননি, পরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কষ্ট হত— বন্ধুবান্ধব নেই, গান হচ্ছে না এইজন্যে। পরে শুনতাম কলকাতার বন্ধুরা অনেকেই ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছেন, কলকাতা ছাড়তে হয়নি, এইসব ভেবে ওঁর মনে কোনো দুঃখ ছিল কি না জানি না। সে সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেননি। আমার কিন্তু দুঃখ হত আর কিছুর জন্যে নয়, উনি যদি অন্তত কলকাতায় থাকতে পারতেন খুব ভালো হত। কলকাতা ছাড়তে ওঁর একটুও ইচ্ছা ছিল না।

উমাদের পেয়ে আমরা দুজনে সত্যিই আনন্দিত হয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, 'যাক, খুকি এসে গেছে, তোমার সঙ্গী হল। তুমি একলা বাড়িতে আছো ভেবে বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্তে হতে পারতাম না। কেবলই মনে হত একলা আছে, কী করছে। যাক, ভাবনার হাত থেকে বাঁচা গেল।'

উমা আর আমি বন্ধুর মতো ছিলাম। উমা যেমন ভালো তেমনি কাজের। ওর মামারা কী খেতে ভালোবাসেন, কী পছন্দ করেন ওর কাছে জেনে নিতাম। ওর মামারা উমার হাতের রান্না অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

পরদিন বড়ঠাকুর আমাদের নিয়ে ফুলডুংরি গেলেন। উমাকে বললেন, 'উমা, তুই তো পাহাড় দেখিসনি, দেখ। এরপর বৌমাকে নিয়ে তুই-শান্ত বেড়াতে আসবি।' সেদিন ফুলডুংরি থেকে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম কমলদির বাড়ি। বড়ঠাকুরকে দেখে কমলদি তো খুব খুশি।

কিছুক্ষণ ওখানে থেকে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি এসে বড়ঠাকুর বললেন, 'বৌমা, একটু তামাক সেজে দাও তো। আমার কাছে কলকেটা নিয়ে এসো, শিখিয়ে দিচ্ছি।' বড়ঠাকুর তামাক সাজা শিখিয়ে দিলেন।

উমাদের বাড়ি ছিল আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ব্যারাকপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে চালকি গ্রামে। ওই গ্রামের জমিদার ছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি বড়ঠাকুরের স্কুলের বন্ধু। বড়ঠাকুরের সঙ্গে 'মিতে' পাতানো ছিল। আমরা ওঁকে মিতেদা বলতাম। ওঁর স্ত্রীর নামও ছিল গৌরী। পরে মিতেদারা ঘাটশিলায় বাড়ি কিনেছিলেন। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার স্বামী বনগ্রাম বোর্ডিং এ থেকে পড়াশুনো করতেন। তখন থেকেই ওঁদের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। মিতেদার মাকে 'মা' বলতেন, মিতেদার এক ভাই সলিলবাবুর সঙ্গে ওঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে ডাক্তারি পড়েছিলেন। মিতেদার স্ত্রী গৌরীদি এঁকে নিজের দেওরের মতো স্নেহ করতেন।

উমার বাবার নাম পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ডাক নাম জ্ঞান। বড়ঠাকুর 'জ্ঞান' বলে ডাকতেন, আর আমার স্বামী বলতেন 'চাটুজ্জেমশাই'। উমার মা জাহ্নবীদি আমার বড় ননদ। উমার বাবা মারা যাওয়ার পর বড়ঠাকুর জাহ্নবীদি ও উমা-শান্তকে বনগাঁয়ে বাসা ভাড়া করে রেখেছিলেন। চালকিতে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া, তা ছাড়া উমা-শান্তর পড়াশুনোর সুবিধার জন্য ওরা থাকত বনগাঁয়ে। বড়ঠাকুর প্রতি সপ্তাহে বনগাঁ আসতেন, থাকতেন কলকাতায় একচল্লিশ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে।

এইভাবেই কাটছিল দিন বড়ঠাকুরের। লিচুতলা ক্লাব, মন্মথদা, মিতে, আরও বন্ধুবান্ধব, বারাকপুর গ্রাম— সবার সঙ্গে দেখাশুনো হত। দেশের সঙ্গে ছিল যোগসূত্র, হঠাৎ জাহ্নবীদি জলে ডুবে মারা গেলেন। খবর পেয়ে বড়ঠাকুর বনগাঁ এলেন, নদীতে অনেক খোঁজাখুজি হল। কিন্তু ফল কিছু হল না। ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে দুপুরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। স্নান করতে যাওয়ার সময় একটা ঘটি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ঘটিটা আর আঁচলের চাবির গোছাটা ঘাটের ওপর রাখা ছিল। আমার স্বামী তখন মুরাতিপুরে, খবর পেয়ে বনগাঁ গেলেন। আমি তখন ভাটপাড়ায়। আমার স্বামীকে বড়ঠাকুর বলেছিলেন, 'বৌমাকে এই অবস্থায় আর আনতে হবে না, তুমি বৌমাকে নিয়ে ঘাটশিলায় যাও। উমা-শান্তকে ওখানে নিয়ে যাব।'

ওই সময় দিদি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা বনগাঁতে বদলি হয়ে আসেন এবং উমাদের অশৌচকালেই একদিন দিদি ও দিদির বোন বেলু বড়ঠাকুরের কাছে

অটোগ্রাফ আনতে যায়। সেই প্রথম বড়ঠাকুরের সঙ্গে দিদির পরিচয়। বড়ঠাকুর দিদিকে বলেছিলেন, 'আমার বিপদের কথা শুনেছেন তো? এখন মুশকিল হচ্ছে এইসব জিনিসপত্র ঘাটশিলায় ভায়ের কাছে কী করে যে পাঠাব।' দিদি বলেছিলেন, 'আমি বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলি, ওঁরা সব ব্যবস্থা করে দেবেন।' সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই পরিণয়ের পরিণতি।

যাই হোক, আমরা ভালোই ছিলাম। উমা আর আমি। দুজনে কাজ করি, গান করি, গল্প করি। ওর ছোটমামা বাড়ি এলে দুজনে গিয়ে দাঁড়াই। ওর ছোটমামা জামাজোড়া খুলে আমার হাতে দিতে দিতে বলতেন, 'কীরে খুকি, কেমন লাগছে?' উমা বলত, 'ভালো লাগছে ছোটমামা।'

উমারা ঘাটশিলায় এসেছে শুনে আমার বাবা চিঠি লিখলেন, 'মা যমুনা, তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নীকে পুত্র-কন্যার ন্যায় যত্ন করিবে, কোনরূপ ত্রুটি যেন না হয়। নুটু ও বিভূতি বাবাজীবনকে যেন কোনরূপ অশান্তি ভোগ করিতে না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। তোমাকে অধিক আর কী লিখিব, যাহাতে সকলে খুশি হয় তাহাই করিবে। ইতি— ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়।'

মা অর্থাৎ আমার ছোট মামিশাশুড়ি লিখলেন, 'বৌমা, উমা দিদিমণি ওখানে গিয়াছেন শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম, দুজনে খুব আনন্দ করিয়া থাকিবে।'

উমা আমি দুজনে মিলে বেড়াতে যাই। উমার গানের গলা ছিল খুব ভালো। দুজনে গান করি। একটু আধটু পড়াশুনো চলে। শান্তকে স্কুলে ভর্তি করা হল। নতুন বই এল, সবই হল। কিন্তু পড়াশুনোয় ওর একটুও মন ছিল না। এর জন্য ছোটমামার কাছে বকুনি খায়, কিন্তু ফল কিছু হয় না। ওর মামাদের আশা— শান্ত বড় হবে, মানুষ হবে।

উমা আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে, সবার আদরের। রাগ হলে আমাকে খুব বকে নেয়। আবার পরক্ষণেই ছোট মামিমা বলে কাছে আসে। ওর বসে গল্প-করা বেশি আসত না, তার চেয়ে বরং ঘুরে বেড়াতেই ও বেশি ভালোবাসত। পরে যখন আমাদের গরু কেনা হয়েছিল, উমা কাজের লোকের সঙ্গে তার তদারক করত। ওর ছোটমামা দুটো চীনা হাঁস এনেছিলেন, তাদের ভারও ছিল উমার ওপর। উমা তাদের খেতে দেওয়ার সময় ডাকত চই চই করে। উনি আমায় ডেকে বলতেন, 'শোনো, খুকি যেমন করে হাঁস ডাকছে তুমি তো শোনোনি! আমাদের দেশে পুকুর থেকে এইভাবে হাঁসদের ডেকে বাড়ি আনে।'

উমার শখে মুরগি পোষা হল। তাদের ডাকত টি টি করে। উনি বলতেন, 'খুকি, তুই যে একেবারে গ্রাম বানিয়ে ফেললি।' গ্রামের মুসলমানরা নাকি এইভাবে মুরগি

ডাকে। একবার বর্ষায় কোথা থেকে একটা ময়ূর এসে উপস্থিত। সে আর যায় না। তখন কে তার ভার নেবে? আর কীভাবেই বা তার তদারক করবে? উমাই ভরসা। ময়ূর মাঠে-বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। খাবার সময় চাল, ছোলা, ভাত— এইসব দেওয়া হত।

তারপর এল জিম। জিমকে যে উনি কার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন বলতে পারব না। কী জাতের ছিল তাও জানি না, তবে নিশ্চয়ই ভালো জাতের ছিল, কারণ দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। গায়ের রং খয়েরি, মাথার কাছটা খানিকটা সাদা দাগ। বেশি ডাকত না, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ খামোকা গম্ভীর গলায় ডেকে উঠে আমাদের চমকে দিত। অচেনা কোনও লোক এলে ডাকত না, শুয়ে লেজ নাড়াত। বড়ঠাকুর বলতেন, 'জিম আমাদের অহিংস।' আমার স্বামী বাড়িতে এসে বারান্দায় পা দিলেই জিম সামনের দুটো পা ওঁর বুকের কাছে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। তখন ওর মুখ দুটোহাত দিয়ে ধরে আদর করতে হবে, তবে ছাড়বে।

বড়ঠাকুর এলেও জিম ঠিক অমনি করত। উনি যখন ডাক্তারখানায় যেতেন তখন সাইকেলটা নিয়ে কিছুটা রাস্তা হেঁটে গিয়ে সাইকেলে উঠতেন, জিমও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তারপর কিছুটা সাইকেলের সঙ্গে ছুটবে, পরে ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় এসে শুয়ে পড়বে। বড়ঠাকুর থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। একবার বড়ঠাকুরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে জিম গালুডি চলে গিয়েছিল। সেদিন নীরদদার বাড়ি আমাদের সব নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা বিকেলে গেছি। বড়ঠাকুর একা সকালে হেঁটে গেছেন। ফেরার সময় রাত্রিবেলা আমার স্বামী জিমকে ট্রেনে তুলে নিয়ে এলেন। স্টেশনে নেমেই জিম করল কী— একদম বাড়িমুখো ছুট। বাড়ি এসে দেখি জিম বারান্দায় শুয়ে আছে। আমাদের দেখে লেজ নাড়লে। জিম খুব স্নেহপ্রবণ ছিল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। এইসব নিয়ে হাসি-কান্না সব মিলিয়ে দিন কাটছে। বেশ সুখের দিন।

৩২

প্রায়ই বড়ঠাকুরের চিঠি আসে। বড়ঠাকুর আসেন। সঙ্গে থাকে প্রচুর বইপত্র। যে ক'টা দিন থাকেন, আনন্দে কাটে। একবার বড়ঠাকুর এসেছেন, শরীর ভালো নেই, উনি বললেন, 'দাদা, এবার এখানে কিছুদিন থাকুন।' বড়ঠাকুর রাজি হলেন। আমি যথাসাধ্য দেখি। উমা তামাক সাজে। বড়ঠাকুরের বাঁ-কাঁধ এবং হাতে দারুণ ব্যথা। আমি-উমা সঙ্গে সঙ্গে থাকি যাতে ওঁর কোনো অসুবিধা না হয়। উমার সঙ্গে দেশের কথা বলেন। আমি শুধু শ্রোতা, কারণ আমি তখনও দেশে যাইনি। অন্যসব

গল্পও হয়। তারপর ভাই এলে কথা বলেন। ডাক্তারখানার কথা জিজ্ঞেস করেন। তখন ওঁদের দুজনের ব্যাপার। একসঙ্গে খেতে বসেন। কেমন সুন্দর ছিল সেইসব দিনগুলো। প্রভাত আসত, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে, সন্ধ্যা নামত পরিপূর্ণ তৃপ্তির আস্বাদনে।

মনে পড়ে উনি রাত্রে বাড়ি ফিরতেন, চৌকির ওপর বসে জানলা দিয়ে দেখতাম। অনেক দূর থেকে সাইকেলের উজ্জ্বল আলো দেখা যেত। তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে দাঁড়াতাম। সাইকেল রাখলেই জিম এসে বুকের কাছে ঝাঁপিয়ে উঠে আদর জানাত। আমাকে বলতেন, 'খবর ভালো?' বলতাম, 'হুঁ।' উমাকে ডেকে বলতেন, 'খুকি, আজ সারাদিন দুজনে কী করলি বল।' ওঁরা গল্প করতেন। শীতের দিন। আমি চা করে নিয়ে আসতাম। এক-একদিন সকাল সকাল ঘরে জামা-জুতো খুলে বলতেন, 'তোমাকে একটু খাটাব, হারমোনিয়ামটা একটু দাওনা গো। বাড়ি এলে কিছু করতে ইচ্ছে করে না, তুমি হাতে হাতে সব দিয়ে আমাকে কুঁড়ে করে দিয়েছ।'

দিন কেটে যাচ্ছে। পাড়ার সবাই আসছেন। আমরাও যাই। মাঝে মাঝে আমি-উমা সাঁওতালদের বাড়ি যাই। ওদের সঙ্গে খাটিয়ার বসে গল্প করি। ওরা বড় গোল বাটি করে জলদেওয়া বাসি ভাত খায়, হাঁড়িয়া বানায় দেখি। বিবাহে বা অন্য উৎসবে ওরা সারিবদ্ধ হয়ে হাত ধরাধরি করে নাচে। হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে এ-ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখতাম। ওরা বলত, 'একটু হাঁড়িয়া খাবি? লাচবি তো আয়।' আমরা হাসতাম। ওরাও হেসে গড়িয়ে পড়ত। প্রায় রাত্রে ভেসে আসত ওদের নাচ-গানের সঙ্গে মাদলের শব্দ। জ্যোৎস্নারাত্রে ওদের নাচগানটা বেশি হত। মাঝে মাঝে ঝগড়ার চিৎকারও ভেসে আসত। আমরা কান খাড়া করে শুনতাম।

পৌষসংক্রান্তিতে ওদের টুসু পরব হত। এই পরবে ওদের খুব জাঁকজমক হত। সারাদিন নেচে নেচে সুর করে টুসুর গান করত। টুসু নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পুজো দিত। তারপর মুরগি বলি দিত। ওদের গানের কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতাম না, শুধু সুরটা ভালো লাগত। একটি— দুটি কলি ওরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারেবারে নেচে গাইত। আমাদের বাড়িতে রাধা নামে একটি মেয়ে কাজ করত, সে টুসু পরবে একটা গান গাইত। একটুখানি মনে আছে। লিখছি—

'ঝিরিঝিরি জল পড়ে
মাথা ভিজিল, ল, মাথা ভিজিল,
জামতলে, বেলা ডুবিল ল, বেলা ডুবিল।'

নেচে নেচে এই তিন লাইন গাইত। আমরা সুবর্ণরেখায় গিয়ে দেখতাম ওরা স্নান করছে, পুজো দিচ্ছে, দলবেঁধে গান গাইছে, হাঁড়িয়া খেয়ে চোখ লাল করে কেউ

বা মাতলামি শুরু করেছে। বেশ লাগত সহজ সরল মানুষগুলির প্রাণখোলা আনন্দের উৎসব।

উমা নতুন এসেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে জ্বর হল। আমি উমার দেখাশুনো করতাম, ওর কাছে থাকতাম। উনি বলতেন, 'তুমি পারবে তো?' বলতেন, 'ডাক্তারের বউ হয়েছ, একটু আধটু নার্সিং শেখো। আমি পাশের ঘরেই রইলাম, দরকার হলে ডেকো।'

উমার সত্যিই অনেক গুণ ছিল। সদ্য মা হারিয়ে দেশ ছেড়ে আমার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু ও এত সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিল ভাবলে অবাক লাগে। ওর মনে কোনোদিন কোনো ক্ষোভ দেখিনি। ও যেমন মামাদের ভালোবাসত, মামারাও তেমনি ওকে ভালোবাসতেন। উমা আমাদের দু'জায়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। আমরা উমার কথামতোই কাজকর্ম করার চেষ্টা করেছি। শ্বশুরবাড়িতে আর কাউকে তো পাইনি। উমার কাছেই পায়েস, পিঠে, তালের বড়া— বড়ঠাকুর যা যা ভালোবাসতেন, শিখেছিলাম। ভালো বা নতুন কাপড় আগে উমা পরবে, তারপর আমি। দুজনে দুজনের কাপড় পরেছি, দিদি থাকলে দিদির কাপড়ও ওইভাবে পরেছি, একসঙ্গে বেড়াতে গেছি, একসঙ্গে বসে খেয়েছি। অন্যায় করলে বকেছি, কিন্তু তা নিয়ে একে অপরকে অনুযোগ করিনি। ওকে কোনো কিছু করতে বাধা দিলেই বলত, 'আমি দু-মামার এক ভাগ্নি— যা খুশি তাই করব।' তা বলে উমা দুর্বিনীত ছিল না। এ সবই ছিল ওর আদর, ওর ছেলেমানুষি।

উমার একটা অভ্যাস ছিল, দুপুরে ঘুমোত না। আমরা ঘুমোচ্ছি, ও তখন করত কী— উনোনে কাঠকুটো দিয়ে আলুসিদ্ধ করে আলুকাবলি করত। কোনোদিন বা আলুপোড়া নুন দিয়ে খেতে বসত। কোনোদিন বা পরোটা। শান্তকে এক-একদিন দিত। এত সুন্দর তেঁতুল জরাত, ঘুম থেকে উঠে আমি বলতাম, 'একটু দে না উমা।' ইচ্ছা হলে দিত, তা না হলে দিত না। ওর ছোটমামা যখন বলত, 'খুকি, আমাকে একটু দে', তখন উমা শান্তগলায় বলত, 'আর তো নেই ছোটমামা। কাল আপনাকে দেব।' ওর কাণ্ড দেখে আমরা হাসতাম।

মাঝে মাঝে বড়ঠাকুর আসেন। ওঁর বন্ধু নীরদদা, প্রফেসার বিশ্বাস ওঁরাও সপরিবারে আসেন। আমরাও গালুডি যাই। দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে 'সুবর্ণ সংঘের' অধিবেশন হয়। কলকাতা থেকে সুধীবৃন্দদের যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে নিমন্ত্রণ করা হয়। সবাই সাহিত্য পাঠ করেন এবং বলেন। গান হয়, শেষে আহারের আয়োজন। এমনই একটি অধিবেশনে কবিতা প্রতিযোগিতায় সবাই জোর করে আমার নাম দেওয়ালেন। বড়ঠাকুর বললেন, 'আমি দেখিয়ে দেব'খন।' দুইভাই একটু দেখিয়ে দিলেন। আমি প্রাণপণে মুখস্ত করলাম। অধিবেশনের দিন আমার স্বামী বললেন, 'আমি

কিন্তু আজ এ সভায় যাচ্ছি না। তুমি কবিতা আবৃত্তি যা করবে বুঝতেই পারছি।' আমি বললাম, 'না থাকলেই ভালো, তা হলে আমি ঠিক বলতে পারব। তা না হলে তোমার দিকে চোখ পড়লেই সব গুলিয়ে যাবে।' সত্যি উনি ডাক্তারখানায় চলে গেলেন। আমি, উমা, বড়ঠাকুর সভায় গেলাম। বুক আমার দুরদুর করছে। অনুদি, সুবর্ণদি, রেখাদি এঁরা সবাই বলছেন, 'যমুনা, ভালো করে বলবি।' সামনে বড়ঠাকুর এবং ওঁর বন্ধুবর্গ, মনে মনে ভাবছি, ভাগ্যিস উনি চলে গেছেন।

পরপর কয়েকজনের বলার পর আমার পালা। আমি তো কোনোদিকে না তাকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সবলা'। আরম্ভ করলাম। কোথাও আটকায়নি। ভালো হল এবং বিচারে প্রথম হলাম। তারপর দেখি উনি কখন এসে ঘরে বসে আছেন। অনুদি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, যমুনা আমাদের মুখ রেখেছে।' উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি শিখিয়েছি বলে।' বড়ঠাকুর আমাকে ভালো বলেননি, কিন্তু ভাটপাড়ায় মাসিমাকে গিয়ে বলেছিলেন, 'বৌমা ভালো আবৃত্তি করেন।'

মা আমাকে চিঠি লিখলেন, 'বৌমা, বিভূতি রবিবারে এসেছিল বলতে—বৌমা ভালো আবৃত্তি করেন। শুনে আমার খুব আনন্দ হল। তোমাকে আনার কথা বলতে বললে, এখন নয়, পুজোর পরে।' যাই হোক, বড়ঠাকুর ভালো বলাতে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। পুরস্কার পেয়েছিলাম দ্বিজেনবাবুর নিজের হাতে তৈরি একটি বেলফুলের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথা মালা। মালার মধ্যে একটি রুপোর পদক। পদকটি এখনও আমার কাছে আছে।

এরকম একবার বড়ঠাকুর এসেছেন, কয়েকদিন থাকবেন। উনি এলেই বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। প্রায় রোজই গোছাভর্তি চিঠিপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে ডাকপিওন আসেন। একদিন কী হল, বড়ঠাকুর ছোটঘরে বসে লিখছিলেন, বোধহয় 'টমাস বাটার জীবনী' অনুবাদ করছিলেন, দেখি পিওন এসে চলে গেল। তার একটু পরে বড়ঠাকুর আমাকে ডাকলেন, 'বৌমা, এদিকে এসে দেখ, সুপ্রভা কী পাঠিয়েছে।' গিয়ে দেখি লেখার সুটকেস কাগজ-কলম বিছানার ওপর ছড়ানো। বড়ঠাকুরের হাতে একটা রুমাল, আমি যেতেই বললেন, 'দেখ', বলে হাতের রুমালটা আমাকে দিলেন। সুন্দর নরম আদ্দির কাপড়ের একটি রুমাল, এককোণে মুগার সুতো দিয়ে ছুঁচের কাজ করা। আর একটি প্যাকেট। বললেন, 'সুপ্রভার যেমন কাণ্ড!'

আমি রুমালটা নিয়ে বললাম, 'খুব সুন্দর রুমালটা, কাজটাও ভারী সুন্দর হয়েছে।' বড়ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, 'সুপ্রভা এখন শিলঙে প্রফেসারি করছে। আমাকে যেতে লিখেছে।' ভাই বললেন, 'ঘুরে আসুন।'

বড়ঠাকুরের মুখে শুনেছি একবার উনি শিলং গেছেন মাত্র দুটোদিন সময় হাতে নিয়ে। তখন সুপ্রভাদি, ওঁর বোনঝি সেবা এবং জর্জিনা বলে একটি মেয়ে এই তিনজনে মিলে তাড়াতাড়ি করে একটা সোয়েটার ওঁকে বুনে দিয়েছিলেন। সেটা উনি খুব পরতেন। সুপ্রভাদি প্রায়ই বালিশের ওয়ার, বালিশের ঢাকা ইত্যাদিতে সূচের কাজ করে পাঠাতেন।

সুপ্রভাদির কথা আমার স্বামীর কাছে প্রথম শুনেছিলাম। সুপ্রভাদি শিক্ষিতা, অধ্যাপিকা, লেখিকা। 'মাতৃভূমি'তে তখন ওঁর একটা উপন্যাস বেরুচ্ছে। পড়েছিলাম। বড়ঠাকুরের সঙ্গে সুপ্রভাদির কলকাতাতে আলাপ, তখন উনি কলেজের ছাত্রী। বড়ঠাকুর সুপ্রভাদিকে খুবই স্নেহ করতেন, ওঁর বহু দিনলিপির পাতায় পাতায় সুপ্রভাদির কথা আছে। সুপ্রভাদিরও ছিল বড়ঠাকুরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। সুপ্রভাদির চিঠি আসে, বড়ঠাকুর ভাইকে পড়ান, ভাটপাড়ায় নিয়ে গিয়ে মাকে পড়ান। আগেই বলেছি, মা হচ্ছেন আমার ছোট মামিশাশুড়ি— আমি মা বলতাম, বড়ঠাকুর মামিমা বলতেন। একবার মা বড়ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'বিভূতি, চিঠি পড়ে মনে হয়, মেয়েটি তোমায় ভালোবাসে।' শুনে বড়ঠাকুর আমতা আমতা করে বলেছিলেন, 'তাই নাকি! তা হবে।'

আমি সুপ্রভাদিকে দেখিনি, কিন্তু ওঁর কথা শুনেই ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল।

সেবার কয়েকটা দিন থেকে বড়ঠাকুর চলে গেলেন। পরে একদিন কী হল, বড়ঠাকুর হঠাৎ রাত্রের ট্রেনে এলেন। যথারীতি রাত্রে খাওয়ার পর বারান্দায় বসে দুইভাই কথা বলছেন। তখন শুনলাম বড়ঠাকুর বলছেন, 'নুটু, সুপ্রভা আমাকে বিয়ে করতে চায়, কী করি বল তো?' আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আপনি বিয়ে করুন দাদা, অমত করবেন না। আমরা খুব খুশি হব। সুপ্রভাদি খুব ভালো মেয়ে।' বড়ঠাকুর বললেন, 'তা তো বটেই। সুপ্রভার বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। একবার ভাটপাড়া যাব, গিয়ে মামাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

তখন আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে অসবর্ণ বিবাহ চালু হয়নি। বয়স্করা এটা মেনে নিতে ইতস্তত করেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বৌমা, তোমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। বলো তো, এ বিয়ে করব?' আমি খুশি হয়ে বলেছিলাম, 'করুন।'

কিন্তু আমার ছোটমামাশ্বশুর এ-বিয়েতে রাজি হননি। উনি বলেছিলেন, 'তোমার ভাগ্নির বিয়ে দিতে হবে। ভাইকে ত্যাগ করতে হবে।' এইসব বিবেচনা করে বড়ঠাকুর প্রথমদিকে বিয়েতে রাজি হননি। শেষে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রভাদির বাড়ি থেকে প্রবল আপত্তি ছিল। বড়ঠাকুরের মতো পাত্রও ওঁদের মনঃপূত ছিলেন না। প্রায় জোর করেই তাঁরা সুপ্রভাদিকে অন্যত্র বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছিলেন। এইরকমই

শুনেছি এবং বড়ঠাকুরের লেখা সুপ্রভাদির চিঠি পড়ে সেইরকমই মনে হয়েছে। তখন এই নিয়ে একটা চাপা দুশ্চিন্তা আমাদের বাড়ির সবার মনে ছিল। বড়ঠাকুরকে লুকিয়ে আমি ওঁর অনেক চিঠিই পড়েছি। অবশ্য লুকিয়ে না পড়লেও হত। কিন্তু আমাকে তো উনি কোনোদিন পড়তে দেননি। ভাইকে পড়াতেন, মামিমাকে পড়াতেন। আমার ভাশুর তো, তাই একটু সংকোচ হত। বিবাহ জিনিসটা ভবিতব্যের ব্যাপার, কারণ ওঁদের দুজনের বিবাহের কোনো বাধাই ছিল না, কিন্তু হয়নি। যাই হোক, এখনও বাবলু-বৌমার কাছে মাঝে মাঝে সুপ্রভাদির খবর পাই।

৩৩

সময় গড়িয়ে চলেছে মহাকালের রথচক্রের তলে। ওঁর পসার ক্রমশ বাড়ছে, নাম-যশও হয়েছে। রোগীদের জন্য ভাবনা-চিন্তা, পড়াশুনো সবই করতে হয়। খাটেন খুব। কোনো রোগীর অবস্থা খারাপ হলে দেখেছি সব সময় একটা চিন্তা ওঁর মনে লেগে থাকত। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন, কখনও বা জার্নালটা নিয়ে পড়তেন। আমি কথা বলার জন্য ধরলে বলতেন, 'পরের বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি। দাঁড়াও, একটু পরে গল্প করছি।' রোগীদের খুব যত্ন করে দেখতেন। নিজে গরিবের ছেলে ছিলেন, তাই গরিব-দুঃখীদের ওপর ওঁর একটা আলাদা টান ছিল, টাকা দিক আর না দিক। ওঁর মৃত্যু সংবাদে আশেপাশের দরিদ্র সাঁওতালরা কেঁদেছিল। ওদের আর কে বিনাপয়সায় যত্ন করে দেখবে। বলে, 'যে দেখত সে চলে গেল।' রোগী সেরে উঠলে ওঁর খুব আনন্দ হত। আমাকে বলতেন, 'তুমি জানো না, মানুষ কত অসহায় হয়ে পড়ে। বাড়িতে কঠিন রোগী থাকলে বাড়ির লোক ভাবে ডাক্তার ভগবান, ডাক্তার এলেই বুঝি রোগ সেরে উঠবে। কিন্তু আমরা জানি যেটুকু করার আমরা করব। বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাত।'

মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে রোগী দেখতে যেতেন। বাড়ি এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আমি কিছু বললে বলতেন, 'একটু কষ্ট হয় বটে, তবে পথের দৃশ্য অপূর্ব। ভাব তো কত কষ্ট করে সিরিয়াস রোগী নিয়ে ওরা শহরে ডাক্তারের কাছে আসে। তা ছাড়া ওরা আমাকে টাকা দেয়। কত কষ্ট করে ওরা ওই সব জায়গায় বাস করে। তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব। দেখবে কত অনাড়ম্বর ওদের জীবনযাত্রা।'

দেখতে দেখতে দু-বছর কেটে গেল। আমার বিয়ের ঠিক দু-বছর পরে ১৯৪০ সালে (১৩৪৭-এর ১৭ অগ্রহায়ণ) দিদির বিয়ে হল। আমার বিয়ে হয়েছিল ১৯৩৮ সালে (১৩৪৫-এর ২১ অগ্রহায়ণ)। দিদি অর্থাৎ আমার বড় জা রমা দেবী। দিদির

ডাকনাম কল্যাণী। এই বিয়ের কিছু আগে বড়ঠাকুর রাঁচি থেকে ফেরার পথে ঘাটশিলায় নেমেছিলেন। সেদিন বড়ঘরে বসে চা খেতে খেতে দু'ভায়ে কথা হচ্ছিল, একসময় আমাকে ডেকে বললেন, 'বৌমা, একবার এদিকে এসো! একটা কথা তোমার শোনা দরকার। বোসো।' তারপর বললেন, 'এবার আমি বিয়ে করছি।' আমরা একটু অবাক, কারণ এই বিয়ের ব্যাপার আমরা আগে শুনিনি। সবাই উদগ্রীব হয়ে শুনছি, উনি বললেন, 'ওরা বনগাঁয় কিছুদিন হল এসেছে। মেয়েটির নাম কল্যাণী। বড় ভালো মেয়ে, আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি বলেছি, দেখ কল্যাণী, আমার বয়স হয়েছে, দেখ চুল পেকে গেছে। পূর্বে একবার আমার বিয়ে হয়েছিল।'

বড়ঠাকুরের প্রথম বিয়ে হয়েছিল পানিতরে কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পরে গৌরীদি মারা যান। ঘাটশিলার বাড়িতে আমরা যাওয়ার পর আমার স্বামী বড়ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'দাদা, এই বাড়ির নাম গৌরীকুঞ্জ রাখি।' বড়ঠাকুর রাজি হয়েছিলেন। আগে ঘাটশিলার বাড়ির নাম ছিল 'শশীকণা বাংলা'।

যাই হোক, অনেক কথার পর বড়ঠাকুর বললেন, 'কল্যাণীর বাবা ষোড়শীবাবু ভাটপাড়া যাবেন ছোটমামার সঙ্গে কথা বলতে।' তারপর বললেন, 'বৌমা, তা হলে তোমাদের মত আছে তো?' আমরা সকলেই খুশি হয়ে বললাম, 'খুব ভালো হবে। আপনি বিয়ে করুন।' শুনে বড়ঠাকুরের মুখে মৃদুমৃদু হাসি। এটা বড়ঠাকুরের একটি বড় ভালো অভ্যাস ছিল, মনোমতো কিছু হলে বা বললে মৃদু হাসি মুখে ভেসে উঠত। আমি চলে এলাম। ওঁরা দুজনে বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

পরদিন বড়ঠাকুর চলে গেলেন কলকাতায়। আমি আর উমা বনগাঁয় বিয়েতে যাব, তার আলোচনা করছি শুনে উমার ছোটমামা বললেন, 'তুমি, উমা এবং শান্ত— তোমাদের বনগাঁ নিয়ে যেতে দাদা বারণ করেছেন। আমি শুধু যাব।' শুনে আমরা থ। এমন কথাও মানুষ বলে! আমরা কোথায় বিয়েতে যাব বলে আনন্দ করছি! শুনে আমাদের খুব দুঃখ হয়েছিল। অবশেষে আমি বললাম, 'আমি তো অনেকদিন ভাটপাড়া যাইনি, তোমার সঙ্গে আমি ভাটপাড়া যাব।' উনি বললেন, 'তা কী করে হয়। উমারা এখানে একলা থাকবে। উমা যদি মত দেয় তবেই যাওয়া হবে, নচেত নয়।' উমা রাজি হল, তবে একটা শর্তে। উমা বললে, 'তুমি বিয়েতে যাবে না বলো।' আমি বললাম, 'নারে উমা, তোকে এখানে ফেলে আমি বিয়েতে কখনওই যাব না। দেখছিস তো বাবা কেবল যেতে লিখছেন। কতদিন যাইনি।' উমা বললে, 'বিয়েতে যদি যাও তা হলে দেখবে!' উনি বললেন, 'আমি যে ক'দিন ওদিকে থাকব সে ক'দিন তুমি ভাটপাড়ায় থাকবে।' আমি বলেছিলাম, 'ফেরার সময় আমাকে নিয়ে এসো।'

ওঁর সঙ্গে ভাটপাড়ায় এলাম। আমাকে দিয়ে উনি বনগাঁ চলে গেলেন।

দিদিকে আমি প্রথম দেখলাম ভাটপাড়ায়। বৌভাতের পরই দিদিকে নিয়ে বড়ঠাকুর মা এবং মাসিমাকে প্রণাম করাতে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম দেখাতেই দিদিকে আমার ভালো লেগেছিল। দুজনে ওপরের বড়ঘরে বসে অনেক গল্প করেছিলাম। একই বাড়ির বৌ আমরা, তাই বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। সেদিন রাত্রিটা ভাটপাড়ায় থেকে পরদিন ওঁরা বনগাঁ চলে যান। আমিও ওঁর সঙ্গে ঘাটশিলায় রওনা হই।

উমা ছোটমামার কাছে বিয়ের কথা বনগাঁর কথা শুনল। আমি দিদির কথা বললাম। ও যেতে পায়নি বলে বেশ দুঃখিত হয়েছে। এর কিছুদিন পরে দিদি-বড়ঠাকুর ঘাটশিলায় এলেন। ওঁদের পেয়ে, বলা বাহুল্য, আমরা খুবই খুশি। প্রথম দিন বিকেলে আমাদের সবাইকে নিয়ে বড়ঠাকুর ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে বড়ঠাকুর বললেন, 'বৌমা, কল্যাণীকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসছি।'

চা খেয়ে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন, ফিরলেন বেলা গড়িয়ে গেলে। আমরা তো ভেবে মরছি। ক্লান্ত হয়ে দুজনে যখন ফিরলেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সেবার কয়েকদিন থেকে ওঁরা বনগাঁ চলে আসেন, তখন দিদির মার অসুখ।

এরপর দ্বিতীয়বার দিদিরা আসেন পুজোর পর। অবশ্য এর মধ্যে বড়ঠাকুর একলা দু-একবার এসে গেছেন। চিঠিও এসেছে। কিন্তু তখনকার চিঠি একটাও পাওয়া যায়নি, কোথায় হারিয়ে গেছে। এই ফাঁকে আমার স্বামী মোটর সাইকেল কিনেছেন। তখন ঘাটশিলায় কেবল ওঁরই মোটর সাইকেল ছিল, আর কোনো ডাক্তারের ছিল না। ওখানে সাঁওতালরা ওঁকে বলত, ভটভটি ডাক্তারবাবু। প্রথমে মোটর সাইকেল কিনে দাদাকে নিয়ে অনেকদূর বেড়িয়ে এলেন। দাদা মহাখুশি। একদিন আমার স্বামী আমাকে বললেন, 'দেখ মোটর তো কিনতে পারব না। তাই মোটর সাইকেলে তোমাকে না চড়ালে তৃপ্তি হচ্ছে না।' আমি বললাম, 'না বাবা। ওতে আমি চড়ব না, ভয় করে।' বললেন, 'ভয় কী! আমাকে জোর করে ধরে থাকবে। কত মেয়েরা চাপছে।' আমি বলেছিলাম, 'আচ্ছা, চাপব। তবে এখন নয়।'

বড়ঠাকুর কলকাতায় চলে গেছেন, একদিন উনি বললেন, 'চলো, আজ বেড়িয়ে আসি। এরপর কে এসে যাবে, হবে না।' আমার ভয় করছিল খুব, তবুও উঠে বসলাম। কাঁধটা খুব জোরে ধরেছি, বললেন, 'লাগছে। একটু আস্তে।' স্টার্ট দিলেন। নার্সারি, রেখাবাংলা ফেলে রেখে জোড়া আমগাছের তলা দিয়ে, ওঁর ডিসপেনসারির পাশ দিয়ে সোজা হরিণধূপড়ি। বেশ ভয় করছিল, যা উঁচুনিচু রাস্তা—। ছিটকে পড়ে না যাই। অবশ্য একটু একটু ভালোও লাগছিল। গতির একটা আনন্দ আছে।

এক জায়গায় থেমে বললেন, 'আর যাবে?' আমি বললাম, 'না, বাড়ি চলো।' উনি বললেন, 'তাই চলো। ডিসপেনসারিতে লোক বসে রয়েছে, ওরা ভাববে ডাক্তার বৌ নিয়ে উড়ছে, চলো।' সেদিনের অভিজ্ঞতা আজও মনকে নাড়া দেয়।

দূরের গ্রাম থেকে রোগী আসে। একদিন একজন গরুর গাড়ি নিয়ে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যেতে এল। উনি যাবেন, আমি বললাম, 'আমি যাব তোমার সঙ্গে।' প্রথমে রাজি হলেন না। পরে বললেন, 'চলো, আমার ডাক্তারির জায়গা দেখে আসবে।' সেদিন আর সাইকেল নিলেন না। খানিকটা হেঁটে কিছুটা গরুর গাড়িতে আমরা যাচ্ছি। যে লোকটি গাড়ি নিয়ে এসেছিল সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। পাহাড় জঙ্গল খেতিজমি অনেক কিছু পার হয়ে একটি পরিষ্কার সাঁওতাল পল্লিতে এসে গরুর গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নামলাম। উনি একটি ঘরের মধ্যে গিয়ে রোগী দেখে এসে বাইরের খাটিয়ায় বসলেন।

ওঁকে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে, একজন বৃদ্ধের খুবই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাকে ইনজেকশন ও ওষুধপত্র দিলেন। আরও সব রোগী এখন দেখছেন, আমি ঘুরে ফিরে চারদিকটা দেখছি। ছোট্ট গ্রাম, কয়েকঘর বসতি, লেপাপোঁছা পরিষ্কার ঘরদোর। দূরে পাহাড়শ্রেণি, অনতিদূরে জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর, দেখতে ভালো লাগছিল। কিন্তু যখনই মনে হচ্ছিল ওঁকে কত কষ্ট করে এই সব জায়গায় রোগী দেখতে আসতে হয়, তখনই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

ফেরার সময় আমি বললাম, 'দেখ, তোমার আর এতদূরে কষ্ট করে রোগী দেখতে আসতে হবে না, আমাদের টাকার দরকার নেই।' শুনে উনি হেসে বলেছিলেন, 'চলো, তার চেয়ে বরং একতারা নিয়ে দুজনে মিলে 'জয় রাধে' বলে বেরিয়ে পরি। তুমি খঞ্জনি নেবে, আমি একতারা।' ঠাট্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সত্যিই যদি দুজনে বেরিয়ে পড়তাম, পথে পথে গান গেয়ে বেড়াতাম। কৃষ্ণকথা। সেখানে সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন থাকত না। কেউ চিনত না, জানত না, বলত না, অমুকের ভাই, ভাই-বৌ। তা হলে ওঁকে কোনো সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত না, কেউ পারত না ওঁকে আঘাত করে দুর্বল করে দিতে! আমি এভাবে ওঁকে হারাতাম না। আমার যে উনি ছাড়া কেউ নেই। সমালোচনার জন্যে তো দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। চক্রধারী ঈশ্বরের এভাবে ছত্র না ঘোরালেই কি তাঁর সৃষ্টি রসাতলে যেত! যাঁরা লেখক, সাহিত্য যাঁদের সাধনা, তাঁরা মানুষের মন বোঝেন, তাঁদের দরদি হৃদয়ের ছোঁয়ায় ব্যর্থ জীবনও সার্থকতায় ভরে উঠে সান্ত্বনা পায়, আমার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। একবারও ভাবলেন না, আঘাত করার সময় এখন নয়। তাঁরা সকলেই ওঁকে চিনতেন। জানতেন দাদা ছাড়া ওঁর কেউ নেই।

স্মৃতির মালা গাঁথতে বসেছি। অসংলগ্নভাবে একটি একটি ঘটনা মনে পড়ছে। দিদিকে বিয়ে করার পর কিছুদিন পরেই বড়ঠাকুর কলকাতার খেলাতচন্দ্র ঘোষ ইনস্টিটিউশনের চাকরি ছেড়ে দিলেন। ভাইকে বললেন, 'নুটু, ভাবছি দেশে গিয়ে থাকব, আর লিখব। তুমি কী বলো?'

দেশের সঙ্গে বড়ঠাকুরের যোগাযোগ কোনোদিনই ছিন্ন হয়নি। উনি যখন কলকাতায় থাকতেন তখন তো প্রতি সপ্তাহে বনগাঁ-ব্যারাকপুর আসা চাই। দেশের মাটির সোঁদা গন্ধ, ইছামতীর স্বচ্ছ জলধারা, ওখানকার গাছগাছালি, পক্ষীকুল, নিরীহ সরল অল্পে-সন্তুষ্ট মানুষগুলিকে উনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। যখনই যেখানেই থাকুন না কেন মাতৃভূমির অমোঘ টান উনি অনুভব করতেন। সুদূর বিহারে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখেছেন যার পটভূমি হল ব্যারাকপুর গ্রামের পথ-ঘাট-মাঠ আপনজন। উনি শহর কলকাতায় অনেকদিন কাটিয়েছেন বটে কিন্তু বাইরের মায়ায় মুগ্ধ হননি। আমার মনে হয় বড়ঠাকুরের মনে চিরদিনই একটি গোপন বাসনা ছিল গ্রামে বাস করার।

ওঁর দেশে যাওয়ার কথা শুনে প্রথমে আমার স্বামী বলেছিলেন, 'না দাদা। সকলে ঘাটশিলাতেই থাকি। মাঝে মাঝে দেশে যাবেন। তা ছাড়া বৌদি ওই গ্রামে থাকতে পারবে না। কষ্ট হবে, ম্যালেরিয়া ধরলে মুশকিল।' বড়ঠাকুর বললেন, 'তোমার বৌদিকে গ্রামে থাকতে হবে। আমাদের গ্রামে কি মানুষ নেই? মা কি ছিলেন না? আর ম্যালেরিয়া, সে দেখা যাবে। কিছুদিন তো গিয়ে থাকি। বাড়িটা সারাতে হবে।'

কোনো কথা শুনলেন না। কিছুদিন পরে উমা ও দিদিকে নিয়ে বড়ঠাকুর দেশের দিকে রওনা হলেন। প্রথমে ওঁরা উমাদের বাড়ি চালকি গিয়ে ওঠেন, ওখানে থেকে ব্যারাকপুরের বাড়ি সারানোর ব্যবস্থা করেন। মিতেদা বাড়ি সারানোর ভার নেন। বাড়ি সারানো হলে ওঁরা ব্যারাকপুরে বাস করতে শুরু করেন। এই বাড়িটা অবশ্য আমাদের ভিটের ওপর নয়। পরে বড়ঠাকুর এটি কিনেছিলেন।

বাড়ি সারানো সাঙ্গ হল, গ্রামে বাস-করা শুরু করলেন। বড়ঠাকুর খুব খুশি। গোপালনগর স্কুলে চাকরি নিলেন, আস্বাদন করতে লাগলেন গ্রাম্য গৃহস্থ জীবন। বড়ঠাকুরের চিঠি এল। সমস্ত সংবাদ দিয়ে। ভাইকে সব কিছু না জানালে উনি স্বস্তি পেতেন না। খুঁটিনাটি সবকথা লেখা চাই, লেখার শত ব্যস্ততার মধ্যেও। এ চিঠিটা ব্যারাকপুরে বাস করার ঠিক আগের লেখা। চারিদিকে বোমাতঙ্ক।

কলিকাতা
শুক্রবার, ২০.২.৪২

কল্যাণবরেষু

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। এখানে অন্যসব একপ্রকার ভাল। বারাকপুরের বাড়ি প্রায় নতুন করে মেরামত হচ্ছে। বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতায় এসেছি। একটি বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে ও কিছু কাজ আছে। রবিবার চালকী ফিরব। গোপালনগর স্কুলে মার্চ থেকে যোগ দিতে হবে। কী করবো লিখবে। ৪০ টাকা মাইনে। তোমার বৌদিদি ও উমা চালকীতে। মিতেরা এখনও বনগাঁয়ে, তারা চালকী যাবে শিগগিরই। বনগাঁয়ে বড় বড় চালাঘর তৈরি হচ্ছে। কলকাতায় বোমা পড়লে পলায়মান জনতার আশ্রয়ের জন্যে। এখানে আলু এক আনা সের, বেগুন দু সের পয়সায়, মাছ আট আনা, ছয় আনা, চাল ছ টাকা, তেল আট আনা সের। তরিতরকারি খুব সস্তা। দুধ নয় সের, খাঁটি দুধ দুয়ে দেয়। উমা ও কল্যাণীর মন ভাল নয়। ঘাটশিলায় যেতে পারলে উমা তো বাঁচে, কিন্তু এখন যাওয়া উচিত নয় বলেই ভাবি। তুমি বেগতিক বুঝলে বৌমাকে এখানে পাঠিয়ে দিও অথবা emergence বুঝলে কোলাঘাট পাঠাতে পারো। ফাল্গুনের শেষে তোমার বৌদিদি কোলাঘাট যেতে পারে। কলকাতায় কাল চিয়াং এসেছেন, জহরলাল নেহরুর বক্তৃতা হবে আজ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। যাবো ভাবছি। কলকাতায় বিশেষ কোন প্যানিক নেই। সাধারণভাবে চলচে। কলেজে শতকরা আশিজন মেয়ে নিয়মিত আসছে একজন অধ্যাপক বললেন। তবে সিঙ্গাপুর পতনের পরে ভারতের অবস্থা ভাল নয়। বঙ্কিমবাবুকে আমার কথা বোলো, মিঃ সিংহকে আমায় চিঠি দিতে বোলো চালকীর ঠিকানায়। নীরদবাবু কোথায়? বালিগঞ্জে কি? দ্বিজুবাবুকে আমার নমস্কার দিও এবং ভট্‌চাজ সাহেবকেও। এখানে কদিন ঝড় ও বৃষ্টি চলচে। শান্তকে বোলো জোলে মাছ খুব হয়েচে। কুল খুব হয়েচে। শিমুল ফুলের খুব শোভা। ভাণ্ডারগোলার হরিভূষণের ছেলের বিয়েতে চালকী থেকে গরুর গাড়ি করে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। সন্তোষ বললে একদিন তোমার সঙ্গে নাকি ওর দেখা হয়েছিল। আর সব মন্দ নয়। তুমি বৌমা শান্ত আশীর্বাদ নিও। সুধীর সরকারের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে রাবিবার সকালে চালকী ফিরবো। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ - আজ খগেন্দ্র মিত্র ইউনিভার্সিটিতে বললেন যে কিছুদিন আগে ইউনিভার্সিটিতে বাংলা ডিপার্টমেন্টে আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার জন্যে ইউনিভার্সিটি আমায় যথেষ্ট খুঁজেছিল। আমার স্কুলেও লোক পাঠিয়েছিল, কিন্তু

আমায় পাওয়া যায়নি। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে ওরকম কোনো পোস্ট আবার এলে তিনি আমায় দেবেন।

দুই ভায়ের চিঠির আদানপ্রদান চলতে থাকে। একবার দিদির বাবা কোলাঘাটে বদলি হয়ে এসেছেন, বড়ঠাকুর দিদি ও উমাকে কোলাঘাটে রেখে নিজে কলকাতা হয়ে দেশে ফিরেছেন। ওই সময় বড়ঠাকুর গুটকেকে ঘাটশিলায় পাঠানোর জন্যে লেখেন। এসময় বড়ঠাকুরের খুব জমিজমা কেনার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। ওইসময় দেশেও কিছু জমি আম-কাঁঠালের বাগান কিনেছিলেন। খেতের জমির চাল হত, চিঁড়ে কোটানো হত, কলায়ের ও সোনামুগ ডাল হত। বড়ঠাকুর ঘাটশিলায় নিয়ে যেতেন।

কলিকাতা, ২৮.৯.৪২

কল্যাণবরেষু,

আমি গত শুক্রবার কোলাঘাটে এসেছিলাম এবং আজ সকালের ট্রেনে কলকাতা এসেছি। আজই বরিশাল এক্সপ্রেসে দেশে ফিরবো। ওখানে উমা ও তোমার বৌদিদি ভালই আছে। তবে বড় কষ্ট গেল কদিন। যেমন দেশে তেমনি এখানে। তোমার কোলাঘাট আসার কথা সকলে বলছিলেন। আমি পূজার পরেই ঘাটশিলা যাবো এবং কিছুদিন থাকবো। চাকরি ছেড়েই দেবো ভাবছি। অনেক অর্ডার পেয়েচি। চাকরি করলে সেসব লেখা সম্ভব হবে না। দার্জিলিংএ অভিনন্দন দেবে আমাকে পুজোর সময়, সে সময় যেতে হবে সেখানে। রেডিওতে বুধবার, আগামী বুধবার অর্থাৎ পরশু সন্ধ্যার সময় সজনী দাস 'অনুবর্তন' সম্বন্ধে বলবে। যদি পারো তো শুনো। শনিবারের চিঠি ও আনন্দবাজারে ওর খুব ভাল সমালোচনা বেরিয়েচে।

জমির কী হল? সাড়াশব্দ দাও না কেন? জমি নিশ্চয়ই নেবো। জানবে ওখানে সেই জমিটা কী হল। বাড়িতে রান্না করে খেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন জ্বর-জ্বারির সময়, উমাদের নিয়ে যেতে সাহস হয় না। কী মশা! যেমন মশা তেমনি কাদা। জিনিসপত্র এতদিন খুব সস্তা ছিল। এখন আলু চার আনা, পটল দু আনা, বেগুন তিন আনা, কাঁচকলা তিন আনা, মাছ ন আনা, দশ আনা, দুধ ৭ সের, চাল ৯ টাকা (মোটা)। অক্টোবর মাসে রেডিওতে আমার বক্তৃতা আছে। তারিখ পরে জানাবো। ১০০ টাকা বা ১২৫ টাকা খরচ করে যেমন হয় বাথরুম পায়খানা করে নেবে, তবে কোথায় হবে জায়গাটা ঠিক কোরো। আমার একটা ছোট ঘর দরকার।

মিতের বৌ ঘাটশিলায় যাবার জন্যে খেপেছে। মিতে সেদিন ব্যারাকপুরে এসে বলেছিল। রত্না দেবী ও সমরের সঙ্গে সেদিন দেখা, ওরা ঘাটশিলায় যাবে।

ওভারসিয়ারের বাড়ির দুটো ঘর দেখতে পারো। ওরা ভাল লোক। উমা বেশ আনন্দে আছে দেখলুম, ছোট শালীদের সঙ্গে বেড়িয়ে মনের আনন্দে আছে। বেচারী বড় খেটেছে ব্যারাকপুরে। একমাস রাতে ঘুম ছিল না।

ভাল কথা, ইন্দু রায়ের ছেলে গুটকে, ১৪ বৎসর বয়স, ঘাটশিলায় গিয়ে থাকতে চায় ও ডিসপেনসারির কাজ শিখতে চায়। ছেলে ভাল, খাটিয়ে আছে। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত বিদ্যে, হাতের লেখা মন্দ নয়। পেটে খেয়েই থাকবে। কিছু দিতে হবে না। তোমার কাজে লাগবে কি? হাট-বাজার সবই চলবে তাকে দিয়ে। তবে পাড়াগেঁয়ে, একটু shy ধরনের। আমায় লিখলে পুজোর সময় নিয়ে যেতে পারি। তুমি ও বৌমা আশীর্বাদ নিও। ইতি—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ- উমাকে শাশুড়ীঠাকরুণ বড় ভালবাসেন। দিদিমণি বলে ডাকেন এবং বড় যত্ন করেন। আবার শুনি শ্বশুরমশাই এখানে একটি গ্রামে উমার বিবাহের সম্বন্ধ করছেন। ধান আছে, জমিজমা আছে। তাদের ওখানে গিয়েছিলাম।

চিঠি পেয়ে আমার স্বামী দাদাকে লিখলেন, 'গুটকেকে নিয়ে আসুন। শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যদি হয়, দেখা যাক।'

একদিন বড়ঠাকুর এলেন, সঙ্গে গুটকে। কালো রোগা, মুখটা টিকটিক করছে, মাথায় একমাথা চুল, চোখদুটি বড়সড়, পরনে হাফপ্যান্ট ও ফুলশার্ট, পায়ে একটা চটি। সঙ্গে চটের বস্তায় কয়েকটা নারকোল। বড়ঠাকুরকে প্রণাম করতে আশীর্বাদ করে বললেন, 'গুটকে এল বৌমা।' গুটকে এসে প্রণাম করলে। উমা, দিদি দেশে। শান্ত গুটকেকে দেখে এগিয়ে এল। বড়ঠাকুর বললেন, 'গুটকের একটা ভালো নাম আছে। অজিত। তোমরা ইচ্ছা করলে ওই নামেও ডাকতে পারো। কী বলিস গুটকে?'

গুটকে চুপ, মুখে কথা নেই। আমরা স্বামী দাঁড়িয়ে ছিলেন, বড়ঠাকুর ওঁকে বললেন, 'গেঁয়ো ভূত। আজ কী করেছে জানিস? কখনও কলকাতা আসেনি, শিয়ালদা নেমেই হকচকিয়ে গেছে। তারপর রাস্তা পার হতে গিয়ে মাথার বস্তাসুদ্ধ গেল পড়ে, তারপর হইহই। ধুলো ঝেড়ে তো উঠল। হাওড়ায় এসে গাড়িতে উঠলাম। গুটকে বাঙ্কের ওপর বস্তাটা তুলে দিয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ চলার পর দেখি বাঙ্কের নীচে বসা ভদ্রলোকটি উশখুশ করছেন আর বারবার ওপরদিকে চাইছেন। একটু পরে দেখি ভদ্রলোকের মাথায় টুপিয়ে টুপিয়ে জল পড়ছে।' শেষে ভদ্রলোক বলেন, 'হাঁ মশাই, বস্তায় আপনার কী আছে? আমার গায়ে জল পড়ছে!' তখন নামিয়ে খুলে দেখে একটা নারকোল ফেটে জল পড়ছে। ওকে নিয়ে আজ এই বিভ্রাট।'

গুটকে বেচারি প্রথম এসেছে, লজ্জায় কথা বলতে পারছে না। এই গুটকের পরে দারুণ পরিবর্তন হল। থাকতে থাকতে সব শিখে ফেলেছিল। ওষুধ তৈরি, ইনজেকশন দেওয়া। এ ছাড়া লিখে লিখে হাতের লেখা ভালো করে ফেললে, ইংরেজিও একটু শিখল। গুটকের রসিয়ে গল্প বলার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এঁরা দুই ভাই ওর কাছে দেশের যত রাজ্যের গল্প শুনতেন। গুটকে আমরা স্বামীকে ছোটকাকা, বড়ঠাকুরকে বড়কাকা বলত।

গুটকে সকালে কিছু খেয়ে ডাক্তারখানা খুলতে চলে যেত। ফিরত ওঁর সঙ্গে দুপুরে। বাড়ির হাট-বাজার-দোকান, গুটকেও একটু-আধটু খুব প্রয়োজন হলে করত, তা ছাড়া ওর সময় কোথায়? বাড়ির কাজের লোকই দোকান-হাট করত।

ক'মাস পরে একদিন সকালে হঠাৎ শোনা গেল গুটকে গান করছে। ওর ছোটকাকারই গাওয়া একটি গান। ওর ছোটকাকা ঘর থেকে শুনে বললেন, 'বেশ তুলেছিস তো!'

সেই থেকে গুটকে মাঝেমধ্যে হারমোনিয়াম নিয়ে বসত। শিখত। গলা বেশ ভালোই ছিল। শান্তর ওসব বালাই ছিল না। ও দুষ্টুমিতে ওস্তাদ।

সংসার বাড়ছে, কাজও বাড়ছে, তবু সময় পেলেই বেড়াতে যেতাম। তখন কত তুচ্ছ কারণে আনন্দ পেয়েছি। আজ ভাবলে অবাক লাগে। খেতে বসে খুব মজা হত। শান্ত, আমি, উমা, গুটকে, দিদি— ক'জন একসঙ্গে রান্নাঘরে খেতে বসতাম। ওঁরা দুইভাই বড়ঘরে খেতেন। শান্ত একটু বেশি ভাত খেত, ডালও তার একটু বেশি চাই, তাই নিয়ে উমা-গুটকে কত হাসাহাসি করেছে। আমিও হেসেছি। আজ সেই সব সামান্য কথাও মনে পড়ছে।

৩৫.

এর কয়েকমাস পরে ভাটপাড়া থেকে মা অর্থাৎ আমার ছোট মামিশাশুড়ি এলেন। সঙ্গে মেজঠাকুরপো, সেজঠাকুরপো, বড়ঠাকুরপো, আমার মামাতো দেওররা। আমাদের খুব আনন্দ, বেড়ানো হচ্ছে খুব। খাওয়া তো যা হয় তাই। আনন্দের পাত্র কিন্তু ভরে উঠেছে কানায় কানায়। এবেলা নদীর ধার তো ওবেলা পাহাড়। ওই সময় আমরা সেজঠাকুরপোর সঙ্গে টাটানগর গিয়েছিলাম। কথা ছিল খেঁদাদার বাড়ি যাওয়া হবে।

সে এক মজার ব্যাপার। বিকেলের ট্রেনে আমি মা উমা ও মেজঠাকুরপো রওনা দিলাম। বেশ অন্ধকার হয়ে গেল টাটায় পৌঁছতে। ঠিকানা আমাদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু

বাড়ি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত বাড়ছে। তখন এক ভদ্রলোকের কোয়ার্টারে গিয়ে রাতের মতো আশ্রয় চেয়ে নেওয়া হল। তাঁরা আমাদের খুবই যত্ন করেছিলেন। পরদিন সকালে বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল এবং একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হল।

ঘাটশিলায় এসে আমরা কাউকে কিছু বলিনি। সেবার মাকে রেখে ঠাকুরপোরা চলে গেল। তখন উমাকে নিয়ে মা খুব বেড়িয়েছেন। আমার সকালে সময় হত না, বিকেলের দিকে ওঁদের সঙ্গী হয়েছি। দিনকতক পরে সেজমাসিমাকে নিয়ে বড়ঠাকুরপো ও সেজঠাকুরপো এল। মাসিমা তখন ভালো চোখে দেখতে পান না। তবুও উনি বেড়াতে যাবেন।

যাই হোক, সেদিন বিকেলে আমরা সবাই বেড়াতে বেরিয়ে রেললাইন পার হলাম। ফুলডুংড়িকে পাশে রেখে সোজা হাঁটতে হাঁটতে একটা লেভেলক্রসিং পার হয়ে ওঁর ডিস্‌পেনসারির সামনে এসে পড়লাম। তখন বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গেছে। আমরা বাড়ি ফিরছি, উনিও আমাদের সঙ্গে সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছেন। এই রাস্তার দুধারে বেশ খানিকটা ফাঁকা। দোকান বা লোকজনের বাড়িঘর কিছুই ছিল না। আমি, মা, উমা ওঁদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি, উনি ভাইদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছেন। এমন সময় একটি সাঁওতাল হাঁড়িয়া খেয়ে টলতে টলতে আর যেন কী বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা ভয় পেয়ে গেছি। মা জোর গলায় হিন্দিতে ওকে বকে উঠলেন এবং চেঁচিয়ে ওঁর নাম ধরে ডাকলেন, 'নুটু, নুটু।' ওঁরা মার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি করে চলে এলেন। তখন সাঁওতাল মাতালটা থতোমতো খেয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল।

আমাদের ভয় দেখে ওঁদের তিনজনের সে কী হাসি! সেই সময় উনি এবং আমি একটু পিছিয়ে পড়েছি, আমাকে বললেন, 'মাসিমা কেমন লোকটাকে ধমক দিলেন! পথেঘাটে চলতে গেলে সাহসের দরকার, বুঝলে?' আমি বললাম, 'আমি কি কম সাহস দেখাচ্ছি! উমা যখন থাকে না, তখন একলা বাড়িতে থাকি না।' উনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। তুমি দস্তুরমতো সাহস দেখাচ্ছ।'

তখনকার দিনে, গুরুজনদের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ ছিল না। আমি গুরুজনের সামনে ওঁর সঙ্গে কথা বলতাম না। এ ব্যাপারটা অবশ্য ওঁর পছন্দ ছিল না। কিন্তু আমি সে নিয়ম ভাঙতে পারিনি। তাতে অনেক অসুবিধা হয়েছে, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আজকাল দেখি এসবের বালাই নেই। ভালোই হয়েছে। সহজ ও স্বাভাবিক যা, তাই ভালো। উনি আমাকে সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা দিতেন। হয়তো ওঁর অন্তরাত্মা বুঝেছিল আমাকে একলা জীবনের দীর্ঘতম বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে, তাই এই সতর্ক শিক্ষা। এটা বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

এর মধ্যে বড়ঠাকুরের চিঠি এল। মামিমারা এলেন। আমি থাকতে পারলাম না। এর কয়েকদিন পরে ঠাকুরপোরা মাকে নিয়ে ভাটপাড়ায় চলে এল। এরপর মা আর একবারমাত্র বাপি ও খুকুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মায়েরা চলে আসাতে মন খুব খারাপ হয়েছিল। তবে সময়ের প্রলেপের জাদুমন্ত্রে সব সয়ে যায়। একদিন আমার স্বামী একজন রুগি নিয়ে কলকাতা যাবেন। আমাকে বললেন, 'আমি এগারোটার গাড়ি ধরব। তুমি আমার জামাপ্যান্ট, পেস্ট, ব্রাশ, শেভিং সেট আর টাকা ঠিক করে রাখবে। ডাক্তারখানা থেকে এসে একটুও সময় থাকবে না, খেয়েই বেরিয়ে যাব।'

তাড়াতাড়ি করে রান্না সারছি, এমনি কপাল সেদিনই সকালে একদল বেড়াতে এলেন। কী করি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চা করে খাওয়াতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি মনে মনে ছটফট করছি, জামাটামা গোছানো হয়নি। অতিথিরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি এসে গেছেন, দেখেন যে আমার গোছগাছ হয়নি।

আমাকে একচোট বকলেন। আমি চুপ করে আছি। দুঃখ হচ্ছে, রাগ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে গুছিয়ে দিলাম। সত্যি বেচারির ট্রেন ধরতে হবে। ওঁর ধারণা আমি নাকি ওঁকে বুঝি না, ইত্যাদি। যাই হোক, আমাকে বকে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর কী মনে হয়েছে জানি না কলকাতা থেকে একটা চিঠি পোস্ট করেছেন।

Calcutta

প্রিয়া,

সেদিনকার কথা মনে রেখো না। চলার পথে এমনি কত বাধা বিপত্তি আনন্দ বেদনার কাঁটা ছড়ানো রয়েছে। এই তো জীবন, ঘাত-প্রতিঘাত না থাকলে জীবনকে বোঝা যায় না। তুমি এখনও বালিকা বা কিশোরী, কিন্তু আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে তো হবে। ঠিক তেমনি হয়ে নাও। কোথায় আমার ক্ষত তা বোঝবার চেষ্টা করবে, তা হলে দ্বন্দ্ব থাকবে না।

কাল সোমবার রাত্রে নাও যেতে পারি। কাজ বোধ হয় কাল সারতে পারব না। তা হলে মঙ্গলবার দুপুরে খোকা আর সখিকে stationএ পাঠাবে, জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাবে। খুব সাবধানে থাকবে। যা দরকার হবে খোকাকে দিয়ে মল্লিকবাবুকে বলে পাঠিয়ো। ইতি—

ডাক্তার

ভালো আছি। দুটো সিনেমা দেখলুম, গিয়ে রাত্রে গল্প বলব।

আমার স্বামীর খুব ইচ্ছা ছিল একটা ছোট নার্সিংহোম মতো কিছু করার, কারণ দূর থেকে যেসব রুগিরা আসত তাদের একদিনে ফিরে যেতে খুবই কষ্ট হত।

একরাত্রি কোথাও থাকলে কিছুটা কষ্টের লাঘব হবে। তাই ডিসপেনসারির ওপরের ঘরগুলি ভাড়া নিয়েছিলেন এবং ওখানে দূরের থেকে আগত রুগিরা দু-একদিন করে থাকত। একবার গ্রাম থেকে দশ-এগারো বছরের ছোট একটি মেয়ে এল। তার নার্ভের অসুখ। সব সময় হাত-পা কাঁপছে, চোখের মণিদুটো পর্যন্ত। ডাক্তারখানার ওপরে জায়গা নেই, তার বাবা আর ঠাকুমা তাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসেছেন। আমার স্বামী ওঁদের বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। দিন পাঁচ-ছয় ওঁরা আমাদের বাড়ি রইলেন। আমি মেয়েটিকে ওষুধ খাইয়ে দিতাম, পথ্য করে দিতাম। ওর বাবা এবং ঠাকুমা বাইরে থেকে খেয়ে আসতেন। সেবার মেয়েটি সেরে বাড়ি চলে গেল। উনি তো মহাখুশি। বললেন, 'দাঁড়াও, ভালো করে একটা রুগিদের থাকার ব্যবস্থা করব। আমি তো আছি। তুমি দেখাশুনা সেবা করতে পারবে তো?' আমি বললাম, 'এখনই তো করছি।' শুনে উনি হাসলেন।

এই মেয়েটির বাড়ি একবার গিয়েছিলাম। মেয়েটির আর একবার কী যেন হয়েছে, ওদের বাড়ি থেকে ওঁকে নিতে এল। ওদের বিশ্বাস এই ডাক্তারবাবু গেলেই রুগি সেরে যাবে। ওদের সঙ্গে আমার চেনা ছিল। আমি বললাম, 'গুটকে যাচ্ছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' উনি বললেন, 'তা হয় না। আমি যাব রুগি দেখতে—তুমি কী করতে যাবে?' যাঁরা নিতে এসেছিলেন তাঁরা বললেন, 'সঙ্গে তো গরুর গাড়ি আছে, যেতে চান, চলুন। আমাদের গ্রাম দেখে আসবেন।' এরা কিন্তু সাঁওতাল নয়, বাঙালি। বাংলা কথা বলে, তবে একটা টান আছে। কোনো পাহাড়তলিতে ওদের গ্রাম। দেখব ভাবতে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

ওঁর সঙ্গে রওনা দিলাম। পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কখনো হেঁটে কখনও গরুর গাড়ি করে একটি পার্বত্য গ্রামে এসে পৌঁছলাম। চাষি গ্রাম, এঁরা বেশ সমৃদ্ধ গৃহস্থ। ধানের গোলা। আমরা যেতেই নিকানো উঠোনে খাটিয়া পেতে দিলে। গ্রামে পুরুষ মহিলা শিশু অনেকেই জড়ো হল। উনি খাটিয়ায় বসে মেয়েটিকে দেখলেন। আরও কয়েকটি রুগি এল। সেদিনের সেই মুক্ত আকাশের তলায় বসে কানে স্টেথস্‌কোপ লাগিয়ে ওর রুগি দেখার চেহারাটা আজও চোখ বুজিয়ে একটু ভাবলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওঁর কাজ শেষ হলে বললেন, 'কী? এখন যাবে, না থাকবে?' আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁগো, এরা তো বাঙালি। কোথা থেকে এরা এখানে এল! এটা তো সাঁওতালদের দেশ?' উনি বললেন, 'বোধ হয়, বহুদিন আগে এসব অঞ্চল বাংলার মধ্যে ছিল। এরা তখন থেকেই বংশপরম্পরায় এখানে রয়ে গেছে।'

আমরা থাকতে থাকতেই দেখলাম একটি বৈষ্ণবী। দেখতে কালো। বেশ লম্বা, মুখটা মন্দ নয়, গলায় কণ্ঠি, কাঁধে ঝোলা। হাতে খঞ্জনি বাজিয়ে গান করতে করতে ভিক্ষা করতে এল। সে একটা বাংলা গান গাইছিল। দু-লাইন মনে আছে-

'বাদল ঝুরুঝুরু মাদল বাজে
গম্ভীর গরজন অম্বরমাঝে।' ইত্যাদি।

আর মনে নেই। বৈষ্ণবী আমার কাছেও ঝুলি নিয়ে এসে দাঁড়াল, বললাম, 'কোথায় থাকো?' টেনে টেনে বললে, 'উধারের গ্রামে বটে।'

সেদিন ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। মনে মনে ভয় করছিল বন্য জন্তু বা মানুষেরও। অবশ্য ওদের গরুর গাড়ি এবং একজন লোক সঙ্গে ছিল।

লিখতে লিখতে কত কথাই মনে পড়ছে। একবার বেশ কলেরা দেখা দিল। রোগীরা আসছে, উনি খুব ব্যস্ত ডাক্তারখানায়, গুটকেকে নিয়ে স্যালাইন দিচ্ছেন, রোগী দেখতে যাচ্ছেন। রাতদিন বেচারির সময় নেই। একদিন রাত্রে ঘুমোচ্ছি, বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কে একজন বাইরে থেকে ডাকছে, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু।' সেই ডাক কানে যেতেই উনি ধড়মড় করে উঠে সাড়া দিলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখেন, গরুর গাড়ি করে রুগি নিয়ে দুজন লোক একেবারে বাড়ি চলে এসেছে। বৃষ্টির রাত্রি বেশ গভীর হয়ে এসেছে। কী করেন। গুটকে উঠল। কোথায় রাখবেন, কলেরা রুগি। আমাদের গরু রাখার একটা বড় চালাঘর ছিল। মাঝখানে পার্টিশানও ছিল। শেষে সেইখানে খাটিয়া পেতে তাকে রাখা হল।

কিন্তু সমস্যা হল, ডিসটিল্ড ওয়াটার শেষ গেছে। কলকাতা বা টাটা থেকে আনাতে হবে। পরদিন সকালে লোক যাবে এই ব্যবস্থা ছিল। হঠাৎ রাত্রে রুগি এলেন, কী করেন, আমাকে বললেন, 'গরম জল বসাও।' বসালাম। উনি তখন বড় বড় সাদা ট্যাবলেট, বোধ হয় নুনজাতীয়, আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে হাতে করে করেছিলাম বলে মনে আছে, ফুটন্ত জলে দিয়ে সেই জল ঠাণ্ডা করে ব্লটিং পেপারের মতো একরকম কাগজ পাকিয়ে বোতলের মুখে দিয়ে ছেঁকে নিলেন। এইভাবে ডিসটিল্ড ওয়াটার প্রস্তুত হল। অবশ্য এই ব্যবস্থা কোনো কিছু উপায়ান্তর না পেয়ে।

ওইভাবে রুগিকে সে রাত্রে স্যালাইন দিয়েছিলেন, রুগি বেঁচে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। পরদিন টাটা থেকে ডিসটিল্ড ওয়াটার এল। কিন্তু সেই ডিসটিল্ড ওয়াটার দিয়ে স্যালাইন দিয়েও একটি দুবছরের শিশুকে বাঁচানো গেল না। ঘটনা হল, ওইসময় একদিন সকালবেলা একটি সাঁওতাল মেয়ে তার বছর দুয়েকের ছেলেটিকে নিয়ে এল। প্রচুর পায়খানা ও বমি করেছে। পাল্স পাওয়া যাচ্ছে না। উনি তাড়াতাড়ি ইনজেকশান দিলেন। স্যালাইনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বাচ্চাটি মারা গেল আমাদের সেই চালাঘরে। আজও ভাবলে কষ্ট হয়। সন্তান হারিয়ে মায়ের সে কী কান্না। আমাদের সবার প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল। উনি তো গম্ভীর হয়ে

গেলেন। পাড়ার মধ্যে ওইসব রুগি রাখায় পাড়ার দু একজন আপত্তি করেছিলেন। তখন ওইসব রুগির পাশে বসে বসে বলেছিলেন, 'আমি যখন হাউস সার্জেন, একবার কলেরা ওয়ার্ডে ডিউটি পড়েছিল, তখন একদিন দারুণ ভয় পেয়েছিলাম।' ওঁর ডায়রি থেকে সেদিনের কথা একটু লিখছি।

শনিবার— ১৬— ৫—

"গতরাত্রে কলেরা ওয়ার্ডে ডিউটিতে গিয়েছিলাম। প্রায় ২০০ রুগী (রুগি), রাত্রে আবার নূতন রুগী এলো। এ্যাম্বুলেন্স ৬টা। শহরের একপ্রান্তে বিরাট পুরোনো বাড়িটার মধ্যে এই ওয়ার্ড। চারদিক অন্ধকার, বাড়িটার মধ্যে বড় বড় শিশুগাছ। দূরে তাল ও নারকেল গাছের মাথায় পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। সব নিঝুম নিশুতি। দু একটা রুগী যন্ত্রণায় কাতর চীৎকার করছে। রাতে নতুন রুগী এলো। ২/৩ জন কম্পাউন্ডারবাবুদের সাহায্যে ওদের ওষুধ দিলাম। মধ্যে মধ্যে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে অন্ধকার। মাঝে মাঝে আমি উপরে গড়ের মাঠের মতো ছাদে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। নার্স বলে, 'দেখুন এত রুগী মারা যাচ্ছে, আপনি এই অন্ধকারে একা একা উপরে যাবেন না। ভয়টয় পেতে পারেন। বলা তো যায় না।' কিন্তু মানা করলে সে কাজে আমার যাওয়া চাই। কিন্তু মনে যে ভয় করছে না তা ঠিক নয়।

উপরে গেলাম। ছাদের উপর পৌছেই প্রথমে খটখট করে জুতোর শব্দ করলাম। কিন্তু তবুও ভয় হচ্ছে, সমস্ত গা ছমছম করছে। ভারী অদ্ভুত একটা ভয়ের অনুভূতি। দারুণ ভয় পেলাম। তখন বর্ষার একটা গান করে নেমে এলাম। বাড়িটার মধ্যে অনেক জায়গা। বড় বড় শিশুগাছ। আরও অনেক রকমের গাছ আছে। এটা ছিল একটা মুসলমান ব্যবসায়ীর চামড়ার গুদাম। বহুদিন হল ব্যবসা ফেল হয়ে চলে গেছে। এরা সে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে সামনের ছোট ছোট ঘরদুটোতে প্রায় শ তিনেক বসন্ত রুগী রেখেছে। আর এই বাড়িটাতে প্রায় শ দুই কলেরা রুগী।

পরদিন সকালে ওখানে এক বন্ধু আছে, তার ওখানে চা খেয়ে বাসায় এলাম। তখন বেলা সাড়ে নটা। চান করে খেয়ে শুয়ে পড়েছি, আর ঘুম এলো। It is the delicious। ঘুম ভাঙল খুব বৃষ্টির শব্দে। ঘড়িতে দেখি সাড়ে তিনটে বেলা। খুব বৃষ্টি হল। বাইরের ভাঙা চেয়ারে বসলাম। অদ্ভুত বৃষ্টির ধারা। মনের সুর বদলে গেল। আনন্দে যেন কানায় কানায় ভরে উঠলো। দূরের দিকে চেয়ে অশান্ত বৃষ্টি-ধারা লক্ষ্য করছিলাম। দূরের নারকেল গাছদুটো আর ওই তালগাছটা ভিজল খুব শান্তভাবে।" ইত্যাদি।

ঘাটশিলায় বাড়ির সামনে প্রিয় সুটকেসটি রেখে সাহিত্য রচনা করছেন বিভূতিভূষণ।

ঘাটশিলায় বাড়ির বারান্দার সামনে বিভূতিভূষণ।

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের বাড়ি 'গৌরীকুঞ্জ'।

ঘাটশিলায় বাড়ির সামনে বসে আছেন বিভূতিভূষণ।

বিভূতিভূষণের ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণের জন্মদিনে বিভূতিভূষণ ও কবিশেখর কালিদাস রায়।

বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবী দেবীর কন্যা উমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণের ভাগনে শান্ত (প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়)।

ঘাটশিলায় শালবনে ভ্রমণরত বিভূতিভূষণ।

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের বাড়ি 'গৌরীকুঞ্জে'র উঠোনে ডা. নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়।
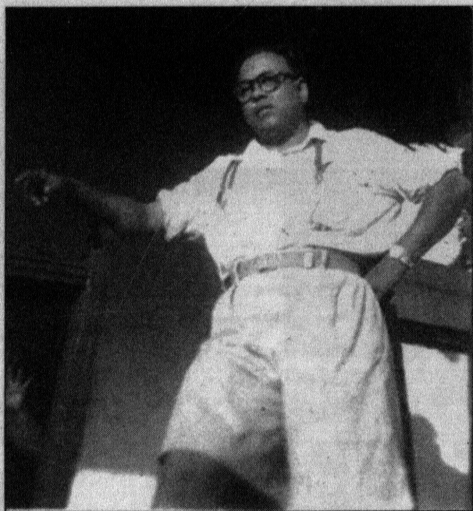
ডা. নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাটশিলায় 'গৌরীকুঞ্জে'র সিঁড়িতে ডা. নুটবিহারী ও যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগীতচর্চারত নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাটশিলায় কুর্মকুট পাহাড়ে ডা. নুটবিহারী ও যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষ
স্নেহভাজন গুটকে (অজিত রায়)।
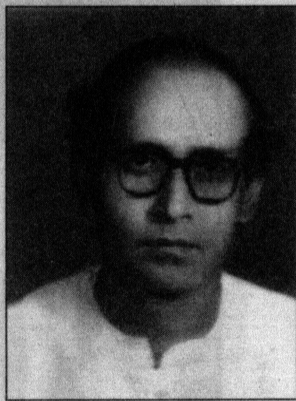
বিভূতিভূষণের ভাগনি-জামাই সাহিত্যিক
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাটশিলায় লেখিকা যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার
মিত্রের সহধর্মিণী প্রতিমা মিত্র।

ঘাটশিলায় শিশুপুত্র বাবলু (তারাদাস) সহ
বিভূতিভূষণ।
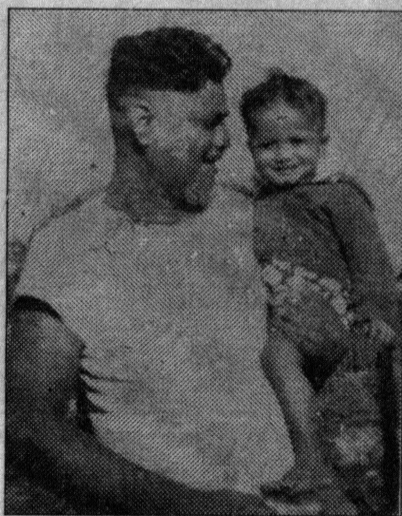
পুত্র বাবলুকে কোলে নিয়ে বিভূতিভূষণ।

ঘাটশিলায় বাড়ির উঠোনে স্ত্রী-পুত্রসহ বিভূতিভূষণ।
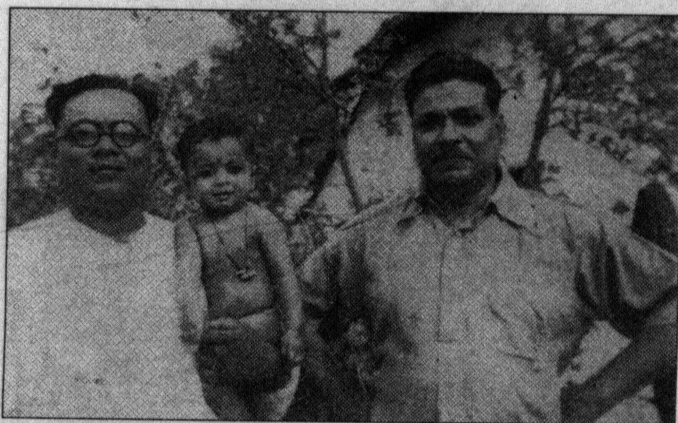
ঘাটশিলার বাড়ির উঠোনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডা. নুটবিহারী, পুত্র বাবলু ও বিভূতিভূষণ।

ঘাটশিলায় ডা. নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোলে বাবলু।

বিভূতি-অনুরাগিণী খুকু (প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। বিভূতিভূষণের পাশে ভাগনি উমা ও ভাগনে শান্ত। ব্যারাকপুরের বাড়িতে ১৯৩৪-এ তোলা ছবি।
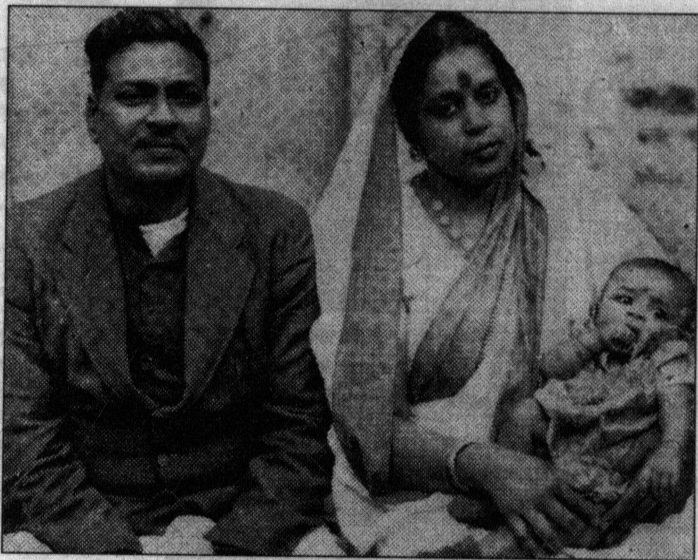
ঘাটশিলায় বাবলুকে কোলে নিয়ে বিভূতি-সহধর্মিণী রমা দেবী ও বিভূতিভূষণ।

বিভূতিভূষণের স্নেহের ভাগনি উমার সঙ্গে বিয়ে হয় সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৯ এপ্রিল ১৯৪৮-এ। ছবিটি বিয়ের পরদিন ঘাটশিলায় তোলা।

বিভূতি-অনুরাগিণী সুপ্রভা।

বিয়ের আট দিন আগে ভাবী পত্নী কল্যাণী দেবীকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠি—

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyaya.

41 Mirzapur Street.

CALCUTTA রবিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর......1940

কল্যাণীয়াসু,

[illegible]

আরও কতদিনের কত ঘটনা, মনের অসংখ্য তরঙ্গ দিনলিপির পাতায় রয়েছে। উনি একটু বেশি চিন্তাশীল, একটু ভাবুক ছিলেন। বেশি ভাবালুতা থাকলে তারা জীবনে দুঃখ পায়। মনের গভীরে ডুব দেওয়ার ওঁর একটা স্বভাব ছিল। কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসাব কি মেলে? কিন্তু মন ছুটে ছুটে তারই পিছনে ধাওয়া করে।

মনে পড়ে শীতকাল। ঘাটশিলা স্টেশনের কাছে কৃষ্ণযাত্রা এসেছে। প্রায় প্রতি বছরই যাত্রাপালা হয়। খোলা মাঠের মধ্যে আসর। তাকে ঘিরে বসার জায়গা। একদিন আমি, উমা, শান্ত, গুটকে এবং আমার স্বামী রাত্রে দেখতে গেছি। বড়ঠাকুর থাকলে উনিও যেতেন, যাত্রা শুনতে খুব ভালোবাসতেন। প্রচণ্ড শীত। আমার স্বামী লংকোট টুপি মোজা ইত্যাদিতে নিজেকে মুড়েছেন। আমরাও ছোট চাদর, যত যা আছে নিয়েছি। আসরের সামনে কিছু চেয়ার পাতা, আমাদের সেখানে বসতে হল যেহেতু ডাক্তারবাবু এসেছেন। একটু পরে শুরু হল যাত্রা। এলেন শ্রীরাধার সঙ্গে সখি ললিতা। পালা 'মানভঞ্জন'। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখন যেমন সখিদের সাজ, তেমনি রাধিকার। ছোট ছোট ছেলেরা মেয়েদের পার্ট করছে, সবার পরচুল পিঠের ওপর খোলা, মাথায় লাল ফিতে বাঁধা, কাপড়-চোপড় ভালোভাবে পরা। রাধা সখিসহ এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর খেদ, অভিমান, মান। রাধা তাঁর জন্মকথা গান গেয়ে সখিদের বলছেন—

"শুনলো মরম সই,
যখন আমার জনম হইল নয়ন মুদিয়া রই।" ইত্যাদি।

"সখি, প্রাণনাথ কৃষ্ণ আসবেন বলেও এলেন না। আমি এ প্রাণ আর রাখব না, কালো রঙ আর দেখব না।" তখন সখি ললিতা বলছেন, "রাই, কালো রং তো দেখবি না, কিন্তু তোর মাথার চুল যে কালো সখি।" রাই তৎক্ষণাৎ বললেন, 'মুড়াইয়া ফেলিব।" পুনরায় ললিতা বলছেন, "তোর চোখের মণি যে কালো।" রাইয়ের উত্তর, "উপড়িয়া ফেলিব।" শুনে আমরা তো মুখ টিপে হাসছি। ওদের কথার সুরে একটা অদ্ভুত টান। পালা জমে উঠেছে। চারদিক লোকে লোকারণ্য। উনি বললেন, 'চলো। রাত হল। এবার বাড়ি যাই।'

সবাই হাঁটা দিলাম বাড়িমুখো। বললেন, 'কী ব্যাপার? কারো মুখে কথা নেই। মনে হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে।' বলে হাসলেন। আমি বললাম, 'আমাদের শীতে আর কথা বেরুচ্ছে না।' বললেন, 'জোর হাঁটো। গা গরম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়িও হবে।' সবাই জোরে পা চালালাম। শর্টকাট করার জন্য আশ্রমের মধ্যে দিয়ে, শরৎবাবুর বাড়ির পিছনের শালবাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ি এলাম।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় উনি ডাক্তারখানায়। গুটকেও ওখানে, বাড়িতে আমি, উমা, শান্ত। রান্না হয়ে গেছে, কাজ নেই, বড়ঘরে আমরা বসে আছি। উমাকে বললাম, 'আয় উমা, আমরা কেষ্টযাত্রা করি।'

উমা বললে, 'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'তা হলে দাঁড়া। আমি করি, তোরা শোন।'

বলে আমি আরম্ভ করেছি, প্রথমে গান, "শুনলো মরম সই।" ইত্যাদি। তারপর শ্রীরাধার খেদ। সখিও আমি হয়েছি। বললাম, 'সখি, তোর মাথার চুল যে কালো সখি।' 'মুড়াইয়া ফেলিব।' তারপর যেই বলেছি 'তোর চোখের মণি যে কালো সখি।' ঠিক সেই মুহূর্তে আস্তে আস্তে উমার ছোটমামার আবির্ভাব। আমি তো দেখে ছোটঘরে পালিয়েছি। উনি বললেন, 'কী ব্যাপার! আমাকে দেখে পালালে যে। বেশ তো হচ্ছিল। এসো, আমার সামনে একটু করো দেখি।' আমি বললাম, 'না না। আর হবে না।' তখন বললেন, 'আমার কাছেই তোমার যত সংকোচ, না?'

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যিই, ওঁর সামনে সেদিন কেষ্টযাত্রা করতে পারিনি, লজ্জা করেছিল। আজ মনে হচ্ছে ওঁর চিরদিনই ধারণা ছিল বা অভিমান ছিল আমি নিজেকে ওঁর কাছে প্রকাশ করি না।

একবার দিদি এসেছে। আমরা সকলে বেড়াতে বেরিয়েছি। আমি-দিদি গল্প করতে করতে চলেছি। বড়ঠাকুরপো অনেকটা এগিয়ে গেছেন। দিদির ঠাকুরপো মাঝামাঝি। আমরা পিছনে। বড়ঠাকুর কিছুক্ষণ আমাদের লক্ষ করেছেন, তারপর দিদিকে ডেকে বললেন, 'কল্যাণী, তোমাদের গল্পের কি শেষ নেই! বেড়াতে এসেছ, তা এখানে অত গল্প কীসের। চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে এসো।' শুনে আমি আর দিদি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম।

বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখা গেল আমি আর দিদি আবার পাশাপাশি এবং গল্প চলছে। বড়ঠাকুর বললেন, 'হয়েছে। আবার দুজন এক জায়গায়।' আমার স্বামী বললেন, 'এদের দুটি মিলেছে ভালো।' দিদি ঠাট্টা করে ওকে বললে, 'তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি ঠাকুরপো?' উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'তা একটু হচ্ছে বইকী। যমুনা দেখি তোমার সঙ্গে খুব কথা বলে চলেছে, এমনি করে আমার সঙ্গে বলে না।' আমি বললাম, 'ঘরে তোমার সঙ্গেও অনেক কথা বলি। দিদির সঙ্গে ওটা আমাদের আলাদা ব্যাপার।' উনি বললেন, 'থাক। এখন চলো। দাদা রাগ করছেন।'

এমনি কত ছোট ছোট টুকরো কথা মনে পড়ছে। তখন অকারণ আনন্দে মন ভরে থাকত। বকুনি খেয়েছি, চোখে জল এসেছে, তারপর একটু ভালো কথায়

মুহূর্তের মধ্যে সে দুঃখ দূর হয়েছে, মনে হয়েছে 'আমি নারী, আমি মহিয়সী।' এতটা সুখ বোধ হয় ভালো নয়। সুখ-দুঃখের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো হত। তা হলে অতর্কিত আঘাতে আমার হৃদয় এত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত না। কেন এমন হল? কোন পাপে? জিজ্ঞাসার উত্তর পাই না, যদি পেতাম তা হলে জনে জনে ডেকে চিৎকার করে বলতাম, 'আমি যা করেছি এমন কাজ আর কেউ কোরো না। এমনি নিষ্ঠুর আঘাত আমার মতো হতভাগিনীই সইতে পেরেছে। তোমরা পারবে না।'

সেবার দোলপূর্ণিমায় বড়দা অর্থাৎ গায়ক বিভূতি দত্ত এসেছেন, সঙ্গে বড় ছেলে অরুণ। একদিন মাত্র থাকবেন। সেদিন ছিল সুবর্ণ সংঘের অধিবেশন। উনি ওখানে বিভূতিদার গানের ব্যবস্থা করলেন। বড়ঠাকুর আছেন। আমরা সবাই ওখানে গিয়ে গান শুনলাম। পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে দিক-দিগন্ত। নার্সারির ফুলে ফুলে জ্যোৎস্নার বন্যা, দূরের শৈলশ্রেণির মাথায় চাঁদের হাসি ছড়িয়ে আছে। মাত্র একটি গানের একটি লাইন মনে আছে—

'ঝুলন পূর্ণিমাতে চাঁদ ছিল মোর সাথে
পূর্ণিমা ফিরে এল, এল না তো পথভোলা।'

আর মনে নেই। সেদিন পরপর অনেক গানই গেয়েছিলেন। অনেক রাত্রে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম। আমার স্বামী বললেন, 'বিভূতিদা, বৌদিকে একবার নিয়ে আসবেন।' বৌদিকে উনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। প্রায় বলতেন, 'যখনই বিভূতিদার কাছে গান শিখতে গেছি বৌদি না খাইয়ে ছাড়েননি।' ওঁর দিনলিপির পাতায় পাতায় সুন্দর করে এসব কথা লেখা আছে। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমার স্বামীর একটা আত্মিক যোগ ছিল। আমার স্বামীকে দেওয়া বিভূতিদার একটি সুন্দর বিজয়ার সম্ভাষণ দেওয়া কার্ড আজও আমার বাক্সে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমিও ওঁর সঙ্গে বিভূতিদার বাড়ি গিয়েছি, থেকেছি। এঁদের কথা বলতে বলতে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। বলতেন, 'বিভূতিদার সঙ্গে কত জায়গায় গান শুনতে গেছি। বৌদির কাছে খেয়ে বিভূতিদার সঙ্গে যাওয়া হত।' ছোট ডায়রিতে একটু-আধটু লেখা আছে। তার থেকে একটু তুলে দিচ্ছি।

৪ঠা জানুয়ারি শুক্রবার রাত্রি ১২টা—

"ফিরলাম সন্ধ্যায় আমি অর্ধেন্দু ও ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর বাড়ি গেল। আমি অর্ধেন্দু শচীনবাবুর বাড়ি গেলাম গান শুনতে। গিয়ে শুনলাম বিভূতিদা চলেছেন পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ি। সেখানে বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক নাসিরুদ্দিন খাঁ এসেছেন। গান হবে। গেলাম ওঁর সঙ্গে। গান শুনলাম, প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাঁটি সুর আর

সেই সুরের আলাপ। আলাপের সময় মনে হল গায়ক তাঁর দেহের ও মনের সমস্ত মাধুর্য যেন ঢেলে দিচ্ছেন। মনে হল দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা, প্রতিটি তন্ত্রী এবং প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে যেন সুর নিংড়ে নিয়ে, উজাড় করে, সুরপিপাসিতদের প্রীত করছেন। অদ্ভুত এঁদের সাধনা, ধন্য এঁদের জন্ম। এঁদের মতো সন্তান পেয়ে দেশ বংশ সবই ধন্য হয়েছে। ঋষির মতো রূপ। মুসলমান হলে কী হবে, গানের প্রথমে হিন্দু গুরু বিশ্বনাথ রাওকে সুরের বিস্তার দিয়ে বন্দনা করে নিলেন। গান শুনে ফিরে এসেছি রাত্রি ১টায়। তখনও শেষ হয়নি। বিরাট জনপদ তখন স্তব্ধ। দারোয়ান দরজা খুলে দিলে। মেসের ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। খাবার ঢাকা ছিল। অন্ধকার স্তব্ধ বারান্দায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে খাওয়া শুরু করা গেল।

আকাশে দশমীর চাঁদ। কাল একাদশী। আকাশের ঠিক মাঝখানে স্তরে স্তরে সাদা মেঘ সাজানো। অনেক দূরে ওই বাড়িটার পিছনে তালগাছটার মাথায় পুঞ্জীভূত একখণ্ড অন্ধকার জমেছে। কী একটা মনে হচ্ছে। এই মনে হওয়াটা কী কেন, না হলেও হত। এর একটা অনুভূতি একটা অব্যক্ত মাধুর্য আছে যা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে পাওয়া যাবে না। অবর্ণনীয়।'' ইত্যাদি।

শ্রীশচীনদাস মতিলালের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের ঘাটশিলা যাওয়ার কিছুদিন পরেই শচীনবাবু একবার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন এবং ক'দিন ছিলেন। তখন বাড়িতে ঘরোয়া আসরেই গান করেন। আমার স্বামী প্রায় প্রতিদিন রাত্রে বাড়িতে গানের আসর বসাতেন। দেবেশ আসত, ডুগি-তবলা বাজাত। দেবেশ সেতারও বাজাত। অন্য আর একজন তবলচিও আসতেন। তাঁর নামটা আমার ঠিক মনে নেই।

দেবেশরা ছিল পূর্ববঙ্গের লোক। ওর বাবা কাকা দুজনেই ঘাটশিলার 'জগদীশচন্দ্র হাইস্কুলের' মাস্টারমশাই ছিলেন। ওদের বাড়ি ছিল সুবর্ণরেখার ধারে। মনে আছে বড় একখানা ধানখেত পার হয়ে আমরা ওদের বাড়ি যেতাম। ওরা তিন ভাই ও এক দিদি। বড়ভাই টাটায় কাজ করত, মেজো দেবেশ মৌভাণ্ডারের ফ্যাক্টরিতে কাজ করত আর ছোট শক্তিশ তখনও স্কুলের ছাত্র। ওদের জামাইবাবু আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন। তাই ওরা আমাকে দিদি ডাকত।

শক্তিশ-এর সাহিত্যপ্রীতি ছিল, হাতে লিখে পত্রিকা বার করত। খুব সুন্দর কবিতা লিখত। এঁদের গানের আসরে দেবেশ একদিনও অনুপস্থিত থাকত না। দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলত গান-বাজনা। বড়ঠাকুর থাকলে দু-একদিন ফাঁক বুঝে হত। খুব একটা হত না কারণ তখন বাড়িতে মেলাই লোকজন আসতেন, আর যেদিন উনি ডিসপেনসারি থেকে দেরি করে ফিরতেন, সেদিন ওরা এসে ফিরে যেত।

প্রথমবার শচীনবাবু এই আসরে গেয়েছিলেন। এরপর একবার আমি ভাটপাড়ায় এসেছি, সে সময় উনি চাইবাসা থেকে ফেরার পথে ঘাটশিলা নেমেছিলেন। আমার স্বামী চিঠিতে লিখেছিলেন, 'শচীন এসেছিল, মৌভাণ্ডার ও ঘাটশিলার যত লোক আমার বাড়ি এসে গানে শুনল। শুধু আমার গৃহিণী শুনল না। তোমার জন্য মন খুব খারাপ হয়েছিল। দেবাকে নিয়ে সুরেশ (দেবা কাজের ছেলে। সুরেশবাবু ওঁর বন্ধু) ও খুকী খুব সামলে দিয়েছে।' ইত্যাদি।

পরের বার শচীনবাবু বৌ নিয়ে এলেন। তখন বড়ঠাকুর-দিদি ওখানে। সেবার ওঁরা দু-দিন ছিলেন। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে রাখি পাতিয়েছিলাম। দুজনে বন্ধুর মতো। দিদি বললে, 'যমুনা, তোরা দুজনে রাখি পাতা।' তখন রাখি পাব কোথায়। সবুজ ডি-এম-সি সুতো পাকিয়ে রাখি করে দুজন দুজনকে পরিয়ে দিলাম।

সেবার শরৎবাবুর বাড়ি রাত্রিবেলা গানের আসর হয়েছিল। তখন সুমনি নামে একটি ছেলে ও শরৎবাবুর শ্যালক সুনীল ওখানে ছিলেন। গান খুব জমেছিল। ওঁর হাতে তানপুরা। ভালো একজন তবলচি ছিলেন। অনেক রাতে গান শেষ হল। বড়ঠাকুর শুনে খুব খুশি।

তারপর বড়ঠাকুর, আমরা সবাই, শচীনবাবুরা সকলে শালবাগানের সরুপথ দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। তখন সবারই মন সুরে মুগ্ধ। শচীনবাবুর গান আমার স্বামীকে পাগল করে তুলত। বলতেন, 'শচীনের গলার সুরে জাদু আছে।' আমাকে গল্প করতেন, 'কলকাতায় শচীনের সঙ্গে বেড়িয়ে কত নিভৃত জায়গায় বসে ওর গান শুনেছি।' ওঁর দিনলিপির পাতায় লিখেছেন—

২১.৪.৩৬

মঙ্গলবার

"তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। শচীনবাবুর বাড়ি যাওয়া গেল। ৩/৪ দিন হল শচীনবাবু ফিরেছে। দেরী হয়েছে বলে বকুনি দিলে। কলেজ স্কোয়ারের এককোণে গিয়ে, অন্ধকার দেখে একটা গাছের তলায় বসা গেল। ও যদি একটা পাত্র হত তাহলে ওতে ভরে আছে যেন একপাত্র সুর। একেবারে কানায় কানায় ভরা। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে বসে আমাদের নতুন পুরাতন বহু সুর শোনালে তন্ময় ও ভাবমুগ্ধ হয়ে। ওর সর্বশরীর ও প্রাণনিঃসৃত সুর শুনলাম অনেকক্ষণ। কোনোটা প্রশান্ত সাগরের মতো গভীর শান্ত মধুর, কোনোটায় তন্দ্রালু ভাব নেমে আসে, প্রকৃত বিরহীর ব্যথা ফুটে ওঠে, কোনোটি আবার সুরের পাণ্ডিত্যে গম্ভীর। ভুল ধরার সুযোগ দেয় না। মনটা আজ বেশ আনন্দে ভরে উঠেছিল। এমন সন্ধ্যা জীবনে কে কটা পায়? কালও ওর

সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। পথে এক বন্ধু জুটল, মোটর নিয়ে যাওয়া হল লেকে। ওখানে লেকের ধারে অন্ধকার গাছতলায় অনেকক্ষণ ধরে গল্প হল। আমি কালোবাবু আর শচীন বিজন ছিল...।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভালো করে রেওয়াজ করতে পারতেন না। অথচ সুরকে পাওয়ার জন্য একটা ব্যাকুলতা অনুভব করতেন, বলতেন, সুর বড় খেয়ালি, সহজে ধরা দেয় না। যে দিন ধরা দেয় সেদিন অহরহ মনের মধ্যে তার গুঞ্জন চলে। ডাক্তারি পড়া এবং করা, আর তার সঙ্গে গান করা— দুটো একই সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। তাই একদিন রাগ করে লিখেছেন, 'দু নৌকায় পা দিয়ে চলে না। গান করা ছেড়ে দিলাম।' কিন্তু ছেড়ে দিলাম বললেই কি ছেড়ে দেওয়া যায়! গান যে ওঁর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

আজও মাঝে মাঝে ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে যেন শুনতে পাই। বিছানায় বসে উনি গাইছেন, "পিয়া পরদেশে"। সেই সুরের মিড় মূর্ছনা। সেই ব্যাকুলতা আমার বুকের দুয়ারে এসে আঘাত করে। মনে হয় আকুলকণ্ঠে ডাকি ওঁরই গাওয়া একটি গান দিয়ে, 'সঁইয়া তু একবার আ যা।' আমার এই ব্যাকুল ক্রন্দন কি সে শুনতে পায়? আমার যে কত কথা বলার ছিল, তাকে পেয়ে আমার সাধ মেটেনি। জন্মান্তর বলে কিছু আছে কি না জানি না, তবে হে ঈশ্বর, হে সর্বনিয়ন্তা, জন্মান্তরে ওঁকেই যেন পাই। আমি জন্মাব, উপভোগ করব তোমার এই পুতুল খেলার লীলা, অনুভব করব এই বিরহ-মিলনের বেদনা— মধুর অনুভূতি।

উনি আমাকে একবার একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'হিন্দু মেয়ের স্বামী কী বলো তো?' তখন ভালো করে গুছিয়ে লিখতে পারিনি, আজ লিখছি— 'যদি স্বামীকে ভালোবাসা যায়, তবে একমাত্র স্বামীই মেয়েদের সর্বস্ব।'

একদিন ডাক্তারখানা থেকে এসে বললেন, 'জানো আজ একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ডাক্তারখানায় এসেছিলেন। নাম সুরেশ সরকার। পি-ডব্লু-ডির ইঞ্জিনিয়ার। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। ভারী সুন্দর ব্যবহার। দাদার সঙ্গে আলাপ করবে বলছিল। টাটার ছেলে। আমার বয়সি হবে। বিয়েও আমাদের একই সময়ে হয়েছে। ও বৌ নিয়ে একদিন আসবে।

এই সুরেশবাবুর সঙ্গে ওঁর অল্পদিনের মধ্যেই দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতাম, যাক। এতদিনে উনি তবু একটি মনের মতো বন্ধু পেয়েছেন। ওঁর বহু চিঠি ও ডায়রির পাতায় সুরেশবাবুর নাম সযত্নে লিখিত আছে। ক'বছর পরে সুরেশবাবু চাইবাসায় বদলি হয়ে চলে যান। এঁদের মৃত্যুর সময় উনি ছিলেন না। ঘাটশিলায় থাকলে আমার স্বামীকে সঙ্গ দিতে পারতেন। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল। ভাবলে অবাক লাগে, বিশ্বাস করতে সময় লাগে। সুরেশবাবুকে বড়ঠাকুর ভায়ের মতোই স্নেহ করতেন।

বড়ঠাকুর পুজোর আগে আসতেন, দেশে যেতেন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে। ওই সময় আমাদের দিন কোথা দিয়ে যে কেটে যেত তার ঠিক নেই। তখন কত লোক আসতেন, কারণ ওই সময় স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় লেগেই থাকত। ঘাটশিলার হাটবাজার দোকানপাট রাস্তাঘাট তখন লোকজনের আনাগোনায় বেশ সরগরম থাকত। ওই সময়টা ছিল আমাদের সারা বছরের আনন্দের সময়। কত নতুন মুখ, কত লোকের সঙ্গে নতুন আলাপ। তাঁরা যখন চলে যেতেন তখন উভয় পক্ষেরই চোখের জল পড়ত। গিয়ে প্রথম প্রথম চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত, তারপর আর নয়।

আমাদের বাড়ির সামনে 'মাতৃধামে' একটি পরিবার এলেন। তাদের সঙ্গে আমাদের খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল। একটি বৌ, তার দুটি ছেলেমেয়ে। দেওর-ননদ ভাগ্নে-ভাগ্নি। বেশ বড় এবং শিক্ষিত পরিবার। দিদি বৌটির সঙ্গে 'সই' পাতিয়েছিল। তাই আমি তাকে সইদি বলতাম। ওঁরা যখন ছিলেন বেশ দিনগুলো কাটছিল। হাসি গানে, গল্পে, সকলে মিলে। সইদির কাছে একটা গান শিখেছিলাম— 'এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে, কে জানে তা কে জানে।' সইদিরা চলে গেলেন, আমাদের খুব খারাপ লাগছিল। চিঠিপত্র আসত। তারপর যথারীতি ধীরে ধীরে বন্ধ হল।

শরৎবাবুর বাড়ি এসেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বোন। তাঁর নামটা আমার ঠিক মনে নেই। তখন বড়ঠাকুর বাড়িতে। ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন বড়ঠাকুরের বন্ধু, সেই সূত্রে বড়ঠাকুরেরও বোন। সেবার উনি এঁদের দুই ভাইকে ফোঁটা দিয়েছিলেন। পরে ওঁরই মেয়ে মায়া— স্বামী, দুইপুত্র বুড়ো ও দীপুকে নিয়ে ওই শরৎবাবুর বাড়িতে এল। তখন বড়ঠাকুর দেশে চলে গেছেন।

মায়ার সঙ্গে হল আমার গভীর বন্ধুত্ব। উমা, আমি, মায়া, তিনজনে দুপুরে গল্প বিকেলে বেড়ানো, খুবই চলছে। ওরা বেশ কয়েকমাস ছিল।

ইতিমধ্যে বড়ঠাকুর একবার এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মায়ারা খুব খুশি। বড়ঠাকুরকে ও 'মামা' বলত, বড়ঠাকুর ডাকতেন 'ভাগনি'। বড়ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ধারাগিরি গেছি। রাতমোহনায় গিয়ে আনন্দ করেছি। ওখান থেকে আমরা মাছ কিনে এনে দু-বাড়িতে ভাগ করে নিয়েছিলাম মনে আছে।

মায়া বেড়াতে গেলে অনেক খাবার সঙ্গে নিত। একদিন বড়ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। বড়ঠাকুর ওকে খুব স্নেহ করতেন। ওর ভবানীপুরের বাড়িতেও গেছেন। মায়াকে লেখা বড়ঠাকুরের কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।

একদিন বিদায়ের ঘণ্টা বাজল। মায়া চলে গেল কলকাতা। বিদায়ের দিনটির কথা বেশ মনে আছে। ও আর আমি দুজনেই কেঁদেছিলাম। নিয়মিত চিঠি আসত। আমাদের

বন্ধুত্ব শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল। ও এত সুন্দর চিঠি লিখত। একদিন আমার স্বামী বলেছিল, 'তোমার বন্ধু দেখছি আমার চেয়েও তোমাকে সুন্দর সুন্দর চিঠি দিচ্ছেন।' একবার মায়া লিখলে, 'যমুনা, তোর স্বামী না আমাকে পুরুষ ভেবে ফেলেন।'

একবার বেশ মজা হয়েছিল। মায়া লিখলে ও পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে। এত সুন্দর ভাষায় আসন্ন নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছে, আমি ভয় পেয়ে গিয়ে ওঁকে চিঠিখানা দেখালাম। উনি পড়ে বললেন, 'দাদাকে দেখাও।' বড়ঠাকুরকে চিঠিখানা দিলাম। পড়ে বললেন, 'তাই তো। ভাবনার কথা, বৌমা। এক কাজ করো। আগে তুমি একখানা চিঠি ওকে লেখো, দেখ কী উত্তর আসে।'

তাই করলাম। উত্তর এল, 'তোকে ভয় পাইয়ে দেব বলে মজা করে লিখেছিলাম।'

পরে ওর শরীর ভেঙেছে, হাঁটতে পারে না, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু ও কখনও আমাকে ভোলেনি। ওর চিঠিতে পেয়েছি পরম সান্ত্বনা ও আশ্রয়। ও আমাকে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা যুগিয়েছে। আমার অনন্ত দুর্ভাগ্যের মধ্যে ওই একটিমাত্র সৌভাগ্য— মায়ার মতো বন্ধু লাভ। ও আমার আনন্দদিনের সঙ্গী ও সাক্ষী এবং দুঃখদিনের পরম বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যে আজও আছে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমার প্রতি মায়ার মাতৃসম স্নেহ ভালোবাসা। ওর ভালোবাসার অমৃতধারায় আমি ধন্য।

৩৭

সুবর্ণ সংঘের এক অধিবেশনে শচীনকে নিজের লেখা গল্প পাঠ করতে শুনেছিলাম। তখন শচীনকে ঠিক চিনতাম না। বাড়ি এসে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁগো, গল্প পড়লে ও ছেলেটি কে?' উনি বললেন, 'আমাদের পাড়াতেই থাকে। ওই আতা বাংলায়।'

বড়ঠাকুর শুনে বললেন, 'ছেলেটির নাম শচীন। লেখে ভালো। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।'

'রেখা বাংলা'র পাশে ছিল 'আতা বাংলা।' একদিন শচীনের মার সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। ওঁকে আমরা দিদি বলতাম। শচীনরা তিন ভাই। শচীন বড়, অহীন মেজ, তোতা ছোট। একটি বোন— চিত্রা। অহীন তখন স্কুলের ছাত্র, তোতা চিত্রা নেহাতই ছোট। শচীন ফ্যাক্টরিতে কাজ নিয়ে এসেছে। সাহিত্যের প্রতি ছিল ওর প্রবল অনুরাগ। বড়ঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসত। একবার 'দেশ'-এ শচীনের একটা গল্প

বেরিয়েছে। সেটা নিয়ে ও বড়ঠাকুরের কাছে এল। বড়ঠাকুরের জ্বর, শুয়ে আছেন। দিদি-বড়ঠাকুর-শচীন— সেই গল্প নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছিল।

শচীনদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। অহীনের সঙ্গে আমার আর উমার খুব গল্প চলত। অহীন তখন ছোট, হাফপ্যান্ট পরে ছাগল ধরবে বলে ছাগলের পিছন পিছন ছুটছে— এই ছবিটা লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে ভেসে উঠল। আমি অহীনের 'ছোট কাকিমা' আর উমা ছিল 'উমাদি'। পরে 'বৌদি'। শচীন আমাদের জামাই হয়ে আসে। শচীনরা কিছুদিন ঘাটশিলায় থেকে। পরে শচীন অন্য চাকরি নিয়ে ওয়ালটেয়ার চলে যায়। কিন্তু বড়ঠাকুরের সঙ্গে শচীনের চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। বড়ঠাকুর শচীনকে বড় স্নেহ করতেন। শচীনকে লেখা বড়ঠাকুরের চিঠি—

ব্যারাকপুর
আষাঢ় সংক্রান্তি
১৩৫৪

কল্যাণবরেষু

শচীন,

তোমার পত্র অনেকদিন পেয়েছি। কিন্তু আমি দেশে অনেকদিন ছিলাম না। সম্প্রতি দিনকয়েক হোল এসেছি। বাড়িতে কেউ নেই। তোমার কাকিমা বাপের বাড়ি, উমা ঘাটশিলায়। আমি একা রেঁধে খাচ্ছি। কলকাতা যেতেও পারিনি অনেকদিন। যাওয়া নিরাপদ নয়। সম্প্রতি 'অভ্যুদয়' কাগজে আমার একখানা উপন্যাস বার হচ্ছে 'ইছামতী' নামে। সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। তুমি চিঠির উত্তর দিও। তোমরা ওখানে বেশ আছো। কোনও উপদ্রব নেই ওদিকে। আমরা পড়ে গিয়েছি বিষম মুস্কিলের মধ্যে। তবে তখন তোমাদের ওদিকে চলে যাবো। জায়গা জমির সন্ধান কোরো।

তোমার বাবা ও মাকে নমস্কার জানিও। তোমার সাহিত্যপ্রচেষ্টার খবর দিও। নাটকটির কী হল?

একটু এদিকের গোলমাল মিটলে আবার শীগগিরই তোমাকে চিঠি দিচ্ছি। তোমার মা কি তোমার কাকিমার কাছ থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন ইতিমধ্যে? আমি কিছু জানিনে। কারণ দেশেই ছিলাম না।

তুমি আশীর্বাদ নিও। ইতি—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ঠাকুর শচীনের সঙ্গে উমার বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। তাঁর ছিল প্রখর দূরদৃষ্টি। তিনি বুঝেছিলেন শচীনের গৌরবময় ভবিষ্যৎ। তাই শচীনের হাতে উমাকে

তুলে দিতে উনি একটুও ইতস্তত করেন নি। উমা-শচীন উভয়েই দুজনকে পেয়ে খুব সুখী হয়েছিল। বড়ঠাকুর শচীনের মা ও বাবার সঙ্গে কথা বলে এ-বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে বড়ঠাকুর শচীনের মাকে লিখছেন—

ঘাটশিলা। বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেলাম কাল এসে। আমার এখানে কাল এসেচি। ১৬ বৈশাখ বিবাহ্ গোধূলিলগ্নে। ৭-২৪ হইতে ৮-২৫ এর মধ্যে। আপনারা ১৫ই তারিখে বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে ছেলের গায়ে হলুদ দিবেন। আমরাও এদিকে মেয়ের গায়ে হলুদ দিব। বিবাহের দিন আপনাদের পাঠানো হলুদ বিবাহের পূর্বে মেয়ের গায়ে ছোঁয়াইলে হইবে। আশীর্ব্বাদ হইবে বিবাহের পূর্বে, বিকেলের দিকে। আমাদের সব ঠিক আছে। দয়া করিয়া বরপক্ষ যথাসময়ে যাহাতে আসেন তাহার ব্যবস্থা করিবেন। গাত্রহরিদ্রার ব্যবস্থা কলিকাতার বিশিষ্ট পুরোহিত কর্তৃক নির্দিষ্ট।

আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার গ্রহণ করুন। শচীনবাবাজীকে আশীর্ব্বাদ দিবেন। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ঠাকুর নিজে এই বিয়ের সব যোগাযোগ করেন। নিজে উপোস করে সম্প্রদান করেছিলেন। সবই মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। শচীন বরযাত্রীসহ বিয়ে করতে এল। গোধূলিলগ্নে বিয়ে। দিদি বরণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমি। সমস্ত অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে চুকে গেল। বৈশাখ মাস। সেদিন বিকেলে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের সুষ্ঠু আয়োজনকে কিছুটা এলোমেলো করে দিয়েছিল, তবে তাতে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়নি, কারণ পাশেই 'মাতৃধাম'। ওখানে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হল।

আমাদের ছোট বাড়ি। হইচই। লোকজন। নিমন্ত্রিতদের আসা-যাওয়া। এইসব ব্যাপার দেখে বাবলু কেঁদেই অস্থির। বড়ঠাকুর অনেকক্ষণ বাবলুকে নিয়ে ছিলেন। আমার স্বামীকে বিশেষ এবাড়িতে দেখিনি, কারণ মাতৃধামে লোক খাওয়ানোর দেখাশোনা করছিলেন। উনি ওখানেই ছিলেন। বিয়ে ও বাসর হয়েছিল বাড়িতেই।

আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হয়েছে। সব মিটে গেছে। বড়ঠাকুররা দু'ভাই ওবাড়িতে শুয়েছেন। বাবলু বড়ঘরের বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমি আর দিদি উমার বাক্স গোছাতে বসলাম। সমস্ত উপহারের জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে দিয়ে শুধু শান্তর জন্যে একটা সাবান আর বাবলুর জন্য একটা পাউডার রেখে দিলাম।

দেখি উমা আমাদের পাশে এসে বসেছে। কাল চলে যাবে, ওর ভালো লাগছে না। দিদি বলেছিল, 'মন খারাপ করিস না। শচীন ভালো ছেলে আর ওদের বাড়ির সকলকেই তো জানিস। কোনো ভয় নেই।' বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেলে বড়ঠাকুর একদিন উমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'খুকি, (উমাকে ওর মামারা খুকি বলে ডাকতেন) শচীনের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করেছি, তোর অমত নেই তো? যদি তোর অমত হয় লজ্জা করিস না। আমি তা হলে এখানে বিয়ে দেব না।' উমা কোনো উত্তর দেয়নি। আমাদের বলেছিল, 'বড়মামাকে বলবে আমার অমত নেই।'

বিয়ের দিনের বাকি রাতটুকু আমি আর দিদি বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে বসে কাটিয়েছিলাম। পরদিন আমার স্বামী বললেন, 'আচ্ছা, কাল তুমি আর বৌদি খাওনি, না? তোমাদের তো খেতে দেখিনি।' পরদিন উমার চলে যাওয়ার সময় ওঁরা দু'ভাই কেঁদেছিলেন, উমাও কেঁদেছিল খুব।

কোথায় হারিয়ে গেল সেসব দিন। কেবলই মনে হয় চরম দুঃখের দিনে উমা শান্তও যদি ওদের ছোটমামার পাশে থাকত তা হলে বোধ হয় উনি এভাবে চলে যেতে পারতেন না। এই একই কথা বারেবারে আমার কলমের মুখে এসে যাচ্ছে। কারণ এটা আমার জীবনের অনুতাপদগ্ধ যন্ত্রণার কাতরোক্তি।

উমার বিয়ের কিছুদিন আগে রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'রেখা বাংলা' কিনে সপরিবারে বাস করছিলেন। ইনি শচীনের সম্পর্কিত মামা হন। রমণীবাবুর স্ত্রীকে আমরা দিদি ডাকতাম, আমার স্বামী বৌদি বলতেন। ওঁদের পুত্রকন্যা— মধুসূদন, গোপা, পিকু, ডালু— সবার কথাই মনে পড়ছে। গোপা পরে বড় ডাক্তার হয়েছে। একবার হালিশহরে রুগি দেখতে এসে ভাটপাড়ায় এসে খুঁজে খুঁজে আমার কাছে এসেছিল। বহুদিন পরে ওকে দেখে আনন্দ হয়েছিল। গল্প করতে করতে ও বললে, 'কাকিমা, আপনার মনে আছে ঘাটশিলায় একদিন আমাদের বাড়িতে বসে একটা গান করেছিলেন? সেই গানটা, সব লাইনগুলো আজও আমার মনে আছে।' বলে গানের দুটি লাইন বললে—

"কৃষ্ণা রাতে কৃষ্ণা রাতে আঁধারে,
ভালোবেসেছিনু হায় আলেয়ারে।"

তখন আমার মনে পড়ল সত্যিই ওই গানটা তখন আমি গাইতাম। কার গান, কী বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। ওদের মা খুব স্নেহময়ী ছিলেন, সুন্দর করে কথা বলতেন। আমার স্বামী বলতেন, 'বৌদির কথার মধ্যে আর্ট আছে।' ওই দিদি বড়ঠাকুরকে বলতেন, 'দেশের নারায়ণ।' গভীর শ্রদ্ধা ছিল ওঁর প্রতি।

একদিন কী হল, আমার স্বামী ওঁদের বাড়ির সামনের গোলবারান্দায় বসে গান গাইছিলেন। 'মেঘমল্লার' ছিল ওঁর প্রিয় রাগ। সেদিন মেঘমল্লার ধরেছেন, তার কিছুক্ষণ পরেই নামল বৃষ্টি। হয়তো সেদিন বৃষ্টি হতই, কিন্তু, রমণীবাবু, দিদি, সবাই মিলে হইহই করে উঠলেন, বললেন, 'ডাক্তারবাবুর গানেই বৃষ্টি নামল।' শুনে উনি খুব খুশি। সেদিন সন্ধ্যাটা ভারী আনন্দে কেটেছিল।

আমার স্বামী সকালে হারমোনিয়ামের সঙ্গে গীতাপাঠ করতেন। দরাজ মিষ্টি গলা ছিল। ওভারসিয়ারবাবু বলতেন, 'ডাক্তারের গীতাপাঠ শুনে সত্যি মনে হয় বামুনপাড়ায় আছি।' বড়ঠাকুরের মুখে বেদের স্তোত্রও অদ্ভুত ভালো লাগত। বড়ঠাকুর ইছামতীতে স্নান করে জলে দাঁড়িয়ে যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-এর একটি স্তোত্র উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে ঈশ্বরবন্দনা করতেন, তখন মনে হত যেন অনেক অনেক পিছনে ফেলে আসা উপনিষদের যুগে ফিরে গেছি, যেন শুনছি তপোবন-ঋষিকণ্ঠে সর্বব্যাপী মহানপুরুষের স্তুতি—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু।
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

পূর্বাকাশ অরুণালোকে রক্তিম। ইছামতীর শান্ত বহমান জলধারা, চারপাশের সবুজ বনভূমির শ্যামল স্নিগ্ধতা। সে যেন একটা অপার্থিব পরিবেশ। মন আপনা থেকেই বিশ্বদেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

৩৮

ঘাটশিলায় আমাদের পাড়াতেই ছিল সৌরেনদের বাড়ি। এরা নৈহাটির লোক। সৌরেনের বাবা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। ওরা চার-পাঁচটি ভাই। সৌরেন বড় এবং ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। ছোটগুলি পড়াশুনা করত। দেখতে ওরা ভারী সুন্দর ছিল, ফরসা টুকটুক করছে। একবার সরস্বতী পুজোর সময় ওরা এবং পাড়ার আরও সব ছেলেরা মিলে 'আলেকজান্ডার ও পুরু' থিয়েটার করল। আমার কাছ থেকে কাপড়চোপড় নিয়ে গিয়ে রাজা সাজা হল, স্টেজ তৈরি হল। ওরা কিন্তু খুব ভালো করেছিল। সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখন আর তেমন থিয়েটার করতে দেখি না। তখন এতেই কত আনন্দ হত।

একবার ওর কাকা এলেন, তিনিও ডাক্তার। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হল। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ছিল যাওয়া-আসার রাস্তা। ছোটঘরের একটা জানলা

ছিল রাস্তার দিকে, বড়ঠাকুর থাকলে ওই ঘরটায় আমরা থাকতাম। ভদ্রলোক ওঁকে বলতেন, 'ওদিকে গেলেই তো দেখি দুজনে মুখোমুখি বসে আছ। ডাক্তারি করো কখন?' অবশ্য ঠাট্টা করে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর বেশ আলাপ জমে উঠেছিল।

যাই হোক, সৌরেনের বিয়ে হল, ছোট বৌ এল। কত আনন্দ। কিছুদিন পরে শোনা গেল সৌরেনের যক্ষ্মা হয়েছে। তখন যক্ষ্মার ওষুধ ছিল না। কিছুদিন ভুগে ও মারা গেল। ঘরে ছোট বৌ। সেদিন পাড়াসুদ্ধু সবাই বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাড়ায় আমরা পরস্পরের আপন ছিলাম। বড়ঠাকুর শুনে দুঃখ করেছিলেন।

'মাতৃধামের' সামনে দিয়ে যে অপ্রশস্ত মেঠো রাস্তা চলে গেছে তার দু'পাশে ছিল ক্যাকটাস, ভেরেন্ডা, রাংচিতে ইত্যাদি গাছ। আর ছিল একটা বিরাট পলাশফুলের গাছ। ওই রাস্তা ধরে যেতাম ধরবাবু, করবাবু ও সোমবাবুদের বাড়ি। বৃদ্ধ ধরবাবু প্রায়ই আসতেন, চা খেতেন ওঁর সঙ্গে। কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যেতেন। বড়ঠাকুর থাকলে রোজ আসা চাই। পূর্ববঙ্গের মানুষ। পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি-নাতনি নিয়ে থাকতেন। ধর্মপ্রাণ মানুষ। করবাবু ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন। শান্ত ছাপোষা ভদ্রলোক। সোমবাবুও ফ্যাক্টরির কর্মী। ওঁর মেয়ে দীপ্তি খুব ভালো গান করত। ছেলে খোকন। তখন ঘাটশিলার প্রায় সব অনুষ্ঠানেই দীপ্তি গান করত। বড়ঠাকুর ঘাটশিলায় এসে খোঁজখবর নিতেন, মিশতেন সবার সঙ্গে তাদের মতো হয়ে। বোঝাই যেত না উনি অত বড় সাহিত্যিক।

কত মুখই ছায়াছবির মতো মানসপটে ভেসে উঠছে। ওই রাস্তা দিয়েই শক্তিশদের বাড়ি নদীর ধারে যেতে হত। ওদের মা ছিলেন সুন্দর, ফর্সা। ছোটখাটো, শান্ত মানুষ। ওদের ব্রাহ্মণ পরিবারটি ছিল ধর্মপরায়ণ, পুরোনো ভারতবর্ষের আদর্শে গড়া। শক্তিশের মার কাছে আমি আর আমার স্বামী বহুবার নিমন্ত্রণ খেয়েছি। শক্তিশ দেবেশ ছোট ভায়ের মতো ছিল। শক্তিশ হঠাৎ মারা গেল। তারপর থেকে কেমন যেন সব হয়ে গেল।

আমাদের বাড়ির সামনেই ওভারসিয়ার মন্মথবাবুর বাড়ি। ওঁর ছেলে তপন। মেয়ে কয়েকটি। শোভার তখনও বিয়ে হয়নি। ওর বিয়ে হল। ছোট মেয়ে গীতা, বীণাদি, এদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বীণাদি অত্যন্ত ভালো ছিলেন। ওঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল নৈহাটি এবং আমাদের বাড়ির পাশে 'মাতৃধাম' ছিল ওঁর। উনি হঠাৎ মারা গেলেন। তখন 'মাতৃধাম' বিক্রি হবে। বড়ঠাকুরের খুবই ইচ্ছা ছিল 'মাতৃধাম'কেনেন। ইদানীং বড়ঠাকুরের জমিজমা, বাড়ি, ধানজমি, গরুর গাড়ি এইসব বিষয়আশয় কেনার ঝোঁক হয়েছিল। বড়ঠাকুর দেশে ভাইকে লিখলেন। বড়ঠাকুরের ওই শিশুসুলভ খেয়াল। আমার স্বামী দাদার এইসব খেয়াল খুব উপভোগ করতেন।

ব্যারাকপুর
২৫শে জুন

কল্যাণবরেষু

নুটু, তোমার পত্র দুখানাই (অর্থাৎ রেডিও শান্তর মারফৎ) পেয়েছি। এখানে বড় বর্ষা নেমেছে। রাস্তাঘাট কাদা ও মশার বড় উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েচে। মিতের মেয়ে ডলির বড় অসুখ শুনেছ বোধ হয়। উমার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল ৪/৫ দিন। মাতৃধাম সম্বন্ধে তুমি কি মতামত দাও সত্বর লিখবে। পাঁচের অঙ্কে হয় না? তুমি কী বল, ওদিকে অত পয়সা ব্যয় করা উচিত? এবার বর্ষাকালে এদের ওদিকে পাঠাবো। বর্ষা এখানে অচল। সুধাময়েরটা বাজে। কী বল? কটা ঘর? কুয়ো আছে? তোমার মত কী? আমার স্কুল খুলচে। পশ্চিমের নানা জায়গা থেকে চিঠি আসচে। তারা কাগজে দেখেচে আমি পুরী গিয়েচি। পশ্চিমে কেন গেলাম না। মোগলসরাই, সোলাপুর, দিল্লী নানা জায়গা থেকে। বৌমার আমের জেলি অতি সুন্দর। বিশুর মা জেলেনী পর্যন্ত খেয়েচে। 'পথের পাঁচালী' গুজরাটিতে অনুবাদ হয়েচে শুনেচ বোধ হয়। আমি ও ইন্দু শীঘ্র একবার বেড়াতে যাবো। শান্ত বললে এখনও বড় গরম। বৃষ্টি হচ্ছে কিনা লিখো। বৌমা ও তুমি আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষে লিখেছেন—
উঠোনের গাছে এখনো আম আছে।

যাই হোক, 'মাতৃধাম' ওঁরা নিজেদের আত্মীয় 'কুমারেশ' ওষুধের মালিকদের কাছে বিক্রি করেন। অর্থাৎ ওঁদের সম্পর্কিত মামা ভোলাবাবুরা কেনেন। 'মাতৃধামে'র সামনের দিকে ছিল ফুলো সাঁওতালের বাড়ি। ফুলো দেখতে ভারী সুন্দর। রং কালো, সুঠাম চেহারা, সাজত সুন্দর করে। ওর অনেক গহনা ছিল, পরত। প্রায়ই সেজেগুজে আসত। গোবিন্দরা থাকত ওদের পাশের ঘরে। গোবিন্দর মা, বোন পার্বতী ও গুয়ামণি— এরা বোধ হয় উড়িয়া ছিল। ওরা আমাদের বাড়ি কাজ করত। বাবলুকে নিয়ে বেড়াত। ওদের বাড়ির পিছনদিকে ছিল 'কূর্মকুট'। কূর্মকূটের পাশ দিয়ে গেলে মিতেদার বাড়ি। 'শৈলসুতা কুটির'। মিতেদা প্রথম দু-বার স্ত্রী গৌরীদিকে নিয়ে আমাদের বাড়ি ছিলেন। পরে বাড়ি কেনেন এবং প্রতিবছরই সপরিবারে ঘাটশিলা আসতেন। গৌরীদি দেখতে সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু হাঁপানি ছিল, প্রায় তাতে কষ্ট পেতেন। মানুষ ছিলেন অতীব ভালো, যার জুড়ি আজও চোখে পড়েনি। ওঁদের দুটি ছেলে গণেশ ও

মান্তু, মেয়ে ডলি। ওরা এলে আমার স্বামীর খুব আনন্দ হত, কারণ ছোট থেকে তো ওঁদেরই কাছে বনগাঁর বোর্ডিং-এ ছিলেন। গৌরীদির সঙ্গে ওঁর খুব গল্প জমত।

আমাদের পাড়াতে দ্বিজেনবাবুর নার্সারির সামনে একটা খোলার বাড়ি ছিল। ওই বাড়িতে একবার কলকাতা থেকে মধুবাবু বলে এক ভদ্রলোক তাঁর মাকে নিয়ে এসেছিলেন। ওঁর মা ছিলেন প্রচণ্ড মোটা। কলকাতার খাস বাসিন্দা। গল্প করতেন, ছোটবেলায় মহাকালী পাঠশালায় পড়েছিলেন। গড়গড় করে সংস্কৃত শ্লোক বলতেন, মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনেকগুলি পর্ব আবৃত্তি করতেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কিছুদিন পরে ওঁরা চলে গেলেন। পরে ওই বাড়িটি কলকাতার গড়পারের রমেশবাবুরা অর্থাৎ 'জেমস লর্ড' কোম্পানির মালিকরা কেনেন এবং সুন্দর বাড়ি তৈরি করেন। এঁদের পরিবারটি ছিল অত্যন্ত ভদ্র এবং অমায়িক। রমেশবাবু, তাঁর মা, স্ত্রী, মেজভাই সুরেশবাবু, ছোটভাই টুলুবাবু, সুরেশবাবুর স্ত্রী সীতা। এঁদের সবার কথা মনে পড়ে। আমার স্বামীর সঙ্গে এঁদের যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছিল।

টুলুবাবু ওঁর ছোটভায়ের মতো ছিলেন। টুলুবাবু আমাকে ডাকতেন বৌদি, ওঁকে ডাক্তারবাবু। অবশ্য এঁরা সবাই ঘাটশিলায় থাকতেন কিছুদিনের অতিথি হয়ে। কর্মস্থান তো কলকাতায়। থাকলে চলবে কেন? বড়ঠাকুরের অসুখ শুনে টুলুবাবু ওঁকে চিঠি দিয়েছিলেন। কোনো প্রয়োজন থাকলে জানাতে বলেছিলেন। যেবার বড়ঠাকুররা বোম্বে যান সাহিত্য সম্মেলনে, বড়ঠাকুর ভাইকে লিখেছিলেন, 'অমুক দিন বোম্বে মেলে বোম্বে যাচ্ছি, ঘাটশিলা স্টেশনে দেখা কোরো।' ওইদিন আমি টুলুবাবু এবং আমার স্বামী দেখা করতে গিয়েছিলাম। আজও স্পষ্ট মনে আছে বড়ঠাকুর দরজায় দাঁড়ানো, ভাই-এর নাম ধরে ডাকছেন। আমরা গাড়িতে উঠে গিয়ে সবাইকে প্রণাম করে ফেরার সময় ঘাটশিলায় নামতে বললাম। ওইখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী, মৌমাছি (বিমলচন্দ্র ঘোষ) এবং আরও অনেকে ছিলেন। খাবারের ব্যাগটা দেখে ওঁরা বললেন, "বৌমা, করেছ কী? এত খাবার!'

সেটা ছিল শীতের রাত্রি। ট্রেন চলে গেলে আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে আসছি। ওঁর মুখে শুধু দাদার কথা। কত কথা যে বলছেন! আমি নীরব শ্রোতা। টুলুবাবু মাঝে-মধ্যে দু-একটা কথা বলছেন। কোথায় হারিয়ে গেল সেসব দিন। ঈশ্বরের সব কাজই নিখুঁত এবং পূর্বপরিকল্পিত। তা না হলে, ওঁর দুঃখের দিনে একজনও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি কাছে ছিলেন না। পরে আমার স্বামীকে লেখা বড়ঠাকুরের চিঠিগুলি টুলুবাবুর হাত দিয়ে সুধাদি (দ্বিজেনবাবুর বৌদি) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায়ই ওঁদের সবার কথা মনে পড়ে। সবার ভালোবাসার দান আমি অঞ্জলিভরে নিলাম। আমার নিজের তাঁদের দেবার মতো কিছু নেই। কেবল একমাত্র প্রার্থনা— ঈশ্বরের মঙ্গলাশিস যেন ঝরে পড়ে সবার ওপর।

আর একটি মেয়ের কথা বলি। তার সুন্দর ম্লান মুখটি বারেবারে মনের আয়নায় এসে ছায়া ফেলছে। তার নাম জানি না। সুন্দর ফর্সা তন্বী চেহারা। সাজপোশাকে আভিজাত্যের ছোঁয়া। ঘাড়ের কাছে খোঁপা, সামনের চুলগুলি কপাল থেকে কান পর্যন্ত ঢেকে আছে। চোখদুটি বড় বড়। দেখে এবং পরিচয়ে জানা গেল উচ্চশিক্ষিতা। আমাদের পাড়াতে সঞ্জীববাবুর বাইরের দিকের ঘরে ভাড়া এসেছেন। বেশ অবস্থাপন্ন। সঙ্গে স্বামী। রোজ দুজনে বেড়াতে বেরোন। একদিন আমার স্বামী এসে বললেন, 'সঞ্জীববাবুর বাড়ি যাঁরা এসেছেন, আজ আমার ডিসপেনসারিতে গিয়ে আলাপ করে এসেছেন।' উনি ডাক্তার বলে অনেকেই অযাচিতভাবে এসে আলাপ করে যান। বললেন, 'মেয়েটির স্বামীর যক্ষ্মা। চেঞ্জের জন্য এসেছেন। মাসকয়েক থাকবেন।'

যক্ষ্মা শুনে মনটা দমে গেল। তখনও যক্ষ্মার ওষুধ বার হয়নি। যাই হোক, একদিন বাড়ি এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। তারপর থেকে প্রায়ই আসতেন। বই নিয়ে যেতেন। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওঁর অসুখ কবে থেকে?' বললেন,'বিয়ের পর ধরা পড়েছে।' বেচারির সন্তান হয়নি, অক্লান্তভাবে স্বামীর সেবা করতেন। একবার ভদ্রলোকের অসুখ বেশ বাড়াবাড়ি হল, দেখতে গেছি, দেখি মেয়েটি স্বামীর পাশে বসে আছেন। ওঁর সেই বিষণ্ণ মূর্তি আমার মানস-পটে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। সেই বাড়াবাড়ি অবস্থাটা একটু কমলে ওঁরা কলকাতা চলে গেলেন। জানি না তার পরের ঘটনা কী।

৩৯

কত কথাই এলোমেলোভাবে মনে পড়ছে। আমাদের সেই রান্নাঘরে কেমন সাহিত্য-বাসর বসত। আমি, দিদি, শক্তিশ, মাঝেমাঝে অজিত এসে বসত দরজার পাশে। বড়ঠাকুর বেড়াতে যেতেন, দিদির ঠাকুরপো বেরিয়ে যেত ডিসপেনসারি। কুটনো, বাটনা, সাহিত্য একই সঙ্গে চলত। শক্তিশ ভালো ভালো কবিতা লিখে এনে আমাদের পড়ে শোনাত। দিদি তো নাম-করা লেখিকা, বিয়ের আগেই কত পত্রিকায় দিদির লেখা বেরিয়েছে। একবার ভাটপাড়া থেকে মা লিখলেন, ''কল্যাণীর একটা গল্প পড়লাম 'তরুণতরুণী' পত্রিকায়।'' দিদি পাকা লেখিকা, শক্তিশ কবি, অজিত শিল্পী—ভালো ছবি তুলত। বড়ঠাকুর এবং আমাদের বহু ফটো অজিতের তোলা।

দিদি বিয়ের পরও লেখা চালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। বড়ঠাকুর বলতেন, 'লেখা-পড়ার চর্চা থাকা ভালো।' দিদি রান্নার অবসরে লিখত। আমার ও দিদির খাতা-পেন-বই সব থাকত কুটনোর চুপড়ির মধ্যে। দিদি বাড়ির বড় বৌ, দায়িত্ব

কর্তব্যও ছিল অনেক। দিদির বিয়ের পর দিদির ঠাকুরপো দিদিকে বলেছিলেন, 'বৌদি, তুমি বয়সে যাই হও না কেন, বড় হয়ে এসেছ, সব দায়-দায়িত্ব এখন থেকে তোমার।' দিদি সে দায়িত্ব চিরকাল বহন করে এসেছে।

ওদের আসরে আমি বেমানান। লিখতে জানি না, কোনো গুণ নেই, মুখ্যু মানুষ, কিন্তু যা পড়ি তা নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে ভালো লাগে। তবে 'সঞ্চয়িতা' পড়তাম খুব। 'সঞ্চয়িতা' ছিল আমার 'গীতার' মতো। মাঝেমধ্যে ওই থেকে আমাদের কবিতাপাঠ হত। আমাদের আসর সকালেই হত বেশি, সন্ধ্যায় এক-আধদিন। আমার স্বামী বলতেন, 'বৌদি, তোমাদের কাব্যের আসরটি ভালোই হয়েছে! আমরা মরছি খেটে খেটে আর তোমরা দিব্যি কাব্যালোচনা করছ।'

দিদি হাসত। আমি আর দিদি প্রায়ই বলতাম, 'আমাদের কিছু হল না।' কী যে হবে তার নেই ঠিক, তবু বলতাম। এঁদের এত লেখালেখি দেখে আমারও কবিতা লেখার শখ হল। কুঁজোর চিত হয়ে শোয়ার ইচ্ছার মতোই। লিখি, পছন্দ হয় না। কাটি, ছিঁড়ে ফেলি।

সেবার দিদি-উমা দেশে, আমি একলা আছি। একদিন কী করেছি, কাজকর্ম হয়ে গেছে, বড়ঘর ও ছোটঘরের দরজা বন্ধ করে তার পাশের ঘরের একটা দরজা খুলে রেখে বড়ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করছি। কখন যে উনি পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়ালই করিনি। হঠাৎ উনি আস্তে আস্তে বলছেন, 'এত তন্ময় হয়ে কাকে চিঠি লিখছ? আমি তো এখানে!' বলেই চট করে খাতাটা নিয়ে একটু পড়েই বললেন, 'কবিতা!' তারপর হো হো করে হাসি। আমার তখন দারুণ লজ্জা করছে, আমি যতই অনুনয়-বিনয় করে বলছি, 'দিয়ে দাও, ভালো হয়নি', উনি ততই জোরে জোরে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন—

'কল্পনা মোর পাখা দিল মেলি
দিক হতে দিকে,
রাঙা মেঘে সূর্যোদয়
সূর্যাস্তের দিকে।
কল্পনা মোর ছুটে চলে।
গ্রহতে গ্রহতে,
তারার আলোতে।'
ইত্যাদি।

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি কবিতা লিখেছ, আমায় দেখাওনি কেন? আমাকে তুমি সবকিছু লুকিয়ে রাখো।' আমি বললাম, 'ভালো হয়নি। ভালো হলে তো

দেখাব।' উনি বলেছিলেন, 'ভালো মন্দ যাই হোক, আমি জানব। তোমার কোনো কিছুই আমার অজানা থাকবে না। বুঝলে?' বলে হেসেছিলেন। সেই খাতা আজও আমার কাছে আছে। হাতে নিয়ে মনে পড়ে ওর সেই হাসিভরা মুখে অনুযোগ।

এর সঙ্গে আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের ঘাটশিলায় আসার কয়েকমাস পরে, উনি মুসাবনিতে সপ্তাহে ক'দিন বসবেন বলে ঠিক করেছেন। রাস্তা সোজা নয়, নদী পার হয়ে যেতে হবে। আমার ইচ্ছা করছে না। একদিন আমি বললাম, 'এখানেই যা হচ্ছে হোক, বেশি কষ্ট করতে হবে না।' শুনে খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি বাধা দিয়ো না তো। আজই একবার গিয়ে দেখে আসব।' আমি চুপ করে রইলাম। বিকেলে মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নিজের ডিসপেনসারিতে কিছুক্ষণ বসে তারপর মুসাবনি যাচ্ছেন, নদী পার হওয়ার সময় গাড়ি গেছে খারাপ হয়ে, আর যাওয়া হয়নি।

রাত্রে বাড়ি এসে বললেন, 'জানো আজ মুসাবনি আর যাওয়া হল না। বুঝলে নদীর কাছে গিয়ে পেট্রল গেল ফুরিয়ে। আগে দেখিনি। ফিরে এলাম। তখুনি মনে হল তোমার মনে কষ্ট দিয়ে গেছি, তাই এমন হল। কিন্তু শোনো, আজ গেলাম না বটে। কিন্তু আমি ওখানে একবার চেষ্টা করবই।'

৪০

মি. সিনহা (যোগেন্দ্রনাথ সিনহা) হাসিখুশি মানুষটি। চাইবাসা থেকে গাড়ি নিয়ে প্রায়ই আসতেন। বড়ঠাকুরের পরম ভক্ত। উনি ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। এতদ্‌অঞ্চলের বনজঙ্গল পাহাড় সব ছিল ওঁর এক্তিয়ারের মধ্যে। বড়ঠাকুরকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়িয়েছেন তার ঠিক নেই। ছোটনাগপুরের গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে, পার্বত্য গুহায়, অসংখ্য ঝরনার ধারে। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অনেক সময় দিদি সঙ্গে থাকত। এইসব স্থানের বর্ণনা ও আনন্দ উপলব্ধি বড়ঠাকুরের দিনলিপির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

মি. সিনহা গাড়ি নিয়ে এলে আমরাও ছিটেফোঁটা বেড়ানোর সুযোগ পেতাম। উনি এসেই বসে যেতেন বড়ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করতে। আর বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে বেড়ানো হত। তখন আমরা সকলেই সঙ্গে যেতাম। বড়ঠাকুর, দিদি, দিদির ঠাকুরপো, আমি। বেড়ানো তো বনজঙ্গল, পাহাড় পর্বত। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। এক একবার ভয়ও করত। বনজঙ্গল, যদি হঠাৎ কোনো বন্যজন্তু আক্রমণ করে অথবা চোর-ডাকাতেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে! আশ্চর্যের কথা, আমরা ওখানে যখন ছিলাম

তখন কোনো ডাকাতি বা বড়রকমের চুরির কথা শুনিনি। ওখানকার আদিবাসী মানুষেরা কিন্তু বড় সরল ও অল্পে সন্তুষ্ট ছিল। কালের পরিবর্তনে এখন কী হয়েছে জানি না।

মি. সিনহা ঘাটশিলায় এলে প্রথমে ডাকবাংলোয় উঠতেন, কিন্তু আমাদের বাড়িতে সারাদিন থাকতেন। খাওয়া-দাওয়া আমাদের ওখানেই হত। বেড়িয়ে এসেই আমি আর দিদি রান্নাঘরে ঢুকতাম। দিদির ঠাকুরপো চা খেয়েই ছুটতেন ডাক্তারখানায়। রোগীরা অপেক্ষা করছে। দাদা এলে ওঁর বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকতে ইচ্ছে করত না। বড়ঠাকুর যখন থাকতেন না তখন মি. সিনহা ডাকবাংলোয় থাকতেন, আমাদের বাড়ি আসতেন দেখা করতে, ওঁর সঙ্গে গল্প করতে। আমাকে 'বৌমা' বলতেন, এসে টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার বার করে হাতে দিয়ে বলতেন, 'বৌমা ছেলেমানুষ আছে, খেয়ে নাও।' ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতেন। পরে বাংলা পড়তেও শিখেছিলেন 'পথের পাঁচালী' পড়বেন বলে।

একবার আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বৌমা ইংরাজি জানে না?' উনি হেসে বলেছিলেন, 'না।'

সেবার কানুমামা ও মায়াদি এসেছেন, দিদিরা দেশে, মি. সিনহাও এসেছেন। উনি আমাদের সবাইকে ডাকবাংলোয় নিমন্ত্রণ করলেন। টেবিল সাজিয়ে খেতে দিয়েছেন, তাতে মুরগির রোস্ট ইত্যাদি আছে। আমার পাশের চেয়ারে আমার স্বামী খেতে বসেছেন। সবাই খাওয়া শুরু করেছে, আমার তো মুশকিল। মুরগি খাই না। উনি বললেন, 'মুরগি বাদ দিয়ে খাও।' মি. সিনহা শুনে বললেন, 'বৌমা তো ছেলেমানুষ আছে, মুরগি খায় না কেন?' আমার স্বামী বললেন, 'বৌদি আর ও দুজনেই মুরগি খায় না। ছেড়ে দিন যোগেনদা।' বাড়ির বৌরা মুরগি খাবে এটা কিন্তু আমার ভাশুর পছন্দ করতেন না। উনি বলতেন, 'ঘরের বৌ মুরগি-খাবে কী? আমাদের গ্রামের বৌরা তো খায় না। মুরগি ছাড়া কত খাবার জিনিস আছে।' দিদি আগে মাংসও খেত না। পরে অবশ্য খাওয়া শুরু করেছিল। মি. সিনহা আমাদের দেশের বাড়িতেও গেছেন।

ওই সময় চাইবাসা থেকে প্রায়ই আসতেন ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ ঘোষ। বড়ঠাকুরের গুণমুগ্ধ, খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই বড়ঠাকুরকে আহ্বান জানাতেন যেখানে যখন থাকতেন সেখানে যেতে। একবার হল কী, সুবোধবাবু, মি. সিনহা সবাই বড়ঠাকুরকে যেতে লিখেছেন, বড়ঠাকুর ভ্রমণপাগল মানুষ, কোনদিকে যাবেন ঠিক করতে পারছেন না। এদিকে আমার স্বামীও দাদাকে ঘাটশিলা আসতে লিখেছেন। বড়ঠাকুর ভাইকে লিখলেন—

বারাকপুর
বুধবার

কল্যাণবরেষু,

অদ্য পাটনা কলেজের চিঠি পাইয়া জানিলাম আমার সভার তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারী ধার্য্য করিয়াছে। এদিকে সুবোধ আবার Executive Engineer হইয়াছে। সে লিখিতেছে, সুরজপুরের রাজাসাহেব আপনার অত্যন্ত ভক্ত। আপনি সরস্বতী পূজার সময় আরায় নাগরী প্রচারিণী সভায় বক্তৃতা দিন। এবং ওখানে আপনার সম্বর্ধনা করা হইবে। সুরজপুরের রাজাসাহেব 'আরণ্যকে'র এক হিন্দি অনুবাদ করাইতেছেন। এই অবস্থায় ঘাটশিলায় সরস্বতী পূজায় যাওয়া সম্ভব হইবে না। ওদিকে সিংহসাহেব লিখিতেছে, আনন্দবাজারের সুরেশদা সারাণ্ডা forest-এ বেড়াতে যাচ্ছে সরস্বতী পূজাতে, আপনিও সঙ্গে আসুন। এখন কোন্‌দিকে যাই। ২৫শে জানুয়ারী যশোরে সভা।

তোমার বৌদিদি ভালো আছে। উমা এখানে আছে। বড় শীত। আমরা ভালো আছি। গুটকে কবে আসবে? জুতোজোড়া পাঠিয়ে দিও। তোমরা আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবার সুবোধবাবু জিনিসপত্র ডাকবাংলোয় রেখে আমাদের বাড়ি এসেছেন। বড়ঠাকুর-দিদি দেশে, আমার স্বামী ডিসপেনসারি, বাড়িতে উমা, আমি, শান্ত। চা দিতে হবে, কিন্তু ভালো কাপ-ডিশ নেই, আমাদের ব্যবহৃত কয়েকটা আছে মাত্র। আমি এবং উমা হাতে-পায়ে খুবই লক্ষ্মী ছিলাম। একদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। কয়েকজন ভদ্রলোক সেদিন এসেছিলেন, চা আর জলখাবার দেওয়া হয়েছে, কাচের কাপ-ডিশ-গ্লাস সব বেরিয়েছে, তাড়াতাড়িতে কী করতে গিয়ে উমার সেগুলোতে পা লাগল। ফলে পরপর সাজানো চারটে গ্লাস একসঙ্গে শেষ। এইভাবে ক্ষণভঙ্গুর কাচের বাসনের আমাদের হাত থেকে পড়ে অকালমৃত্যু ঘটত। চট করে নতুন কেনার উপায় নেই, ওখানে পাওয়া যেত না। কলকাতা এলে তবে তার ব্যবস্থা হত। যাই হোক, ভদ্রলোক এসেছেন, উমা গজগজ করছে। অবশ্য যা ছিল তাতেই চা দেওয়া হল।

কিছুদিন পরে দিদি-বড়ঠাকুর এসেছেন। বড়ঠাকুর বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। আমরা ঘরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি। দিদিকে বললাম, 'দিদি, এবার কিছু ভালো কাপ-ডিশ কিনতে হবে। ভদ্রলোক কেউ এলে এই কাপ-ডিশে দিতে বড় লজ্জা করে।' আমাদের কথা বড়ঠাকুর শুনতে পেয়ে বললেন, 'না-না, বৌমা।

মোটেই কিনো না। নিজের অবস্থা ডিঙিয়ে কিছু করবে না। বৃথা আড়ম্বর ভালো নয়। তোমার যা থাকবে তাতেই দেবে— সে যেই আসুন না কেন, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। শ্রদ্ধা করে দেওয়াটাই বড় কথা, পাত্র সোনার না মাটির দেখবার দরকার নেই।' শুনে মনে হয়েছিল, সত্যিই তো। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়াটাই বড়। আমি বড়ঠাকুরের আদর্শে চলতে চেষ্টা করতাম। আজও করি। দিদি, দিদির ঠাকুরপো একটু শৌখিন প্রকৃতির ছিলেন। ওঁরা একটু ভালো এবং দামি জামাকাপড় পছন্দ করতেন। ভালো ভালো জিনিস কেনা, লোকজন খাওয়ানো ওদের শখ ছিল। কিন্তু তাই বলে ওঁরা কখনও সামর্থ্যের সীমা লঙ্ঘন করেননি, কারণ বড়ঠাকুরের নীরব উপস্থিতি আমাদের সংসারের সর্বত্র বিরাজিত ছিল। ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউই কখনও কোনো মত প্রকাশ করেননি। আমার স্বামী দাদার সব আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। ওঁকে পিতৃসম ভালোবাসতেন। শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।

৪১

ওঁর অসীম গর্ব ছিল— উনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। আর ছিল দাদার প্রতি প্রাণঢালা ভালোবাসা। একবার টাটানগর থেকে ফিরছেন, ট্রেনে পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সেই ভদ্রলোক খুশি হয়ে তাঁর পাশে পরিচিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ইনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই।' এইভাবে কয়েকবার বলার পর তাঁর নিজের খেয়াল হয়েছে যে উনি একজন ডাক্তার, তখন সেই ভদ্রলোক বললেন, 'আর উনি নিজে একজন প্রথিতযশা ডাক্তারও বটে।' তখন আমার স্বামী হেসে হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'না। আমি শুধু বিভূতিভূষণের ভাই।' সেদিন বাড়ি এসে বলেছিলেন, 'জানো, আজ বেশ মজা হয়েছে।' বলে এই ঘটনাটি বলেছিলেন।

এঁরা দু'ভাই মাঝেমাঝে চাইবাসা যেতেন, কারণ ওখানে মি. সিনহা, সুবোধবাবু ও পরে ওঁর বন্ধু সুরেশবাবু এবং পরিচিত কয়েকজন ছিলেন। ওঁদেরই কাছে এঁরা যেতেন।

সেবার আমি ভাটপাড়ায়, উনি চাইবাসা থেকে বেড়িয়ে বাড়ি এসে আমাকে চিঠি লিখলেন—

কল্যাণীয়াসু

যমুনা, এইমাত্র বৌদির পত্র পেয়েছি। তাতে উনি লিখছেন তোমাকে দুখানা পত্র দিয়ে কোনো উত্তর পান নাই। এবং আরও লিখেছেন বোধ হয় ঠিকানা ভুল হচ্ছে।

তুমি পত্রপাঠ ওকে পত্র দিও। কেন পত্র দিচ্ছ না তাও বুঝতে পাচ্ছি না। তোমার পত্র পেয়ে সেইদিনই আমি তোমাকে পত্র দিয়েছিলাম। আজ প্রায় ১৫ দিন কী তার বেশী হল, তোমার নিকট থেকে কোনো সংবাদ পাইনি। সেজন্য চিন্তিত আছি, শীঘ্র উত্তর দিও।

আমি মধ্যে চাইবাসা গিয়েছিলাম। সিনহাসাহেবের বাড়িতেই ছিলাম, কারণ সুরেশ সেদিন বাইরে কোথায় গিয়েছিল। ওখান থেকে আমরা সেরাইকেলা, রাজস্টেটে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। যোগেনদা, সুবোধদা, ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আরও উকিল, ইত্যাদি। চমৎকার রাস্তা। রাজদরবারে পৌঁছিয়ে ওখানকার উড়িয়া রাজাসাহেব এবং রাজকুমারদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল। পরে রাজাসাহেব আমাদের সকলকে সন্ধ্যাভোজে আপ্যায়িত করলেন। সেখানে আর এক ভারতবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন। নাম শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ, প্রশান্ত আনন, সাদাসিধা বাঙালি ব্রাহ্মণের বেশ। পাঞ্জাবি পরেছেন, একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড়। ওঁর লেকচার খুবই উচ্চাঙ্গের। ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি, শহর বাজার, খাল নদী ইত্যাদি জল কল কেমনভাবে সংস্কার হওয়া আবশ্যক. কলকারখানা যন্ত্রযুগের সময়-উপযোগী, ভারতেরও কী কী আশু উন্নতি উচিত, এইসব বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করলেন। এই তো গেল সেদিন।

হ্যাঁ, আসবার পথে রাত্রি হয়ে গেছে, জ্যোৎস্নাভরা রাত্রি, দূরে একটি অপূর্ব পাহাড়স্তূপ বিরাট। কোন গাছ নেই, উপরটা চমৎকার ঢালু, নীচে থেকে মোটর নিয়ে উপরে ওঠা যায়। যোগেনদারা তার নাম দিয়েছেন 'বিভূতি পাহাড়'। তার নিকটে এসে গাড়ি থামল। খানিকটা পদব্রজে বেড়ানো গেল। পরে রাত্রে চাইবাসা ফিরলাম। পরের দিন লীলা, বেলা অবিনাশবাবুদের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করে গেল। 'ভীষ্মদেবের এক ছাত্র এসেছেন এবং আপনিও, আজ আমাদের বাড়িতে গানের আসর হবে, যোগদান করবেন।' সন্ধ্যায় যাওয়ার কথা, কিন্তু সকালে সুরেশের বাড়ি বেশ করে নিমন্ত্রণ খাওয়া হল এবং সুরেশকে নিয়ে যোগেনদা ইত্যাদি আমরা তাদের বাড়িতে গেলাম। চমৎকার আসর। মঞ্জুশ্রী বলে আর একটি গায়িকা ছিল। বাংলা গাইল। উকিল মোক্তার অন্যান্য ভদ্রলোক মিলে বেশ আসর। তানপুরার যোগাড় ছিল, আমি প্রথমে গাইলাম "বেহাগ"। রাগ শেষ হয়েছে, এমন সময় ভীষ্মদেবের ছাত্র এলেন। আর সেও গাইল 'পিয়া পরদেশে'। সেই ধানেশ্রী রাগ খুবই শক্ত এবং অনেক চমৎকার কাজ দেখালেন। কিন্তু আশ্চর্য, সবাই বল্লে আপনার গলার কাছে ওঁর যেন তেমন জমল না। ঘরটা জমজম করছিল, তা আর ফিরে আসেনি। শুনে তোমার গর্ব হচ্ছে নাকি? 'হে বিজয়ী বীর'। তা ঠিক নয়। ভগবানের নিকট

চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। তাঁর এই দান বহু চক্র-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে না চলতে হলে হয়তো বেশ বড় হতাম, বুঝেছ? তোমায় বলে আনন্দ পাই, তাই জানাচ্ছি। আমার আনন্দের অংশ গ্রহণ করো। তোমার সংবাদ দিও। আমার মিলিটারিতে যাওয়ার এখনও ঠিক নেই। প্রীতি নাও। ইতি—

তোমার

কত তুচ্ছ ঘটনা, তুচ্ছ কথা, হাসি-কান্না, রাগ-অভিমান মনে পড়ছে। একবার কী হল, বর্ষাকালে, আমাদের পায়খানা-বাথরুম গেল ভেঙে, কী মুশকিল। বড়ঠাকুরকে উনি লিখলেন। উত্তরে বড়ঠাকুর লিখলেন, ১০০/১২৫ টাকার মধ্যে পায়খানা বাথরুম ঠিক করে নাও। আর আমার একটা ছোট ঘরের দরকার। তখন কত সস্তা-গণ্ডার বাজার ছিল। বাথরুম ইত্যাদি হল, ছোটঘর হল না। বড়ঠাকুর বলতেন, আমাদের দেশে এসবের দরকার হয় না, সব আগানে-বাগানে যায়। শুনে আমরা হেসেছিলাম। বলে বড়ঠাকুর নিজেও মৃদুমৃদু হেসেছিলেন।

একবার বড়ঠাকুর লিখলেন, 'একটি বামুনের মেয়ে আছে, খুব কাজের। পাঠাব?' উনি বললেন, 'দাদা লিখেছেন। পাঠাতে লিখব? এলে তোমার কাজে সাহায্য করতে পারবে। একলা থাকো, এলে মন্দ হয় না।' আমি বললাম, 'আমার তো সুবিধা হবে। তোমার সুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।' উনি বললেন, 'ওই হল।'

যতদূর মনে পড়ছে সে বছর শীতকাল বড়ঠাকুর 'মাঘীপূর্ণিমা' উপলক্ষে মোড়িঘাটায় গিয়েছিলেন, তারই বর্ণনা দিয়ে ভাইকে চিঠি লিখেছেন। পড়তে পড়তে আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম, 'মনে হচ্ছে আমিও যেন ওঁদের সঙ্গী হয়েছি।' উনি বলেছিলেন, 'এখানেই তো লেখক বিভূতিভূষণের লেখার জাদু।' হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

গোপালনগর স্কুল
সোমবার

কল্যাণবরেষু,

কাল রাত্রি ১১টার সময় মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে মোড়িঘাটা হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া নৌকা করিয়া ফিরিয়াছি। তোমার বৌদিদি, উমা, নগেনখুড়োর বাড়ি মেয়েরা, দেবেন ও খোতন সবাই গিয়াছিল। মোড়িঘাটা ৪ ঘণ্টার পথ। মোল্লাহাটির ঘাট থেকে আরও ২ ঘণ্টার। পথটি বড় সুন্দর। দুধারে উঁচুপাড়ে খারবাপোতা পাঁচপোতা অম্বরপুরের ঘাট, মেয়েরা নাইচে, গাঙশালিকের গর্ত উঁচুপাড়ের গায়ে। মোড়িঘাটা পৌঁছে এপারে এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে ওঠা গেল ও দেবেনের মা, তোমার বৌদি, পিসিমা সবাই

রান্না করলে, খাওয়া-দাওয়া হল। সেখানে একজন লোক আবার তোমায় চেনে। বল্লে, 'গত পুজোর সময় আপনার ভাইকে সলিলবাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় দেখেচি।' দিব্বি করে চখাবালির ঘাটে স্নান করা গেল। ওখানে মেলা বসেচে। তেলেভাজা পাঁপড়ভাজা কদমা মুড়কি পুতুল প্রভৃতির দোকান। লোকে রান্না করে খাচ্চে গাছতলায়। সন্ধ্যার সময় পূর্ণচন্দ্র যখন উঠলো তখন নৌকা ছাড়া গেল। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো। ইছামতীর জলে বন্যেবুড়োর গাছ ও কাশবন জ্যোৎস্নায় অপরূপ হয়ে গেল। বড় শীত লাগলো। সরাইপুরের বাঁক পার হয়ে ৯টার গাড়ি চলে গেলে ১০টার সময় বাড়ি পৌঁছুই।

এখানে সব ভালো। যোগেন সিং চিঠি লিখেচে বেতিয়া থেকে খুব বেড়াচ্চে। থাকলে ধলভূমগড় আসতো। এখানে শিমুলফুল দেখা দিয়েচে গাছে গাছে। আমের মুকুল নেই। বৌমা কেমন আচেন? আমার আশীর্ব্বাদ নিও ও তাকে দিও এবং গুটকেকে দিও। দোলপূর্ণিমায় তোমার বৌদিদি ও উমা যাবে ঠিক হয়েচে। সাধনের ছেলে পাঁচু বোধহয় সঙ্গে যাবে। তুমি কাত্যায়নী স্টলের উমেশ সোমের নামে (উমেশচন্দ্র সোম) একখানা চিঠি দিও— মায়ের নামে উৎসর্গ 'অপরাজিত'-এ নেই কেন এ সংস্করণে। বেশ কড়া চিঠি দিও একখানা। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন খড়্গপুর থেকে মহাদেব রায় এলেন। ইনি বড়ঠাকুরের দারুণ ভক্ত। দিদি-বড়ঠাকুর ঘাটশিলায়। সারাদিন উনি থাকলেন। গল্পগুজব করে রাত্রে চলে গেলেন। উনি প্রায়ই বড়ঠাকুর ও আমার স্বামীকে চিঠি দিতেন। বড়ঠাকুরকে পুরী নিয়ে নিয়েছিলেন। উনি দেশের বাড়িও গিয়েছিলেন একবার। আমার স্বামীর সঙ্গে বড়ঠাকুরের রেডিয়ো বক্তৃতা শুনতে মৌভাণ্ডার গিয়েছিলাম। সেকথাও আজ মনে পড়ছে। মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, কত জন্ম কত মৃত্যুর দুয়ার পার হতে হতে এগিয়ে চলেছি। ভাবলে বিস্মিত হই। এ কী লীলা তব লীলাময়! কোথায় তিনি?

৪২

দিদির বিয়ের পরের বছর বড়ঠাকুর দিদিকে নিয়ে ঘাটশিলা এলেন। সবার জন্যে কাপড়, আমার জন্যে স্পেশাল 'দুই বাড়ি' বই। এই বইটি বড়ঠাকুর আমাকে উৎসর্গ করেছেন। বইটি পেয়ে আমার খুবই আনন্দ। বইটি নিয়ে ওঁকে দেখিয়ে বললাম,

'এবার পুজোয় বড়ঠাকুর আমাকে সব চেয়ে ভালো জিনিস দিয়েছেন।' উনি বইটি উলটেপালটে দেখে বললেন, 'আমাকে তোমার আগেই দেওয়া হয়ে গেছে।' ওঁকে বড়ঠাকুর 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' দিয়েছেন। দিদি তখনও বাকি। দিদিকে 'ইছামতী' দিয়েছিলেন।

প্রতি বছর বড়ঠাকুর দেশ থেকে নলেন গুড়ের পাটালি নিয়ে যেতেন পায়েস খাবার জন্যে। প্রায়দিন পায়েস করতে হত। বাসি পায়েস খেতে খুব ভালোবাসতেন। খেতে খেতে দিদিকে না খাইয়ে তৃপ্তি নেই। আমরা কাছে থাকলে পেতাম। দিদির ঠাকুরপো পায়েস-পিঠে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু বড়ঠাকুরের মতো অতটা নয়। বড়ঠাকুর চালভাজা কাঁঠালবিচি ভাজা পেলে খুশি হয়ে উঠতেন। ওঁর ওসব নয়। ওঁর নিমকি, কচুরি এইসব পছন্দ ছিল। রান্না খাবারদাবার খারাপ হলে সমালোচনা করতেন। বড়ঠাকুরের ওসব ছিল না। যা দাও সোনা হেন মুখ করে খেতেন। হয়তো কোনো কিছু করতে গিয়ে ঠিক তেমনটি হল না, বড়ঠাকুর খেয়ে বলতেন, 'মনে করো এটাও একরকম হয়েছে।' একদিন আমার স্বামীকে হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'বড়ঠাকুর খেতে খেতে দিদিকে দেন, আমাদেরও দেন, কই তোমাকে তো এসব ব্যাপারে দেখি না।' উনি হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, 'ওসব আমার দ্বারা হবে না। আশা কোরো না। ওটা দাদার নিজস্ব ব্যাপার।'

বড়ঠাকুরের কিছু কিছু শিশুসুলভ আচরণ ছিল, তার মধ্যে এটা একটা। আমরা এইসব নিয়ে আনন্দ করতাম, হাসাহাসি করতাম। বড়ঠাকুর বুঝতেন আর মৃদুমৃদু হাসতেন। প্রথম ঘাটশিলা আসার পর বড়ঠাকুর বলেছিলেন. 'রোজকার রোজ হিসাব লিখবে।'

তখন থেকে হিসাব লিখতাম। বড়ঠাকুর খুশিমতো দৈবাৎ এক-একদিন দেখতে চাইতেন। বেশি খরচের জন্য বকুনিও খেতে হয়েছে। আর আমার স্বামীকে যদি বলেছি, 'একটু হিসাবের খাতাটা দেখ না। এমাসে একটু বেশি খরচ হয়ে গেছে—' শুনে বলতেন, 'ওসব আমার দ্বারা হবে না, যা খুশি করো। ওসব দাদাকে দেখাবে।'

একদিন একটু রাত্রি করে বাড়ি ফিরেছেন, জামা খুলতে খুলতে বললেন, 'আজ সুরেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে এত রাত্রি হয়ে গেল যে খেয়ালই ছিল না। দুজনেই গল্পে জমে গিয়েছিলাম।' শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়িতে একলা ওঁর পথ চেয়ে বসে আছি, আর উনি কিনা বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে এত রাত্রে বাড়ি এলেন। বাড়ির কথা খেয়ালই ছিল না, কাজ থাকে আলাদা কথা। মনের মধ্যে একটা অভিমান চাড়া দিয়ে উঠল। এখানে আমারও তো কেউ নেই, আমিও তো নির্বান্ধব। গম্ভীর হয়ে আছি, কোনো কথার উত্তর দিচ্ছি না। কিছুক্ষণ পরে ওঁর খেয়াল হয়েছে

আমি চুপ করে আছি। আমাকে ডেকে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? চুপ করে আছো কেন?' আমি বললাম, 'কই, না তো। অনেকক্ষণ গল্প করেছি তাই একটু চুপ করে আছি।' শুনে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হো হো করে হেসে বললেন, 'আজকাল বেশ কথা বলতে শিখেছ তো দেখছি। আজ তোমার সঙ্গেও অনেকক্ষণ গল্প করব। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নাও, একটা ভালো গল্প বলব।' সেদিন মোপাসাঁর 'মুখোশ' গল্পটা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আমায় বলেছিলেন।

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা। এ সবই কি মিথ্যা! কিন্তু তখন কত সত্য ছিল, ভাবলে সব গোলমাল হয়ে যায়।

৪৩

প্রথম ঘাটশিলা যাওয়ার পর অনেক দিনে ভাটপাড়ায় আসা হয়নি। বাবা চিঠি লেখেন, ওবাড়ির মা চিঠি দেন, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। একবার বড়ঠাকুর ভাইকে লিখলেন, 'তোমার বৌদি ভাটপাড়ায় গিয়ে বৌমাদের বাড়ি গিয়েছিল, বৌমার মা দুঃখ করেছেন দুবছর মেয়েকে দেখেননি।' ইত্যাদি।

সেকথা চিঠিতে লিখেছেন বড়ঠাকুর—

ব্যারাকপুর

কল্যাণবরেষু,

সেদিন ট্রেনটা যখন হাওড়া এলো তখনও ভালো করে ফর্সা হয়নি, আলো জ্বলছে স্টেশনে। নেমেই সুরেশ মজুমদারের বাসায়। তিনি চা-খাবার খাওয়ালেন। সারান্ডা ভ্রমণের গল্প দোলসংখ্যা 'আনন্দবাজারে' চাইলেন। ১০০ টাকা দেবেন বল্লেন। সুতরাং ভ্রমণে খরচ করলে দেখছি উঠে আসে তার তিনগুণ। অতএব ভ্রমণ করে বেড়ানো মন্দ নয়। তোমার বৌদিদি ও নুকুকে নিয়ে পরদিন সকালে ব্যারাকপুর থেকে ভাটপাড়ায় গিয়েছিলাম। সবাই খুব খুশি। ওরা আমার ছোট মামীমা ও মাসীমার সঙ্গে নারাণদের বাড়ি গিয়েছিল। বৌমার মা দুঃখ করেছেন দু'বছর মেয়েকে দেখেননি, তোমার বৌদি বলেচে, আমি এবার নিজে নিয়ে আসবো।

কিন্তু ওখান থেকে গিয়ে ব্যারাকপুরে সেই রাত্রে তোমার বৌদিদির খুব জ্বর হল। আমি আর উমা চলে এসেচি এখানে, ওকে আনা সম্ভব হল না। এখানে দেখবে কে? ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই, দেখার লোক নেই। গ্রামের ও পাড়ার সব লোক জিগ্যেস করছে, বড় বৌমা কেন এল না? না আসায় সবাই খুব দুঃখিত। তুমি ও বৌমা ব্যারাকপুরে চিঠি দিও, মানে ঐ ব্যারাকপুরে।

গুটকে যখন আসবে তখন আমার জুতোজোড়া অবিশ্যি তার হাতে পাঠিয়ে দিও। ব্যারাকপুরে চিঠি দিয়ে তোমার বৌদিদির খবর নিও, বৌমাকেও দিতে বলো।

এখানে বড় শীত। একটা বাঘ মেরেচে কুটির মাঠ থেকে। আরও দুটো আছে। কাল যুগলকাকার ভিটের পিছনে ফেউ ডেকেছিল। শান্তকে বোলো চালকী থেকে তক্তাপোষ দিয়ে গিয়েচে। সরস্বতী পুজোয় যেতে চেষ্টা করবো। তবে ২৪শে জানুয়ারী শনিবার যশোর সাহিত্য সঙ্ঘে মাইকেলের জন্মোৎসব, আমি ও তারাশঙ্কর দুজনে যাচ্চি। শনিবার থেকে ছুটি আরম্ভ। শনিবার তো যশোরেই কাটলো। তবে কী হয় দেখি। আর সব ভালো। আমার আশীর্ব্বাদ নিও। বৌমাকে শান্তকে ও গুটকেকে, তুমি নিও। শরৎ পাল ওখানে আছেন? নমস্কার দিও। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ঠাকুরের চিঠির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাবার চিঠি এল— 'একবার তোমরা এসো।' মন কেমন করে, অথচ উনি একলা থাকবেন। উমা ছেলেমানুষ, ওর শরীরও ভালো নয়। যাই হোক, একবার বাবা আমাকে নিতে আসবেন লিখলেন। আমি ওঁকে বললাম, 'কয়েকটা দিনের জন্য ঘুরে আসি।' ওঁর ইচ্ছা নয়, আমার আগ্রহ দেখে বললেন, 'যাও।'

এসে চিঠি লিখলাম, উত্তর নেই। পরের চিঠির উত্তর এল—

ঘাটশিলা

সোমবার রাত্রি ১০টা

কল্যাণীয়াসু

মীনা, তোমার পরপর লেখা দুখানা লিপিই পেয়েছি। বেশ আনন্দ পেলাম তোমার যাত্রাপর্বের কাব্যটুকুর প্রকাশভঙ্গিতে। ভগবানের নিকট সর্বদাই প্রার্থনা জানাই তোমার শিক্ষা এবং সকল সাধনাই সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করুক। তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হয়েছে, কিছু মনে করো না। এদেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাষাণস্তূপের মতোই আমি দিনদিন অচলায়তন স্থবির হতে চলেছি। তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। নিরুৎসাহী জড়ের সমান। কেন? প্রশ্নের উত্তর নেই। চিন্তাশক্তিও কেমন মরচে ধরে গেছে। হয়তো দেশের গুণ, নয়তো অন্যকিছু। ঠিক, ঐ কারণে ও বহুদূরান্তরে তোমার নিকট-আত্মীয়দের সমীপে পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্যটুকু বিস্মৃত হয়েছিলাম। তবে তুমি যদি আমায় বিশ্বাস করো তা হলে সত্যিই বলছি এর ভিতর কোনো দুরভিসন্ধি আমার মনে ছিল না। তোমার প্রিয়জনের গৃহ যে তোমার নিপুণ হস্তের মাধুর্যে প্রাণবন্ত হয়েছে তা কি সে জানে না! তাই বলে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাকে সে ভুলবে তাও সে বোঝে,

তবুও সে তার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি একটু একটু করে হারিয়ে ফেলেছে। কী যে কোন্ অভিশাপে তা তো সে নিজেই জানে না। মনে হয় একটু একটু করে পাষাণ হয়ে যাবে সবটুকু। সোনার বাংলা ছেড়ে এই রুক্ষ কঠিন প্রস্তরাস্তীর্ণ দেশের পাষাণস্তূপের সঙ্গে একটু একটু করে পাষাণে পরিবর্তিত হবে। দেবযান-লোকের বিরাট দ্যুতির স্পর্শ পেয়ে তখন হয়তো আবার নতুন করে পুনরায় কর্মঠ জীবন সুরু হবে আমাদের। তোমার আনন্দ বেদনার আশ্রমেই বেশ সুখে আছি। তুমি মোটেই চিন্তিত হবে না। যে কটা দিন পারো শৈশবের বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণভরে মিশে নাও। এক একবার মনে হচ্ছে এই রুক্ষ আবহাওয়া পরিত্যাগ করে কোথাও পালিয়ে যাই। মা রঙ্কিনীর এই বেড়াজাল ছিন্ন করে যায়, কার সাধ্য। তোমার কোথাও গিয়ে বেশীদিন থাকতে হবে না। আমি শীঘ্রই যাচ্ছি, নিয়ে আসব। চিন্তিত হয়ে উঠবে না। শান্তিলতা চলে গেছেন। উমা সব করছে। সংসার থেকে দূরে গেলেই শান্তি পেতাম। আমার আশীষ গ্রহণ কর। প্রীতি নাও। ইতি

তোমার প্রিয়জন

অভিমান-ভরা চিঠি। ঘাটশিলায় থাকার ওঁর একটুও ইচ্ছা ছিল না। অথচ পরিস্থিতির চাপে থাকতে হয়েছে। সত্যিই মা রঙ্কিনীর বেড়াজালে উনি অনিচ্ছায়ও জড়িয়ে পড়েছিলেন। ছিন্ন করতে পারেননি। চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পথ পাননি। এখন মনে হয় তখন কেন ওঁকে অন্য কোথাও নিয়ে আসিনি। তা হলে ওঁর জীবনের পরিণতি বোধ হয় অন্যরকম হত। কিন্তু আমার কতটুকু শক্তি। শুধু চোখের জলই যে আমার সম্বল।

দাদাকে ছেড়ে থাকা ওঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। প্রায়ই বলতেন, 'কলকাতায় দাদা আর আমি, কত সুন্দর সে দিনগুলো ছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সেই দিনগুলো যদি ফিরে পেতাম।' বলতেন, 'আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস নেই, তবু যে ক'পাতা লেখা আছে পড়ে দেখো।'

ডাক্তারি-পড়া, গান ও দাদা— ব্যস, এ-জায়গাটাতে উনি শিশুর মতো ছিলেন। ছোটতে মা, বাবা, দিদি সবাইকে হারিয়েছেন। দাদা ছিলেন ওঁর জীবনের একমাত্র নির্ভরস্থল ও ভালোবাসার স্থান। এখানে দিনলিপির কয়েকটি পাতা লিখছি—

১২. ৮. ৩৮

প্রায় ৬টার সময় গড়পারে বিভূতিদার বাসায় যাওয়া গেল। বিভূতিদাকে ডেকে তোলা হলো। উঠেই বল্লেন, 'শেখো গান।' ওঁর কাছে ভৈরোঁ রাগের বাকি অর্দ্ধেক শিখে আর রাগের বিস্তার পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বই থেকে লিখে নিলাম। বৌদি চা-

খাবার এনে দিলেন। আবার নটার সময় বললেন, 'আজ বৃষ্টির দিন, খিচুড়ি খেয়ে যান।' আজ ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। তবে খুব অল্প অল্প করে। রাত্রি ১১টা থেকে বেশ মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। আকাশের বুক চৌচির করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দাদা লেখা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। মেঘের গর্জনও বেশ। ''গরজে গরজে বরিষণে আই মে হারোয়া। বরষণ লাগিরে বুঁদরিয়া।''

১৩.৮.৩৮

রাত্রের বৃষ্টি আর থামতে চায় না। সকালেও ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টি চলছে। উঠতে একটু দেরী হল, নীচের ঘরে বাসে নিয়মিত একটু ভৈরোঁ রাগ আলাপ করা গেল। ভাত-খণ্ডের বই থেকে রাগ বিস্তার তুলে এনেছি। প্রাণের মিল আনতে পারলাম না। একটু নির্জন না হলে সুরসাধনা চলে না। কিন্তু উপায় কই? জীবনের সবকটা দিনই তো এমনি কাটছে। যাক, যতটুকু পাওয়া যায়। ভৈরোঁতে সুরবিস্তারের সঙ্গে কোমল ঋখাব আর ধৈবত পৌঁছলে আপনি প্রাণে একটি চমক এনে দেয়, সব ভুলে যেতে হয়। আমার ধন ঐশ্বর্য. মটরগাড়ী, নামের লোভ এবং সভাসমিতি, বা সংবাদপত্রের খ্যাতি-অর্জন সব তুচ্ছ। এরা কতদিনের? সঙ্গের তো সাথী নয়? প্রাণের এমন নির্মল আনন্দ আর কিছুতে কি পাওয়া যায়? সুরসাধনের সঙ্গে মনে হয় বিশ্বসৃষ্টির পুঞ্জপুঞ্জ আনন্দধারা যেন আমায় পরিবেষ্টিত করেছে। কোথায় আমার ইহকাল, কোথায় আমার পরকাল? এই কি জীবন?... জীবনের বাকি মুহূর্তগুলি যদি এমনি সুরের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, শুধুই গান গেয়ে যাই। প্রতিদিন সুরকে পাওয়া যায় না। কত আরাধনা করা যায়, আসে না। কোথা হতে কেমন করে কণ্ঠের সুর বিকৃত হয়ে গেল, সেদিন কিছুই ভালো লাগে না।

ডাক্তারি ভালো লাগছে না। মানুষের কতটুকু উপকার করা যায়? বাস্তবিক, প্রাণ দেনেওয়ালা যে, তার যদি সে প্রাণকে নেবার মতলব হয়, তবে সব ব্যর্থ হয়ে গেল। হাসপাতালে নিয়মিত গিয়েছিলাম। মাইক্রোসকোপে কিছুক্ষণ ধরে রক্তের ভিতরকার অনেক কিছু দেখা গেল। এতে লাভ কী? বুঝি না... আমার শেষের দিনগুলো কেমন কাটবে তা এখনও ভেবে পাচ্ছি না। রাত্রি এখন সাড়ে বারোটা। ঘুম আসছে। দাদা অনেক আগে শুয়েছেন বারান্দায়।

১৬. ৮. ৩৮

লাহাবাবুদের বাড়ি দেখি বলাইবাবু আর সরোজ বসে আছে। শৈলেনকে আশা করেছিলাম, দেখি নেই ওখানে। বলাইবাবু গাইতে বল্লে। জৌনপুরী আর ভৈরবী

গাইলাম। ফিরে এসে মণি বর্ধনের ওখানে গেলাম। ওখান থেকে ফিরে বহুক্ষণ বারান্দায় চুপ করে বসেছিলাম। বাবার লেখা পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের সংক্ষিপ্ত ডায়েরী পড়লাম। ভারী চমৎকার লেখা। এতে বাবার উৎসাহপূর্ণ আর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা পড়লাম। সাহিত্য আর গান এ আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আজ সুষর কাকার বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওখানে চাটুয্যেমশায়ের বলা 'চালকীর' দুটো ভৌতিক ঘটনা বল্লাম। সুষর কাকা, শিবু বারাকপুরের গল্প করছিল। আমাদের পোড়োভিটের পিছনকার সেই mysterious তেঁতুলগাছটা, আশপাশের বহু ইতিহাসযুক্ত বাঁশঝাড়গুলো, শিবুদের মড়মড়ের আমগাছ। বিহারী গয়লা ও আখলে গয়লার কথা। গিরীনদার বাড়ির ওখানে তার ভিটে ছিল। খুব জোয়ান, ভাল ঘরামির কাজ করতে পারতো, আর রাত্রে বহু স্থানে ডাকাতিও তখন নাকি করেছে। এইসব নাম পৃথিবী থেকে এখন একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। আর কেউ ডাকাতি করতে আমাদের গাঁয়ে আর ফিরে আসবে না। দাদার এইমাত্র খাওয়া হল। সামনে পুজো, উনি খুব গল্প লিখছেন।

১৮. ৮. ৩৮

এইমাত্র বিভূতিদার বাড়ি থেকে আসছি। রাত্রি অনেক হয়েছে। ১২টা। ওঁর কাছে গান শিখলাম, ওঁর গান শোনাও গেল। আজ সকালে মতিলালের কাছেও গিয়েছিলাম। ওখানেও অনেকগুলো সকালের সুর শোনা গেল, রামকেলি "মায় বনকে চিড়িয়া", বিলাবল, মধুমাধব, সারংভৈরবী ইত্যাদি। সঙ্গীতের মতো এত মধুর জগতে আর কিছুই নেই। মোটর সোফার চাপে এসব জিনিস লুপ্ত হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত ঘরেও এর দেখা কম পাওয়া যায়। সত্যই যে সর্বহারা সেই এ অমূল্য রত্ন লাভ করেছে। আমাদের অবস্থা between the two horns। কেমন করে ছাড়ি।

গড়পারের বৌদি গরম মাছভাজা আর ভাত দিলেন। গান গেয়ে খেয়ে বেরুতে দেরি হল। সন্ধ্যায় Curzon Park-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। বারীনের সঙ্গে engagement ছিল।

১৯. ৮. ৩৮

দাদা লিখছেন। আজ জন্মাষ্টমী। সকালে দাদা বেরুলেন। আমি হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম।

এমনি ও আর কত কী। পাতার পর পাতা লিখেছেন। তখন উনি ব্যস্ত ছিলেন আনন্দের চয়নে আর চেনা-জানার অন্বেষণে। দুই ভাই একই মেসে আছেন। যে

যেখানেই যান বা যাই করুন, দিনান্তে একবার দেখা হবেই। সেটাই ছিল ওঁদের অভ্যাস আর আনন্দের উৎস। কর্মজীবনে দুজনে দু-দিকে ছিলেন। দেখা হত মাসান্তে অথবা তারও একটু পরে। তাতে আমার স্বামীর মন ভরত না। এক জায়গায় থাকা হচ্ছে না এই বেদনা বহুবার বলতে শুনেছি। 'দাদা রইলেন দেশে, আমি রইলাম এখানে, একটুও ভালো লাগছে না।' বড়ঠাকুরও বেশিদিন ভাইকে না দেখে থাকতে পারতেন না। আমরা অর্থাৎ বৌরা যেখানেই থাকি না কেন, উনি ঠিক সময়মতো এসে ভাইকে দেখে যাবেন। উনি জানতেন নুটুর যাওয়ার সময় হবে না, তা ছাড়া সপ্তাহে একটা করে চিঠি বড়ঠাকুরের আসবেই— সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদ দিয়ে। ভাইকে লেখা ওঁর এত চিঠি ভাবাই যায় না। যা পাওয়া গেছে তার চেয়ে বহুসংখ্যক চিঠি হারিয়ে গেছে। সেগুলি থাকলে অনেক কিছু এখন জানা যেত।

৪৪

একবার বড়ঠাকুরের সঙ্গে ভাটপাড়ায় এলাম। উনি চলে গেলেন দেশে। বলে গেলেন, 'পরে এসে তোমায় নিয়ে যাব।' এলেন বটে, কিন্তু নিয়ে গেলেন না, কারণ তখন ওখানে খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে। ভাইকে লিখলেন, 'বৌমাকে আনা গেল না। ম্যালেরিয়াব ভয়ে।'

একবার ঘাটশিলায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার স্বামী দাদাকে জানিয়েছেন, বড়ঠাকুর ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছেন, 'তুমি ঐ টাকার জন্যে ভেবো না। আমি দেবো।' যেন ছোট ছেলেকে ভোলাচ্ছেন। ওই সময় দিদির খুব অসুখ, বড়ঠাকুর লিখেছেন—

মঙ্গলবার

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেয়ে সব অবগত হয়েছি। ও ৭০ টাকার জন্যে ভেবো না, আমি তোমায় দেবো। ছেলেটা হতভাগা, ওকে আর বাড়িতে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যেখানে যায় যাকগে, চালকীতে এখনও আসেনি। এদিকে তোমার বৌদিকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়েছি। আজ ৭/৮ দিন জ্বর। ১০২-আড়াই ওঠে, ১০০ নামে। সুরেন দেখছে। রেমিটেন্ট জ্বর বলে। পেটব্যথা, মাথার যন্ত্রণা। উমা একা ছেলেমানুষ, সব করে। বড় বিব্রত হয়েছি। দুভার্বনা খুব। সারারাত্রি ঘুমুতে পারে না। জ্বর মোটে ছাড়ে না। সুরেন দেখছে এই ভরসা।

যা হয় পরে খবর দেবো। শান্তর জন্য ভেবো না, টাকা আমি দেবো, তবে ওকে স্থান দিও না আর। চালকী এসে থাকুক।

তুমি বৌমা আশীর্ব্বাদ নিও। মনে যথেষ্ট উদ্বেগ। পয়সাও ব্যয় হইতেছে বেশ। এক একখানা প্রেসক্রিপশানের দাম দেড় টাকা, দু টাকা। তার ওপরে ফল পথ্যাদি আছে। পরে চিঠি দেবো। ইতি—

আঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদার চিঠি পেয়ে আমার স্বামী তার করলেন। জানালেন, 'আমরা যাচ্ছি। বৌদি কেমন থাকেন জানাবেন।' তার পেয়েই বড়ঠাকুর লিখলেন—

নুটু,

তার পেয়েছি। তোমার বৌদিদির জ্বর ১০০ ডিগ্রিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ কদিন সেটুকু যাচ্ছে না। দুর্বল হয়ে পড়েছে, বমির ভাবও আছে। সুরেন বলেছে কোনো ভয় নেই, এমন কী ঝোল খেতেও দিয়েছে। রাত্রে জ্বর বাড়ে, আমি বেশ বুঝতে পারি। এখন তোমাদের আসার দরকার নেই। আবশ্যক হলে তার করবো। এদিকে আনন্দবাজার পূজাসংখ্যায় উপন্যাস চেয়েচে। কিন্তু এ অবস্থায় তাও লিখতে পাচ্ছি নে। এদিকে খুব বৃষ্টি হয়নি। গরম খুব। কুশল লিখো। ছোটমামাকে পত্র দিয়েচি। তুমি ও বৌমা আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

আঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ঠাকুরের চিঠি পেয়ে ওঁর তো রাগ হল বড়ঠাকুর যেতে বারণ করেছেন বলে। চিঠির উত্তর দিচ্ছেন না, গম্ভীর হয়ে আছেন। আমি বললাম, 'গম্ভীর হয়ে থাকলেই চলবে? দিদি কেমন রইল খবর নাও।' তারপর দাদাকে লিখলেন। সেবার দিদি আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠল।

একদিন রান্নাঘরের পিছন দিকে আতাতলায় বসে উল বুনছি, দেখি উনি সাইকেল নিয়ে আসছেন। সাইকেল রেখে আমার কাছে এসে বললেন, 'বেশ করেছ তো এই জায়গাটা। বেশ ছায়া আছে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।' আমি বললাম, 'তুমি একটু বোসো না এখানে। বড়ঠাকুর এখানে এসে বসেন, তামাক খান।' উনি বললেন, 'দাদা বাড়ি থাকেন, সময় পান, আমার সময় কোথায় বলো তো?'

আমি চৌপাইটা দিলাম। একটু বসে উঠে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথাও যাবে নাকি?' বললেন, 'তোমার রান্না হয়ে গেছে? আজ একবার টাটায় যাব।'

তাড়াতাড়ি করে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। এলেন সেই রাত্রে। রুগি নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

ওঁর সময় ছিল বড় অল্প। বেড়াতে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু হয়ে ওঠে না। বড়ঠাকুর ভাইকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেন, বেচারি মনে কষ্ট পায়, কোথাও যাওয়া হয় না। একবার বেশ মজা হয়েছিল। উনি তখন ধলভূমগড়ে, বড়ঠাকুর কটক যাচ্ছেন। ভাইকে খড়্গপুরে এসে দেখা করতে লিখেছেন এবং ভাইকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য মজার প্রস্তাব দিয়েছেন। আরও লিখেছেন, 'আমি উদয়পুরে গেলে তুমি গিয়ে দেখে আসবে।' যেন কত ছোটভাই, ভোলাচ্ছেন। আমার নামগন্ধও নেই। উনি হেসে বলেছিলেন, 'ঈর্ষা কোরো না। ওইটুকু আমার সম্বল। তোমাকেও দাদা খুব স্নেহ করেন।'

৪. ৩. ৪৬

নুটু,

এই পত্র পেয়ে শুক্রবার ছুটি নিয়ে খড়্গপুরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? শুক্রবার নাগপুর প্যাসেঞ্জারে এলে খড়্গপুরে বেলা ১২টায় এসে পৌঁছবে। মহাদেববাবুর ওখানে যেও। রাত আটটায় মাদ্রাজ মেলে। আমার সঙ্গে দেখা করে তুমি রাঁচিতে ফিরতে পারবে। আমি গজেন, সুমথ গৌরীশঙ্কর, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রভৃতি এক বন্ধুর ভায়েব বিয়েতে যাচ্ছি কটক। শনিবার রাত্রে বিবাহ। ওখান থেকে রবিবার আমি পুরী যাবো। একদিনের জন্যে। রবিবার রাত্রে পুরী এক্সপ্রেসে ফিরব। আর যদি ৪ দিনের ছুটি নিয়ে আসতে পারো তবে পুরী বেড়িয়ে আসতে পারো এই সুযোগে। তবে তা হলে তুমি বলবে যে, আমি একলাই পুরী যাচ্ছি। তোমাকে আমি যেন ওদের বলে কয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। রবিবার রাত্রে এমনি ভাব দেখাতে হবে। মোট ২০ টাকা লাগবে খরচ। মিঃ সিংহ মেটাবুরু যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁকে এই পত্র দেখিও, ৭ই যাবেন লিখেছেন। আমি এই বিবাহের জন্য যেতে পারলুম না।

আমি উদয়পুর (রাজপুতানা) চাকুরী পেয়েছি। ১৫০ মাইনে। ১০/১২ দিনের মধ্যে রওনা হতে পারি। তোমার বৌদিকে নিয়ে যাবো। তবে বেশিদিন সেখানে না থাকি, একবার বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা আছে। তারা ভাড়া দেবে join করার। যদি সেখানে বাসা হয়, তবে তুমি গিয়ে দেখে আসবে। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার তোমার ছুটি নিতে হবে। যদি পারো এসো। যদি পুরী না যেতে পারো, শুধু শুক্রবার দেখা করে রাঁচি এক্সপ্রেসে ফিরে যেতে পারো। শুক্রবার নাগপুর প্যাসেঞ্জারে খড়্গপুর আসতে হবে। রাত ৮টা বা সাড়ে ৭টায় মাদ্রাজ মেল। আমরা ইন্টারক্লাস কামরায় থাকবো। উদয়পুর যদি যাই তবে কুচবিহার সাহিত্য সম্মেলনে

যাওয়া হবে না। গুটকে নিশ্চয়ই ওখানে পৌঁছেচে। তুমি, বৌমা, উমা, গুটকে আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গদাধর পাঁড়ে ইসমাইলপুর কাছারি থেকে তোমাকে পত্র দিয়েচে। কিন্তু সে পত্র এখানকার ঠিকানায় দিয়েচে। তাকে একখানা পত্র দিও। ঠিকানা—Ismailpur Katchery, Suktia P. O., Dist Bhagalpur.

৪৫

মনে পড়ে কোলাঘাটেই মুকুলবাবুর সঙ্গে বড়ঠাকুরের পরিচয়। মুকুলবাবুর বাড়ি ছিল কোলাঘাট। উনি প্রথমে রেঙ্গুনে ছিলেন, ব্যবসা করতেন। পরে ওখান থেকে চলে এসে কোলাঘাটে চালের ব্যবসা করেন। সেখানেও সুবিধা হয়নি। ঘাটশিলায় আসেন রুজি-রোজগারের আশায়। বড়ঠাকুর ওঁকে বলেছিলেন, 'আপনি কাঠের ব্যবসা করুন।' উনি তাতেই প্রচুর উন্নতি করেছিলেন। বিয়ে করলেন। আজও মনে পড়ে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলেন। বৌ-এর নাম চামেলি। পরে ওঁর ভাই ফণী, বোন ছায়া এবং ভগ্নীপতি শৈলেনবাবু সকলে ঘাটশিলায় এলেন। কিছুদিন পরে ওঁরা বাড়ি করে স্থায়ীভাবে ঘাটশিলায় বসবাস করেন। ওঁদের সঙ্গে আমাদের খুবই মেলামেশা ছিল। বড়ঠাকুরকে ওঁরা 'দাদা' বলতেন আর আমার স্বামীকে নুটুদা, কখনও বা ডাক্তারবাবু। উনি ওঁদের বাড়ির চিকিৎসক ছিলেন। মুকুলবাবুর ট্রাকে বড়ঠাকুর কতবার জঙ্গল বেড়াতে গেছেন। খুব সকালে বেরুতেন। তারপর ওঁরা কাঠ সংগ্রহ করে যখন গাড়ি ভর্তি করে কাঠ নিয়ে ফিরতেন তখন বড়ঠাকুর বাড়ি আসতেন।

একদিন মুকুলবাবুরা কাঠের গাড়ি নিয়ে ফিরছেন, দেখেন হরিণধূপড়ির রাস্তার ওপর একটা সাইকেল, তাতে একটা ব্যাগ ঝোলানো, চালক নেই। মুকুলবাবু ট্রাক থেকে নেমে দেখেন সাইকেলটা নুটুদার, কারণ ডাক্তারি ব্যাগটা মুকুলবাবুর চেনা। উনি এদিকওদিক একটু ঘুরে দেখেন নদীর ধারে নুটুদা বসে আছেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কাছে গিয়ে মুকুলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'নুটুদা, আপনি ওখানে সাইকেল তার সঙ্গে ব্যাগ রেখে এখানে এসেছেন, কী ব্যাপার বলুন তো! কী করছেন এখানে?' আমার স্বামী বলেছিলেন, 'সূর্যাস্ত দেখছিলাম। দেখুন কী সুন্দর দেখাচ্ছে পশ্চিম আকাশটা।' তারপর দুজনে গল্প করতে করতে ফিরে আসেন। মুকুলবাবু ওঁকে রেঙ্গুন থেকে আনা একটি সুন্দর সিগারেট কেস দিয়েছিলেন।

উনি বলতেন, 'প্রকৃতিকে ভালোবাসা আমাদের বংশের ধারা।' ওঁর প্রকৃতির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। কতদিন দেখেছি গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বাঁ হাতের ওপর থুতনি রেখে খোলা জানালা দিয়ে অদূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। খুব রৌদ্রে উত্তপ্ত দমকা বাতাসে শুকনো শালপাতা যখন চারিদিকে উড়তে উড়তে এসে একজায়গায় ঘূর্ণির সৃষ্টি করে লম্বা হয়ে ওপরের দিকে উঠত তাই দেখতে দেখতে আমাকে ডেকে বলতেন, 'শিগগির এসো। কী সুন্দর ঘূর্ণি হয়েছে দেখে যাও।' গ্রীষ্মের অন্ধকার রাত্রে দূরের পাহাড়-শ্রেণির বুকে যখন আগুনের মালা দেখা যেত, বলতেন, 'বিশ্বদেবতার গলায় যেন আলোর মালা, প্রাণভরে দেখে নাও।' যখন শ্যামঘন শালমহুয়ার অরণ্যে বর্ষা নামত, চারিদিক প্লাবিত হয়ে যেত বৃষ্টির ধারায়, উনি বারান্দায় বসে চুপ করে দেখতেন।

আজও মনে পড়ে সেদিন খুব শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, বড় বড় শিল, চড়বড় করে পড়তে আরম্ভ করল, আর তার সঙ্গে শুভ্র শিলায় ঢেকে গেল আমাদের উঠোন, মাঠঘাট। তাই দেখে আমাদের কী আনন্দ! দুজন শিল কুড়োলাম। তারপর বৃষ্টি থামলে শিল মাড়িয়ে মাড়িয়ে শালবনের মধ্য দিয়ে সুবর্ণরেখার ধার পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা। বাংলাদেশের শিলাবৃষ্টি দেখি কিন্তু ঘাটশিলার শিলাবৃষ্টির তুলনায় যেন কিছুই নয়।

শরৎকাল ছিল আমাদের মৌসুমির সময়। দিদি-বড়ঠাকুর আসতেন, আসতেন আরও অনেকে। হেমন্তের বিষণ্ণতা কোথা দিয়ে যে কেটে যেত। ঘুরে ঘুরে আসত ২১শে অগ্রহায়ণ। আমাদের বিবাহের দিন। বাইরের কোনো আড়ম্বর উৎসব দিয়ে তাকে আমরা কখনও স্মরণীয় করিনি, সেদিনটি ছিল একান্ত আমাদের দুজনের। শীত আসত তার কম্পন নিয়ে। বসন্তে বনে বনে লেগে যেত উৎসব। শাল পিয়াল ও মহুয়ার শাখায় শাখায় কচিপাতার আগমন। গাছে গাছে নবমঞ্জরীর শোভা, মহুয়ার মাতাল-করা গন্ধ আর কুরচির সুবাস আমরা উপভোগ করতাম।

এখানে বৃষ্টি যখন হয় তখন তার সঙ্গে মেঘগর্জন বিদ্যুতের চমক আর ঘনঘন বজ্রপাত দেখে প্রথম থেকেই আমার ভয় ধরে গিয়েছিল। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখানে এত বাজ পড়ে কেন গো?' বলেছিলেন, 'এখানে পাহাড়, নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে, তাই বোধ হয় বজ্রপাত বেশি হয়। তোমার অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' উনি যাই বলুন, আমি তো মেঘের ডাক শুনেই চৌকির ওপর উঠে বসতাম। শুনেছি কাঠে বিদ্যুৎ স্পর্শ করতে পারে না।

একদিন কী হল, তখন গজেনবাবুদের বাড়ি কেনা হয়েছে, ওঁরা আসা-যাওয়া করছেন। আমাদের বাড়িতে ওঁরা সবাই আসছেন। গল্প, বেড়ানো খুবই চলছে।

সেবার মণীশ (ঘচু), রমু, বোধ হয় ভানুও ছিল। ওরা তখন ছেলেমানুষ। ঘাটশিলায় এলেই আমাদের বাড়ি এসে গল্প করত। হাসি গল্প খুব হত। ওরা কলকাতার ছেলে, অল্প বয়স, ওদের স্টকে তখন অনেক গল্প। একদিন বিকেলে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে, তারপর কালো মেঘে আকাশ অন্ধকার করে এল বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জন আর বিদ্যুতের চমক। ওরা ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের বাড়ি ঢুকেছে। আমি আগে থেকেই চৌকির ওপর উঠে বসে আছি। ওরাও দেখি লাফিয়ে লাফিয়ে তক্তাপোশের ওপর উঠে পড়েছে। তারপর আমাদের সে কী হাসি! উনি ছিলেন পাশের ঘরে। আমাদের হাসি শুনে এঘরে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমাদের অত হাসি কীসের?' মণীশ বললে, 'ছোটবৌদির ভয় দেখে আমরা হাসছি।' উনি হেসে ফেলে বলেছিলেন, 'আর তোমরা খুব সাহসী? মেঘের ডাক শুনে সবাই ভয়ে জড়সড়।'

ওঁর কিন্তু মেঘের গর্জনকে ভয় ছিল না। এক-একদিন আমাকে জোর করে বাইরের বারান্দায় নিয়ে যেতেন। দেখতাম যেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অমনি উনি চোখটা বুজিয়ে ফেলছেন। তখন আমি বলতাম, 'ও, তুমিও তা হলে চোখ বোজাচ্ছ?' তখন হাসতেন। বড়ঠাকুরও ভয় পেতেন না।

প্রতিমাদিরা এলে খুব ভালো লাগত। প্রতিমাদি গজেনবাবুর স্ত্রী, মৃদুলা সুমথবাবুর সহধর্মিণী। সবাই একসঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বেরুতাম। বড়ঠাকুরকে ওঁরা বড়দা বলতেন, আমার স্বামীকে নুটুদা। বড়ঠাকুর-দিদি থাকলে দু'বাড়িতে হইহই-এর মাত্রা বেড়ে যেত। ওরা সকালে বড়ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। সকালে আমাদের বিশেষ সময় হত না। গজেনবাবু মিশুকে মানুষ, মজার মজার কথা বলতেন। সুমথবাবু শান্ত মানুষ, তবুও সব গল্পে যোগ দিতেন। একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি, উঠল ঝড়। সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। সবাই ছুটছে। প্রতিমাদি আমার হাতটা ধরে বললেন, 'যমুনাদি, আমরা দুজন ঝড় দেখতে দেখতে যাব। আমাদের জন্যে কাঁদবার কঁকাবার কেউ নেই। মরে যাই যাব।' প্রতিমাদিও খুব মিশুকে ছিলেন। একদিন সকালে অজিত দত্ত এল। দিদি-বড়ঠাকুর ওকে দেখে বললে, 'ফটো তুলব।' আমি আর প্রতিমাদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটা ফটো তুললাম। আমার স্বামী এবং গজেনবাবু আলাদা একটা তুললেন। কত আনন্দ। পাখির পালকের মতো হালকা ছিল সেসব দিনগুলো।

এবার সুন্দরমামার কথা। সুন্দরমামা হলেন দিদির অর্থাৎ আমার জায়ের মেজমামা, আর কানুমামা হলেন ছোটমামা। এই সুন্দরমামার স্ত্রীকে আমরা ডাকতাম সুন্দরমামিমা বলে। সুন্দরমামিমা সত্যি সুন্দর ছিলেন। মামিমা আমাদের ভাগনি

বলতেন। ওঁর প্রথম মেয়েটি ঘাটশিলাতে হয়। সুন্দরমামা ঘাটশিলায় কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমে ওঁরা লরি বাংলায় ছিলেন, পরে ফুলডুংরির ধারে বাড়ি করেছিলেন। কানুমামার তখনও বিয়ে হয়নি। ওঁর বড় ভায়ের ছেলে, বেণু, দুলু, টেপু, মেয়ে বাসন্তী সবার কথা মনে পড়ে। কানুমামার বাবা, আমাদের দাদুও এসেছিলেন। সেই বৃদ্ধ মানুষটি শেষনিশ্বাস ওখানেই ত্যাগ করেন। শেষের দিকে ঘাটশিলায় আত্মীয়-বন্ধুর সমাগম হচ্ছিল, কেউ আসছেন, কেউ যাচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে ক্রমশই জমে উঠেছিল ঘাটশিলা।

একবার সুবর্ণ সংঘের অধিবেশন। বড়ঠাকুর এসেছেন বেশ কিছুদিন আগে থেকে। মল্লিকবাবুর বাড়ি 'ডাকঘর' অভিনীত হবে বলে রিহার্সাল চলছে। আমার স্বামী উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। দারুণ ব্যস্ত ওই নিয়ে। চুনাবালি অমল। চুনাবালি মল্লিকবাবুর মেজ পুত্রবধূ অনুদির পালিতা কন্যা। সেই অধিবেশনে গ্রাম্যকবি বিষ্ণুদাস তাঁর কবিতা পাঠ করেন। সেবার সভা হয়েছিল নার্সারির পুকুরের ধারের জমিতে। সেখানে শুধু গোলাপ আর গোলাপ। বেশ খানিকটা করে জায়গা জুড়ে এক-একরকমের গোলাপের গাছ। এইসব গোলাপ নিয়ে মল্লিকবাবু গবেষণা করতেন। সুন্দরভাবে সভা শেষ হল। 'ডাকঘর' ভালো হল। গালুডি থেকে নীরদদা, সুবর্ণদি আরও অনেকে এসেছিলেন। ঘাটশিলা ও মৌভাণ্ডার থেকে ভট্টাচার্যসাহেব এবং আরও অনেকে এসেছিলেন।

ভট্টাচার্যসাহেব নৈহাটি কাঁঠালপাড়ার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র। ইনি মৌভাণ্ডার ফ্যাক্টরিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সভাশেষে বাড়ি যাওয়ার সময় তিনি বড়ঠাকুরের কাছে আমাদের সকলকে ওঁর বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। অনেকেই যাবেন, বড় আয়োজন। আমার স্বামী এবং বড়ঠাকুরের সঙ্গে ওঁর আগেই পরিচয়। এঁরা দুভাই ওঁর বাড়ি প্রায়ই যান। দিদি আর আমি, আমরা দুজন কখনও ওর বাড়ি যাইনি। আমার স্বামীর কাছে গল্প শুনেছি। উনি বলতেন, 'সাহেব খুব ভালো লোক।' ওঁর ছেলেমেয়েরা বোধ হয় নৈহাটিতে থাকেন, স্ত্রী আছেন কিনা জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। আমাকে খুব স্নেহ করেন।

ভট্টাচার্যসাহেব এঁদের দু'ভায়ের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। শোনা যেত ওঁর নাকি একটি সাঁওতাল স্ত্রী আছেন। আমার স্বামী ডাক্তার, অতএব রুগি হিসাবে ওর স্ত্রীকে একবার দেখতে গিয়েছিলেন। সাহেবের নিজেরও হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করার নেশা ছিল। যাই হোক, আমার এবং দিদির মনের বাসনা ছিল সেই স্ত্রীকে দেখবার।

সেদিন বড়ঠাকুরের সঙ্গে আমি আর দিদি গেলাম। বিরাট কোয়ার্টার, সাজানো গোছানো। সামনে লন, বাইরে চেয়ার টেবিল পেতে বসার ব্যবস্থা হয়েছে।

অভ্যাগতের আগমন শুরু হয়েছে। আমরা দুজনে প্রথমে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম। দেখি সুন্দর গোছানো রান্নাঘর। দিদির ঠাকুরপো তার মধ্যে ছাঁকনি হাতে করে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে বিপন্নের হাসি হেসে বললেন, 'বৌদি, তোমরা একটু হাত লাগাও।' আমরা তো অবাক। দিদি বললে, 'তুমি এখানে কী করছ ঠাকুরপো?' আমার স্বামী বললেন, 'ভট্টাচার্যসাহেব বললেন, সবাই এসে যাচ্ছেন, ডাক্তার, তুমি একটু চায়ের দিকটা দেখো। লোকজন কাউকে দেখছি না, আমি তো কখনও চা করিনি। দেখ ভগবান আছেন, তোমরা এসে গেছ।'

আমাদের সাড়া পেয়ে সাহেবের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। প্লেন করে একটা ঢাকাই শাড়ি পরা। বাংলা বলছেন। একটু টান রয়েছে। দেখতে মন্দ নয়। দোহারা চেহারা। একটু বয়স হয়েছে। আমরা চা করতে শুরু করব সেই সময় চা তৈরির লোক এসে গেল। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলে বাইরে এসে বসলাম। উনি কিন্তু বাইরে এলেন না, বললেন, 'আমি বাইরে যাব না।'

এর কয়েকমাস পরে ওঁর একটি মেয়ে হয়। ভট্টাচার্যসাহেব মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ওঁর অন্যান্য সন্তান এবং স্ত্রী কেন ওঁর কাছে থাকতেন না জানি না। কিন্তু প্রায়-বৃদ্ধ পিতার বুভুক্ষ অন্তর নিজের ওই ছোট্ট মেয়েটি পেয়ে মনে হয় শান্তি পেয়েছিল। মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালো করে মানুষ করছিলেন। অর্থের অভাব ছিল না। সবসময় মেয়েটি ওঁর সঙ্গে থাকত। প্রায় সময় মেয়েটিকে নিয়ে মোটরে বেড়াতে বেরুতেন। আমার ভাগনি উমার বিয়েতেও উনি মেয়েটিকে নিয়ে নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। এখনকার সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উচ্চ বংশজাত ও পদস্থ হয়েও স্ত্রী-কন্যাকে স্বীকৃতি দিতে উনি এতটুকু সংকুচিত হননি। ওই স্ত্রীর বাড়ি করে দিয়েছিলেন। মেয়েটির ভালোভাবে পড়াশুনোর ব্যবস্থাও করেছিলেন।

৪৬

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন সকালে উনি গান করে তানপুরাটা বিছানার ওপর রেখে বেরিয়ে গেছেন, কী করে জানি না সেটা চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়ে ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। উমা আমি দুজনেই ভয় পেয়ে গেছি, দুঃখিতও হয়েছি। সত্যি, তানপুরা ওঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়, দেখে না জানি কী করবেন। কলকাতা কাছে নয় যে কোনো একটা ব্যবস্থা হবে। সময়ও নেই। নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে, উনি রেখে দিয়ে চলে যাওয়ার পর কেন আমি তুলে রাখিনি। তখন বড়ঠাকুর এখানে

আছেন। আমি-উমা ভয়ে ভয়ে আছি। আমাদের মন খুব খারাপ। বড়ঠাকুর কিছু বলছেন না। উনি বাড়ি এসে তানপুরার ওই দশা দেখে আমাকে ও উমাকে খুব বকলেন। নেহাতই বড়ঠাকুর ছিলেন, তাই রক্ষে। বড়ঠাকুর বললেন, 'আমি ওটা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সারাতে দেব'খন। তুমি একসময় গিয়ে নিয়ে এসো। ওদের আর বোকো না, অসাবধানে হয়ে গেছে।' দাদা যা বলবেন তাই। সুতরাং রাগ হজম করলেন। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল যতদিন না তানপুরা সারিয়ে বাড়ি এল।

ভাগনে শান্তর জন্যে প্রায়ই বকুনি খেতাম। ওর পড়াশুনোয় একটুও মন ছিল না, স্কুলে যাবে না। ওর ছোটমামা সকালে ডিসপেনসারি চলে যেতেন। বাড়ি এসে জিগ্যেস করতেন, 'খোকা স্কুলে গেছে?' যেই শুনতেন যায়নি, অমনি আমাকে বকুনি। বলতেন, 'তুমি ওকে স্কুলে পাঠাতে পারো না, আমি কি ঘরে-বাইরে দু-দিক দেখব!' ইত্যাদি। আমি চুপচাপ। আমার সত্যিই করার কিছু ছিল না। শান্ত ঠিক করেছিল ও স্কুলে যাবে না। সেকথা আমি এবং উমা জানি, কিন্তু ওর ছোটমামাকে বলা যাচ্ছে না। সেদিন বকেঝকে স্নান-খাওয়া সেরে, ঘরে গিয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি তো গম্ভীর হয়ে আছি, বললেন, 'দেখ, হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। তোমাকে বকলাম। এ পর্যন্ত কেউই ওকে কিছু করতে পারেনি। এমনকী দাদাও না। তুমি কী করে পারবে। তোমার মাথায় সত্যিই অনেক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি।'

তারপর হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্যে বললেন, 'এখন তোমাকে এত বকছি, আমি বুড়ো হলে এর শোধ তুলবে, না গো? খুব বকবে, না? আমি দেখেছি গ্রামে বুড়ো-বুড়িরা খুব বকাবকি করে।' আমি তখন অযথা বকুনি খেয়েছি বলে আমার চোখে জল এসে গেছে।

শান্তর দৌরাত্ম্য ছিল প্রচুর। একবার বম্বে চলে গেল। আমি তখন ভাটপাড়ায়। আমাকে লিখল, 'কিছু টাকা পাঠাও।' আমি ওঁকে লিখলাম, 'শান্তকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।' উনি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে লিখলেন, 'তোমার আদেশমতো শান্তকে টাকা পাঠিয়েছি। এবার থেকে ওসব ভাবনাগুলো আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার ছোট মাথায় আর বেশি ভেবো না।' একবার শান্ত মোটর সাইকেল ভেঙে নিয়ে চলে এল, আমি খেলাম বকুনি। ওঁর কোনো জিনিসের প্রতি আমার নাকি লক্ষ্য নেই। তবে শান্তর গুণ ছিল অনেক। সুন্দর কথা বলত, হাতের রান্না ছিল ভালো, সেবা করতে পারত। দোষে-গুণে ছিল। উমা আমাদের চিরকালই লক্ষ্মী। শান্তর দুষ্টুমির শেষ ছিল না বটে, কিন্তু ওর মামারা চিরদিনই স্নেহভরে সব মেনে নিয়েছিলেন।

গুটকের ওপর ছিল ডাক্তারখানার ভার। প্রায়ই এটা-ওটা ভাঙছে, ভুলভাল করছে, বকুনিও খাচ্ছে। ওকে সামাল দিতে গিয়ে আমিও বকুনি খেয়ে মরছি। বড়ঠাকুর দেশ থেকে মঙ্গল ঠাকুরপো, কেতো, ফুচু, হাবু, খোতন, গোপাল এদের সকলকে পাঠিয়েছিলেন। সবার খাওয়া-শোয়ার বন্দোবস্ত আমার উপর। ছোটকাকাকে নিজেদের সব কথা বলতে পারে না, ওদের হয়ে ওকালতি করতে হত। বেশ কিছুদিন করে ওরা ঘাটশিলায় ছিল। যুদ্ধের সময় উনি A.R.Pতে সবার কাজ করে দিয়েছিলেন। এইসব নিয়ে ভালোয় মন্দয়, আনন্দে হাসিতে অশ্রুতে বয়ে চলেছিল আমাদের জীবনপ্রবাহ।

বড়ঠাকুর একবার মেজখুড়িমাকে ঘাটশিলায় পাঠালেন। মেজখুড়িমা হলেন জেলিঠাকুরপোর মা। আমাদের বর্তমান দেশের বাড়ির ঠিক পিছনে ছিল ওঁর উঁচু দাওয়াওয়ালা মাটির চালাঘর। জেলি ওর একমাত্র ছেলে। অল্পবয়সে বাবাকে হারিয়েছিল জেলি ঠাকুরপো। মা ও ছেলে দুটি প্রাণী। এই মেজ খুড়িমার রান্নার সুখ্যাতি কত যে বড়ঠাকুরের মুখে শুনেছি! বলতেন, 'মেজখুড়িমার মতো চচ্চড়ি ও-তল্লাটে কেউ রাঁধতে পারে না। এই খুড়িমাই এক ছটাক তেলে মাস চালান।' বড়ঠাকুর লিখলেন, 'জেলি বলছিল, মার শরীর খারাপ, মাকে ছোটদার কাছে পাঠিয়ে দিই। আমি বলেছি, স্বচ্ছন্দে। জেলি মেজ খুড়িমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

আসছেন শুনে আমি তো ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। গ্রাম্য সেকেলে বিধবা মানুষ, তাঁর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আচার-বিচার তো থাকবেই। সুতরাং আমি কোমর বেঁধে বাড়িঘর পবিষ্কার, রান্নাঘরের কোটাবাটা ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। মেজ খুড়িমা এলেন। আমি ওঁকে সেই প্রথম দেখলাম। বয়স হয়েছে, দেখতে মন্দ নয়, চেহারা মানানসই। মাথার চুল ছাঁটা. সাদাসিধে সরল মানুষ। ওঁর হার্টের অসুখ।

যাই হোক, আমাকে তিনি বৌমা বলে সস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। সুন্দর নিরামিষ রান্না করতেন। সাদা ময়দার পরোটা এত সুন্দর ভাজতেন, আমার স্বামী খুব ভালোবাসতেন। অবশ্য আচার-বিচার ছিল একটু বেশি, কিন্তু কী করা যাবে, আমি প্রাণপণে সেটুকু মেনে চলার চেষ্টা করেছি।

একদিন কিন্তু বিপদ ঘটে গেল। সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওঁর শরীরটা ভালো নেই, শুয়ে আছেন. বিকেলে ইলিশ মাছ বিক্রি করতে এল, কিনলেন। আমি রান্নাঘরের একপাশে বসে ভাজছি। উনি আমাকে ডেকে বললেন, 'ইলিশ মাছ ভাজা আর চা খাব। মাছ ভাজা হলে নিয়ে এসো আর চা করো।' আমি মনে মনে ভাবছি মরেচে রে, মাছ ভাজা খাবে, এখুনি কোথায় ঠেকাঠেকি হয়ে যাবে।

যাই হোক, মাছ ভাজা ডিশে করে এনে বললাম, 'বিছানার থেকে উঠে এসে খাও।' বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি, যাব না, বিছানায় দাও।' আমি বললাম, 'সে কী! খুড়িমা দেখে ফেলবেন।' বললেন, 'আরে, তুমি দাও তো। খুড়িমা দেখতে পাবে না।' আমি খবরের কাগজ পেতে তার ওপর দিয়ে চা করতে এসেছি। খুড়িমা কী করে শুনেছেন, বললেন, 'নুটু বিছানায় বসে মাছ খাচ্ছে।' আমি বললাম, 'শুনছে না খুড়িমা!' উনি রাগ করে বললেন, 'পুরুষমানুষ অনেক কিছুই বলে, তাই বলে কি সবকথা শুনলে চলে।'

আমি আর কী বলব, চুপ করে রইলাম। হেসে বললেন, 'ছেড়ে দাও তো। সব ঠিক হয়ে যাবে।' খুড়িমা থাকাতে বাড়িটা বেশ লাগত। ওঁর কাছে বসে দেশের কত গল্প শুনতাম।

৪৭

আমার শ্বশুরমশায়ের আদিবাড়ি ছিল পানিতরে। আমার দাদাশ্বশুর তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ ছিলেন। তখন সাহেবদের নীলকুঠির খুব বোলবোলা। ব্যারাকপুরে নীলকুঠি ছিল, আমার দাদাশ্বশুর রুজি-রোজগারের আশায়, নিজের দেশ ছেড়ে ব্যারাকপুরে এসে বসবাস করেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, আমার শ্বশুর মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেখে অল্প বয়সে মারা যান। তখনকার লোক হয়েও তিনি কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আমার শ্বশুরমশাই খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন। কাশী থেকে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। লিখতে পারতেন। ওঁর 'ভুবনমোহিনী' নাটক তখনকার দিনে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কথকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। গানের গলা ছিল খুব ভালো, যেমন চড়া তেমনি সুরেলা। বড়ঠাকুর বলতেন, 'নুটু, আমার বাবার গলা পেয়েছে, আর আমি লেখা।' আমার শ্বশুরমশায়ের লেখা পুঁথি ডায়রি বাবলুর কাছে আছে। আমার শ্বশুরমশায়ের দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন, তারপর আমার শাশুড়ি মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এঁর পাঁচটি সন্তান। প্রথম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ইন্দুভূষণ, তারপর বড় মেয়ে জাহ্নবী, ছোট মেয়ে সরস্বতী, সর্বকনিষ্ঠ আমার স্বামী নুটুবিহারী। এঁদের পরিবারটি গ্রামের লোকেদের কাছে বেশ গল্পকথার মতো ছিল।

জেলি ঠাকুরপোর বাবারা তিন ভাই। আমাদের বাড়ির পিছনে জেলি ঠাকুরপোদের বাড়ি। ঠিক পাশেই খুকু ঠাকুরঝিদের বাড়ি ও বড়ঠাকুরের প্রিয় বকুল

গাছ। আর সামনের দিকে বিলবিলের পাশে বিমলা ঠাকুরঝিদের বাড়ি। খুকুর বাবা ছিলেন জেলিঠাকুরপোর জ্যাঠামশাই, আর বিমলা ঠাকুরঝির বাবা ছিলেন কাকা।

আমাদের বাড়ির বাঁদিকে নগেনখুড়োদের দুভায়ের বাড়ি। নগেনখুড়োকে এঁরা ছোটকাকা বলতেন। ছোট কাকিমা খুব সুন্দরী ছিলেন। নাম ছিল কল্যাণী। আর ছিলেন এঁদের ভাই বড়কাকা ও কাকিমা। এবাড়ির আর এক শরিকের ছেলে দেবুদা। এঁর সঙ্গে খুকুর বিয়ে হয়েছিল। শোনা যায় লাভ ম্যারেজ। বিমলা ঠাকুরঝিরা কলকাতা থাকতেন। আমার স্বামী ওঁদের বাড়ি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিমলা ঠাকুরঝিকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমরা দুজনে দুজনকে চিঠি দিতাম। ও লিখত, 'বৌদি, তোমার আর্যপুত্রটি কেমন আছেন? তাঁকে আমার প্রণাম দিও।' এই কথাটি মনে আছে এইজন্যে যে, আর কারওর কাছে আর্যপুত্র কথাটা শুনিনি।

খুকুকে আমি দেখিনি। দিদির কাছে ওর গল্প শুনেছি, ফটো দেখেছি। খুকুদের বনগাঁতে একটা বাড়ি ছিল। ওঁরা এখানে থাকতেন, মাঝেমাঝে দেশের বাড়িতে যেতেন। বড়টাকুর দেশে থাকলে নদি, পিসিমা সবাই খুশি হতেন, রান্না করে দিতেন। খুকুরা দেশে থাকলে বড়ঠাকুরের দেখাশোনা করতেন। গ্রামের সবার সঙ্গেই যেন এঁদের একটা আত্মীয়তা ছিল। হয়তো এঁরা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিলেন বলে, অথবা পরিচয় দেওয়ার মতো মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলে।

খুকু বড়ঠাকুরের খুবই স্নেহের পাত্রী ছিলেন। খুকু দেখতে ভালো, কথাবার্তায় চালাক-চতুর মেয়ে, গান জানতেন, পড়াশুনো শেখার আগ্রহ ছিল। খুকুর বিয়ের কিছুদিন পরে দিদির বিয়ে হয়। তখন খুকু বনগাঁয় বাপের বাড়িতে ছিলেন। বড়ঠাকুর দিদিকে নিয়ে খুকুদের বাড়ি যেতেন। সবাই মিলে গল্প করতেন। দিদির কাছে ওঁদের গল্প শুনেছি এবং খুড়িমার মুখে দেশের সবার গল্প শুনে ওঁদের না দেখলেও যেন ওঁরা আমার কতদিনের পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

ক'মাস পরে খুড়িমা দেশে চলে গেলেন। জেলিঠাকুরপো একটা ঘি রঙের চাদর ওর নুটুদাকে দিয়েছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে ওই চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি, উনি হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে কাছে এসে বললেন, 'আরাম করে শুয়ে আছো যে? ওঠো, চা করে দাও। বেরুব না?' আমি বলেছিলাম, 'আজ বেরুতে হবে না।' উনি হেসে বলেছিলেন, 'তা কি হয়! ওঠো।' বললাম, 'চা করতে ভালো লাগছে না।' উনি বললেন, 'তা হলে আজ আমি তোমাকে চা করে খাওয়াই।' বলে উঠতে যাচ্ছেন, তখন আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে বললাম, 'আমি চা করছি।' হেসে বললেন, 'দেখলে তো? তোমায় কেমন ওঠালাম। জানি তুমি আমায় কিছুতেই চা করতে দেবে না।' কতদিনের কত টুকরো কথা মনে পড়ছে। হয়তো এগুলো অবান্তর তবুও আমার কাছে সুখস্মৃতি।

উত্তরপাড়ার জমিদার অমর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ঘাটশিলায়। একবার সুবর্ণ সংঘের অনেকে এবং আমরা সকলে ওঁর বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমাদের জিম কুকুরও ছিল। প্রচুর খাওয়া, ফটো তোলা ইত্যাদি হয়েছিল। বড়ঠাকুরের সঙ্গে ওঁর খুবই হৃদ্যতা ছিল। আমার স্বামীর সঙ্গেও বিশেষ পরিচয়। কিছুদিন পরে ওঁরা ওখানকার বাড়ি বিক্রি করে দেন। বড়ঠাকুর তখন দেশে ভাইকে চিঠি লিখেছেন, তাতে লিখেছেন, 'অমরবাবুর বাড়ি কে কিনল?' বড়ঠাকুরের চিঠিতে বাজার-দর, প্রকৃতি-বর্ণনা এত সুন্দর। ওঁর চিঠি এলেই আমরা দু'জনে পড়তে বসতাম। চোখের সামনে যেন দেশের সবকিছু ছবির মতো ফুটে উঠত।

বারাকপুর, শুক্রবার
২১শে জুলাই ১৯৪৪

কল্যাণবরেষু

নুটু, অনেকদিন তোমার পত্র পাইনি। মহাদেববাবুর পত্রে জানলাম তুমি ওখানে গিয়েছিলে। এখানে আমি গোপালনগরের স্কুলে চাকুরী আরম্ভ করেচি। মাঝে মাঝে খুব বৃষ্টি ঝড় হয়। আজ দুদিন ঝড়বৃষ্টি কম। পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম। গ্রহণের দিন গতকাল সকালের ট্রেনে বাড়ি এসেচি। আজ আবার স্কুল করেই বেলা ৪টার গাড়িতে কলকাতা যাবো। 'ছোটদের পথের পাঁচালী' ইউনিভারসিটিতে Rapid Reader হিসাবে পড়ানো হবে বলে একজন publisher ছাপিয়েচে, আমায় ২০০ টাকা দিয়ে। লাভ যা হবে অর্ধেক তার অর্ধেক আমার। সেই পাবলিশারই সেদিন আমায় ৩০ টাকা travelling allowance দিয়েচে, বলেচে শুক্রবার আবার আসবেন। শনিবার সেনেটের মিটিং আমাকে নিয়ে দু-একজন মেম্বারের কাছে যাবে। যেমন সুনীতিবাবু, কালিদাস নাগ ইত্যাদি।

এখানে ধান হবে না হবে না করে গতবারের চেয়ে খুব বৃষ্টি হয়ে ধান-রোয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এবার আম-কাঁঠাল খুব ছিল। কাল রাত্রেও বাড়ির গাছের কাঁঠাল খেয়েচি। বাহাদুর বাড়িতে বেগুন, লাউ, লাল ডাঁটা ইত্যাদি বুনেচে। দিব্যি বাঁশ কেটে বেড়া দিয়েচে। তিনু প্রায় রাত্রে আমাদের বাড়িতে শোয়, বাহাদুরের সঙ্গে ওঘরে শোয়। বাড়ির সামনে পিছনে বাহাদুর সব জঙ্গল কেটে ফর্সা করে ফেলেছে। কদিন বৃষ্টির দারুণ উজুসে মাছ হয়েছিল। ৪ আনা সের। খুব ডিমওয়ালা পুঁটি, ট্যাংরা, কাঁটালকুশি ইত্যাদি খাওয়া গেল। এখন আবার আক্রা হয়ে গিয়েচে। এক টাকা, পাঁচ সিকে সের, কনট্রোলে সন্দেশ ২ টাকা সের গোপালনগরে। মাঝে মাঝে আনি। পটল ৪ আনা গিয়েচে কাল হাটে। কাল গ্রহণের দিন ছুটি ছিল স্কুলে, তার আগের দিনও

ছিল সবেবরাত বলে একটা মুসলমানের পরবের। কালই সকালের ট্রেনে কলকাতা থেকে এলাম বলে আমি হাটে যাইনি। বাহাদুর গিয়েছিল।

শীল বাংলার কালো চিঠি লিখেছে। অমরবাবু নাকি ঘাটশিলার বাড়ি বিক্রি করবেন। কাল কলকাতায় গজেনের দোকানে গিয়ে শুনলাম, 'আপনার জন্যে উত্তরপাড়া রাজবাড়ি থেকে রমেন বলে একটি ছেলে এসেছিল, বলেচে আপনাকে একবার অবশ্যই উত্তরপাড়ার রাজবাড়ি যেতে। দুদিন এসেছিল, গত রবিবার আবার সোমবার।' ব্যাপার কী? অমরবাবু বাড়ি বিক্রি করবেন কেন? কালী মেম নাকি "মাতৃধাম" ভাড়া নিয়েচে? এই শনিবারে কলকাতা গিয়ে (আজই স্কুল করে ৪টার গাড়িতে রাণাঘাট হয়ে কলকাতায় যাবো) নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা করবো ভাবচি। অনেককাল দেখা হয়নি। বাণী রায় গবর্নমেন্টের চাকুরী করচে ৩০০ টাকা মাইনে। সজনীর কাছে শুনলাম। একবার সেখানেও যাবো। তিনু এখানে রাত্রে শোয়। মানুরা টুলুও শোয়। গুটকে কেমন আছে? উমা ও বৌমা কেমন আছে? ওদের আশীষ দিও। শান্ত বোম্বে গিয়ে চিঠি দিয়েচে তবে বোম্বেতে নাকি মন টিকচে না। এবার 'দেবযান' অর্ধেকের বেশি ছাপা হয়েচে। 'আরণ্যকে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'পথের পাঁচালী'র ৫ম সংস্করণ ছাপা হচ্চে। 'উর্মিমুখর' বলে ডায়েরীর অর্ধেকের বেশি ছাপা হয়েচে। এইসব নিয়ে ব্যস্ত আছি।

ইছামতীতে এখনও ঘোলা নামেনি। ঘন সবুজ হয়েচে চারিদিক। আমাদের পাড়ার ঘাটের ওপারে সাঁইবাবলা গাছটা, বিকেলবেলা যখন গা ধুতে নামি তখন অপূর্ব দেখায়। তেলাকুচো লতায় সাদা ফুল দেখা দিয়েচে। ভক্তের সংখ্যা আরও বেড়েছে। কেউ ময়মনসিং, দিল্লী, কেউ কলকাতা। তাদের চিঠির উত্তর দিতে দিতেই প্রাণান্ত।

১৫ই শ্রাবণ রবিবার তোমার বৌদি বাপের বাড়ি যাবে। শ্বশুরমশাই দিনস্থির করে পত্র দিয়েচেন। আমি বোর্ডিংএ থাকবো মাস দেড়েক। উমা শান্ত বাহাদুরকে পাঠাবো। ঐ সঙ্গে আমতায়। ও মাইজীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। দেড়মাস বোর্ডিং-এ কাটাবো। আর সকলে ভালো আছে। গুটকে, মঙ্গল ও তুমি আশীর্ব্বাদ নিও। ওদের বাড়ির সব ভালো আছে। ইতি—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ- অমরবাবুর বাড়ি কিনলে কে? কালো শীলের সঙ্গে দেখা হলে বোলো ওর চিঠি পেয়েচি। চিনি ও কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে ওখানে? এখানে আমি বেশ পাচ্ছি। তবে অন্য কেউ নয়। S.D.O. আমায় Special permit দিয়েছেন চিনি ও তেলের।

আমাদের সামনের বাড়িতে থাকতেন বিষ্ণুবাবুরা। তিনভাই। বড়ভায়ের স্ত্রী ছিল না। মেয়ে হেনা তখন ছোট, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করত। ছোট একটি ভাই ছিল। লিখতে বসে ওদের মুখদুটি মনে পড়ছে।

দীপালি আসত। ওর হারমোনিয়াম ছিল না। আমাদের বাড়ি এসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তুলত। বেশ লাগত ওদের আসা-যাওয়া। দীপালির একটা গানের একটা লাইন মনে আছে। একদিন এসে বলল, বৌদি, একটা নতুন ভজন শিখেছি, হারমোনিয়ামে তুলি, শোনো। 'তোমারই পূজায় নয়নজলে নয়নজলে প্রভুজি।'

সরস্বতী পূজা এসে গেছে। পাড়ার ছোটছেলেরা বাঁধের ধারে তোড়জোড় করে পূজা করল। থিয়েটার হবে, আমরা দেখতে যাব, ম্যানেজার বঙ্কিমবাবুর ভাই ইন্দুবাবু সস্ত্রীক এলেন। সবাই একসঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাওয়া হল। ছেলেরা নিজেরাই সেজেছে। স্টেজও নিজেদের তৈরি। হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। কী আনন্দ করেই না দেখেছিলাম ওদের থিয়েটার। হয়তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু তখন ওতেই কত আনন্দে পেয়েছি। আজ ভাবলে অবাক লাগে।

আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার খুব চল ছিল। কতদিন বেড়াতে বেড়াতে নবাবসাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছি। উনি ডাক্তারমানুষ, নবাবসাহেবের বাড়ি যেতেন, কিন্তু আমি একবারও জিজ্ঞেস করিনি, কোথাকার নবাবের বাড়ি? কত কথা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। কত কথাই তো বলার ছিল। কত কিছুই যে আজ শুনতে ইচ্ছে করছে। আমার মন আমার চোখ আজও যে ওকে খুঁজছে।

৪৮

আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। উনি ঘাটশিলায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। প্রথমদিকে পসার জমাতে কষ্ট হচ্ছে। প্রথম প্রথম পরিচিত হতেই তো বেশ সময় লাগে। উনি প্রাণপণে পসার জমাবার চেষ্টা করছেন। দু-তিন জায়গায় বসছেন। আমি ভাবছি অত্যধিক কাজের চাপ পড়েছে, শরীরে সইলে হয়। ওঁর বড় সর্দিকাশির ধাত ছিল। একটু ঠাণ্ডা লাগলে আর রক্ষে নেই, প্রচণ্ড কাশি শুরু হবে। তার ওপর সিগারেট খাওয়া। মুসাবনি যাবেন, আমি বাধা দিয়েছিলাম। তখন যাওয়া স্থগিত রেখেছিলেন। পরে আমি ভাটপাড়া এসেছি। উনি লিখলেন, 'আমি মুসাবনি যাচ্ছি।'

দেশ জুড়ে শুরু হল অশান্তি। যুদ্ধের আতঙ্ক ঘন হয়ে উঠেছে। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছে। কলকাতা ছেড়ে লোক পালাচ্ছে যার যেখানে সুবিধা। বাড়ির

সবাইকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেই আঁচ আমাদের সংসারে এসেও লাগল। দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা। ঘাটশিলাতেও ফ্যাক্টরি আছে, সুতরাং যদি বোমা পড়ে এই আশঙ্কা সকলের মনেই দোলা দিচ্ছে। অনেকে বৌ-ছেলেকে নিরাপদ স্থানে পাঠাচ্ছেন। অবশ্য কোন স্থানটি যে নিরাপদ তা কারও জানা নেই। মানুষ ছুটছে স্থান থেকে স্থানান্তরে। কাগজ মারফত খবর আসছে নিত্যনূতন। চাল পাওয়া যাচ্ছে না, ডাল নেই, তেল মেলে না। কাপড় কন্ট্রোলে কখনওসখনো পাওয়া যায়, তা যেমন মোটা তেমনি দেখতে, তা-ই লোকে মারামারি করে জোগাড় করছে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। বহু জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রেডিয়োতে উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। রাস্তাঘাট তেরি হচ্ছে, গাড়ি গাড়ি সৈন্য যাচ্ছে। গোরা পলটনদের অত্যাচারের কাহিনি শোনা যাচ্ছে। বড়ঠাকুর উমা ও দিদিকে নিয়ে দেশে চলে এলেন। আমি ঘাটশিলার বাড়িতে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। আমার স্বামীর মনে একটুও শান্তি নেই। আমাকে কোথায় রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না। ওই সময়ে বড়ঠাকুরের চিঠি এল, 'বৌমাকে কিছুদিনের জন্য ভাটপাড়ায় পাঠিয়ে দাও।' আমাকে উনি বললেন, 'আমিও ভাবছিলাম, আর দাদাও লিখেছেন, তুমি কিছুদিন ভাটপাড়ায় থাকো। পরে দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা ঠিক করব।'

আমি একান্ত অনিচ্ছায় ভাটপাড়ায় এলাম। চিঠি দিই, উত্তর আসে ওঁর ভারাক্রান্ত মনের বার্তা নিয়ে— ভালো লাগছে না। আমিও অস্থির হয়ে উঠেছি। লিখেছেন—

ঘাটশিলা
শনিবার
রাত্রি ১০টা

প্রিয়তমাসু

মীন্, আজই তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে যখন পাঠিয়েছিলাম তখন ভাবিনি তুমি আমার কতটুকু জুড়ে বসেছ। সেই দুপুরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখনও কিছু যেন ভাবতে পারিনি। শান্ত বিকেলে চা করে দিলে, না বলতেই। রাতে খুব সকাল সকাল ফিরলাম। সেই সময় অন্তরে একটা কিসের বেদনা অনুভব করলাম। এই সকালে আসার জন্যে সে যে কত অনুযোগ করেছে। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত সে পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমার সেই কুটিরের রানী। আমার সেই ভগ্নদেউলের দেবী। সে তো নেই, অনেক দূরে চলে গেছে। ঘরদুয়ার বারান্দা আজ যেন সবই শূন্য মনে হচ্ছে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। কেন

আমি ওকে যেতে দিলাম। যেখানে পাঠালাম সেটা তো মোটেই নিরাপদ স্থান নয়। একথা আমার একবারও মনে আসেনি। মা বাবা ভাইরা সবাই একসঙ্গে থাকাটাই নিরাপদ মনে করেছি। কিন্তু আমার অবস্থা যে এরূপ হবে আমি এক মুহূর্তের জন্যও অনুভূতির মধ্যে আনতে পারিনি। পরের দিন রাত্রেও আর কাগজ পড়তে ভালো লাগছে না। কিছুতেই না। আমার পাশে শুয়ে আছে জেনে আমি রোজ নিশ্চিন্ত মনে দেশবিদেশের সব সাংবাদিকদের অভিমত ও কূট রাজনৈতিক সমালোচনা পাঠ করতাম। সে মনের অবস্থাটুকু কে চুরি করলো। অপূর্ব দুঃখ আর ব্যথা। এরূপ মনের অবস্থা, এও একটা উপভোগ করার জিনিস। তোমার মনে অনেক আঘাত দিয়েছি কাজে অকাজে বহু ছুতোয়, তার জন্যই এই শাস্তি।

মীন্ তুমি কষ্ট পাবে আমি জানতাম। কিন্তু আমার এরূপ মনের অবস্থা তুমি করে যাবে তা ভাবিনি। সে গর্ব আজ আমার দূর হয়েছে। আমার এই ঘরকে ঘর বলেই মনে হচ্ছে না। তুমি নেই, সবটুকু শূন্য, সবটুকুই খালি! সকল স্থানেই তোমার মঙ্গল হাতদুটির স্পর্শ রেখে গেছো। যেদিকে তাকাচ্ছি সবকিছুই ইঙ্গিত করছে সে এখানে নেই, সে এখানে নেই। আমি একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি। কী করি। এই-সব জিনিস, ডিসপেনসারি, ওষুধ, আলমারি, টেবিল চেয়ার। সব ছেড়ে কেমন করে আবার নূতনের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করি। মীন্, আমার তুমি, এতটা উতলা হোয়ো না আমার যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে, ঠিক সময় থাকতেই তোমার কাছে উপস্থিত হব। কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছি না, আর কারো সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগছে না। বাড়িও সম্পূর্ণ খারাপ লাগছে। ওরা দু'জনে যা কিছু রান্না করে দেয়, চোখমুখ বুজে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছি। কত কিছুতে মুখ বেঁকিয়েছি মনে পড়ছে।

মানি, ওপরে একজন লোক বসে আছে, সে অদৃশ্য চক্ষু দিয়ে সেসব দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারও হয়ে যায়। কিছু না, কিছু না, কিছু ভালো লাগছে না। সেদিন রাত্রে ঘরে আলো জ্বলছে, কাগজটা পড়তে পড়তে ঘুম এসেছে, খানিকটা পরে ঘুমভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠেছি, 'কই, এখনো এলে না।' পরে পরিপূর্ণ জেগে ভাবলুম, ছি ছি, খোকা ও-ঘরে থাকলে কী মনে করবে। সত্যি, এবার আমার মন কেন এমন খারাপ হচ্ছে। কী জানি, ভগবান আরও কী শাস্তি দেবেন। আমি একা হয়ে আরও মন অস্থির হয়ে গেল বোধ হয়। উঃ, কী একাকীত্ব! এর পূর্বে অনেকবার একা থেকেছি, সেটাই তখন ভালো লাগত। এখন এ কী হল। আশ্চর্য সময়ের প্রভাব। কত অপূর্ব কত পরিবর্তনীয় এই মন।

আজও একটু দেরী হল আসতে। ডিসপেনসারিতে অত লোকের মধ্যেও যেন একা ছিলাম। কথাও ভালো লাগছে না। মেল চলে গেছে অনেকক্ষণ। এসেই হাতমুখ

ধুয়ে খেতে বসলাম। খোকা আর রাজেন ডিমের ডানলা মুগের ডাল রেঁধেছিল। ওরা এখন ঘুমোচ্ছে। একবার বাইরে গেলাম। নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। ঘোর অন্ধকারাবৃত। দূরে ঐ পাহাড়ের বুকে বহ্নিশিখা ধিকধিক করে জ্বলছে। আমার মনের গভীরে ঐরূপ একটি জ্বালা। প্রতি রাত্রিতে সেই যে শান্তিপূর্ণ সুপ্তি কই সে নিদ্রা? কে হরণ করলো? বিশ্বস্রষ্টার নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি আবার সেই পুরাতন দিনগুলো শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে দাও। তুমি ভেবো না মিনা। ভগবানের কাছে তোমার মনের কথা জানাও, তিনি তা পূর্ণ করবেন। কেবল এই কথা মনে হচ্ছে তোমায় কেন পাঠালাম। এখানেই হয়তো নিরাপদ ছিল। যা হয় হত।

শীঘ্র যেতে চেষ্টা করবো। তুমি ভেবো না। দুঃখের রাত আর দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। ওবাড়ির সংবাদ দিও। আমার প্রীতি।

তোমার—
শ্রী N.

এর কিছুদিন পরে ধলভূমগড়ে চাকরি নিলেন। সেখানেও ভালো লাগছে না। তবুও নতুনত্বের নেশায় এবং বাঁধা মাইনের জন্যে চুপ করে আছেন। ওখানে রাত্রে থাকতে হয়। ঘাটশিলায় থাকতে পারেন না অথচ বাড়ি, জিনিসপত্র, আমি। আমাকেও কাছে রাখতে পারছেন না। কোয়ার্টার পাননি। সে এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি। এক-একদিন বাড়ি আসেন। ঘাটশিলা থেকে ধলভূমগড় একটা স্টেশন। উনি গাড়ি অথবা মোটরসাইকেলে আসা-যাওয়া করতেন। ওই সময় দেশের কয়েকটি ছেলেকে এ. আর. পিতে চাকরি করে দিয়েছিলেন। ওরাই দু-একজন করে বাড়ি এসে থাকত। তখন হরদম মিলিটারি গাড়ি যাওয়া-আসা করত। মঙ্গল, কেতো, গোপাল, গুটকে তো ছিলই।

ওই সময় এক সাধু ওঁর হাত দেখে বলেছিলেন, 'তোমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে।' একটা পাথর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আপনাদের দুজনের মধ্যে একজনের হাতে এটা পরে থাকবেন, খুলবেন না।' উনি সেই পাথরটা আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাটপাড়ায় গিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ো।' খুব একটা গুরুত্ব দেননি। সাধুকে আমি দেখিনি, ব্যাপারটা আমার সামনেও হয়নি। ডিসপেনসারিতে বসে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম প্রায় সময় তো বলছেন, 'এখানে থাকব না, অন্য কোথাও সুযোগ পেলেই চলে যাব।' ভেবেছিলাম সেরকম কোথাও দূরে হয়তো চলে যাবেন। সেইজন্য হয়তো সাধু পাথরটা দিয়েছেন। পাথরটা ভাটপাড়ায় এসে বাঁধিয়ে ওঁকে দিয়েছিলাম। উনি সেটা পরেননি। বৌদিকে অর্থাৎ দিদিকে দিয়ে দিলেন। আমি আর

কিছু বলতে পারলাম না। আমাকে বলেও দেননি, তা হলে হয়তো একবার সাধুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। দিদিও জানত না।

তারপর বেশ ক বছর কেটে গেছে। ও নিয়ে কোনোদিন কোনো কথাও ওঠেনি। প্রায় ভুলে যাওয়ার মতো। ওঁর মৃত্যুর পর মনে হয়েছে, সেই দূরদর্শী সাধু হয়তো বুঝেছিলেন শীঘ্রই ওঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই তার প্রতিকারও দিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য বিধিলিপি খণ্ডন করার সাধ্য কারও নেই। তাই বোধ হয় আমরা দুজনেই ওই ব্যাপারটা ভালো করে ভাবিনি, গুরুত্ব দিইনি। পাথরটা পরলে হয়তো ওঁর মৃত্যু হত না। নিজের নির্বুদ্ধিতার অনুতাপে আমি যে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি। ওঁকে হারানোর যন্ত্রণা যে আমাকে কুরেকুরে খাচ্ছে। দৈব মানতে হয়। হয়তো তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত ছিলেন। আমরা নিজেদের কর্মফলে তাঁকে চিনতে পারিনি।

আমার স্বামী ধলভূমগড়ে, দিদিরা দেশে, আমি ভাটপাড়ায়। নার্সারির দ্বিজেনবাবুর অসুখ, কাছে কেউ নেই। ভট্টাচার্যসাহেব খবর পেয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে গেছেন এবং চিকিৎসা চলছে। আমার স্বামী মাঝেমধ্যে দেখতে যান। ইতিমধ্যে উনি ভাটপাড়ায় এসেছেন আমাকে ঘাটশিলায় নিয়ে যাবেন বলে। আমি বলছি, 'আমি ধলভূমগড় যাব, ঘাটশিলায় নয়। তুমি কোথায় থাকো আমি দেখব, দিদি বড়ঠাকুর গুটকে শান্ত সবাই ধলভূমগড় গেছে, শুধু আমি দেখিনি।' উনি রাজি হচ্ছেন না। থাকার অসুবিধার জন্য। আমার জোর ইচ্ছায় বললেন, 'আচ্ছা, চলো। ওখানে মাত্র দু-দিন। তারপর ঘাটশিলায়। কেমন?'

আমি তাতেই রাজি। এলাম ওঁর আস্তানায়। জায়গাটা ভারী সুন্দর। অস্থায়ী কোয়ার্টার। দুখানা শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর। বাথরুম ইত্যাদি লেখার মতো নয়। যাই হোক, সূর্যি বলে একটি ছেলে রান্না করে। ওঁর কাছে সূর্যির রান্নার খুব প্রশংসা শুনেছি। বললেন, 'তোমাকে রান্না করতে হবে না। সূর্যি করবে। খেয়ে দেখো—তোমাদের চেয়ে কত ভালো রান্না করে।'

ডাক্তারবাবুর প্রশংসা শুনে সূর্যি মহাখুশি। চারপাশে পাঞ্জাবি, হিন্দুস্থানি আরও বিভিন্ন দেশীয় লোকের কোয়ার্টার। আমি প্রায় ঘরের মধ্যে বন্দি। কোনো কোয়ার্টারেই মেয়েরা নেই। আমি একটুআধটু বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছি। একদিন রাত্রে উনি আমাকে এস.ডি.ও আচার্যিবাবুর বাড়ি বেড়াতে নিয়ে গেলেন। ওঁদের সুন্দর ব্যবহার আজও মনে আছে। ওঁর স্ত্রী সেদিন রাত্রে আমাদের না খাইয়ে ছাড়লেন না।

পরদিন সকালে উঠে দেখি ওঁর মুখ গম্ভীর। চা খেয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেল বার করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ

এত সকালে?' বললেন, 'ঘাটশিলায়। তোমার মন খারাপ হবে বলে বলিনি। কাল দ্বিজেনবাবুকে স্বপ্নে দেখেছি। দ্বিজেনবাবু এসে বললেন, ডাক্তার, তুমি আমায় দেখলে না! মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে বুড়ো বোধ হয় মারা গেছেন। যাই, একবার দেখে আসি কী ব্যাপার।'

দুজনের মন খারাপ হয়ে গেল। উনি যতক্ষণ না আসেন একটা উৎকণ্ঠা। উনি এসে বললেন, 'সত্যিই রাত্রে দ্বিজেনবাবু মারা গেছেন। ওঁকে ফুল দিয়ে এলাম।' মন আমাদের দুজনেরই খারাপ। ঘাটশিলায় আসার প্রথম দিনটি থেকে উনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আমাকে মেয়ে বলতেন। কত আনন্দ উৎসব হয়েছে ওঁর বাড়ি। আমরা তার অংশ নিয়েছি। চিরদিনের মতো সেই আনন্দের স্থান চলে গেল। দ্বিজেনবাবু যতদিন সুস্থ ছিলেন এমন দিন যায়নি যেদিন উনি ফুল পাঠাননি। কলকাতা থেকে নানারকম জিনিস এনে, কখনও বা বাড়িতে তৈরি করে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে খাইয়েছেন। ওঁর প্রচুর বই ছিল, বেছে বেছে পড়তে পাঠিয়ে দিতেন। সেই স্নেহময় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের কথা আজ স্মরণপথে বারবার আসছে। ওঁকে ভুলিনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা— ওঁর যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।

সেবার আমরা সবাই ঘাটশিলার বাড়িতে। ভট্টাচার্যসাহেব ভুগছিলেন। একদিন খবর এল তিনি মারা গেছেন। এঁরা দু'ভাই দেখতে গেলেন, এসে বললেন, 'নৈহাটি থেকে ওঁর ভাই এসেছেন।' এর পরের কথা বিশেষ কিছু শুনিনি, শুধু শুনেছিলাম জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছেন, সাহেবের মোটরটা বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সাঁওতাল স্ত্রী ও কন্যার কী ব্যবস্থা করেছেন শুনিনি। তারা ঘাটশিলাতেই ছিল শুনেছি। আজও সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা মনে হলে দুঃখ হয়। কত স্নেহে আদর-যত্নে মানুষ হচ্ছিল। হঠাৎ এক ঝটকায় রূপকথার গল্পের মতো রাজরানি থেকে অবস্থান্তর।

৪৯

আর একটি স্নেহনীড়ের কথা বলে নিই, যা মনের মাঝে অক্ষয় হয়ে আছে। বিপ্লবী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁর বৌদি সুধাদির কথা। এঁরা প্রথমে সঞ্জীবনবাবুর বাইরের দিকের ঘরগুলিতে ভাড়া আসেন। সুধাদিকে আমরা দিদি ডাকতাম। দেখতে সুন্দর, গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ. দীর্ঘ চেহারা, মুখশ্রী সুন্দর। চোখদুটি বড় বড়। পান খেতেন, মুখে হাসি লেগেই থাকত। এঁর দুই ছেলে গোপাল, শুনু। মেয়ে অপর্ণা। এরা তখন ছোট। দ্বিজেনদা আঠারো বছর জেলবাস করেছেন, তাতে স্বাস্থ্য ভেঙেছে, কিন্তু মুখের স্নেহময় হাসিটি মেলায়নি। এঁরা ছিলেন আদর্শস্থানীয়।

প্রথম প্রথম দ্বিজেনদা গায়ে চাদর দিয়ে লাঠি হাতে আমাদের বাড়ি আসতেন। দেখতাম, এসেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুজনে হেসে উঠতেন। দ্বিজেনদা খুব হাসতে পারতেন। আমার স্বামীও খুব হাসতেন। উনি একটু চুপ করে থাকলে ওঁর বন্ধুরা বলতেন, 'কী রে, তোর হাসি কোথায় গেল?'

দ্বিজেনদা অত্যন্ত বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। আমরা ওঁদের বাড়ি প্রায়ই যেতাম। একদিন গিয়ে দেখি, বাড়িতে অনেক ভদ্রলোক এসেছেন, দিদি রান্নায় ব্যস্ত। আমরা যেতেই দ্বিজেনদা বললেন, 'দেখ, এরা সব আমার রাজনীতির বন্ধু।' আমরা একটু দাঁড়িয়ে ভিতরে দিদির কাছে গেলাম।

দিদির অর্থাৎ দ্বিজেনদার বৌদির সব কাজ ছিল নিখুঁত, রান্নাঘরের উনোন থেকে শোয়ার ঘরের আসবাবপত্র সব ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অতি সুন্দর রান্না করতেন, ওঁর বাড়িতে গেলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। অত্যন্ত সাধারণ জিনিস দিয়ে নানারকম রান্না করতেন। বড়ঠাকুর ওঁর রান্নার অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। আমরা ওঁর কাছে বসে গল্প শুনতাম। আমি এবং আমার জা দিদি বলতাম, 'দিদির কাজ কী ভালো!' উনি (সুধাদি) হেসে দ্বিজেনদাকে বলতেন, 'দেখেন ঠাকুরপো, যমুনা আর দিদি (সুধাদি দিদিকে দিদি বলতেন) কী বলত্যাছে।' দ্বিজেনদা হাসতেন। বড়ঠাকুরকে এঁরা দাদা ডাকতেন।

ঘাটশিলায় থাকলে প্রায় প্রতিদিন বড়ঠাকুর বিকেলে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় দ্বিজেনদার বাড়ি যেতেন। চা-খাওয়া গল্প দশটা পর্যন্ত চলত। আমার স্বামী ডিসপেনসারির কাজ সেরে ওই আড্ডায় যেতেন। দিব্যি জমে উঠত। সুধাদির হাতের সেলাইও ছিল অপূর্ব। উনি এঁদের দুই ভাইকে দুখানা আসন বুনে দিয়েছিলেন। ওই আসন দুটি পেতে আমরা ওঁদের ভাত খেতে দিতাম। একদিন আমার স্বামীকে একটা ছোট ব্যাগ তৈরি করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, রোজ একব্যাগ করে টাকা রোজগার করে আমাকে এনে দিতে হবে।' উনি হেসে বলেছিলেন, 'যদি আপনার আশীর্বাদের জোর থাকে এনে দেব বৌদি।' আমার স্বামীকে ছোট দেওরের মতো ভালোবাসতেন। সেই সব স্নেহময় দরদি মানুষ ও মায়াময় দিন মহাকালের চক্রপৃষ্ঠে কোথায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

আমাদের পাড়ার 'রামকৃষ্ণ মিশন' তখন বেশ ছোটই ছিল। একটি লম্বা চালার মধ্যে ঠাকুরঘর, মহারাজের থাকার ঘর এবং রান্নাঘর। মহারাজের ঘরের একপাশে আলমারিতে কিছু বই। এঁরা দু'ভাই রোজই প্রায় আশ্রমে যেতেন, কারণ আমাদের বাড়ি আসার পথেই পড়ত। ছোটখাটো করে উৎসব হত, কালীকীর্তনের দল আসত। আমরা মহা উৎসাহে যেতাম। একবার কী কারণে মনে নেই, ঠাকুরের জন্য ভোগ

রান্না করে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। উনি নতুন থালা-বাটি কিনে দিয়েছিলেন। সেদিন খুব তৃপ্তি হয়েছিল।

একদিন রাত্রে আমার স্বামী তিনজন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করলেন। তার মধ্যে হংসানন্দ মহারাজ ছিলেন। সেদিন মহারাজদের পদধূলিতে আমাদের ছোট্ট কুটির ধন্য হয়ে গিয়েছিল। বড়ঠাকুর ঋষির মতো ছিলেন। ওঁর ভায়েরও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস কিছু কম ছিল না। কোনো কিছু হলেই বলতেন, 'ঈশ্বরকে জানাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু নিজেদের জীবনের সংকটময় মুহূর্তে হয়তো আমরা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এই পরিণতি। অভ্যাসের অভাবেই হয়তো এসেছিল এই বিস্মৃতি। তাঁকে স্মরণ করলে, তাঁর শরণাগত হলে ওঁর এই পালিয়ে যাওয়ার খেয়াল হত না। অথবা এটাই ঈশ্বরের অমোঘ বিধান, অনিবার্য কর্মফল, বা 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'।

দিদি বড়ঠাকুর দেশে, উনি ধলভূমগড়ে, আমি ভাটপাড়ায়। ইতিমধ্যে বড়ঠাকুর ভায়ের কাছে গেছেন বনে অরণ্যে বসন্তোৎসব দেখবেন বলে। উনি আমাকে চিঠি লিখলেন। বড়ঠাকুরের এমনি খেয়াল ছিল। কখনও ঘাটশিলার জন্যে মন কেমন করছে, ভাই এবং প্রকৃতি এ দুটিকে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারতেন না, কখনো বা ব্যারাকপুরের ইছামতী হাতছানি দিত।

ঘাটশিলা
মঙ্গলবার

প্রিয়তমাসু

মীন, তোমার পত্র সময়মতো পেয়েছি। হঠাৎ বেশ কাজের ভীড় লেগেছে। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকালে ডিসপেনসারিতে বসেই পত্র লিখছি। গত শনিবার ভোররাত্রে, অপ্রত্যাশিতভাবে দাদার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল, উনি বললেন, পাহাড় অরণ্যে বসন্তোৎসব দেখতে এসেছি। না দেখে মন কেমন করছিল। পরে রবিবার দিন আমরা জঙ্গল অভিযানের ব্যবস্থা করলাম। ভোরে গরুর গাড়িতে করে নদীর ওপারে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া হল। সঙ্গে ছিল সুরেশ, জিম কুকুর আর একজন কনট্রাকটার। সেই সব আহারের ব্যবস্থা করেছিল। দাদা তো পর্বতের উপর গাছগুলির সবুজ ঘন কচি পত্রপল্লব দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। আমাদের বহু গল্প বললেন। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আমরা এক গভীর অরণ্যানীর মধ্য গিয়ে পড়লাম। কুলকুল করে শীর্ণকায়া পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে। চারদিকে মহুয়ার মাদক গন্ধ এবং বনজ পুষ্পের গন্ধে প্রাণমন ভরে উঠল। ভাবছিলাম আর একজনের কথা। বহু দূরে, সে এখন বোধ হয় আমার কথা স্মরণ করছে। শূন্যঘরে যখনই ফিরে আসি তখনই মনটা ব্যথিয়ে ওঠে।

আর একটা আনন্দের কথা বলছি। যেদিন দাদা এলেন ঐদিন দুপুরে নরসিংগড় থেকে একটা call এল। ফেরবার পথে ম্যানেজার বঙ্কিমবাবু বললেন, 'আপনার দাদার কাছে বিশেষ জরুরী কাজ আছে। তাঁর ঠিকানা দেবেন?' আমি বললাম, 'উনি আজই এসেছেন।' পরের দিন ভোরে উনি নিজে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বাড়ি এলেন, এবং খুব গোপনে বলেছেন, 'আপনি আমাদের স্কুলে হেডমাস্টারি এখনই নিন। কাল থেকে যোগ দিন।' দাদা বলেছেন, 'উপস্থিত পারছি না, তবে জুলাই মাস থেকে নিশ্চয়ই পারব।' তা হলে বোধ হয় আমরা আবার সবাই একসঙ্গেই থাকছি। দুমাস পরের থেকে। আর বৈশাখ মাস থেকে আমাদের দেশের বাড়িতে যাওয়া হবে। ঐ সময় তোমাকে নিয়ে যেতে বলে গেলেন।

সন্ধ্যায় রাজু এল। একটা ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া জামা গায়ে। ওখানে বসে আছি, সন্ধ্যার কিছু পরে ভট্টাচার্যসাহেব এলেন মোটরে। ওঁর সঙ্গে রাজবাড়ি বেড়াতে গেলাম। ঠিক সাড়ে আটটায় বঙ্কিমবাবুর বাড়ির মেয়েরাও বাইরের ঘরে জাপান রেডিও শোনার জন্যে ভিড় করেছেন, ঠিক ওই সময় ওখান থেকে সংবাদ এল— না, সুভাষ মারা যাননি, আর একজন বিখ্যাত লোক মারা গেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ফিরে এলাম ওঁরই সঙ্গে। বেশ রাত্রি হয়ে গেল। কুক্ষণে আসার পথে মল্লিকবাবুর বাড়ি প্রবেশ করলাম আর উনি বললেন, 'ডাকঘর' আবার হবে, আপনি মোটেই আসছেন না।' আর আমি গেলাম খেপে, ওঁকে বেশ করে শোনালাম, সেই পুরানো দিনের 'ডাকঘরে'র জন্যে প্রাণপাত করে চমৎকার বদনাম দিয়েছেন, আবার সাহায্য চাইছেন, মায় নীরদদা সুবর্ণদির তিক্ত কথাগুলো পর্যন্ত বেশ করে বললাম। বাড়ি ফিরতে আরও রাত হয়ে গেল। রাজু ভাত দিলে। খোকা চমৎকার রান্না করেছে। ওর অসুখ সেরেছে, তবে ও রাজুকে রাঁধতে দেয় না। নিজেই কষ্ট ভোগ করছে, তবে এ কাজে ওর খুবই উৎসাহ। ঠিক তোমার মতো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। বিছানা করে, কাপড় তোলে খুব পরিষ্কার।

বাইরে অপূর্ব জ্যোৎস্না। পাহাড়ের বুক কুয়াশায় ঘেরা। কাল সকালে নরসিংগড় রাজবাড়ি যেতে হবে। এবার ঘুম আসছে।...

সোমবার, এখন বেলা ১টা। এই ভাত খেয়ে উঠছি। একটু শুয়ে আবার ডিসপেনসারি যাব। তুমি কেমন আছ? শীঘ্র শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও। এই আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস তোমার কেশের গন্ধ আমার সমীপে বয়ে আনছে বই কী। ওবাড়ির সংবাদ দিও। আমার প্রীতি নাও। ইতি—

তোমার

বর্ষাকালটা বড়ঠাকুর খুব বেশি ঘাটশিলায় থাকতেন না। আম-কাঁঠালের পরই বর্ষা নামত, ওঁদের আসতে আসতে শরৎ এসে যেত। তবে মাঝেমধ্যে এসেছেন বই কী। একবার বেশ বৃষ্টি নেমেছে, দিদি দেশে, উমা ঘাটশিলায়, বড়ঠাকুর এসেছেন। রাত্রে বেশ ঝড়বৃষ্টি হল। সকালে আকাশ পরিষ্কার। বড়ঠাকুর বললেন, 'চলো সকলে এঁদেলবেড়ার জঙ্গল বেরিয়ে আসি।' এঁরা দু'ভাই, উমা, আমি আর আমাদের জিম কুকুর। চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় বেরিয়ে সবাই খুশি। একটুও কাদা নেই। বড়ঠাকুর বললেন, 'এ কী আমাদের গ্রাম পেয়েচ যে, কাদায় হাবড়ে পা ডুবে যাবে।'

আকাশ ঝকঝক করছে। সদ্যস্নাত বনবীথির সজীবতা ও সবুজতা দেখে বড়ঠাকুর তো বটেই, আমরাও মুগ্ধ। জঙ্গলের মধ্যে লেকটা আগের দিনের বৃষ্টির জলে ভর্তি হয়ে থইথই করছে। অবশ্য বড়ঠাকুর সেদিন জল দেখে স্নান করতে নামেননি।

বেড়িয়ে একটু বেলায় আমরা ফিরলাম। আমার স্বামী এসেই ডাক্তারখানা ছুটলেন। আমরা বাড়ি এসে চা খেলাম। বড়ঠাকুর বললেন, 'আজ একপাক বসিয়ে দাও, বৌমা।'

খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। সেদিন রাত্রে বড়ঠাকুর চলে গেলেন, দিদি একলা আছে।

লিখতে লিখতে আর একটি বৃষ্টির রাত্রির কথা মনে পড়ছে। সেদিন প্রচণ্ড ঝড় এবং জল। উনি বিকেলে বেরিয়েছেন। ফিরতে রাত্রি হচ্ছে। আমি একা দরজা-জানলা সব বন্ধ করে হ্যারিকেনের আলোয় চুপ করে বসে আছি। ভালো লাগছে না, ভয় করছে। কখনও বই খুলে পড়ছি, কখনও গান করছি। একসময় কিছুক্ষণ গ্রামোফোন বাজালাম। উনি আর আসছেন না, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। রান্না সারা হয়ে গেছে। একে আমি মেঘের ডাকে ভয় পাই তায় বাড়িতে সেদিন আমি একেবারে একা। কিন্তু আমার ভয় পাওয়াতে মেঘের কিছু যায় আসে না, সে ক্রমাগতই কড়কড় করে ডাকছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বজ্রপাত হচ্ছে। আমি শেষে সব কিছু বন্ধ করে চৌকির বিছানার ওপর চুপ করে বসে আছি। বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য চলছে। রাত্রিও গভীর হচ্ছে।

ওই জল ঝড় বিদ্যুৎ ও মেঘের গর্জনের মধ্যে হঠাৎ মোটর সাইকেলের ভটভট আওয়াজ কানে এল। আমি জানি উনি ছাড়া কেউ নয়। কারণ এদিকে একমাত্র ওঁরই মোটর সাইকেল ছিল। আমি উঠে তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলেছি। জলের ঝাপটায় বারান্দা ভেসে যাচ্ছে। উনি ভটভট করতে করতে সোজা চালাঘরে গিয়ে গাড়ি রেখে এলেন।

বারান্দায় উঠতেই দেখি সারা অঙ্গ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। তাড়াতাড়ি করে তোয়ালেটা হাতে দিয়ে বললাম, 'বর্ষাতিটা খুলে আগে মাথাটা মুছে

নাও। এখুনি সর্দিকাশি হবে।' উনি বড্ড সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতেন। বর্ষাতিটা খুলে মাথা মুছতে মুছতে বললেন, 'চলো না, বাইরেটা একটু ঘুরে আসি।' আমি বললাম, 'সে কী! এই বৃষ্টিতে ভিজে এসে আবার বাইরে? না না। আর বৃষ্টি দেখতে বাইরে যেতে হবে না। অসুখ করবে।' উনি বলেছিলেন, 'কী আর হবে। বড়জোর একটু জ্বর হবে।' তারপর বললেন, 'জানো এই দুর্যোগের মধ্যে মোটর সাইকেলে আসতে আসতে ভাবছিলাম এই মুহূর্তে যদি অ্যাকসিডেন্ট করি কিংবা বজ্রপাতে মৃত্যু হয়, তুমি জানতেও পারবে না। তারপর যখন জানবে—। ওকথা মনে হতেই জোরে সাইকেল চালিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তোমার কথা মনে পড়ল, তুমি একলা আছো।'

আমার বেশ মনে আছে, আমি বলেছিলাম, 'বাইরে বেরুলে, আমার কথা তোমার মনে পড়ে তাহলে?' উনি শুধু আমার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলেন।

৫০

আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে আমার বিয়ের পর প্রথম বর্ষার মধ্যে উনি একলা মুরাতিপুরে ছিলেন। আমি ভাটপাড়ায়। তখন একবার ওঁব জীবন-সংশয় হয়েছিল। দিনলিপির পাতায় লিখেছেন—

মুরাতিপুর
24. 8. 39
৬ই ভাদ্র

আজ ৪/৫ দিন হল বসে আছি চুপচাপ এই জনহীন পল্লীতে। কেন কিসের আশায় এসেছিলাম, তাও ঠিক বুঝি না। কিন্তু সমস্ত দেহমন একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল। মধ্যে-মধ্যে দু'একটা রোগী পাই, কিন্তু তাদের দেবার সংগতি কই? দাবি করতে পারি না, যেতেও হয়। অবস্থা দেখে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে আসি। আবার ওষুধটা নিয়ে বলে, 'পয়সা এখন কই বাবু? পরে দেখব।' এখানে আসাই হয়তো অন্যায় হয়েছে। প্রথম ঝোঁকে চাকুরি ছেড়ে, ব্যবসা বুঝি না, তাই অল্প খরচ করে এখানে আসা। বোধ হয় তাই হবে।

'একদিনের ডাকে যাওয়া'—

ঝম্‌ঝম্ করে ৩ দিন বৃষ্টি হচ্ছে। পথেঘাটে একহাঁটু কাদা, শ্রাবণের শেষ সপ্তাহ। গ্রাম্য ওল কচু শ্যাওড়া আর বনতুলসীর জঙ্গল বর্ষায় সতেজ হয়ে উঠেছে। গ্রামের সবটাই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাইরের দিকে চেয়ে আছি। প্রতিদিনের মতো যদি একটা ডাক আসে। তা হোক এই দারুণ বর্ষা। সেদিন ঠিক ১১॥০ টার সময় খেতে যাবো এমন সময় দূরের চর থেকে এক ঢাকাই মুসলমান বলে, 'ডাক্তারবাবু, আমাদের ওখানে

যেতে হবে। একটা শক্ত রুগী আছে। ভেদবমি হচ্ছে গতরাত্রি থেকে। এখন আর সাড়া দিচ্ছে না।' টাকার কথা ভুলে বৃষ্টিতে একটা কোট গায়ে ছাতি নিয়ে বেরুলাম। দুঃখের কথা, রাস্তার কাদা মাথায় উঠলো। গঙ্গায় নৌকাযোগে যেতে হবে, ওরা গঙ্গার চরে বসতি করেছে।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি, প্রায় আধ মাইল জলকাদা ভেঙে গেলে নৌকায় পৌঁছানো যায়। উপায় নেই। টাল খেতে খেতে, কোনরূপে নৌকায় আশ্রয় নিলাম। নৌকার উপর দেখি প্রায় আরও ৪/৫ জন লুঙ্গিপরা মুসলমান বসে, প্রত্যেকের হাতে হেঁসো। অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। আমার সঙ্গে চাকর ছিল। চতুর্দিকে নদী সমুদ্রের আকার ধারণ করেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল। পাটের মাথা একটু একটু জেগে আছে। কত আবাদ, দরিদ্র চাষীদের যে কত ক্ষতি হয়েছে এই প্লাবনে তা সহজেই চোখে পড়ে। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে রোগীর ঘরের দাওয়ায় নৌকা পৌঁছালো। সেখান থেকে দেখি ঘরের ভেতর একটা শতছিন্ন মাদুরের উপর জ্ঞানহীন অসহায় অবস্থায় রুগী পড়ে আছে।

আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বুঝলাম হাতের নাড়ির গতি শূন্য। কলেরা হয়েছে। উঠে মাদুরের উপর পা দিতে দেখি খানিকটা জল উঠে পা ভিজে গেল। বয়স ৩০/৩২ হবে। আমার দিকে চেয়ে বল্লে, 'জল।' জল দিলাম, একটি ইনজেকশান দিলাম।

তখুনি স্যালাইন দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু পথের বিপদের কথা চিন্তা করে ভাবলাম মৃত্যুই একে শেষ করবে এবং এখুনি। তবুও ওদের বল্লাম, 'শীঘ্রই আমার সঙ্গে লোক পাঠাও। দেখি যদি কিছু করতে পারি।' গ্রামের লোকের বিশেষ একতা আছে এবং প্রায় প্রত্যেকেই আমার হাত ধরে অনুরোধ করে বল্লে, 'একে বাঁচিয়ে দিন। আল্লা আপনার মঙ্গল করবে। এর স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একেবারে পথে বসবে।' যৎসামান্য পারিশ্রমিকও ওরা দিয়েছিল। আসার সময় ভাঙা দাওয়ার ধারে কোনো এক ত্রিপুরাবাসিনী রমণী উদাসভাবে আমার দিকে চেয়েছিল। যেন আমার হাতেই ওর স্বামীর প্রাণ। হায় দুর্ভাগিনী পল্লী রমণী, মানুষ কত দীন, কত অসহায়, তোমায় কী করে বোঝাবো।

বাড়ি ফিরেছি ১৷৷০ টায়। এসেই লোকটাকে আবার পাঠালাম। 'তুমি একটা ওষুধ খাইয়ে এসো।' এইজন্যে পাঠালাম যে ঐ সময়ের মধ্যে, আমি ওষুধটা তৈরি করে নিই আর আহারাদি সেরে নিই। যদি এসে বেঁচে আছে বলে তা হলে নিশ্চয়ই যাবো।

ঠিক ৪টার সময় লোকটা ফিরে এসে বল্লে, ডাক্তারবাবু, চলুন। মনে ভাবছি এতটা কষ্ট, পারিশ্রমিক কিছুই হয়তো পাবো না। এমন কী ওষুধের দামও পাওয়া

যাবে না। যাই দেখি, যদি বাঁচে। ৫টায় পৌঁছে সেই জলের উপর দাঁড়িয়ে ডুসক্যানেবর সঙ্গে গ্লুকোস দেওয়ার নিড্‌ল দিয়ে ওর ভেন পাংচার করে দু বোতল স্যালাইন দিলাম। নাড়ির গতি তখুনি ফিরে এলো, কিন্তু দুর্বল। ডাবের জল ইত্যাদি খেতে বলে ফিরে এসেছি।

বাড়িতে যে উপায়ে স্যালাইন তৈরি করেছি এরূপ নিয়মে ওষুধ কখনো ব্যবহার হয় জানা ছিল না। অন্য কোনো স্থান হলে দিতে সাহস করতাম না। উপায়হীন, Experimental, something is better than I treat ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাগবত তত্ত্ব ভেবে নিয়েছি। জানি শেষ হবে। পরের দিন সকালে কোনো সংবাদ নেই। ভাবলুম মারা গেছে। বাতায়ন পথবর্তিনী সেই অসহায়া রমণীর উদাস নেত্রের কথা আমায় কেবলই ব্যথা দিয়েছে। ঠিক এই সময় বেলা তখন ৩টে, আবদুল এসে বল্লে, 'বাবু, কিছু খাইতে চায়, কী দেওন যায়?' আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলাম, 'এখনও বেঁচে আছে?' 'হ্যাঁ বাবু, কী যে কন।' বললাম, 'পেচ্ছাপ হয়েছে?' 'না। সেডা তো অয় নাই। আর হিক্কা আইতে আছে। বড় কষ্ট দেয়। ইডার কী করা যাইব।' বল্লাম, 'চলো, আজ আবার যাবো।' আবার দু'বোতল স্যালাইন তৈরি করে পুনরায় সেগুলি দিলাম। ঘরের দাওয়া উঠোন বন্যার জলে ভেসে গেছে। কাজ সেরে বাইরে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। নিম্নে দিগন্তবিস্তৃত বর্ষার প্লাবিত নদী, যেদিকে চোখ যায় শুধু জল, জল আর জল। গঙ্গার গৈরিমাটি রঙের জল, আর ওপরের অসীম নীল আকাশ, আর অতি ক্ষুদ্র আমি। এই প্লাবনপীড়িত পল্লীতে জীবন ও মরণের সঙ্গে যুদ্ধে। যোদ্ধার রসদ যোগাচ্ছি। দেখি যদি জয়ী হয়। এমন সময় একজন চীৎকার করে উঠলো, 'ডাক্তারবাবু, সাপ সাপ!' আমি অতর্কিত প্রাণভয়ে উর্ধ্বে লাফ দিয়ে উঠেছি। তখন ওদের একজন তার হাতেব লাঠি দিয়ে সাপটার পেটের কাছে আঘাত করেছে। পরে তাকে মেরে ফেললে। একটি মাঝারি রকমের গোখরো। মনে মনে হাসি এলো। নিজের মনে বেশ একটা গর্বের আনন্দ এসেছিল, এই রুগী প্রাণ পেয়েছে জেনে। বিধাতা বুঝি তাই সচল এবং চাক্ষুষ মৃত্যুদূত পাঠিয়েছিলেন আমায় সাবধান করে দিতে, ওরে এ গর্বের নয়, বৃথা গর্ব কিসের।

পশ্চিমাকাশে রক্তমেঘের লীলা, অস্তসূর্যের শেষ কিরণ মেঘের মধ্য দিয়ে সমস্ত পশ্চিমাকাশটা ছেয়ে ফেলেছে। ভাবছিলাম আজ যদি, এই স্বজন-বান্ধবহীন বন্যার প্লাবনের মধ্যে আমার শেষ হত। হয়তো আমার জন্যে কেউ বাতায়ন পথবর্তিনী হয়ে আছে, তার জীবনকাল এমনি চেয়ে থাকতো, আমার সঙ্গে আর দেখাই হত না— না না।

যখনই উনি প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, তখনই মনে পড়েছে, ওঁর প্রতীক্ষায় যে বাতায়ন পথবর্তিনী হয়ে বসে আছে তার কথা, কিন্তু সে প্রতীক্ষা অনন্তকালের জন্যে হবে আর দেখা হবে না, একথা এবং ব্যথা, উনি কখনও ভাবতে পারেননি, লিখতে গিয়ে কলম থেমে গেছে। অথচ সত্যিই যেদিন চলে গেলেন সেদিন কি আমার কথা একটুও মনে পড়েনি? একবারও মনে হয়নি আমার ওঁকে হারানোর কান্না যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুতে পরমাণুতে অনুরণিত হয়ে ওঁকে আকুল করে তুলবে, ব্যথা দেবে?

উনি ধলভূমগড়ে একা, দিদিরা দেশে, আমি তো ভাটপাড়ায়। ওঁর চিঠি আসে। পড়ে কষ্ট হয়, বেচারীর সারা জীবনই যুদ্ধের ইতিহাস। ঘাটশিলার বাড়ি নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমি কিছু করতে পারছি না। ওঁর চিঠির আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকি। চিঠি আসে—

সোমবার

৩১. ৫. ৪৩

কল্যাণীয়াসু

প্রিয়া, আজ এইমাত্র বাড়ি থেকে আসছি। ৪ দিন পূর্বে তোমার পত্র পেয়েছি। আর পরশুদিন মি. সিনহা ব্যারাকপুর ঘুরে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। দাদা ও বৌদিরা পত্র দিয়ে গেলেন। দাদা লিখেছেন ওঁরা আর ১০/১২ দিন পরে পুরী যাবেন, তারপর ফেরার পথে তোমাকে ব্যারাকপুর নিয়ে যেতে পারেন। এঁবাই আছেন ভালো। খুব ঘুরে বেড়িয়েছেন। সবাই নদীতে সাঁতার, পিকনিক, মিটিং ইত্যাদি হৈ হৈ সব হয়েছে। বৌদিও বেশ দুঃখ জানিয়েছেন আমি যেতে পারিনি। ইত্যাদি।

কয়েকদিন কিরূপ ভুগেছি জানো। গত সপ্তাহের পূর্বে তোমাকে পত্র লেখার পরের দিন হঠাৎ সন্ধ্যা থেকে পায়খানা শুরু হল এবং রাত্রে ভীষণ জ্বর। পরের দিন দুপুরের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল, কিন্তু ভীষণ রক্ত আমাশা শুরু হল। ৪/৫ দিন কিছুতেই কমে না। ঔষধ খেয়েও মানতে চায় না। এই দারুণ জঙ্গলের মধ্যে, ভাবলাম টাটা হাসপাতালে যাই, কিন্তু তাও যেতে পারিনি। একটু একটু করে কমেছে। এখন ভাল আছি। ৬/৭ দিন খুব কষ্ট পেয়েছি। ওকথা ভেবে লাভ নেই। সুখ আর দুঃখ চক্রাকারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আসে আর যায়। কয়েকদিন হল আমার আলাদা কোয়াটার শুরু হয়েছে, কিন্তু এই ক্যাম্পের মধ্যে। তোমায় কেমন করে আনি তাই ভাবছি। আর কোন অফিসার পরিবার নিয়ে এখানে বাস করছেন না। চারিদিকে লোকের ঘিঞ্জি, আমার কোয়াটারের পাশেই পাঞ্জাবীদের ডেরা। তুমি এখানে এসে

থাকলে খুবই কষ্টে পড়বে। ঘর থেকে একটুও বেরুতে পারবে না, চলাফেরার মধ্যে খুবই কষ্ট হবে। তাই আবার ভাবছি, যা হোক একটা ব্যবস্থা করবোই। ঘাটশিলার বাড়িতেও থাকতে পারো। কারণ ওভারসিয়ারবাবুর বাড়ি আজকাল ভর্তি হয়ে আছে। আমারও ভাল লাগছে না। আমি উপস্থিত যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। দিন ১৫/২০ পরে একবার ছুটি নিতে চেষ্টা করবো।

রাণাঘাট গিয়েছিলে, ওদের বাড়ি গিয়েছিলে, বেশ ভালো। ওরা কোন পাড়ায় থাকে, ঠিকানা কী? ওদের বাড়ির সকলেরই বেশ মিষ্টি ব্যবহার। যাক, আমি কিন্তু ভাবছি যুদ্ধে যাবো। তাতে তোমার ভাববার কিছু নেই, জানলে? ভারতবর্ষের মধ্যে থাকতে হবে। জীবন বিপন্ন আজকাল ভারতের সব স্থানেই। সুতরাং অর্থ এবং পদগৌরব ছেড়ে লাভ কী? তুমি নিশ্চয়ই বিচলিত হবে না। মাকেও বলতে পারো। আমি এদের এখানে মাইনে বাড়াবার দরখাস্ত দিয়েছি। যদি বেড়ে যায় তাহলে থাকবো নইলে যুদ্ধে যাবো মনে করেছি। ৪০০ টাকা মাইনে পাবো। ৯৫০ টাকা পর্যন্ত বাড়বে। আংটিটা পাথর কেটেও করতে পারো, ভাল দেখতে হলেই ভাল। এখানে আমার ভাল লাগচে না। ওবাড়ির সব সংবাদ দিও। দাদা নাকি একমাস কলকাতা থাকবেন জানিয়েছেন। তারপর এদিকে আসবেন শ্রাবণ ভাদ্রে। মা এবং আর আর সকলে কেমন আছেন ও আছে? বাবা মাকে প্রণাম দিও। ছোটদের স্নেহাশীষ দিও। তুমি আমার ভালোবাসা নাও। তোমাকে একটা কাগজ পাঠাচ্ছি।

ইতি

তোমার

চিঠি পড়ে মন খারাপ লাগে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঁর অসহায় অবস্থা বুঝি। আমার মনও খুব খারাপ হচ্ছে।-আমার নিজের হাতে গড়া সংসার, ওঁর প্রতিটি জিনিসের ওপর আমার অসীম মায়া, অসীম ভালোবাসা। আয়োজন যত সামান্যই হোক, আমার কাছে এর মূল্য অসামান্য। সব কোথায় পড়ে রইল। স্বামী কোথায় কোথায় ঘুরছেন, তাঁকে সান্নিধ্য দেওয়ার সুযোগ নেই, নেই রোগে সেবা ও সহানুভূতি দেখাবার উপায়ও। আমি জানতাম পরের চাকরি ওঁর ধাতে সইবে না। বেলডাঙায় এককথায় চাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন। এখানে তবু ধৈর্য ধরে আছেন। দাদাকে বারবার লিখছেন— 'এখানে ভালো লাগছে না, চাকুরি ছেড়ে দেবো।' যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা, বলা যায় না, চলে যেতে পারেন। আশঙ্কায় বুক আমার দুরদুর করছে। কাউকে বলতে পারছি না। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছি। ওঁকে লিখলাম— 'আমাকে

কাঁদাবার জন্যই কি এ ভীষণ যুদ্ধে যাওয়ার ব্যবস্থা করছ?' আর কী লিখেছিলাম মনে নেই। তার উত্তরে লিখলেন—

ধলভূমগড়
সোমবার

প্রিয়তমাসু,

কাল সকালে তোমার পত্র পেয়েছি। চিঠিখানা ৪ দিন ঘাটশিলার পোঃ অফিসে এসে পড়েছিল। তার কারণ হচ্ছে গুটকে আজকাল প্রায়ই এখানে থাকে। ওকে একটা A R Pতে চাকুরী করে দিয়েছি। ও মাসে ২৫ টাকা পাবে। সূর্য্যিও ২২ টাকা মাইনের চাকুরী করছে এখানেই আমার কাছে। তোমার আদেশমত শান্তকে কিছু টাকা পাঠিয়েছি এবং প্রাপ্তি সংবাদও পেয়েছি। সুতরাং তুমি আর ভেবো না। তোমার ছোট মাথার মধ্যে অত ভাবনা কিসের ও ভারগুলো তুমি আমার উপর নিঃসন্দেহে চাপিয়ে দাও।

মীন্ তোমাকে কাঁদাবার জন্যই কি দারুণ এই মারাত্মক যুদ্ধের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি? তা ঠিক নয়। তোমাকে হয়তো আরও বেশী সুখী করার জন্যে এই বিরাট অভিযানের কথা মনে এসেছে। মৃত্যু জীবনের মধ্যে মাত্র একবারই আসবে। সত্যই যদি পৃথিবীর এই দুর্বিপাকের দিনে আমার জীবনের শেষ অঙ্কের অভিনয় হয়, তা হলে সে যবনিকাপাত থেকে কেমন করে বাঁচবো? আর তোমার সিঁথির সিন্দুররাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনদীপ যদি উজ্জ্বলতর হবার ইঙ্গিত থাকে তা হলে, মানা, সে লিখন মুছে ফেলবে কে! তুমি চিন্তিত হবে না। একমনে চিন্তা করে যাবে বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তাঁর কথা। তিনি এই জীবনপথের একমাত্র কাণ্ডারী 'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'' তিনি যা করাবেন তাই করে যাবো। অবশ্য এখনও আমি কিছু পাকা স্থির করিনি। তবে এদের সঙ্গে আমি ঠিক খাপ খাইয়ে চলতে পাচ্ছি না। অনেক কিছুই সুবিধা করে দিয়েছে, কিন্তু মাইনেটা আশানুরূপ করেনি। যাই হোক, তুমি ভেবো না! আমার প্রকৃতিকে তুমি খুব ভালো করেই চিনেছ কতকটা। আমার দুর্বুদ্ধি যদি একবার জেগে ওঠে হয়তো আমি চলে যেতে পারি। তবে নিশ্চিন্ত থাকো। এখনও কিছু স্থির হয়নি। মামীমার নিকট লিখেছিলাম। উনিও লিখেছেন— 'খুব চিন্তা করে তবে বিপদের মধ্যে যাবে। একটুও যদি আশঙ্কা থাকে তা হলে আবশ্যক নেই।' ইত্যাদি। দাদা লিখেছেন, 'যদি ভালো বোঝো যেতে পারো।'

অসুখ হলে সত্যিই ভারী কষ্টে পড়ে যাই। তখন প্রতি মুহূর্তে তোমার সেই আন্তরিক সেবারত ছবি মনের মধ্যে ভেসে আসে। মানা, কোনো সদ অসদ কাজ করতে গেলে কেবল তোমার ছবি এসে বাধা দেয় বা উৎসাহ দেয়, তাই মনে হচ্ছে

আমার অজান্তে আমার অন্তরের কতকটা তুমি আপন আসন রচনা করে নিয়েছ। ধন্য নারী, মায়াময়ীও বটে, আরও কত কিছু। তোমার চিঠি পেতে ভারী দেরী হচ্ছে, তাই যেন দিতেও দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি যে কবে তোমার সান্নিধ্যে যাবো তা বলতে পাচ্ছি না। শীঘ্রই যাবো। আশায় থাকবে। কায়দা করে ছুটি নিয়ে যাবো। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করবে।

ইতি

তোমার

তুমি না থাকলেও আমার অনেক বিপদ হতে পারে। বাড়ির জিনিসপত্র আছে একরকম তালগোল পাকিয়ে।

৫১

কিছুদিন পরে আমি ঘাটশিলার বাড়িতে এলাম। উনি ধলভূমগড়ে। দু-একদিন বাদে বাদে উনি আসতেন। মাঝে মাঝে বড়ঠাকুর-দিদি আসতেন। এইভাবে দিন কাটছে। সেবার মিতেদা, মিতেদার স্ত্রী, গৌরীদি, ছেলেমেয়ে ডলি ও মান্তু— সবাই এসেছে। দিনগুলো ভালোই কাটছে। উনি প্রায়দিন রাত্রে ধলভূমগড় থেকে আসছেন। বড়ঠাকুরের চিঠি এল— 'আমরা যাচ্ছি।' আমাদের তো ষোলোকলা পূর্ণ।

ওঁরা এলেন। সেবার দিদির শরীর ভালো ছিল না। তবুও আমাদের কথা এবং বেড়ানো কিছু কম হয়নি। দিদির দুটি মেয়ে হয়ে বাঁচল না। প্রথম মেয়েটি হওয়ার সময় দিদি অনেকদিন টাইফয়েডে ভোগে। সেই অবস্থায় মেয়েটি হয়েছিল, কিন্তু বাঁচানো যায়নি। দ্বিতীয়টি মৃতই হয়েছিল। দুটি মেয়ে হবার সময়ই বড়ঠাকুর দিদিকে দেশে নিয়ে যান। বাড়িতে লোকজন নেই, আমরা ঘাটশিলায়। আমাদের আসতে বারণ করছেন। সেই পরিস্থিতির মধ্যে দুটি সন্তান চলে গেল। সেই থেকে দিদির দেহ এবং মন ভেঙে গেছে। বাড়ির সবারই মন খারাপ। তবুও দিন চলছে, আমরা বেড়াচ্ছি। কোনো কিছুই বন্ধ নেই।

গৌরীদিরা আসছেন। বড়ঠাকুরদেরও খুব বেড়ানো আড্ডা চলছে। মিতেদা আছেন। আমার স্বামী রাত্রে বাড়ি চলে আসছেন। ওই সময় আমার শরীরও ভালো ছিল না। ওঁর হঠাৎ কলকাতা যাওয়ার দরকার পড়ল। আমায় বললেন, 'চলো, তোমার ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে আসি। বৌদিরা আছে, এই সময় তোমার অপারেশনটা সেরে ফেলা যাবে।' দিদি বললে, 'সেই ভালো। তুই কলকাতা যা, আমি আছি।'

আমি চিরদিনই দিদির অনুগত। দিদি যা বলবে তাই ঠিক। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতাম, ভালোবাসতাম। কখনও কেউ কারওর কথার বা কাজের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করিনি। সবাই বলত, 'এদের মতো দু'জায়ে মিল দেখা যায় না। বোনে-বোনে ঝগড়া হয়, এদের কিন্তু ওসব কখনও দেখিনি।' শুনে আমরা হাসতাম। গজেনবাবু, লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্রমশাই বলতেন, 'কল্যাণী বৌদি আর যমুনা বৌদির এত মিল যে গলার সুরটা পর্যন্ত একরকম।'

দু'জায়ে গল্প-করা নিয়ে প্রচুর বকুনি খেয়েছি। কত সময় গল্প করছি, উনোনে ডালতরকারি গেল ধরে। এইসব আর কী। কিন্তু যত যাই হোক, আমাদের গল্পে কখনও ভাটা পড়েনি। ওঁরা দু'ভাই মাঝে মাঝে আমাদের গল্পের জন্যে বকতেন বটে, কিন্তু আমরা জানতাম, আমাদের এই দু'জায়ের মধ্যে ভালোবাসা ওঁরা মনে মনে সস্নেহে উপভোগ করতেন। কত সময় দু'জায়ে গলা মিলিয়ে গান করেছি, কবিতা পড়েছি, কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে হেসেছি। জীবনের অনেকগুলি দিন ওইভাবে কেটেছে। তখন জীবনবীণায় কত সময় কত সুর বেজে উঠত। সেদিনগুলি আর ফিরে আসবে না। শুধু স্মৃতির পরতে পরতে সাজানো থাকবে।

দিদি-বড়ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে আমার স্বামী এবং আমি এগারোটার প্যাসেঞ্জারে রওনা হলাম। ভাটপাড়া পৌঁছতে রাত্রি হয়ে গেল। মা, মামা, মামিমা, দেওর, ননদরা সবাই খুশি। সেদিন আর বাপের বাড়ি যাওয়া হল না।

পরদিন বাপের বাড়ি ঘুরে ওঁর সঙ্গে কলকাতা গেলাম। ডাক্তার দেখাবার জন্যে। কিন্তু বিধি বাম, কী যেন একটা অসুবিধা হল, ডাক্তার দেখানো হল না। উনি বললেন, 'চলো, তুমি তো ভিক্টোরিয়া দেখনি, চলো ঘুরে আসি।' সেদিন ভিক্টোরিয়া দেখে খাওয়াটা দোকানে সেরে একটা সিনেমা দেখি। তারপর ভাটপাড়ায় ফিরেছিলাম। দুটো দিন ভাটপাড়া থেকে ওঁরই সঙ্গে ঘাটশিলায় ফিরে এলাম। এর কিছুদিন পরে দিদিরা দেশে চলে এলেন।

আমি ঘাটশিলায় উনি ধলভূমগড়ে। প্রায় প্রতিদিন বাড়ি আসেন। একদিন বললেন, 'তোমার ডাক্তার দেখানোর দেরি হয়ে যাচ্ছে। শান্ত কলকাতা যাচ্ছে, ওঁর সঙ্গে ভাটপাড়া চলে যাও। আমি এদিকটা একটু সামলে যাব।'

আমি শান্তর সঙ্গে এলাম। ওঁর তাড়াতাড়ি আসার কথা। দেরি হচ্ছে, চিঠিও নেই। আমি মনে মনে ভাবছি, কিছু হল নাকি? ডাক্তার দেখিয়ে আর কাজ নেই। ফিরেই যাই। ওঁকে ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখলাম। ইতিমধ্যে বড়ঠাকুর একদিন ভাটপাড়ায় এলেন। ওঁর চিঠি এল---

ধলভূমগড়

মীন,

তোমার পত্র পেয়েছি। কী যে লেখো ঠিক বুঝি না। আরও বড় করে লিখবে। হাতের লেখা একটু ভালই হয়েছে। আচ্ছা এই তো কদিনমাত্র গেছ, এর মধ্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন বল তো? দাদার পত্রেই জানলাম উনি ভাটপাড়া গিয়েছিলেন। তুমি ওঁর সঙ্গে বোধ হয় যাওনি মনে হচ্ছে। আমি ছুটি পাওয়ার চেষ্টা করছি। পেলেই অনেক কাজ আছে। হাসপাতালে তোমার বন্দোবস্ত সর্বপ্রথম।

কাল সিংহসাহেব এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ছিলেন, মানে খাওয়াদাওয়া করে সমস্ত দুপুর। সাঁওতালদের নিয়ে এক ছোটগল্প লিখেছেন, বেশ চমৎকার। আমাকে মুখে মুখে বললেন। সেটার আবার বাংলা করেছেন, উৎসাহী সাহিত্যিক বটে। ভারী মজার কথা একটা শোনো। বেশ একটা হারমোনিয়াম পেয়েছি। পুরানো হলেও খুব সুন্দর সুরটা। কলকাতার নামজাদা দোকান ডোয়ার্কিনের বাড়ির জিনিস। আর তোমার জন্যে চমৎকার একটা জিনিস, বলব না এখন কী। কয়েকদিন খুব টাটা আর চাকুলিয়া ইত্যাদি যাচ্ছি। আমাদের পাড়াতে পুজো হচ্ছে রমণীবাবুর বাড়িতে। পরশু বাড়ি গিয়েছিলাম। মঙ্গলা সঙ্গে যায়, রান্না করে, ফুলমণি অন্যান্য কাজ করে দেয়। তোমরা যাওয়ার পরই উৎপলরা পালিয়েছে। ৬/৭ দিনের মধ্যেই শুনেছিলাম। নমিতা আছে, মধ্যেমধ্যে দেখা হয়।

পুজো তো আসছে। ভাবনা কবার কী আছে। আনন্দ আর ফূর্তি নিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে। তা সামনে যাই থাক না কেন। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মরীচিকা আর অতীতের দৈন্য দুঃখগুলোকে মনে করে মন ভার করে কোন উপায়ও নেই আনন্দও নেই, শান্তিও নেই। বর্তমানকে যে করে হোক মঙ্গলময় শান্তিময় করে তুলতে হবে। তার জন্য সব কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করে নিতে হবে। প্রীতি নাও।

ইতি

তোমার

চিঠিখানা পেয়ে মনে বেশ আনন্দ হল। যাক, এতদিনে ওঁর একটা ভালো হারমোনিয়াম হল। এত গান ভালোবাসে। বেচারির কোনো আশাই পূর্ণ হল না। আর আমার জন্যে কী কিনেছে লেখেনি। জিনিসটা কী জানার জন্যে আমি মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

কয়েকদিন পরে উনি মামার বাড়ি এলেন। আমি তখন ওখানেই আছি। দেখি না একটা খুব সুন্দর পাথর-সেটিং আংটি। আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা নুটু তোমার জন্যে এনেচে। আর একটা কাপড়।'

পরে একসময় উনি আমাকে বললেন, 'আংটিটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?' আমি বলেছিলাম, 'খুব পছন্দ হয়েছে। তবে ওটা তো তুমি দাওনি। মা দিয়েছেন।' শুনে হেসে উনি বলেছিলেন, 'আরে, তুমি তো জানোই আমি দিয়েছি। মামিমার হাতে দিলাম, মামিমা কত খুশি হলেন বলো তো। গুরুজনদের আশীর্বাদ নিতে হয়। তাঁদের সম্মান দিতে হয়, বুঝলে?'

শুনে সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমার স্বামী ছোট মামিমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। ওঁর মৃত্যুকালে মা যদি ওই সময় ঘাটশিলায় থাকতেন তা হলে হয়তো ওঁর এই বিভ্রান্তি আসত না।

পরদিন ওঁর সঙ্গে আবার কলকাতা এলাম। এবার ডাক্তার ব্যবস্থা করলেন। ডা. সুধাংশু, পদবিটা মনে নেই। এই ডাক্তারবাবু ছিলেন ওঁর মাস্টারমশাই। যাই হোক, কয়েকটা পরীক্ষার পর অপারেশন হবে ঠিক হল। সব ব্যবস্থা করে বললেন, 'চলো বিভূতিদার বাড়িতে যাই।'

সেদিন ওঁদের বাড়ি গিয়ে খুবই আনন্দ হয়েছিল। আমার স্বামী তো ওঁদের মাঝে গিয়ে মহাখুশি। সেদিন আর কিছু নয়, সোজা ভাটপাড়ায়।

পরদিন উনি চলে যাবেন। ঠিক হল, অন্যান্য পরীক্ষাগুলো হয়ে গেলে অপারেশানের আগে এখান থেকে কেউ আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে। সঙ্গে মা যাবেন এবং থাকবেন।

ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই নার্সিংহোমের ব্যবস্থা। উনি ধলভূমগড় চলে গেলেন। বেচারি একটুও স্বস্তি পাচ্ছেন না। নিজে ধলভূমগড়ে, ওখানে আমাকে রাখার অসুবিধা। ঘাটশিলার বাড়িতে আমাকে একলা রেখেও স্বস্তি পাচ্ছেন না। তার ওপর আমার এই ঝামেলা। চিঠিতে লিখলেন—

ধলভূমগড়
বৃহস্পতিবার
১০টা

মীন্,

তুমি দূরে রইলে, তাই একটুও ভালো লাগছে না। কতদূর কী হল যেন, তোমার পরীক্ষা শেষ হলে বাঁচি। আর কতদিন লাগবে জানিও। পরশু দাদা ও পচাদা এসেছিলেন। কাল রাত্রে চলে গেলেন। চাইবাসায় সিংহসাহেবের ওখানে গিয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে বেড়ানো গেল।

একা মোটেই দিন কাটছে না, সবই যেন ফাঁকা। কাল একটু জ্যোৎস্না উঠেছিল। মহুয়াগাছের তলায় বসে বসে ভাবছিলাম, কীরূপ ছন্নছাড়া আমার জীবন, আমার

সঙ্গে যে এলো তার জীবনটাও ঐরূপ ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তাকে আনন্দ দেওয়া আর হল না। মীন্, তোমাকে দূরে রেখে আনন্দ নেই। কী জানি কেন। আবার রাখারও স্থান নেই। তাই এক-একবার মনে হচ্ছে নিজেই অনেক দূরে চলে যাই। এইসব চিন্তা থেকে দূরে থাকলেই যেন ভাল হয়। তুমি পত্র দিও। আমার একটু বিলম্ব হয়ে গেল, দিচ্ছি দিচ্ছি করে কেটে গেল কদিন।

এখানে দারুণ বৃষ্টি হয়ে গেল।... 'দেবযান' পড়লে বেশ আনন্দ পেতে। কিন্তু তুমি অন্য রাজ্যে থাকছ, বই পাওয়া দায় হবে। পেলে নিয়ে পড়ো। দাদা ওদিকে বই পাঠাবেন না কেন জানি না। তুমি কেমন আছো? আমাকে শীঘ্র পত্র দিও। মনটা খুব ভারী, তাই পত্রটাও কেমন খাপছাড়া হল।

আমার প্রীতি নাও। ইতি

তোমার

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে আমি নার্সিংহোমে গেলাম এবং অপারেশান হল। ওইদিন ঠিক সময়েই উনি এসেছিলেন। আমার জ্ঞান ফেরার সময় দেখলাম মা ও উনি বসে আছেন। সেদিন রাত্রে উনি ডাক্তারবাবুর উপরে অনেকক্ষণ গান করেছিলেন। পরে বন্ধু বিজুর বাড়ি যান। তারপর দুদিন ভাটপাড়া আর কলকাতা করেন। তৃতীয় দিন আমি ছাড়া পাই। ওইদিন আমাকে ও মাকে সেজঠাকুরপোর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে উনি কলকাতা রইলেন রাত্রের গাড়িতে 'ধলভূমগড়' যাবেন বলে। ঠিক ছিল দিনআষ্টেক পরে ওঁর বন্ধু ডা. ব্রজেশ্বর বোসের ধর্মতলার চেম্বারে গিয়ে ইলেকট্রিক তাপ নিতে হবে। ওই সময় আমি আমার বড় মাসিমার বৌবাজারের বাসায় ছিলাম। আমার মাসতুতো ছোটভাই কৃষ্ণদাস মুখার্জি আমাকে ধর্মতলায় সঙ্গে করে নিয়ে যেত। দিনকয়েক পরে উনি চিঠি লিখলেন—

ধলভূমগড়
বুধবার

কল্যাণীয়াসু

মীন্, সেদিন তো কোনরকমে বাড়ী গেলে। আমি কলকাতা থেকে একটা পত্র দিয়েছি। নিশ্চয়ই পেয়েছ? গতকাল তোমার কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল, গিয়েছিলে নাকি? জানাবে কেমন লাগল। সেদিন এখানে আসা হয়নি কারণ ব্রজেশ্বরের পাকা-দেখা ছিল। কিছুতেই আসতে দিল না। ঐদিনই "উদয়ের পথে" দেখে এসেছি। বেশ লাগলো বইটা। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ? চলার পথে একমাত্র সঙ্গী করে নিলে। বৈকালে 'সন্ধি' বলে বইটা দেখলাম। মন্দ নয়।

আচ্ছা, সেদিন ক্লোরোফর্ম করে যখন অজ্ঞান করেছিল সেই অবস্থায় মনের কেমন চিন্তা এবং অনুভূতি এসেছিল চিঠিতে লিখতে চেষ্টা করবে, কেমন? গত রবিবার সন্ধ্যার ট্রেনে দাদা এসেছিলেন এবং কাল এসেছিলেন যোগেন সিনহা। খুব গল্প আর আহারাদি হল। পরশু সন্ধ্যায় একটা গাড়ি পাওয়া গেল। দাদা, আমি, আচার্য্য S D. O আর গুটকে তিনজনে ভট্টাচার্য্যমশাই-এর বাড়ী গেলাম, আবার গল্প। প্রায় ৯৷৷০ রাত্রি হলো। ফিরে এসে দাদা এদিকের বিরাট জ্যোৎস্নার রূপের গল্প কল্লেন, পরে কাল সন্ধ্যার দিকে আমরা গেলাম এদিকের ঐ নদীর ধারে। চতুর্দিকে জ্যোৎস্না নেমেছে। শাল আর শ্যামল লোহাজাঙ্গির গাছ। এদের ছায়াতে আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি, সে এক অপূর্ব রূপ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষণ আমরা বসেছিলাম। ফিরে এসে বহু গল্প হল। দাদা বোধ হয় শান্তিনিকেতনে চাকুরী নিয়ে যাচ্ছেন শীঘ্রই, মানে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই। তা হলে তোমাকেও সেখানে যেতে হবে ছাত্রী হিসাবে। ২/৩ বৎসর সেখানে থেকে দাদা যে কদিন থাকবেন সে কদিন ওদিকে থেকে বেশ পড়াশুনো করবে। মধ্যেমধ্যে আমিও যাবো। আত্মার উন্নতির চেয়ে পার্থিব জীবনে আর কিছুই বড় নয়। আমার শরীর ভালই আছে। তুমি কেমন থাক, কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানিও। যদি সম্ভব হয় ব্রজেশ্বরের বৌভাতে তুমি চলে যেও কাউকে সঙ্গে নিয়ে। মনে হয় তোমাকে বলবে। বেলা এখন ২টা। এইমাত্র খাবার দিয়ে গেল, খেয়ে নিয়ে আবার লিখব। আজও বাইরের এক ভদ্রলোক সঙ্গে খাচ্ছেন। তুমি অনেকদিন আছো। কেমন ভাল লাগছে না। আর কিছু লিখব না আজ। তুমি শীঘ্রই পত্র দিও, আমার ভালবাসা নাও।

ইতি
তোমার

আমি সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি দিলাম, আর লিখেছিলাম, 'এবার আমাকে নিয়ে যাও। অনেকদিন হয়ে গেল এসেছি।' উনি লিখলেন—

ধলভূমগড়

প্রিয়া

মীন্, তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে শীঘ্রই এখানে আনবো। চিন্তা করবে না। আমার মন ততটা ভাল নয়। কেবলই মনে হচ্ছে, প্রতিক্ষণে, প্রত্যেক স্মরণে যে, এমনি সময় যদি কেউ কাছে থাকত তাহলে বেশ হত। কিন্তু কখন কখন বিধাতা চক্র ঘুরিয়ে দেন। মানুষ যা চিন্তা করে, তা সবসময় হয়ে ওঠে না। তুমি ব্রজেশ্বরের বিয়ের জন্য কিছু ভেবো না, ও আমি এখানে বসে ব্যবস্থা করবো। তুমি বলবে যে

সে আসতে চেষ্টা করবে বলেছে, আপনি ভাববেন না। তুমি ছদিন লাইট নেবে। কলকাতায় থেকো, যেমন শেষ হবে আমাকে জানাবে যে ঐ তারিখে শেষ হবে। এখান থেকে গিয়ে আমি ঠিক ঐ তারিখে নিয়ে আসবো। আমি এ সম্বন্ধে ছোট-মামাকেও পত্র দিয়ে রাখব যে তোমার জিনিসপত্র সব কেউ সম্ভব। হলে কলকাতায় দিয়ে যাবে। দেখি চিন্তা করে কোনটা সম্ভব। ১৩/১৪ তারিখ ইংরাজী পর্যন্ত ওখানে থাকতে চেষ্টা করবো। পরে আবার পত্র দিচ্ছি। আমার ভালোবাসা নাও।

ইতি

তোমার

উনি লিখলেন বটে, কিন্তু একান্ত ইচ্ছা থাকলেও কাজের চাপে আসতে পারলেন না। আমি বাপের বাড়ি চলে এলাম। এদিকে মামার বাড়িতে মেজ ঠাকুরপোর দারুণ অসুখ। খোকন (দেওর) এসে আমাকে ওবাড়ি নিয়ে গেল। ওই সময় হঠাৎ বড়ঠাকুর এলেন। তখন মেজ ঠাকুরপোর খুবই বাড়াবাড়ি চলছে। সে রাত্রে আর ফিরলেন না, থাকলেন। পরদিন সকালে দেশে চলে গেলেন এবং ভাইকে চিঠিতে সব জানিয়েছিলেন—

Gopalnagar P.O

কল্যাণবরেষু,

এইমাত্র স্কুলে বসে তোমার পত্র পেলাম। চাইবাসা ও সেরাইকেলা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে খুশি হলাম। সুবোধ ও যোগেন 'দেবযান' পড়ে কী বললে? এখানে ৪০০ কপি 'দেবযান' হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। এক ভদ্রলোক বরিশাল থেকে লিখেছেন, পুত্রশোক ভুলেছেন 'দেবযান' পড়ে। দীর্ঘ পত্র লিখেছেন আমায়, বইখানি লেখা সার্থক। ধনপতিবাবুর ভাল লেগেছে, এতে আমি খুশি। তাঁকে আমার নমস্কার জানিও। বড় ভালো লোক। গত রবিবার ভাঁটপাড়া গিয়ে দেখি মনু ভীষণ ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। ক্ষীণ নাড়ী। রাত্রে উঠে দুবার নাড়ী দেখলুম। মামীমা ও ছোটমামা সারারাত জেগে। তোমাকে টেলিগ্রাম করবে বলেছিলেন। এখন একটু সেরেছে। বৌমা সেখানে আছেন। বাপের বাড়ী থেকে ওঁরা আনিয়েছেন, শরীর ভালই আছে। কলিকাতায় গিয়েছিলেন। আবার ডাক্তার একবার যেতে বলেছেন। বৌমাকে ঘাটশিলায় নিয়ে যেয়ো। জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ইদের ছুটিতে (বকরিদ) ধলভূমগড় যাবো। ইন্দু রায়েরও যাবার খুব ইচ্ছা। তিনদিন ছুটি। ইন্দু রায়ের ভয়ানক ভালো লেগেছে 'ধলভূমগড়' ও 'ঘাটশিলা'। আমাদের সেই গাছটাতে বড় লাউয়ের জালি পড়েছে। পালংশাক বোনা হয়েছে। এখানে খুব ম্যালেরিয়া ঘরে

ঘরে পড়ে। ইন্দু রায়ের বাড়ি হাসপাতাল। নিজে ইন্দু রায় ৪/৫ দিন শয্যাগত। আমাদের বাড়িতে ঈশ্বরেচ্ছায় এখন সব ভালো। বাহাদুর চলে গিয়েচে, তার আর থাকবার ইচ্ছা নেই। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। দিব্বি চলে যাচ্ছে। আধ সের খাঁটি দুধ যোগান, তিন আনা করে বেগুনের সের। যাবার সময় নতুন পাটালী নিয়ে যাবো। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া with menangitis। লোকও মরচে খুব। গ্রামে ২/৩ টি মারা গিয়েচে। কলকাতা ও ভাটপাড়ায় ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েচে। বৌমাকে নিয়ে আসার সাহস হল না। তবে আর দুদিন পরে শীত পড়লে থাকবে না। অনুকূলকাকার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েচে, চিঠি দিয়েচেন। দুঃখ করেচেন খুব। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২

এর কিছুদিন পরে। আমার যতদূর মনে পড়ছে, বড়ঠাকুর ঘাটশিলা যাচ্ছেন, আমার স্বামী ছোটমামাকে এবং আমার বাবাকে লিখলেন, আমার যাওয়ার সময় নেই। দাদা আসছেন। যমুনাকে কেউ যেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেয়। আমার মাসতুতো ভাই কেষ্ট আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি বড়ঠাকুরের সঙ্গে ঘাটশিলায় এলাম।

রাতের ট্রেন। অনেক রাত্রে ঘাটশিলায় পৌঁছলাম। গাড়ি ছিল। বড়ঠাকুর নিলেন না। বললেন, 'একটুখানি রাস্তা হেঁটেই দিব্যি চলে যাওয়া যাবে।' কুলির মাথায় বাক্স দিয়ে হেঁটে বড়ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ি এলাম। গভীর রাত্রি। সবাই ঘুমোচ্ছে। বড়ঠাকুরের ডাক শুনে উনি তাড়াতাড়ি করে বিছানা থেকে উঠে এসে গেটের তালা খুলে দিলেন। গায়ে মাত্র একটা সুতোর হাতকাটা গেঞ্জি। আজ ওঁর সেই সদ্য ঘুমভাঙা মুখটা মনের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সেই আগ্রহভরা দৃষ্টি, সেই উন্মুখতা, সেই আনন্দময় প্রসন্নতা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। বোধ হয় জীবনে একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কারুর কাছ থেকেই তেমনি প্রসন্নময় দৃষ্টি পাওয়া যায় না।

একবার শীতকালে আমাদের মৌভাণ্ডারের ফ্যাক্টরিতে প্রচণ্ড অ্যাকসিডেন্ট হল। বোধ হয় কয়েকজন প্রাণ হারালেন। আর বেশ কিছু হলেন আহত। তাঁদের ওখানকার হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। জীবন সংশয়। ওখানকার হাসপাতালে মাত্র একজন ডাক্তার। সুতরাং আরও ডাক্তারের প্রয়োজন। আমার স্বামীকে ওঁরা ডাকলেন। উনি রাত্রের ডিউটি নিলেন, দিনে নিজের রুগিপত্র আছে। সন্ধ্যায় চলে যেতেন। সারারাত্রি হসপিটালে ডিউটি দিতেন, শেষরাত্রে ফ্যাক্টরির গাড়ি এসে দিয়ে যেত। উনি এসে

ডাকতেন, আমি লেপ ছেড়ে তাড়াতাড়ি করে উঠে এসে গেট খুলে দিতাম। দেখতাম রাত্রিশেষের ম্লান জ্যোৎস্নায় ভরে আছে চারিদিক, সিদ্ধেশ্বর ডুংরির গায়ে জ্যোৎস্নার আস্তরণ। নদীর ওপারের শৈলশ্রেণির বুক যেন ধোঁয়াচ্ছন্ন। দুলো সাঁওতালের বাড়ির তেঁতুলগাছটার পাতা ঝিরঝির করে কাঁপছে। ওঁর গায়ে গরমের লংকোট, মাথায় টুপি, কালো ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে দুটি উজ্জ্বল চোখ। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তালা খুলতে খুলতে বলতাম, 'উঃ, বড্ড শীত করছে।' উনি বলতেন, 'শীত কোথায়। চলো একটু বেড়িয়ে আসি।' আমি বলতাম, 'না বাবা। এই শীতে আমি এক পাও যাব না। তুমি শিগগির ভেতরে এসো।'

আজও হঠাৎ শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে যেন শুনতে পাই উনি ডাকছেন, 'দরজা খোলো।' হঠাৎ ছায়াছবির মতো মনের পটে ভেসে ওঠে সেইসব দিনের কথা ও ছবি।

আমাকে দিয়ে বড়ঠাকুর কয়েকদিন পরে দেশে চলে গেলেন। এবার বড়ঠাকুরের চিঠি এল— 'আমি আর তোমার বৌদি গজেন-সুমথদের সঙ্গে বেড়াতে যাবো ঠিক হয়েছে। কী কতদূর হয় কলকাতা না গেলে বুঝতে পাচ্ছি না।' উনি বাড়ি এসে বললেন, 'দাদারা বেড়াতে যাচ্ছেন। ওখান থেকে ফিরে এখানে আসবেন।'

অনেকদিন এঁদের বাড়িতে এসেছি, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির দেশ দেখিনি। গ্রামের গল্প শুনি, গ্রামের লোকজন আসে দেখি। ওঁরা দু-ভাই, উমা, শান্ত, গুটকে, দিদি একসঙ্গে হলে সবাই দেশের গল্প করে, আমি চুপ করে শুনি। খুব খারাপ লাগে। যেতে ইচ্ছা করে, দেখতে ইচ্ছা করে। কখনও গ্রাম দেখিনি। ওঁকে বলি, 'চলো না, একবার দেশে যাই।' বলেন, 'সময় কোথায় বলো তো! দেশে যেতে গেলে কয়েকটা দিন হাতে নিয়ে যেতে হবে। এদিকে আসতে দেরি হবে, পরের জীবনের দায়িত্ব নিয়েছি তাদের ছেড়ে যাই কী করে।' বলতেন, 'পরে যেয়ো।' আমার সত্যি দুঃখ হয়। মাঝেমাঝেই বলি। অভিমান হয়। উনি বলেন, 'দাদা বৌদির সঙ্গে যেয়ো।' কিন্তু কেউই আমাকে নিয়ে যায় না। মনে ব্যথা পুষে রাখি, কাউকে কিছু বলি না। দেশের কথা উঠলে চুপ করে থাকি, উনি বোঝেন ব্যাপারটা। বলেন, 'দুঃখ কোরো না। দেখো একদিন ঠিক নিয়ে যাব।'

সেবার দিদি, বড়ঠাকুর, উমা দেশে আসছেন, আমার স্বামী বললেন, 'তুমি ওদের সঙ্গে ভাটপাড়ায় ঘুরে এসো। আমি একসময় গিয়ে নিয়ে আসব।' সেই কথামতো আমার বাবাও ছোটমামাকে লিখলেন, 'আপনার কেউ হাওড়ায় থাকবেন, যমুনা দাদার সঙ্গে যাচ্ছে, ওকে ভাটপাড়ায় নিয়ে যাবেন।' সেইমতো আমার বাবা এবং

বড়ঠাকুরপো দুজনে হাওড়া স্টেশন থেকে দিদিকে আমাকে এবং উমাকে নিয়ে এল। বড়ঠাকুর কলকাতায় চলে গেলেন। কাজ ছিল। দিদি উমা সেদিন আমাদের বাড়ি ছিল, পরদিন মামার বাড়ি গেল। ওখান থেকে বড়ঠাকুর ওদের দেশের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এবং গিয়েই ভাইকে সব জানিয়ে চিঠি লিখলেন। ওইবারই আমাকে নিতে আসার আগে আমার স্বামী লিখলেন—

Dhalbhumgarh
শনিবার রাত্রি

প্রিয়তমাসু

মীন্, তোমার পত্র পেয়েছি, যেমন পেয়ে থাকি। বেশ মনে দোলা দিচ্ছে তোমার সান্নিধ্য পাবার জন্যে। কিন্তু কতকগুলো বাধাবিপত্তি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছি না। কিছুতেই না। চিন্তা করছি। বেশ, আচ্ছা। যুদ্ধে যাওয়া স্থগিত করলাম। সত্যি, ও বিষয়ে আর ভাবব না। আবশ্যক নেই। তবে ওদিকে যাওয়ার সম্বন্ধে সত্যি কিছু ঠিক করতে পাচ্ছি না। আসছে মাসে ৫ থেকে ১০ তারিখ নাগাদ যাবার খুব ইচ্ছা রইল জানবে। এখানকার কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে বটে, একটু এখনও অসম্পূর্ণ আছে। সরকারী ব্যাপার, খোঁচা দিতে দিতে কবে যে শেষ হবে বুঝি না। এ সময় যাচ্ছি এবং ব্যারাকপুর যাবো তোমাকে নিয়ে এবং দু'দিন থেকে ফের চলে আসবো। দুটির বেশি দিন পাবো না। দাদা, বৌদি, উমা— এরা পুরী ভুবনেশ্বর ইত্যাদি থেকে গত ২০শে জুন ফিরেছেন এবং আমাকে শীঘ্র যেতেও লিখেছেন।

কয়েকটা দিন টাটাতে কাজ খুব গেছে। উপস্থিত আমার কোন কাজ নেই। সকালে সূর্য্যি উদয়ের সঙ্গে ঘুম ভাঙে। বাইরে মাঠের মধ্যে বারান্দায় শুয়ে থাকি। আর ভাবি সেই পুরাতন বৎসরের দিনরাত্রিগুলোর কথা। কই, মিনু খাবার দাও, জল দাও, জুতো খুলে দাও, কাপড় দাও, গামছা দাও, ঘড়ি কলম। সমস্ত দিন শুধু দাও দাও। কই, সেইগুলো কতদিনে ফিরে আসবে।

সামনের মাঠগুলোতে নতুন ধান রোপণ করছে। নতুন কচিধানের সবুজ মনের ভিতর একটা নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করছে। দূরে মাটির স্তরগুলো নীচু থেকে একটু একটু উপরে উঠে গেছে। ওদের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। মনের মধ্যে কত সব ছবির বিবর্তন সুরু হয়। প্রেক্ষাগৃহের পট-পরিবর্তনের মত। তোমাকে এনে বাড়িতেই বা কেমন করে রাখি। যা হোক একটা ব্যবস্থা কচ্ছি এবং ঐ ৮/১০ তারিখে যাচ্ছি জানবে। অপেক্ষায় থাক। তোমার সে আসবে, তোমাকে সে ভোলেনি। কেমন করে ভুলব মীন্। বহু দিনরাত্রির সঙ্গিনী, বহু সুখ দুঃখে জীবনের অনেকগুলো ছত্রের অপূর্ব্ব মধুর যোগসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছ। স্রোতের মন্দগতিতে তা দূরে সরে যেতে পারে

বটে কিন্তু হতাশ হবার কিছু নেই জানবে। কিছু ভাল লাগছে না। আমাদের এই চলার মধ্যে বেশ একটা দুষ্টগ্রহ লেগেছে যে বাধা দিচ্ছে। নির্বাক হয়ে চলার পথে এগিয়ে চলো। ওসব আপনি কেটে যাবে। বেশ রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছে, নিঝুম নিস্তব্ধ। ভাবছি আর কতদিন সে থাকবে বসে পথ চেয়ে আর কাল গুনে— আমার প্রীতি নাও... শীঘ্র যাচ্ছি মিনু। হ্যাঁ, ভেবো না। ইতি

তোমার

আবার একটুকরো কাগজে লিখেছেন— 'এইমাত্র আবার দাদা আর বৌদির পত্র পেলাম। ব্যারাকপুর থেকে লিখেছেন। শীঘ্রই আমাকে যেতে লিখেছেন এবং যাবার সময় যেন তোমাকে নিয়ে যাই। ইত্যাদি। এবং তোমার চিঠিটা গতকাল ডাকে দেওয়া হয়নি, রবিবার ছিল। হঠাৎ রাত্রে বাড়ি গিয়েছিলাম মিলিটারি গাড়ি নিয়ে এবং বাড়িতে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। পার্বতীর ভায়ের বৌ ছোট পুঁটি সর্বদার জন্য বাড়ি থাকতে রাজি হয়েছে। সুতরাং বারাকপুরে তোমায় নিয়ে যাবো এবং ওখান থেকে ঘাটশিলার বাড়িতে চলে আসব। জানবে ৫ তারিখ ৮ তারিখের নিশ্চয়ই যাব। মাকে বলে রাখবে আর তৈরী হয়ে থাকবে। কেমন? একবেলামাত্র ভাটপাড়ায়। ২ দিন ব্যারাকপুর। ফেরৎ ভাটপাড়া সব জিনিস নিয়ে— একেবারে এখানে। এই হল প্রোগ্রাম, বুঝেছো? কখন যাব কিছু ঠিক নেই। ধূমকেতুর মত বৌদির পত্রের আজই উত্তর দিচ্ছি। থাকু কেমন আছ? ওর কী অসুখ বুঝলাম না। কেমন থাকো পত্রপাঠ জানিও।'

ওই তারিখের মধ্যে উনি ভাটপাড়ায় এলেন। আমি তৈরি ছিলাম। সে রাত্রিটা থেকে সকালের ট্রেনে আমরা রওনা হলাম। দেশে যাচ্ছি। অনেক দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। তার ওপর ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি। সেদিন যে কী আনন্দ হয়েছিল লেখার ভাষা নেই। কাঁকিনাড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল। এই পথে কোন ছোটবেলায় মার সঙ্গে মামার বাড়ি রাণাঘাটে আসতাম। চকিতের মধ্যে কত কথাই মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

৫৩

ছোটদের কাছে মামার বাড়ি যাওয়া চিরকালই একটা আনন্দের ব্যাপার। মামার বাড়ি যাওয়া হবে ঠিক হলে কতদিন ধরে মনের মধ্যে একটা আনন্দের রেশ থাকত। সবাইকে বলতাম, 'আমরা মামার বাড়ি যাব।' মামারা কেউ না কেউ নিতে আসতেন। বেশ মনে আছে, আমরা সেজেগুজে মাথায় লাল ফিতে বেঁধে ক্লিপ লাগিয়ে তৈরি। মাকে বারেবারে তাড়া দিচ্ছি, বলছি, 'মা, চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে।' মা রাগ করে বলতেন, 'যাকগে। আমার সমস্ত সংসার গুছিয়ে তবে তো যাব।'

দরজায় ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। কী আনন্দ। ধৈর্য যেন বাঁধ মানছে না। মাঝে মাঝে স্প্রিং দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছি। দেখি কোচম্যান ঘোড়ার গাড়ির মাথায় বসে ছপটি পাশে রেখে দু'হাতে খৈনি টিপছে। আর ঘোড়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ দোলাচ্ছে। একছুটে মার কাছে গিয়ে বলতাম, 'চলো মা, সময় হয়ে গেছে।' মা ঠাকুর প্রণাম করে বেরিয়ে বলতেন, 'চল।' চেনা রাস্তা। ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছি। সবাই দেখছে। মনের মধ্যে বেশ একটা ভাব। কাঁকিনাড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। প্ল্যাটফর্মে ছোটমামার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি, একটু পরে ছোটমামা একলা ঘুরে একটু এসে বললে, 'দেখ, ট্রেন আজ আর আসবে না। চল বাড়ি ফিরে যাই।' আমাদের মুখ গম্ভীর দেখে ছোটমামা বললে, 'নারে, এখুনি গাড়ি আসবে।'

গাড়িতে উঠে জানলার কাছে বসা নিয়ে সেজদির সঙ্গে ঝগড়া। মা সেজদিকে বললেন, 'এদিকে আয়। ওর সঙ্গে পারবি না।' আমি জানলার কাছে গাঁট হয়ে বসলাম। প্রথম নৈহাটি স্টেশন। এটা আমাদের চেনা জায়গা। তারপর চাকদা, শিমুরালি, পায়রাডাঙা, আরও কত অচেনা স্টেশন এল। বাইরে তাকিয়ে আছি। মুহূর্তের মধ্যে সরসর করে চলে যাচ্ছে মাঠ, ধানখেত, গাছপালা, জলাজমি। গরু-ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা জমি নিড়োচ্ছে। খুব ভালো লাগছিল। বেঞ্চের ওপর বসে আরাম করে পা দোলাতে দোলাতে দেখছি। রাণাঘাট। এল কত বড় স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে কত বড় একটা ঘড়ি। কত দোকান, প্রচুর ভিড়। চারিদিককার লাইনে গাড়ি আসছে। আমরা প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে উঠতাম। সে কী আনন্দ! যেই গাড়ি দরজায় দাঁড়াত বাড়ির সবাই বাইরে এসে দাঁড়াতেন। বাড়িতে একগাদা লোক, মাসতুতো ভাইবোনেরা সবাই একসঙ্গে বেড়াতাম। খেতে বসতাম সার হয়ে বসে। এখানকার পানতুয়া ছিল বিখ্যাত। এখানকার আর একটা লোভনীয় খাদ্য ছিল হবে পক্কানো আর আঙুলগজা। পক্কানো হচ্ছে বেসনের ছোট ছোট মোটা মোটা কাটিভাজাকে গুড় দিয়ে পাক করে নাড়ি পাকানো আর আঙুলগজা আঙুলের মতো লম্বা লম্বা ভাজা। ওপরটায় চিনি মাখানো। এক পয়সায় পাঁচটা। আমাদের প্রিয় বস্তু ছিল। মামার বাড়ি গেলে ভোরে মামাতো মাসতুতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে নিয়ে চলে যেতাম হরে পক্কানোর দোকান। পক্কানোর আসল নাম কী ছিল কখনও শুনিনি, যা শুনতাম তাই লিখলাম। আমাদের বাড়ি থেকে একটু গিয়ে বড় রাস্তার ধারে ছিল ওর দোকানঘরটি। অতি পুরানো, ছোট ছোট জানলা, রাস্তার দিকে একটা ছোট দরজা। হরে পক্কানোর তখন মধ্যবয়স, গায়ের রং কালো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল ছোটছোট করে ছাঁটা। পরনে আধময়লা ন'হাতি ধুতি। ঘরের মধ্যে একটা ছোট তক্তাপোশ, তার ওপরে কতকগুলো মাটির

হাঁড়ি, কয়েকটা ক্যানেস্তারা টিন বসানো। তার একটিতে হাত ঢুকিয়ে পকানো বার করে শালপাতার ঠোঙায় দিত। তাই মহানন্দে খেতাম। বড় রাস্তা পার হয়ে ওপারে ছিল চূর্ণি নদী। সরু নদী। তারই দু'ধারে নানারকম গাছ লতাগুল্ম। ভালো লাগত। সন্ধ্যাবেলায় মার সঙ্গে ছোট বাজারে রাধাবল্লভতলায় আরতি দেখতে যেতাম। কত কথা মনে পড়ছে।

সেই রাণাঘাট স্টেশন এল। গাড়ি থামতেই স্টেশনে নেমে একবার পায়চারি করে নিলাম। উনি বললেন, 'আরে তুমি যে ছোট মেয়ের মতো করছ। চলো দেখবে দেশের রাস্তায় কতখানিটা করে কাদা। তখন আনন্দ বেরিয়ে যাবে।'

সেটা ছিল বর্ষাকাল। রাণাঘাট থেকে গোপালনগর যেতে যেতে ট্রেনের দু'পাশে বাংলার পল্লিশ্রী সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এত সবুজ গাছপালা ধানখেত এসব সেই বেলডাঙা যাওয়ার সময় দেখেছিলাম। অবশেষে গোপালনগর স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনে বেশি লোকজন ছিল না।

সেদিনের পর থেকে অনেকগুলো যুগ পার হয়ে এসেছি। তখন গোপালনগর ছিল অন্যরকম, এখনকার মতো শহরঘেঁষা নয়। যাই হোক, আমাদের দেখে একটি লোক এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কোথায় যাবেন? উনি বললেন, ব্যারাকপুর। শুনে লোকটি বললে ওরে বাবা, কী, করে যাবেন! পথ তো হাবড় হয়ে আছে। আমার স্বামী বললেন, একটা গরুর গাড়ি পেলে হয়ে যেত। পাওয়া যাবে?

একটা গাড়ি পাওয়া গেল। আমরা উঠে বসলাম। দুজনের মনে অসম্ভব ফুর্তি। উনি বললেন, 'শ্বশুরবাড়ির দেশ দেখতে দেখতে চলো। তোমার অনেকদিনের ইচ্ছা।' হেচং হেচং করতে করতে গরুর গাড়ি চলেছে। কাঁচা রাস্তা। চিটচিটে কাদায় গরুর গাড়ির চাকা ডুবে যাচ্ছে। ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে বসে আছি, বাইরে শ্যামল প্রকৃতি, উনি এটা-ওটা দেখাচ্ছেন, বলছেন। শেষে ব্যারাকপুর গ্রামে ঢোকার মুখে গাড়োয়ান গাড়ি থামাল। বাকি পথটুকু আমরা হাঁটলাম। পথের দু'ধারে দুটো শিরীষফুলের মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছ। মাঝখান দিয়ে সরু মেঠোপথ চলে গেছে। একটি ছেলের মাথায় সুটকেস দিয়ে আমরা চলেছি। গ্রামের ছেলে সবাই ওঁর চেনা। আমাকে দেখাচ্ছেন। কিছুদূর গিয়ে পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হল। দাঁড়িয়ে কথা বললেন।

আমরা বাড়ির উঠোনে এসে দেখি বড়ঠাকুর ঠেসচেয়ারে বসে আছেন। আমাদের দেখে দিদিকে ডেকে বললেন, 'কল্যাণী, নুটু-বৌমা এসে গেছে।' আমরা প্রণাম করলাম। বললেন, 'বেশ বেশ। আজ ইছামতীতে গিয়ে সবাই স্নান করে এসো। আমি স্কুলে বেরুব।'

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এই প্রথম এ-বাড়ি এসেছি। দেখতে সবই ভালো লাগছে। ঘরে ঢুকে ডানদিকে একটা তক্তাপোশ। তার ওপর বিছানা পাতা। সামনের দেওয়ালের গায়ে পাশাপাশি দুটো কুলুঙ্গি, তাতে টুকিটাকি জিনিসপত্র দিদির। দিদির সিঁদুরকৌটো, আলতার শিশি, মাথায় মাখার সুগন্ধি লক্ষ্মীবিলাস তেলের শিশি এইসব রাখা।

ঘরের তিনদিকে তিনটে জানলা। এবং তিনটে দরজা। সামনের দিকে একটা, পিছনের দিকের রকের দিকে একটা দরজা, আর পাশের ঘরে যাওয়ার একটা। ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালের কাছে একটি র‍্যাক। তার উপর-তাকে দিদির লক্ষ্মীর আসন, আমাদের শাশুড়ি ঠাকরুনের ভাঙা কড়া, শ্বশুরমশায়ের লেখার বহু পাণ্ডুলিপি, পুঁথি এবং গৌরীদির বড়ঠাকুরকে লেখা চিঠি ইত্যাদি রয়েছে আর নীচের তাকদুটোতে বইপত্র। পাশের ঘরে দুটো বড় বড় জানলা, ঘরের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার একটি দরজা। ঘরে একটা চৌকি পাতা, একটা আলনা আর সংসারের জিনিসপত্র থাকে। রান্নাঘরে কাঠের উনোন পাতা। তখন কাঠেই রান্না হত। পশ্চিমদিকে বাঁধানো রক, ঘরের মধ্য দিয়ে রকে আসা যায়। পিছনদিকে নিবিড় বাঁশবন। বনের মধ্য দিয়ে সরু পথ ইছামতী নদীর দিকে আমাদের বনসীমতলী ঘাট পর্যন্ত চলে গেছে। ওই পথ দিয়ে কয়েক পা গেলেই ডানদিকে আমাদের ভিটে, শ্যামাচরণদার বাড়ি। তাড়াতাড়ি করে উমার সঙ্গে একচক্র ঘুরে দেখলাম। আমাদের আসার খবর পেয়ে পাড়ার আশপাশের খুড়িমা, কাকিমা, বুড়িপিসিমা, মানুঠাকুরঝি, ছোটকাকা, বড়কাকা এলেন। অন্ন, ফুচু, হাবু ইত্যাদি ছেলের দল এল। আমি এঁদের কাউকেই আগে দেখিনি, কিন্তু এত গল্প শুনেছি যে কাউকেই আমার অপরিচিত বলে মনে হল না।

বড়ঠাকুর খেয়ে স্কুলে গেলেন। একটু পরে আমরা সবাই স্নান করতে গেলাম। বাঁশবাগানের মধ্য দিয়ে, ঝরা বাঁশপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে একদল চলেছি, ভারী ভালো লাগছে। অনেকদিন পরে সবাই দেশের বাড়িতে একত্র হয়েছি। ইছামতীতে নেমে খুব আনন্দ হয়েছিল। কাঁচা ঘাট, কাদায় পা হড়কে যাচ্ছে, দিদিকে ধরে ধরে নামলাম। ওপারে মাধবপুরের খেতিমাঠ, নদীর ধারে ধারে বাবলা গাছ, দূরে একটা সাঁইবাবলা গাছে বাবুই পাখির নিপুণ একটি ঝুলন্ত বাসা। মাথার ওপর উন্মুক্ত সুনীল আকাশ। স্বচ্ছ নদীবক্ষে ইতস্তত ছড়ানো কচুরিপানার দাম, জলের ধারে ঝুঁকে পড়া জলজ উদ্ভিদের সমারোহ। যেন একখানা ফ্রেমে-আঁটা ছবি। দিদি, দিদির ঠাকুরপো, উমা সবাই সাঁতার কেটে ওপারে গেল। আমি সাঁতার জানি না, ঘাটশিলার বাঁধে শেখবার

চেষ্টা করেছিলাম। এখানেও একবার চেষ্টা করতে গেলাম, কোথায় ছোট্ট বাঁধ আর কোথায় স্রোতবতী ইছামতী। একটু গিয়ে তো হাবুডুবু খাচ্ছি, দিদির ঠাকুরপো ঝুঁটি ধরে তুললেন।

সেদিন বিকেলে ওঁর সঙ্গে কুটির মাঠ দেখতে গিয়েছিলাম। কুটির মাঠ দেখিয়ে আমাকে পুরানো ভিটায় নিয়ে গেলেন, বললেন, 'এই তোমার শ্বশুরের ভিটে মিনু, প্রণাম করো।' তারপর ভিটের পিছন দিকের mysterious তেঁতুলগাছটার কথা বলতে বলতে বললেন, 'ছোটবেলায় আমি আর দাদা ওই গাছের তেঁতুল খুব খেয়েছি। কী মিষ্টি তেঁতুল, বুঝলে?' আমি বললাম, 'তেঁতুল আবার মিষ্টি!' উনি বললেন, 'সত্যি তখন এত মিষ্টি লাগত। তুমি দাদাকে জিজ্ঞেস কোরো।' তারপর শিবুদের মড়মড়ে আমগাছ, বিহারী ও আখলে গয়লার গল্প শুরু করলেন। আমি তো ওঁর ডায়রিতে ওদের কথা পড়েছি। ওখান থেকে গ্রামের মধ্যে একটু ঘুরে বাড়ি এলাম। উনি এসেই দাদার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমাদের খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু হাতে তো মাত্র দুটি দিন সময়। উনি বলেছিলেন, 'পরে আবার আসব।' সন্ধেবেলায় উমার বন্ধু মিনা, বুলু, উমা ওরা সব এল। মিনা গান করলে। রাত্রে বড়ঠাকুর ভাইকে বললেন, 'বৌমা থাক। আমরা তো ঘাটশিলায় যাব। বৌমা তখন যাবেন, তুমি বরং চলে যাও।' দু-দিন দেশে থেকে উনি যাত্রা করলেন।

৫৪

আমার মনটা খারাপ লাগছিল। একলা চলে যাচ্ছেন, উনি থাকলে আনন্দটা পরিপূর্ণ হত। যাই হোক, দেশে যে ক'টা দিন ছিলাম তার স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। রোজ ইছামতীতে স্নান করেছি, দিদি ও বড়ঠাকুরের সঙ্গে বেড়িয়েছি। মনে পড়ছে অন্নর বিয়ের বাসর জেগেছিলাম। শেষরাত্রে সবাই মিলে বাড়ি এলাম, আকাশে তখন ক্ষীণ চাঁদ, গাছের মাথায় মাথায় তারই হালকা জ্যোৎস্নার প্রলেপ। একদিন গোপালনগরে যাওয়া হল। হাজারি প্রামাণিকের বাড়ি নিমন্ত্রণও খাওয়া হল। বড়ঠাকুর খুব খুশি আমাকে একটা গ্রাম্য নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পেরেছেন বলে। একদিন দুপুরে বড়ঠাকুর বললেন, 'চলো আজ বনগাঁটা বৌমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।' সেদিন বনগাঁতে মিতেদার বাড়ি গিয়েছিলাম। গৌরীদি খুব যত্ন করেছিলেন। রাত্রে খেয়ে বাড়ি এসেছিলাম।

ক'দিন পরে ওর পৌঁছানোর সংবাদ নিয়ে চিঠি এল।

প্রিয়তমাসু

মীন্, এইমাত্র বাইরে থেকে এলাম। দারুণ বৃষ্টি ও ঝড়। উঃ, সেই কাল গাড়ি থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আর থামার নাম নেই। অবিশ্রান্ত বর্ষণ, চারিদিকে শুধু জল আর জল। মিনা, পাহাড়ের দেশে এরকম জল তুমি ধারণা করতে পারবে না, আবার সঙ্গে ঝড়ও আছে। নিশ্চয়ই কোথাও সাইক্লোন শুরু হয়েছে। দারুণ গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ শব্দ, মনের মধ্যে বেশ একটা আতঙ্ক হচ্ছে। পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে ঘাটশিলা যাওয়া বন্ধ। ছোট পাহাড়ী নদীগুলো সব ভীষণ আকার ধারণ করেছে। হরিণধূপড়ীর নিকট যে পুল ছিল সেটা ভেসে কোথায় চলে গেছে, তারই কাছে কয়েক ঘর হাড়িদের বাস ছিল, তার মধ্যে দুটি ঘর ভেসে গেছে এবং তিন ব্যক্তিকে চিরনিদ্রার পথে যেতে হয়েছে।

সেদিন কলকাতায় ফিরে থাকুকে দেখতে বেলঘরিয়া গিয়েছিলাম। গোবিন্দ এবং ওদের বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ হল। মা ছিলেন। তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন, বৌদির কথা জিজ্ঞেস করলেন। ওখান থেকে মামীমাদের সঙ্গে দেখা করে সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরি, ওখানে কিছু কাজ সেরে বিজুর বাড়ি ছিলাম। পরের দিন এখানে রওনা হওয়া গেল।

বহুদিন পরে নিজের গ্রামে ফিরে খুবই আনন্দ হয়েছে। ওখানকার স্নিগ্ধ-শ্যামল বনশ্রী, ওখানকার পথঘাট, মাঠ, লতাপাতা, ফুল এদের সঙ্গে বহুদিন পরে আবার নতুন করে পরিচয় হল। তুমি সেদিন সেই যে আমায় বলেছিলে তোমার সবসময় সকলের সঙ্গে লজ্জা করে বা অমনি একটা কিছু, ওকথা একবারও মনে করবে না, জানলে? সকলের সঙ্গে বেশ শীঘ্র পরিচয়ের মধ্যে এলে নিজেকে যতই প্রকাশ করবে ততই কুণ্ঠা কেটে যাবে, আর লজ্জাবোধ থাকলে আর কখনও ভালো করে নতুন দলের সঙ্গে মিশতে পারবে না। ব্যবধান গড়ে উঠবে, কেউ বলবে অন্যকিছু, সুতরাং ওকথা মনে আনবে না, বুঝলে মীন্? খুব সাবধানে থাকবে, অসুখ হলে বৌদিকে বলে তিনুকে দিয়ে ঔষধ খাবে। এই ম্যালেরিয়া ব্যতীত আমাদের দেশে অল্পায়াসে এখনও কতকিছু পাওয়া যায়। স্কুল পাঠশালা, বাংলার আসল রূপটি কোথায় পাওয়া যাবে এই পল্লী ছাড়া।

এখানে মনের প্রসারতা আপনি আসবে, চিন্তাশক্তি বেড়ে যাবে। মানুষ সব জিনিষই যদি হাতের কাছে পায় বা সবই অনায়াসলব্ধ হয় তাহলে তার কোন জিনিষ পাওয়ার জন্য চিন্তা করার শক্তি গড়ে ওঠবার সুযোগই পাবে না। মনে কোনরূপ কুণ্ঠের স্থান দেবে না, ওতে আমারও মনে কেমন আঘাত লাগে, তুমি বিশ্বাস কর। আর আমার সে আঘাত শীঘ্র যেতে চায় না। ঘুরেফিরে স্মৃতির দ্বারে আঘাত দিতে

থাকে। তাই যেন কেমন একটা ব্যথা অনুভব করি। মীন্‌, বিশ্বাস কর বাইরেটা আমার ভীষণ ক্রূর কঠিন হলেও আমার ভিতরটাতে যেন একটা কোমলের বাসা আছে, সেই আঘাত হানে। এতদিন যার সঙ্গে শোয়া বসা ঘুম হাসি গল্প, প্রতিদিন যে এত কাছে থাকত, তার মুখটা যদি কালো দেখি তা হলে মনেও আঘাত পাই। তাই বলছি সর্বদা হাসিমুখে থাকবে। প্রীতি নাও, ভালোবাসা নাও।

ইতি

তোমার ডাক্তার

বড়ঠাকুর দিদি ও আমাকে একই সঙ্গে চিঠি দিয়েছেন। তখন ব্যারাকপুরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না। যাই হোক, গ্রামে আমাদের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। শুধু ওর জন্য মনটা খারাপ লাগত। দিদি-বড়ঠাকুরও বলছিলেন, 'নুটুর তো আসাই হয় না। এবার নুটু আসতে বড় ভালো লেগেছে, দুজনে একসঙ্গে খেতে বসতাম, একসঙ্গে গ্রামে বেড়ালাম। অনেক দিন পরে বেশ লাগছিল। আর দু'টো দিন থেকে গেলে পারত।'

এর মধ্যে বেলুর বিয়ে এসে গেল। বেলু দিদির পরের বোন। খোকা, কানুমামা আমাদের আনতে গিয়েছিল। আমি, দিদি, উমা ওদের সঙ্গে দিদির বাপের বাড়ি ব্যারাকপুরে এলাম। বড়ঠাকুর বিয়ের দিন এলেন। আমার স্বামী আসতে পারলেন না। বিয়ের দিন আনন্দের সঙ্গে কাটল। বড়ঠাকুর পরের দিন কলকাতা গেলেন। ভাই বিয়েতে আসতে পারেননি, বোধ হয় বড়ঠাকুরের মন খারাপ লেগেছিল, তাই ভাইকে কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছেন—

কলিকাতা

শনিবার

কল্যাণবরেষু

নুটু, বেলুর বিয়েতে আশা করিয়াছিলাম তুমি আসিবে। বিবাহ হইয়া গেল। ছোটমামার দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে (আরতি ও ছোটটি) ভাটপাড়া থেকে আসিয়াছিল। বেশ আমোদ হইল। তুমি আসিলে ভালোই হইত। বৌমা, তোমার বৌদিদি ও উমাকে ২/৩ দিনের মধ্যে লইয়া দেশে যাইব। একবার এইসময় এসো। গুটকে শান্তকে আশীর্ব্বাদ দিও। গুটকের বাড়ির সংবাদ ভালো। কাল হঠাৎ রাজপুরের বেগুনের মার সঙ্গে গাড়িতে দেখা। বেগুনের বিয়ে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ। বর্দ্ধমানের সিভিল সার্জ্জেনের মেয়ের সঙ্গে। বি, এ পাশ মেয়ে। অন্ততঃ এইরকমই

বেগুনের মা বললেন। আমায় বিয়েতে যাইবার অনুরোধ করিলেন, আমি যেন বরযাত্রী যাই এবং তোমার কথাও বারবার বললেন। এখানে সব ভালো। বড় বৃষ্টি হইতেছে। আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদার চিঠি পেয়ে আমার স্বামী দিদির বাপের বাড়ি ব্যারাকপুরে ভূতনাথ কুটিরে এলেন। তার ঠিক আগের দিন বেলুব বৌভাত হয়ে গেছে। আমরা সবাই তখন ব্যারাকপুরে আছি। দুই ভায়ে দেখা হল। পরদিন বড়ঠাকুর দেশে চলে গেলেন, স্কুল আছে। আর উনি গেলেন কলকাতা। ওখান থেকে ধলভূমগড় যাবেন। আমি খোকার সঙ্গে গেলাম কানুমামার বাসায়। অনেক করে যেতে বলেছিলেন। ওখান থেকে ঘুরে ব্যারাকপুর এসেছিলাম, এবং তার পরদিন, উমা, আমি, দিদি দেশে ফিরি। এবার আর উনি দেশে এলেন না, বিশেষ কাজ ছিল। আমরা ওঁকে চিঠি দিলাম। উত্তর এল।

ঘাটশিলা
শনিবার দুপুর

কল্যাণীয়াসু

যমু, ঐদিন বৌদি ইত্যাদির সঙ্গে তোমার সুন্দর ভাষায় লেখা পত্রখানি পেয়ে তৃপ্তি হয়েছে। আমি সবসময়েই কি আর সঙ্গে যেতে পারি? তা হলে তোমার আরও বেশী আনন্দ হত তা আমি বুঝেছি। কিন্তু পুরুষ তো আমি, বিশ্বের কাছে আমার কর্তব্য করণীয় বহু কিছু আছে। সর্ব্বদাই এই সুদূর প্রবাসে বাস করে দেশের বা দশের কতটুকু কাজ করতে পারলাম, তবু সেই কাজ করার ইচ্ছার পিছে ঘুরতে হচ্ছে, কি জানি এ এক নেশা। চিঠি লেখার অভ্যাস আর নেই, তাই পত্র দিতে দেরী হয়ে গেল। আর কুঁড়েও হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই একবার দেশের দিকে বোধ হয় যাবো।

বৃষ্টির পর এদিকে আবার শ্যামশষ্পরাজি যেখানে সেখানে গালিচা বিছিয়েছে। পথের ধারে বনকুরুচির ফুল ও কৃষ্ণচূড়ার রক্তিমগুচ্ছ বেশ মনের রং বদলে দিচ্ছে। পাখীর সুর যে এখানে নেই মনেই পড়ছে না, পর্ব্বত সানুর রং-এর বৈচিত্র্য এই তো এদিকের সম্পদ। কিন্তু যে পল্লীতে গেছ তার প্রত্যেকটি ধূলিকণাকে পূজা করো। আর মনে মনে বলবে তুমিও আজ ধন্য হয়েছ এর প্রতিটি ধূলিকণার স্পর্শে। ঐ মহা আনন্দময় গ্রামের প্রত্যেকটি সুঁড়িপথ, বন উপবন, বেণুকুঞ্জ আম্রকুঞ্জের পত্রে পত্রে তাদের শিরায় উপশিরায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের দুঃখের সঙ্গীত মিশে আছে। আর সেই বংশেই আমার অগ্রজ আজ পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর সৃষ্টি হয়েছে ঐ ক্ষুদ্র পল্লীর আবেষ্টনীর মধ্যে। ওরই পরিবেশে, আজ শ্রেষ্ঠ

কথাশিল্পী জন্ম নিয়েছে। ঐ বাঁশবন, ভাঁটবন, ঐ পল্লী আমাদের তীর্থস্থান। আমি নিশ্চয়ই কিছু পাপ করেছি, তাই আজ আমার জন্মভূমি থেকে দূর প্রবাসে পেটের জন্য জাল পাততে হয়েছে। এই কামনা করি, জন্মে জন্মে যুগে যুগে ফিরে এসে যেন ঐ দীন আবেষ্টনীর মধ্যেই জন্ম নিই।

দোয়েল, পাপিয়া, বৌ কথা কও এইসব পাখীর গান দেহের প্রতি তন্ত্রী ও মনের সঙ্গে মিলিয়ে নাও প্রিয়া, এরাই চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবে তোমার মনের মাঝখানে, ওরাই সবচেয়ে মধুর সঙ্গী। মানুষ আঘাত দেয়, তাই তাকে দূর থেকে ভালোবাসাই ভালো, খুব গভীর করে মিশতে গেলে যদি আঘাত পাও।

বাইরে লোক বসে আছে, আজ আর নয়। এখানে আমরা ভালোই আছি। শান্ত রান্‌ছে, আমরা খাচ্ছি। আজ থেকে খুব গরম পড়লো। গতকাল আর পরশু সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি আর ঝড় হয়ে গেছে। আমার মনটা খুব ভালো লাগছে না কারণ এদেশে মনটা যেন পঙ্গু হয়ে যায়। মনের সঙ্গে আপনমনের কথা হয় না তাই বোধ হয়। আমার প্রীতি নাও।

ইতি

তোমার—

পরে মাথার দিকে লিখেছেন, 'ভালো কথা, কানুমামার ওখানে সেদিন কেমন খেলে বা আনন্দ করলে, লিখলে কৈ? আমি ভাটপাড়া গিয়েছিলাম। বাবা, মা ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হয়েছে। সবাই ভালো, আমাকে বল্লেন, কৈ, যমুনাকে আনলে না? বললাম পরে এইসব।'

৫৫

সেবার বড়ঠাকুরের সঙ্গে দিদি, উমা, আমি ঘাটশিলা ফিরেছিলাম। উনি স্টেশনে ছিলেন। সেদিনের সেই আনন্দানুভূতি আজও অনুভব করতে পারি। কানায় কানায় পূর্ণ জীবনে কোথাও এতটুকু দুঃখের ছোঁয়া ছিল না।

শরৎ আসতে বেশি দেরি নেই। ঘাটশিলায় লোকজন আসতে শুরু করেছে। একদিন আমাদের একজন দাদু বেড়াতে এসেছেন। আমি প্রণাম করে বসিয়েছি। তারপর চা খাবার দিয়ে বসে কথা বলছি, উনি বাড়ি আছেন, উনিও দাদুর সঙ্গে গল্প করছেন। একথা সেকথার পর, দাদু বৃদ্ধমানুষ, ওঁকে বললেন, নাতনির তো সন্তানাদি হয়নি, তা তুমি আর একটি বিবাহ করো। পুত্র না হলে মুশকিল। উনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, সবই ভাগ্য দাদু। আমিও তাই ভাবছি। ঠিকমতো যোগাযোগ

হচ্ছে না। শুনে দাদু বললেন, একটি পাত্রী আছে, যদি বলো সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি বসেছিলাম, এইসব শুনে রান্নাঘরে উঠে এসেছি। একটু পরে দেখি উনি রান্নাঘরে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, ও ঘর থেকে উঠে এলে যে বড়! আমি বললাম, ওখানে বসে থেকে কী করব। তোমার বিয়ের কেমন ব্যবস্থা হচ্ছে, তাই শুনব? শুনে উনি তো হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, ওরে বাবা, বিয়ের কথাতেই এত রাগ! তুমি কি খেপেছ? আবার আমি বিয়ে করব এই তুমি ভাবলে। সত্যিই তোমার ছেলেমানুষি গেল না। চলো, দাদু কী ভাবছেন। উনি বুড়োমানুষ কী বলছেন তাই নিয়ে কেউ মন খারাপ করে!

সন্তানকামনা আমাদেরও ছিল । যা পাইনি তা নিয়ে হা-হুতাশ করিনি। আমি যদি দুঃখ পাই সেজন্য উনি কখনও ও-বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলতেন না। আমি কথা তুললে বলতেন, হলে হত। না হলে অত দুঃখ করার কিছু নেই। জগতে অনেক করার মতো কাজ আছে।

একদিনেব একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। আমার স্বামী ডিসপেনসারি থেকে বাড়ি এসে জামাজোড়া ছেড়ে একটা ধুতি দুপাট করে পরে গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি দিয়ে বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। দিদি-বড়ঠাকুর বাবলুকে নিয়ে এসেছেন, উনি তাড়াতাড়ি উঠে বাবলুকে কোলে নিয়ে উঁচু করে তুলে আদর করতে করতে বললেন, 'যমুনা, তুই খুব বেঁচে গেছিস। এবার যদি বৌদির কিছু হত আমি ঠিক বিয়ে করতাম। এই ছেলেটা তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অবশ্য দাদা কী করতেন জানি না।' বড়ঠাকুর পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুমৃদু হাসছেন। এমনি রসিকতা মাঝেমাঝেই উনি করতেন। তখন বড়ঠাকুরের মুখে লেগে থাকত স্নেহের হাসি।

মানুষের যদি কিছু সেবা করতে পারেন এই মানসিকতা নিয়ে উনি ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছিলেন। এবং ডাক্তারিতে ওঁর দারুণ আগ্রহও ছিল। উনি বলতেন, ডাক্তার কি মানুষের প্রাণ দিতে পারে? পারে না, শুধু জীবনযুদ্ধে রসদ জোগাতে পারে মাত্র। বলতেন, সব চেয়ে আনন্দ হয় রোগী যখন রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। সুস্থ জীবন ফিরে পায়।

কত কথাই তো মনে পড়ছে। দুপুরে বাড়ি এসে একটু বিশ্রাম করে, বাথরুমে স্নান করে নিতেন। বড়ঠাকুর কোনোদিনই বাথরুমে স্নান করেননি। প্রতিদিনই বাঁধে করতেন। বাড়িতে জল ছিল না। ভূতেশ্বর ভারী এসে জল দিয়ে যেত। আজ এই ভারীর মুখটাও কত আপনজনের মতো মনে হচ্ছে। জল তুলে বারান্দায় বসে পড়ে বলত, খেতে দিন। ঘাটশিলায় জল বড় দুর্মূল্য ছিল। কাছে-পিঠে ওভারসিয়ারবাবুর

বাড়ির একটিমাত্র কুয়ো আর বাঁধ। বাড়িতে যারা কাজ করত তারা বাঁধে বাসন নিয়ে গিয়ে জমত, কাপড় কাচত। ভূতেশ্বর·বাড়ির জল তুলত। প্রথম যখন ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম তখন সখি বলে একটি মধ্যবয়সি মেয়ে কাজ করত। তারপর এল ফুলমণি, ফুলো, পার্বতী, গোবিন্দ, গোবিন্দর মা। পরপর কত এসেছে, গেছে। রাজেন, খুব বাচ্ছা ছেলে, এসেছিল। ভুগত খুব। ওকে খুব সাবধানে রাখতে হত। ঔষধপথ্য করে তবে সেরেছিল। কিন্তু বড় হয়ে চলে গেল। দেবা, কালীপদ এরা খুব ভালো রান্না করত। সূর্যি ছোট বয়সে এসেছিল, একটা চোখ ছিল না। ওঁর সঙ্গে ধলভূমগড় গিয়েছিল। ওঁকে খুব যত্ন করত। হাতের রান্না ছিল ভালো। গুয়ামণি আর রাধা এরা দুজনও কাজ করেছে। এদের বয়স ছিল অল্প। হাসিখুশি মেয়ে রাধা, আবার কথায় কথায় গান করত। কিছুদিন ছোট পুঁটি বলে একটি মেয়ে এল, বাহাদুর এল। বড়ঠাকুর বাহাদুরকে দেশে নিয়ে গেলেন। একেবারে শেষের দিকে গোবিন্দ ছিল। গোবিন্দদের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির কাছেই। এরা সবাই এদের শ্রম দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ঋণী করে গেছে।

একদিন বেশ মজা হয়েছিল। গোবিন্দ বাবলুকে নিয়ে ওদের বাড়ি গেছে। গিয়ে ও কী করেছে, নিজে বাটিতে করে পান্তাভাত নিয়ে খাচ্ছে আর বাবলুকে সামনে বসিয়ে নিজের বাটি থেকে দু-একটা ভাত মুখে দিচ্ছে। ফুলোর ঘর ছিল পাশেই। ফুলো ছুটে এসে বললে, 'বৌদি, গোবিন্দ বাবলুর মুখে ভাত দিয়েছে।' আমরা বললাম, 'গোবিন্দ তো আচ্ছা ছেলে। আসুক, বকব।' বড়ঠাকুর শুনে বললেন, 'দিগ্‌গে, ছোটবেলায় অমন অনেক কিছু হয়।' বড়ঠাকুরের মধ্যে পুতুপুতু ভাব একদম ছিল না।

কাছেই ছিল খাটাল। গোয়ালা দুধ দিয়ে যেত। ধোপা আসত কাপড় নিতে, বসে বসে কত গল্প করত। চাল দিতে আসত সাঁওতাল মেয়েরা। পালি মেপে চাল দিত, 'সীতাশাল' 'মকড়কোঁদ' কত সস্তা আর কত ভালো চাল। মাছ নিয়ে আসত ছোট ছোট জেলে ছেলেরা। বেশ ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত নানা লোকের আনাগোনা। কখনও তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতাম, কখন হাসি, কখনও রাগ। ওঁর ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডারের কাজ গুটকেই করেছে দীর্ঘদিন। শেষের দিকে ওখানকারই একটি ছেলে এসেছিল। তার নাম ছিল তারিণীতারণ। গুটকে ছিল ঘরের ছেলে। বাড়িতেই খেত। মাইনের টাকা বাবাকে পাঠাত। এদের সবার মুখের উজ্জ্বল স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে। যেন এরা আমার কত আপনজন, আমাকে সংসার করতে এরা সাহায্য করেছে। ওদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের

আনন্দ দুঃখ মিলিয়ে দিয়েছিলাম। আজ এরা কে কোথায় জানি না, তবু ওদের উদ্দেশে পাঠালাম আমার অন্তরের শুভকামনা আর ভালোবাসা।

এক একদিন কেউ আসত না, সন্ধ্যা হয়ে আসত। বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে বসে ভাবতাম। ভাটপাড়ার কথা। মা বাবা ভাই বোন দেওর ননদ, সবার কথা। কে কেমন আছে। তাদের হাসিভরা মুখ কথা গল্প মনে পড়ে মন কেমন করত। কত সময় আরও কত কী ভাবতাম, ভবিষ্যতের ছবি আঁকতাম। ওঁকে সুখী করব। সন্তান যদি হয়, কেমন হবে? দেখতে কেমন হবে? তাকেও ডাক্তারি পড়াব। আরও মনে হত, অনেক লেখাপড়া শিখব, ইংরেজি শিখব। উনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। গান করব, দুজনে বেড়াতে যাব অনেক দূরের দেশ। যাব তুষারমৌলি হিমালয়ের বুকে, কখনও যাব অসীম অনন্ত সমুদ্রের কূলে কূলে, কখনও বা রাজপুত ইতিহাসের গৌরবময় পুণ্যভূমি রাজপুতানা। কখনো বা বড়ঠাকুরের মতো পাহাড়ে পর্বতে বনে বনান্তরে। উনি ডাক্তারি ফেলে বেরুতে পারেন না। যখন পসার খুব জমে উঠবে, টাকা পয়সা হবে, তখন বেড়াতে বেরুব। কখনও দুজনে, কখনও বা বড়ঠাকুর দিদি আর আমরা দুজন। তখন বেশ আনন্দ করব। মনে হত, কবে যে যাব। আর কত দেরি সেদিনের?

ওঁকে যখন এসব কথা বলতাম, বলতেন, 'আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা করো, তারপর তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব। আমিও তো কোথাও যাইনি।' বড়ঠাকুর প্রায়ই ভাইকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন, বলতেন, 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটুআধটু বেড়িয়ে আসবে।' একবার বড়ঠাকুর পুরী থেকে ভাইকে লিখলেন, 'আমরা পুরী এসেছি, তুমি এসে বেড়িয়ে যাও।' দাদা বলেছেন, অতএব যেতে হবেই। ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করে এসে আমাকে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে পরে একবার যাব। এখন একলাই ঘুরে আসি, কী বলো? তুমি গেলে বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, একদিনের মধ্যে কী করে করি বলো তো?' আমি বললাম, 'না-না। তুমি ঘুরে এসো। আমি পরে যাব।'

উনি চলে গেলেন। ফেরার সময় ওঁর একই গাড়িতে তখন জওহরলাল নেহেরু যাচ্ছিলেন, ঘাটশিলা স্টেশনে নেমে হইহই ব্যাপার। সবাই দেখতে ছুটছে। উনি দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে নেমেছেন, বেডিং নামাতে ভুলে গেছেন। ওই বেডিং-এর মধ্যে বিয়ের সোনার বোতাম-লাগানো পাঞ্জাবি জামাপ্যান্ট ইত্যাদি ছিল, গেল হারিয়ে! মনে একটু দুঃখ। আমি শুনে বললাম, 'তোমার তো আর বোতাম নেই, পাঞ্জাবির সঙ্গে কী পরবে?' বললেন, 'পরে একটা করে নেব।' পরে চেনসুদ্ধ একসেট বোতাম করিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন। ওই সময় ভাটপাড়ার একজন স্বর্ণশিল্পী ঘাটশিলায় দোকান করেছিলেন। তার কাছ থেকেই গড়িয়েছিলেন। পরে

আমার একটা হার ওঁর কাছ থেকে গড়িয়েছিলেন। আমার বিয়েতে যে ঘড়ি বাবা দিয়েছিলেন, সেটাও কী করে হারালেন। পরে একদিন দুঃখ করে বলেছেন, 'বিয়ের সবই হারিয়ে গেল, কোনদিন বৌটা না হারিয়ে যায়।' পরে নিজে একটা ঘড়ি কিনেছিলেন। সে ঘড়িটা পরে শান্তকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

৫৬

একবার বর্ষাকাল, দিদি-বড়ঠাকুর দেশে, উনি কোথা থেকে দুটো আমগাছের চারা নিয়ে বাড়ি এলেন। এসেই গোবিন্দকে ডেকে বললেন, 'গোবিন্দ, এই চারাদুটো লাগিয়ে দে তো। গর্ত কর, আমি আসছি।' গোবিন্দ আমাদের কাজের ছেলে। বললেন, 'কাঁটাতার থেকে একটু দূরে লাগাতে হবে। আর গাছদুটোর মধ্যে অনেকটা জায়গা রাখতে হবে, গাছগুলো বড় হবে। অনেকখানি করে জায়গা লাগবে।' গোবিন্দ চারাদুটো নিয়ে লাগাতে চলে গেল। উনি এসে জামাজুতো খুলতে খুলতে বললেন, 'জানো, ভালো দুটো আমগাছের চারা নিয়ে এলাম। এই আমগাছ দুটোতে আম হলে দাদাকে আর জ্যৈষ্ঠমাসে দেশে যেতে দেব না। এখানেই আম খাবেন।' আমি হেসে বলেছিলাম, 'আজ লাগাচ্ছ, এই পাথুরে জমি, গাছ বাঁচবে কিনা তার ঠিক নেই, তারপর গাছ বড় হবে, আম হবে।' উনি হেসে ফেলে বলেছিলেন, 'দেখই না, কী হয়।' টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যেই গোবিন্দর কাছে গিয়ে দুজনে মিলে গাছদুটো পুঁতলেন। সেই গাছদুটির মধ্যে একটি গাছ এখনও আছে, শুধু তিনিই নেই।

আমাদের বাড়ি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। তারই পাশেপাশে ছিল অনেকগুলো বড় বড় আতাগাছ। প্রতি বছর বড় বড় আর খুব মিষ্টি আতা হত। বড়ঘরের পিছনদিকে জানলার কাছে ছিল। মাধবীলতার গাছ, ওটা আমারই হাতে লাগানো। খুব ফুল হত। সামনের দিকে গেটের পাশেই ছিল একটা ফুরুস ফুলের গাছ। তার সরু সরু লম্বা ডালগুলো ফুলের ভারে নত হয়ে পড়ত। টগর ফুলের গাছের মাথাও ফুলে সাদা হয়ে থাকত। পরে একটা চাঁপা ও একটা শিউলিগাছ লাগানো হয়েছিল। বাথরুমের পাঁচিলের গায়েই ছিল একটা পেঁপেগাছ। গাছটা যেমন লম্বা, তেমনি ছোট ছোট পেঁপে হত আর ঝরে পড়ত। আর ছিল একটা ভেরেন্ডা গাছ। শেষের দিকে আমি আর গোবিন্দ কিছু কিছু গাছ লাগিয়েছিলাম। গোবিন্দ একটা কাঠের বাক্সে চাকা লাগিয়ে গাড়ি করেছিল। বাঁধের ধার থেকে সেই গাড়ি করে মাটি নিয়ে এসে ফেলত। ওই গাড়িতে বাবলুকেও চড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। তাই দেখে বড়ঠাকুরের সে কী আনন্দ! বাবলুও খুব খুশি। সবই যেন পরপর ভেসে উঠছে।

ওখানে কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে তারপর উনোন ধরানো হত। কাজের লোকরাই কয়লা সাজিয়ে কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিত। প্রথমে প্রচুর ধোঁয়া কাঁচা কয়লার। তারপর দাউদাউ করে কয়লার আগুন জ্বলে উঠত। তার লেলিহান শিখায় একটা সৌন্দর্য ছিল। ধীরে ধীরে লাল গনগনে আঁচ হয়ে যেত। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ভাটপাড়ায় অমন কয়লা পোড়ানো দেখিনি। খানিকটা পরে জল ঢেলে নেভাতে হত। লিখতে লিখতে সবই যেন স্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসছে। একবার ওই কয়লায় আগুন দেওয়া দেখে বড়ঠাকুর বলেছিলেন, এ যে দেখি দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার!

বড়ঠাকুররা দেশে, চিঠি আসে। প্রতি চিঠিতেই নানা সংবাদ। কখনও যুদ্ধের আতঙ্ক নিয়ে, কখনো বা বাজারের মূল্য বৃদ্ধির ওঠাপড়া, কখনও আবার দাঙ্গার ভয়ংকর বার্তা নিয়ে। চিঠি এল। ভাইকে লিখেছেন।—

বারাকপুর

কল্যাণবরেষু

নুটু, যেরকম কলকাতার অবস্থা তাতে ইস্টারের ছুটিতে ঘাটশিলা যাওয়া ঘটলো না। আমাদের এদিকে ট্রেনের বড় গোলমাল। কখন কোন ট্রেন আসে ঠিক নেই। লোকাল ট্রেনগুলো সব বন্ধ। এ অবস্থায় পথে নামি কোন উপায়ে?

তোমার বৌদিদির আবার ২ দিন জ্বর হয়েছিল, এখনো ভাত খায়নি। বুধবার প্রথম দাঙ্গা বাঁধার দিন সকালবেলায় গজেনবাবুর সঙ্গে কানুমামার বাসায় গিয়েছিলাম। ওখান থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় বেরিয়ে ১০টায় বাণী রায়ের বাড়ি গেলুম। সাড়ে ১১টার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আলিপুর ইনস্পেকটর অফিসে গেলুম, সেখানে থাকা অবস্থায় বেলা দেড়টার সময় শুনি যে ঘোর দাঙ্গা বেঁধেছে। বাস চলাচল বন্ধ। ৩টার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আমি ও বনগাঁ স্কুলের যতীন মাস্টার হাঁটতে হাঁটতে সেই দুপুররোদে বালিগঞ্জের স্টেশনে এলুম। লোকজন সব ছুটোছুটি করছে। কোন গাড়িঘোড়া নেই। জল খেতে সুবর্ণ দেবীর বাড়ি গেলুম। সুবর্ণ দেবী চা ও খাবার খাওয়ালেন আমাকে ও যতীনদাকে। কথা হল যে ইস্টারের ছুটিতে তিনি ও নীরদবাবু গালুডি যাবেন। আমি ঘাটশিলায় যাবো। তার পরেই দাঙ্গার ক্রমশ বৃদ্ধি। কোথা থেকে কি হল। সব নষ্ট হল। ইস্টারের ছুটিতে যাওয়া হল না।

বৌমার চিঠি পাওয়া গিয়েচে। দাঙ্গার দিন ভবানীপুরে অহীনের সঙ্গে দেখা। সে যাচ্ছে ওয়ালটেয়ার শচীনের কাছে। আমি তাকে উমার সঙ্গে শচীনের বিয়ের কথা বল্লাম। সে গিয়েই চিঠি লিখবে। অহীন মাকে বিয়ের কথা জানায়। ওরা রাজি আছে বোধ হয়। গুটকে ও শান্তকে আশীর্ব্বাদ দেবে। তুমি ও বৌমা আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ঠাকুরের জন্মদিন এসে গেছে। দেশের অবস্থা ভালো না। বনগাঁয়ে ওঁর জন্মদিন পালিত হল। সর্বত্র একটা ভীতির ভাব। চিঠি লিখলেন, তাতে ভাইকে কলকাতা আসতে বারণ করেছেন। আর লিখেছেন বিজুর জন্যে স্নেহপ্রবণ অন্তরের ভাবনা উৎকণ্ঠার কথা। বিজুকে ওঁরা দু'ভাই অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বিজুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। যাই হোক, বড়ঠাকুরের চিঠি এল। মির্জাপুর স্ট্রিটেই বিজুবাবুর দোকান ছিল। বাড়িও ছিল কাছাকাছি। বড়ঠাকুরকে দাদা বলতেন। অত্যন্ত ভালো ছিলেন। বড়ঠাকুর লিখেছেন—

কল্যাণবরেষু

নুটু, কল্য আমার জন্মোৎসব হয়ে গেল বনগাঁ। কলকাতা থেকে কেউ আসতে পারেননি। হাঙ্গামার জন্যে। তা হলেও function বেশ হয়েছিল। তোমার বৌদিদি, উমা ও আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাতে আসি। কলকাতায় এখন এসো না। রাস্তা বিপদজনক। ছুরিঘাতক সর্বত্র বিদ্যমান। বহুলোক কলকাতা থেকে পালাচ্চে। বিজুকে একখানা পত্র দিয়ে খোঁজ নাও। আমার তো খুব সন্দেহ হচ্চে বিজু সম্বন্ধে। ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছা আছে। ছুটি হবে ২৮শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু কলকাতার মধ্য দিয়ে যাতায়াত যদি safe হয় তবেই শিয়ালদা থেকে হাওড়া যাওয়া যাবে এদের নিয়ে। হাওড়া স্টেশনেও ছুরিঘাতক বর্তমান। মিতে ২/৪ দিনের মধ্যে ঘাটশিলা যাবে। কাল বনগ্রামে সভায় বসে আমাকে বলেছিল। ঘাটশিলাতে কি লোকজন এসেচে কলকাতা থেকে? তুমি বিলাসপুর ভ্রমণের কী করলে? হয় বিলাসপুর যাও না, হয় Goaতে যাও। এতদিন তোমার যাওয়া উচিত ছিল। ছোটমামা কাল পত্র দিয়েচেন। তোমার ও আমার পত্র পাননি বলে উদ্বিগ্ন হয়ে। আমি পত্র দিয়েচি। যদি যাতায়াত safe হয় তবে ষষ্ঠীর দিনই ঘাটশিলাতে যাব, আর যদি তা না হয় দ্বাদশী একাদশীর দিন। পথঘাট safe না হলে মেয়েদের নিয়ে শেয়ালদা থেকে হাওড়া যাওয়া যে মুস্কিল। তুমি কলকাতা এসো না কোন কারণেই। গুটকে বা শান্ত যেন না আসে। আমরা ভাল আছি। বৌমা তুমি শান্ত ও গুটকে আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭

দিন কাটছে। আমাদের দেশ হিন্দুস্থানে পড়বে না পাকিস্তানে পড়বে এই নিয়ে বড়ঠাকুরের ভাবনার অন্ত নেই। চিঠিতে সংশয় প্রকাশ পায় দেশে থাকা চলবে কি না। সেভিংস অ্যাকাউন্ট ঘাটশিলায় ট্রান্সফার করবেন কি না এমনি সব ধরনের কথা।

একবার লিখলেন, এখন বুঝচি বিহারে একটা বাড়ি থাকার উপকারিতা। এখন কলকাতা থেকে সব পালাতে পারলে বাঁচে। দাঙ্গা থেমেছে। বড়ঠাকুর লিখলেন, তোমার বিলাসপুর বেড়ানোর কী হল? নিজে অত্যন্ত বেড়াতে ভালোবাসতেন, ইচ্ছা ভাইও একটুআধটু বেড়িয়ে আসুক। উনি ভায়ের কলকাতার জীবন জানতেন। কত আনন্দময় ছিল সেসব দিন। যাই হোক, লিখেছেন—

২রা সেপ্টেম্বর
১৯৪৬

কল্যাণবরেষু

নুটু, কলকাতার দাঙ্গা থামলেই আমি একখানা পত্র তোমাকে দিই। উত্তর না পাওয়ার কারণ কী? কাল কলকাতা গিয়েছিলাম। সে চেহারা আর নেই। শিয়ালদহের কাছে দোকানপসার সব দগ্ধ ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মির্জাপুর স্ট্রীটে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। বিজু বা তার দোকান কেমন আছে কে জানে? লোকজন তেমন চলচে না, প্রায় সব দোকান বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-চারখানা দোকান খোলা, লোক এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনি। আমার এক চিঠি এসেছে উদয়পুর থেকে। সেখানে স্কুলে চাকুরী দিচ্চে। উদয়পুর রাজপুতানায় ভাবচি ঘুরে আসি ২/৪ মাসের জন্যে। তুমি কী বলো। তারা এমন ধরেছে যে না গেলেই নয়। তোমার বৌদিদিকে নিয়ে যেতে হবে। নইলে খাবো কোথায়। আমি সেখানে থাকলে তুমি একবার গিয়ে ঘুরে আসতে পারবে। বিলাসপুর পর্যন্ত বেড়ানোর কী হল। বেড়াতে গিয়েছিলে কিনা? না যাও তো এইবার একদিন ঘুরে এসো। আমি গজেনবাবুদের বলেচি এবার পুজোর সময় আর কোথাও না গিয়ে ওই পথে বিলাসপুর পর্যন্ত ঘুরে আসতে, কারণ এবার পয়সাকড়ির অবস্থা ভাল নয়। কলকাতায় ব্যবসার খুবই ক্ষতি হল। যতগুলো কাগজ বেরুচ্ছিল পূজাবার্ষিকী তার অর্দ্ধেকও বেরোবে না। সুতরাং গল্প লিখে যে টাকা পুজোর সময় পাওয়া যেতো তা পাওয়া যাবে না। হাত একেবারেই খালি। এরকম দুর্গোৎসব কখনো দেখিনি। কলকাতার সব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত। কলকাতায় এখন এসো না। ঘাটশিলা নিশ্চয়ই এসব থেকে নিরাপদ। কংগ্রেস গবর্নমেন্টের অধীনে বাস করাই এখন সর্বাপেক্ষা ভালো। এখানে দিনকতক রেল ও ডাক বন্ধ ছিল, কলিকাতার দাঙ্গার জন্য। বাজারে আটা নাই, একটা দেশলাই নাই, লবণ নাই, সরিষার তেল নাই। কলিকাতায় সব দোকান ঘুরিয়া একটি টুথপেষ্ট পাইলাম না, প্রায় সব দোকান বন্ধ। আমার আগের পত্র কেন পাইলে না বুঝিলাম না। বিজুদের অবস্থা কী হল ভাবিতেছি। এখানে কোন গোলমাল নাই। ভালো আছে সব। তোমরা আমার আশীর্বাদ নিও। গুটকের অনেকদিন চিঠি পাই নাই। ইতি—

আঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে আমি যেন আগের মতোই আছি। উনি ঘাটশিলায়, আমি ভাটপাড়ায় এসেছি। চিঠি আসছে প্রিয়তমের বার্তা নিয়ে— 'মিনু তোমাকে শীঘ্রই নিয়ে আসব।' ছোট মেয়ের মতো মনে হচ্ছে 'আমি ভালোবাসি যারে সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে?' কত কথা কত গান, কত ব্যথা হাসি কান্না সবই মহাকালের স্রোতধারায় কোথায় যাচ্ছে? যা যায় তা আর ফিরে আসে না।

একবার আমাকে নিয়ে আসার সময় উনি আমাকে প্রথমে শৈলেনবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। শৈলেনবাবু ডাক্তার, ওঁর বিশেষ বন্ধু। উনি আমাদের কাছে বেলডাঙাতে গিয়েছিলেন, ঘাটশিলাও দু'বার গেছেন। ওঁকে তো দেখেছি, কিন্তু ওঁর স্ত্রী নীহারের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। অবশ্য নীহারের নাম আমার স্বামীর কাছে অনেকবার শুনেছি। ওইবার নীহারের সঙ্গে আলাপ হল। বিকেলে আমরা চারজন শুভলক্ষ্মীর 'মীরা' দেখেছিলাম এবং খুব ভালো লেগেছিল। বিশেষ করে গান অপূর্ব লেগেছিল। তারপর ওদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরি। উনি গাড়িতে উঠেই আশপাশের ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। আমি চুপচাপ ওঁর মতো সবার সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে আলাপ জমাতে পারি না। এর জন্যে ওঁর কাছে মাঝেমাঝে বকুনি খেয়েছি। বলতেন, 'সবার সঙ্গে মেশো, লোকে তোমাকে বুঝবে না, ভাববে অহংকার। এই দেখ আমার ভাল লাগুক আর না লাগুক সবার সঙ্গে মিশতে পারি।' আমি বলতাম, 'চেষ্টা তো করি তোমার কথামতো, কিন্তু তোমার আর দিদির মতো সবার সঙ্গে অত কথা বলতে পারি না।' উনি হেসে বলতেন, 'চেষ্টা করে যাও, হবে।'

গাড়ি ছুটছে। উনি গান ধরলেন, আমাকে বললেন, 'মীরার ভজন কয়েকটা তুলো।' আমি ওঁর গান শুনছি। পাশের একজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। একসময় হঠাৎ বললেন, 'নতুন বিয়ে করে যাচ্ছেন বুঝি? আপনার স্ত্রী গান জানেন? আপনিও তো দেখছি গান করছেন।' উনি হেসে ফেলে বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন। আর গান আমরা সামান্যই জানি।' ভদ্রলোক আর কোনো কথা বললেন না। কেন যে এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করেছিলেন ভগবান জানেন। মনে হয় তিনি আমাদের ওপর মনে মনে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। উনি আপনমনে সুর ভাঁজতে লাগলেন, আর কোনো কথা নয়। আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। চোখের পলকে অজানা দেশ-দেশান্তর পার হয়ে চলেছি। কত নগর গ্রাম কত অজানা মানুষের অকথিত ইতিহাস বুকে নিয়ে রাত্রির প্রহর গুনছে। ভাবতে বেশ লাগছিল। বললেন, 'কী ভাবছ?' বললাম, 'কিছু নয়, বেশ লাগছে। সারাটা

জীবন যদি এমনি গতির আনন্দে দুজনে কাটাতে পারতাম বেশ হত না?' বললেন, 'তা তো হত, কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থান যে নির্দিষ্ট। তোমার ঘুম পাচ্ছে, জায়গা আছে, শুয়ে পড়ো।' আমি ওঁর পাশে বেঞ্চের ওপর পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন রিজার্ভেশনের বোধ হয় দরকার হত না। ঘুম ভাঙল ওঁর ডাকে— 'আমাদের ডেরা এসে গেছে, ওঠো।'

৫৮

ঘাটশিলায় গ্রীষ্মের দিনে প্রচণ্ড গরম। হু হু করে গরম হাওয়া বয়। সেই গরম হাওয়া চোখেমুখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। গরমে ওঁর খুব কষ্ট হত, যদিও ওখানকার গরমে ঘাম কম হত। উনি বলতেন, 'বাংলাদেশের ঘাম-প্যাচপ্যাচে গরমের চেয়ে এ বরং একরকম ভালো। শুকনো গরম, ঘামে হিমসিম খাওয়া নেই।' সকালে উনি বেরিয়ে গেলে, দরজা জানলা বন্ধ করে রাখতাম। কোনোদিন মেঝেতে জল ঢেলে রাখতাম, পরে ওঁর আসার আগে মুছে ফেলতাম। শীতের চেয়ে উনি গরমে কাবু হতেন বেশি। রৌদ্রে সাইকেল করে এসে ঠাণ্ডাঘরে ঢুকেই বলতেন, 'আঃ, একেই বলে ঘরের লক্ষ্মী। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা করে রেখেছে তো! বাইরে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে।'

রাত্রে কিন্তু আবহাওয়া পালটে যেত। সন্ধ্যার পর থেকে উত্তাপ কমতে শুরু করত, বইত মিষ্টি হাওয়া। কত রাত পর্যন্ত বাইরের বারান্দায় বসে আমরা গল্প করতাম। উনি ডিসপেনসারি থেকে এসে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দার টেবিলে খেতে বসতেন। মাংস রুটি ছিল প্রিয় খাদ্য। প্রতিদিন আমিষ একটা কিছু চাই। নিরামিষ খুব একটা পছন্দ নয়, তবে খেতেন সবই। খাওয়া সেরে, সমস্ত গ্রীষ্মকালই বৃষ্টি না হলে, আমরা অর্ধেক রাত পর্যন্ত বাইরের উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকতাম। শুয়ে শুয়ে কথা বলতেন, গল্প করতেন। কত রাত পর্যন্ত গান চলত। ওপরের দিকে নক্ষত্র-ভরা নীল আকাশ. দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছের মাথাগুলোতে লম্বা লম্বা পাতার দুলুনি। কখনো বা আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার মাঝে চাঁদের শোভা। দূর থেকে ভেসে আসত সাঁওতাল পল্লি থেকে মাদলের আওয়াজ। আর ওঁর সুরেলা কণ্ঠের গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাত্রে ওঁর ডাকে ঘুম ভাঙত, 'চলো ঘরে, আর বাইরে নয়।' তখন বেশ ঠাণ্ডা লাগত, গা শিরশির করত। গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়তাম।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয়, বাড়ি এসে বললেন, 'বড়ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে দাও। আজ একটু গান-বাজনা হবে। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,

তিনি গান করবেন। আজ আসতে বলেছি। তুমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করো।' প্রায়ই বাড়িতে গানের আসর হয়। নতুন কোনো লোক এলে বা আলাপ হলে তাঁদের বাড়ি নিয়ে আসেন। চায়ের ব্যবস্থা তো থাকেই। একটু পরে সুরেশবাবুর সঙ্গে সেই ভদ্রলোক এলেন। নাম মিহির, পদবি জানি না। দেবেশ এল। আর একজন তবলচি। তিনি এলেন। গানে গানে রাত্রি প্রথম প্রহর কাটল। সুন্দব গান করেন ভদ্রলোক। ওঁর গানও হল। দেবেশ সেতার বাজালে। প্রায়ই মিহিরবাবু গান করতে আসতেন। শেষের দিকে ওঁর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী গানপাগল মানুষ, সময় পেলেই গান করতেন। যেদিন গান খুব জমে যেত, হয়তো সুরের ছোঁয়া পেতেন, সেদিন খুব আনন্দ হত। আমাকে ডেকে বলতেন, 'আমার কাছে একটু বোসো, আজ বড় আনন্দ হচ্ছে।' আমি পাশে বসতাম, কখনও বা তানপুরা ছাড়তাম। বুঝি আর না বুঝি, ওতেই ওঁর আনন্দ ছিল। মালকোশ, জয়জয়ন্তী, দরবারি কানাড়া, ভৈরোঁ ইত্যাদি কত কী, আমার সব মনে নেই। মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি আসত। এটা ছিল ওঁর খুব প্রিয় রাগ।

আমাদের তখনকার দিনের একটা দম-লাগানো বক্স-গ্রামোফোন ছিল। উনি টাটা থেকে ভালো ভালো রেকর্ড কিনে আনতেন। তা ছাড়া মুখার্জি বাংলো থেকে, ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় প্রসূন মুখার্জির কাছ থেকে, বড় বড় রেকর্ডগুলো আনতেন। সে সমস্তই ছিল বড় বড় নামজাদা উস্তাদদের উচ্চাঙ্গ সংগীত। একবার আমি ভাটপাড়ায়, উনি ধলভূমগড়ে। আমায় চিঠি লিখলেন—

Dr. N Banerjee
Medical Officer
P.O. Dhalbhumgarh

প্রিয়তমাসু

মিনু,

কেবলমাত্র ভোর হয়েছে। উঠেই ভাবছি তোমার কাছে যাওয়া আবার কিছুদিনের জন্য বন্ধ হল। তাই এই ডাকদূত পাঠাচ্ছি। প্রিয়ার মনে কিছুটা তৃপ্তি দিতে তো হবে। পরশু এই নূতন কোয়ার্টারে এসেছি, স্থানটি চমৎকার। চতুর্দিকে পাহাড়ের সারি। উন্মুক্ত আকাশ। ছুটির চেষ্টা করে পাওয়া গেল না। হয়ত আবার কয়েকটা দিন বিলম্ব হবে। মাকে বলবে ছুটি পাইনি, কয়েকদিন আগে আমি বাবাকেও পত্র দিয়েছি যে আমি শীঘ্র যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়া হল না। তবে এক সপ্তাহ দেরী হবে মাত্র। আমি হঠাৎ কখন গিয়ে পড়ব তার কিছু স্থির নেই। ওবাড়ির সকলে কে কেমন আছে পত্রে

জানাবে। মীনু, তুমি কেমন আছো? অনেকদিন তোমার পত্র বন্ধ আছে। আমার যাওয়ার আশায় নিশ্চয়ই পত্র বন্ধ করেছো?

আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সেই রেকর্ডগুলো মনে পড়ছে আজ সকালে। "ভোর কহি মিলন সখি, ভোর কহি মিলন।" মনে আছে তোমার সেই মুখার্জি বাংলো থেকে সেই বড় বড় রেকর্ডগুলো আনতাম! ওবাড়িতে ছোট মামীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি? উনি যুদ্ধে যাওয়ার কিছু কী বললেন? এদিকে এসে আমার ভালো লাগছে না। জীবনটা দুর্বহ হয়ে উঠল, তবুও স্বাধীনভাবে ঠিক ব্যবসা করা কষ্টকর এখন। তাই ভাবছিলাম যুদ্ধে যাই। বহু আনন্দ আছে। ডাক্তারীর আসল রূপ সেখানে, তাজা রক্ত ছোটে। একটার পর একটা আহত রুগী হাতের কাছে আসবে আর নিপুণতার সঙ্গে কাটছাঁট করে, বিকলাঙ্গকে নবরূপ দিয়ে মৃত্যুর দ্বার থেকে এপারে নিয়ে আসার চেষ্টা। ও! সে এক অপূর্ব অনুভূতি ও ডাক্তারী জীবনের চরম কামনা। তবুও যাচ্ছি না, মানে একটু বিপদের ভয় তো আছেই। পরিস্থিতিটা আর কিছুদিন দেখবো, তারপর। আমার প্রীতি নাও।

ইতি

তোমার

যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কারণ ওখানকার উদ্দীপনাহীন একঘেয়ে জীবন ওঁর ভালো লাগছিল না। ডাক্তারি জীবনের সার্থকতা বা তৃপ্তি উনি পাচ্ছিলেন না। যাই হোক, যুদ্ধে যাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়নি। যা বলছিলাম। উনি অবশ্য পরে অনেক রেকর্ড কিনেছিলেন। আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, কেশরীবাই কেরকার, হীরাবাই বরোদেকার, ইত্যাদি। ভীষ্মদেব চ্যাটার্জির অনেক হিন্দি ও রাগপ্রধান বাংলা গান ছিল। এ ছাড়া সায়গল, শচীনদেব বর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞান গোঁসাই-এর বহু গান ছিল। এ ছাড়া কীর্তন, ভজন, আধুনিক বাংলা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত তো ছিলই, পঙ্কজ মল্লিকের বেশি। শুভলক্ষ্মীর কয়েকটা ভজন আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। উনি যখন বাজাতেন বাজাতেন, কিন্তু উনি বাইরে গেলে রেকর্ড ছিল আমার সঙ্গী। এমন কতদিন হয়েছে উনি রাত্রে কলে চলে গেছেন, দেরি হচ্ছে, রাত্রি গভীর হচ্ছে, ভয়ে অস্বস্তিতে ঘুম আসছে না, তখন উঠে হারিকেনটার পলতে বাড়িয়ে দিয়ে বসে বসে রেকর্ড বাজাতাম। গান শুনতাম বটে কিন্তু কান থাকত বাইরের দিকে। একসময় শুনতে পেতাম দূর থেকে ভেসে আসছে মোটর সাইকেলের আওয়াজ। তারপর শালবাগানের পথের উপর দেখা যেত আলোর রেখা, তখন ধড়ে যেন প্রাণ আসত। উনি বলতেন, এটাই ঠিক করো, ঘুম না এলে রেকর্ড বাজাবে। আজ কী কী গান শুনলে? গলায় তোলার চেষ্টা করো।

এভাবে কত সুখদুঃখের দিবানিশি যাপিত হয়েছে। বড়ঠাকুরও গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। ভায়ের পছন্দ করা রেকর্ডের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন।

একবার কী হল, বড়ঠাকুর এবং আমরা সবাই ঘাটশিলায়, আমার স্বামী ধলভূমগড়, কয়েকদিন বাড়ি আসেননি। একদিন বড়ঠাকুর কী করেছেন, বিকেলে একটা বই হাতে নিয়ে সোজা হাঁটা শুরু করেছেন ধলভূমগড়ের দিকে। কখনো একটু বসে পড়ছেন, কখনো হাঁটছেন। রাস্তায় মুকুলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'বিভূতিদা, কোথায় চলেছেন?' 'এই নুটুর কাছে।' আরও যেন কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওই একই ব্যাপার, 'যাচ্ছি নুটুর কাছে।' এই করতে করতে ভায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন। ভাই তো অবাক। দাদা কীসে করে এলেন? বড়ঠাকুর বলেছিলেন, 'কেন দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। ক'দিন যাওনি। কী খবর?' উনি বলেছিলেন, 'আমি তো কাল যেতাম দাদা।' সেই রাত্রে দু'ভাই গাড়ি করে বাড়ি আসেন। আমার স্বামী বাড়ি এসে দিদিকে বললেন, 'জানো বৌদি, দাদা আজ আমার কাছে হেঁটে চলে গেছেন।' বড়ঠাকুর বললেন, 'স্বচ্ছন্দে চলে গেলাম, আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।' শুনে দিদি বললে, 'তোমরা দুই ভাই যেন ছেলেমানুষের মতো করো।'

তখন মিলিটারির ব্যাপার। যখন তখন গাড়ি পাওয়া যেত। অনেক বাঙালি অফিসার ছিলেন। সবাই আসতেন, সকলেই বড়ঠাকুরকে সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন। মনে পড়ছে সুরঞ্জনবাবুর কথা। প্রায়ই আসতেন। হাসিখুশি মানুষটি। এখান থেকে বিয়ে করতে গেলেন এবং বৌ নিয়ে এসে এখানে একটা পার্টি দিলেন। প্রায়ই বৌ নিয়ে আসতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক ভদ্রলোককে নিয়ে উনি বাড়ি এলেন। দরজা খুলে তাঁকে বসানো হল। ভদ্রলোকের একটু বয়স হয়েছে। শান্তিনিকেতনে থাকেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওঁর গান শুনতে এসেছেন। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত গান হল। তখনকার দিনে আমি সবসময় সকলের সামনে যেতাম না বা কথা বলতাম না। আমি ভিতরের ঘরে আছি। আমার স্বামী আমাকে ডেকে বললেন, 'একটা গান করো, উনি শুনতে চাইছেন।' আমি লজ্জায় মরছি। এটা আবার কেমন হল! হঠাৎ গান গাইতে বলা। তায় শান্তিনিকেতনের মানুষ। কী গান করব। উনি বললেন, 'সংকোচের কারণ নেই, উনি জিজ্ঞেস করছিলেন, বৌমা গান জানেন? তুমি যা পারো করো।' আমি তখন কী আর করি, 'একটি একটি করে তোমার পুরানো তার খোলো' এই গানটা করলাম। উনি বললেন, 'মীরার ভজনটা গাও।' গাইলাম, না গাইলে আবার রাগ হবে। বলবেন, 'আমাকে তুমি গান শোনাতে চাও না।' মাঝেমধ্যে ওঁর এমনি খেয়াল চাপত। একবার টাটা থেকে কিনে আনলেন পঙ্কজ মল্লিকের রেকর্ড।

একপিঠে ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’, অন্যপিঠে ‘মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে।’ এসে বললেন, ‘গানদুটো তুলবে, বুঝলে?’

আমি গানদুটো তুলেছি। একদিন এক ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে খাচ্ছেন, খেতে দিয়েছি, উনি গল্প করতে করতে, বোধ হয় কোনো গানের কথা উঠেছে, আমাকে ডেকে বললেন, ‘মরণের মুখে রেখে’ ওই গানটা তো তুমি তুলেছ? একটু গাও তো।’ আমি তো অপ্রস্তুত, কী জানি ঠিকমতো তোলা হয়েছে কিনা। বললাম, ‘ওটা এখন পারব কি?’ বললেন, ‘দু'লাইন গাও।’ তাই গাইলাম। এমনি করে গানে, গল্পে, প্রস্তুতে ও অপ্রস্তুতে দিন কাটছিল।

শীতের প্রথম। গৌরীদিরা ঘাটশিলায় এসেছেন, দিদি বড়ঠাকুর আছেন। তবে বড়ঠাকুর মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন, দেশে যান। কিছুদিন আগে মা অর্থাৎ আমার ছোট মামিশাশুড়ি ওঁকে লিখেছিলেন, বৌমা অনেকদিন আসেনি, একবার এসে ঘুরে যাক। ওঁকে বললাম, মা যেতে লিখেছেন। চলো এই ফাঁকে একবার ঘুরে আসি।

আমাকে নিয়ে ভাটপাড়ায় এলেন। কথা ছিল ওঁর সঙ্গে ফিরে যাব। কিন্তু মা বললেন, বৌমা কিছুদিন থাকুক, তুমি পরে একবার এসে নিয়ে যেয়ো। কী আর করেন, আমাকে রেখে কলকাতার কাজ সেরে ঘাটশিলা ফিরে গেছেন। গিয়ে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল। সাড়াশব্দ নেই। আমাদের আসার আগেই বড়ঠাকুর কলকাতা এসেছিলেন, বাড়ি ফিরলেন কবে কে জানে ভাবছি। একটা চিঠি দিলাম। তার উত্তর এল বেশ কয়েকদিন পরে।

ঘাটশিলা

কল্যাণীয়াসু

প্রিয়া, কয়েকদিন হয়ে গেল তোমার লিপি পেয়েছি। এতদিন আর সময় পাইনি। আর তোমাকে ছেড়ে এসে কলকাতা থেকে সর্দ্দি নিয়ে এসেছি। এখানে এসে আরও বেড়ে গেল। খুব কষ্ট পেলাম। আমার সর্দ্দি হলে কি অবস্থা হয জানো তো। আর এখন সিগারেট আরও বেড়ে গ্যাছে। তবে আজ দু'দিন হল কমেছে একটু। গত শুক্রবার ভোরের ট্রেনে দাদা এসেছেন। উনি এসেই বল্লেন আবার ধারাগিরি বেড়াতে যাবো। সুতরাং গতকাল রবিবার আমরা সবাই মিলে ধারাগিরি যাওয়া হল। গৌরীবৌদির বাড়ির সব আর আমাদের বাড়ির বৌদি দাদা আর আমি। দাদা বৌদি গরুর গাড়িতে গেলেন, এবং আমি আর সুরেশ ডিসপেনসারি সেরে পরে cycle-এ গিয়ে দূরে পাহাড়ের কাছে একটি ঝর্ণার ধারে ওঁদের ধরলাম। সেখানে সবাই চা ও খাবার খাওয়া হল। বৌদিরা কেবল তোমার নাম করছিলেন। আমারও মনে মনে ভালো লাগেনি, বহুবার স্মরণপথে কার কথা উদয় হচ্ছিল।

এত চমৎকার স্থান সহসা চোখে পড়ে না। কিছুদুর আরও অগ্রসর হতে হল। পথের উভয়দিকে পাহাড় আর জঙ্গল, যতই অগ্রসর হওয়া যায় জঙ্গল আরও ঘন হতে থাকে। আরও দূর গিয়ে পাহাড়ের উপরে রাস্তা তৈরি হয়েছে, গরুর গাড়ি যেতে পারে কিন্তু উচ্চতা এত বেশী যে, একটু গিয়ে সবাই নেমে পড়ল। পাহাড়ের বিরাট খাদ এত গভীর যে, নীচে দৃষ্টি যায় না। এবং সেই অতলপুরী গভীরতর অন্ধকার ভেদ করে একটি পার্বত্য নদীর ছলছল স্রোতধারা কানে এসে বাজছে। কিন্তু সেই ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কারণ বিরাট বনস্পতিটা ঐ গভীর খাদের ভিতর মাথা তুলে আছে, তাই ঐ নিম্নদেশ এত অন্ধকার। এই স্থানটির গাম্ভীর্য্য অবর্ণনীয়, কেবল অনুভব করা যায় মাত্র।

তারপর সেই পার্ব্বত্যশীর্ষের পথটি অতিক্রম করে আমরা একটি ছোট উপত্যকায় নামলাম। সেখানে একটি গ্রাম। সেই গ্রামটি পার হয়ে এবার ধারাগিরি পাহাড় পড়ল। আমরা চাল, ডাল, বাসন নিয়ে ধারাগিরির একটি বিরাট গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেই স্থানটি আরও মনোরম, শান্ত ও গম্ভীর। চতুর্দিকে সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী। বিশালাকায় শিলাখণ্ডের মধ্য থেকে ঝরঝর ধারে ঝর্না নেমে আসছে এবং তার থেকে একটি নদীর সৃষ্টি হয়েছে। বৌদি কোমর বেঁধে রান্না চড়ালেন, মিতেদা ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে কাঠ যোগাড় উনোন ধরানো ইত্যাদি করলেন। ডলি মান্তুকে নিয়ে ব্যস্ত। কিছু পরে দাদা মিতেদা আরও পর্ব্বতারোহণ শুরু করলেন। পরে আমি সুরেশ ও গৌরীবৌদি পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। বৌদি একা রান্না করছিল। লতা ধরে ধরে আর একটি পাহাড়ে উঠে আরও উপরে একটি শিখরে উঠলাম। লতা বেয়ে উপরে উঠতে ভারী আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু তোমার কথা ভেবে মনটা মাঝে মাঝে ভারী হচ্ছিল।

গৌরীবৌদি প্রত্যহ জ্বালাতন শুরু করেছেন, শীঘ্র শীঘ্র যমুনাকে আনো, আমি একা একা থাকতে পাচ্ছি না। আমাদের বৌদিও বলছেন, একা একা কিছু ভাল লাগছে না। আর ওখানে গিয়ে কেবল সব যমুনা যমুনা সবাই যমুনা যমুনা করে অস্থির। মানা, তোমার সৌজন্য দিয়ে তুমি এক এক করে প্রত্যেককে মুগ্ধ করেছ। এ আমার বিশেষ গর্বের বস্তু, আমার মহা অহংকারের জিনিস। খুব ভালো লেগেছে মানা। বৌদিরা সবাই বলছিল, তুমি একটু চলার পর কেমন নাকি পেটে এবং বুকে ব্যথা ধরে। মানা, বুকের ব্যথা। আমায় তো একদিনও বলনি। আমার কাছে কি তুমি এমনি করে সব জিনিস গোপন করে যাবে আজীবন। প্রকাশকে যে আমি খুব ভালবাসি। সেদিন তুমি বল্লে সাদা রঙের শাড়ী, ভারী আনন্দ হয়েছিল শুনে।

এত লোক ছিল দোকানে, সকালে পত্রটা ঠিক করে লেখা গেল না। ওখানে গিয়ে তুমি কেমন আছ। কোনরূপ অসুখ মনে করলে বলবে। আমি তার ব্যবস্থা করব। দাদা আজ রাত্রেই Calcutta যাচ্ছেন। পরের বার উনি যখন আসবেন সেই সঙ্গে এস। আমার প্রীতি গ্রহণ কর। ইতি

বিরহী তোমার

চিঠি পড়ে আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি চলে এলেই ওঁদের সব ভালো ভালো জায়গা বেড়ানো শুরু হয়। দিদি আর দিদির ঠাকুরপোকে লিখলাম, আমি না থাকলেই তোমাদের মজা। ভালো ভালো জায়গা বেশ বেড়াতে যাও। আমি ধারাগিরি দেখিনি, প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল। আমি যখন একা একা থাকি তখন কোথাও যেতে পাই না। আর যেই চলে আসি ওরা বেড়াতে যায়। দিদি লিখল, তুমি বাপের বাড়ি যাও, আমরা আরও বেড়াতে যাব। শেষে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছিল, না রে, তুই এলে আবার আমরা যাব। আর দিদির ঠাকুরপো লিখল, ভাবছ কেন? তোমাকে নিয়ে পরে একবার যাব।

৫৯

মনে পড়ছে বড়ঠাকুর দেশে, পিঠে কার্বাঙ্কল হয়েছে, কিন্তু ভাইকে কিছু জানাননি। দিদি লিখল, ঠাকুরপো, তোমার দাদা কার্বাঙ্কলে বড় কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু তোমাকে জানাতে বারণ করেছেন। সেই চিঠি পেয়ে আমরা দেশে এলাম। আমাদের দেখে বড়ঠাকুর কাঁচুমাচু মুখে বললেন, কল্যাণীকে বারণ করেছিলাম, নুটুকে লিখো না, শুনলেই ছুটে আসবে। উনি বললেন, বৌদি ঠিকই করেছে দাদা, আপনার শরীর এত খারাপ। আসতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। বিধুদা চিকিৎসা করছিলেন, উনি গিয়ে বঙ্কুদার সঙ্গে দেখা করলেন। বঙ্কুদা বললেন, ভয়ের কিছু নেই।

সেবার বড়ঠাকুর খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। শরীর দুর্বল। আমরা দু-দিন দেশে থেকে ঘাটশিলায় ফিরেছি। কলকাতায় ওর কাজ ছিল। রাত্রের গাড়ি। আমাকে মিত্র ও ঘোষে বসিয়ে রেখে উনি ঘুরতে গেলেন। কেনাকাটা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে এসে আমাকে একগুচ্ছ সুতোয় গাঁথা চাঁপাফুল দিলেন। আমি সেই গুচ্ছটা সেফটিপিন দিয়ে চুড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলাম। মাথায় দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লজ্জায় মাথায় দিতে পারিনি। সেদিন উমার দেওয়া ভায়োলেট রঙের শাড়িটা পরেছিলাম। চাঁপাফুলের অপূর্ব গন্ধ। ব্যাপারটা ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। বললেন, ফুলগুলো বেশ কায়দা করে লাগিয়েছ তো। হঠাৎ সেদিনের সেই সুন্দর সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল। রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে বাড়ি আসি।

সেবার ভাটপাড়ায় অনেকের মুখেই দাঙ্গার গল্প শুনেছিলাম। কলকাতার চেহারা কিন্তু যে কে সেই। দাঙ্গার কোনো হাওয়া আমাদের ঘাটশিলায় লাগেনি। মৌভাণ্ডারের কপার ফ্যাক্টরি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বজাতির মানুষের সমন্বয়ে চলছে, সেখানে কোন বিদ্বেষবহ্নি জ্বলে ওঠেনি। আমরা ভালোই ছিলাম। শুধু সংবাদপত্র মারফত সংবাদ আসত, তখন দুর্গত মানুষদের জন্য বেদনা অনুভব করতাম। আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবের জন্য চিন্তা হত। ভয় হত, এখানে দাঙ্গা লাগবে না তো? ভাবতাম মানুষ কী করে এত নিষ্ঠুর হয়? কী করে হত্যা করে একজন মানুষকে মানুষ! যাই হোক, দাঙ্গা মিটেছে আস্তে আস্তে। সবই পূর্বের মতো হতে শুরু করেছে। বড়ঠাকুরের চিঠি আসে। দেশ স্বাধীন হবে, নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সেই ইপ্সিত দিনটি এল। দেশ জুড়ে আনন্দোৎসব। ওইদিন বড়ঠাকুর কলকাতায় এসেছিলেন। ভাইকে চিঠি লিখছেন সেদিনের সেই আনন্দ সংবাদ দিয়ে—

সোমবার

কল্যাণবরেষু,

আজ বাড়ি যাচ্ছি। সব ভালো আছে। ১৫ই আগস্ট কী অপূর্ব্ব উৎসবই দেখলুম কলকাতায়। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের আলিঙ্গনের দৃশ্য অতি প্রাণস্পর্শী। কলাবাগান ও রাজাবাজার অঞ্চলে ঢুকিয়া মেয়েরা পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদের আলিঙ্গন করিয়াছে। নাখোদা মসজিদে হিন্দু হাজারে হাজারে গিয়াছে। মুসলমানেরা গোলাপজল ও আতর দিয়াছে, সন্দেশ ও সিগারেট খাওয়াইতেছে। সে এক অভিনব দৃশ্য। আমি গান্ধিজীর ওখানে ৩ ঘণ্টা ছিলাম শনিবার। সোরাবর্দ্দী ওসমান প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হলো, আর সে সোরাবর্দ্দী নেই। রাজপথে হিন্দু মুসলমানেরা আলিঙ্গন করছে। আমি বহু মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছি। তোমরা ওখানে করো।

শুনে সুখী হবে বনগ্রাম ও গাইঘাটা থানা-পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। জয় হিন্দ।

কল্যাণ জানিবে। দিল্লী যাওয়ার স্থির নাই। মহাত্মাজী শুনিতেছি বাংলার সাহিত্যিকদের লইয়া এখানেই একটা সভা করিবেন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবার দিদি ব্যারাকপুরে বাপের বাড়ি ভূতনাথ কুটিরে আছে। আমরা সবাই ঘাটশিলায়। বড়ঠাকুর বোম্বে গিয়েছিলেন, ফেরার সময় ঘাটশিলা নেমেছেন। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বোম্বের গল্প, বাড়িতেও হত বোম্বের গল্প। ওঁর ভায়েরও তাই।

দাদা এসেছেন, এবং তাঁর বোম্বে যাওয়া, সেখানে কী দেখেছেন, কী করেছেন ইত্যাদি গল্প চলছে। দাদা এলে উনি কী করবেন যেন ভেবে পেতেন না। মাত্র ক'টা দিন থেকে বড়ঠাকুর দেশে চলে গেলেন। ১৯৪৭ সাল। আশ্বিন মাসে বাবলু হয়েছে। খবর পেয়ে আমাদের দারুণ আনন্দ। বড়ঠাকুর ভাইকে লিখলেন, 'খোকা ভালো আছে, তুমি একবার এসে দেখে যাও।' আমরা তাড়াতাড়ি করে দেখে এলাম। বাবলু হওয়ার পর থেকে বড়ঠাকুরের সব চিঠিতেই বাবলুর নানা সংবাদ আর কাণ্ডকারখানার কথা লেখা থাকত।

বাবলু প্রথম ঘাটশিলায় এল উমার বিয়েতে। বাবলুর ভাত হয়েছিল ঘাটশিলাতে। বড়ঠাকুর সমস্ত অনুষ্ঠান করেই ভাত দিয়েছিলেন। ওঁর কাকার তো আনন্দের সীমা নেই, আমারও খুব আনন্দ। আমার মা বলত, বাবলু 'বিন্দুর ছেলে'। বাবলু রোজ বিকেলে বড়ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াতে বেরুত। রেললাইনের ধারে একটা নির্দিষ্ট জায়গা ছিল। তার নাম ছিল বাবলুসুর আসর। সেখানে বসে বাবলুকে রেলগাড়ি দেখাতেন। তখন যে সাহিত্যিক ওখানে থাকতেন তিনিও ওই আসরের সভ্য হতেন। প্রমথনাথ বিশী ছিলেন প্রধান অতিথি। মিতেদা, গজেনবাবু ও সুমথবাবু ওখানে থাকলে তাঁরা তো অবশ্যই থাকতেন। আমার স্বামী মাঝেমধ্যে ক্ষণিকের অতিথি হতেন। দিদি মাঝেমাঝে যেত। আমি কখনও যাইনি।

বাবলু ওর কাকার কাছে দুপুরে ঘুমোত। উনি খুব ছেলে ভোলাতে পারতেন। একটা ছোট পাউডারের কৌটোর মাথায় একটা মুণ্ডি ছিল, বাবলুকে হয় টেবিলে নয়তো মেঝেতে বসিয়ে উলটো পিঠ করে সেটা ঘোরাতেন, আর বাবলু খুব মজা পেয়ে হাসত। দু হাতে উঁচু করে তুলে আদর করলে বাবলু খিলখিল করে হাসত। এটা বাবলুর খুব পছন্দসই খেলা ছিল। বাবলু খাওয়া নিয়ে বড্ড ভোগাত। বড়ঠাকুর যেখানে যাবেন সেখানে বাবলুর খাওয়ার কথা উঠবেই এবং উনি বাড়ি এসে বলবেন, 'তোমরা খাওয়াতে জানো না,' ইত্যাদি। দিদি তো বাবলুর খাওয়া নিয়ে হিমসিম খেত। দুপুরে ভাত খাওয়াতে বসতাম। একদিন একটা আলু গলায় আটকে গিয়েছিল। সে কী বিপদ! ভাগ্যিস, পিঠে চাপড় দিতে বেরিয়ে এসেছিল। বাবলুর কাকা তো শুনে আমায় বকলেন। বললেন, 'আচ্ছা বুদ্ধি তোমার, ছোট বাচ্চা, আলু টিপে মুখে দিতে হয় না!' আমি তো লজ্জায় মরচি।

বাবলু যখন একটু একটু করে খেতে শিখল, তখন ও রাত্রে কাকার সঙ্গে খেত। উনি খেতেন আর বাবলুকে টেবিলে বসিয়ে দেওয়া হত। উনি খেতে খেতে ওর মুখে অল্প একটু একটু রুটি দুধে ভিজিয়ে দিতেন আর বাবলু টুকটুক করে খেয়ে নিত।

উনি দিদিকে ডেকে বলতেন, বৌদি, তোমার ছেলে নাকি খায় না! দেখ কেমন খাচ্ছে। বড়ঠাকুর বলতেন, নুটুর কাছে তো বেশ খাচ্ছে, আর তোমাদের কাছে খায় না কেন? বাবলু ছোটবেলায় বড় রোগা ছিল।

বাবলু যখন হাঁটতে শিখল, এক-একদিন ওর কাকা বলত, বাবলুকে সাজিয়ে দাও, নিয়ে যাব। অমনি বাবলু চুপ করে জামাজুতো পরে নিল, কাকার সঙ্গে মোটর সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে হুস করে দুজনে বেরিয়ে গেল, একটুও ভয় পেল না। বড়ঠাকুর বলতেন, দেখ ছেলের সাহস। একটুও ভয় পেল না।

একবার আমার স্বামীর পায়ে চোট লাগল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, তাই রিকশা করে বেরুচ্ছেন! বাবলু সঙ্গে যাবে, সাজিয়ে দেওয়া হল। বাবলু গম্ভীর হয়ে কাকার পাশে গিয়ে বসল। তখন আমাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। বড়ঠাকুর কলকাতায়, আমি-দিদি কোথাও বেরুব, বাবলু কাকার কাছে থাকবে খাবে, কোনো ঝামেলা নেই, দুষ্টুমি যত আমাদের কাছে। বাবলু সকালের দিকে বেড়ানোর বায়না ধরলে দিদি বলত, যা না যমুনা, ওকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আয়, আমি দেখছি।

আমার বেশ মজা। একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসতাম। বড়ঠাকুর লিখতে লিখতে বলতেন, কতদূর বেড়ালে বৌমা? বাবুল তখন কোল থেকে নেমে বড়ঠাকুরের কাছে যাবে। এই পরিপূর্ণ আনন্দের হাট, ক'টা দিনই বা আমরা পেলাম। বাবলুর তিন বছর পূর্ণ হতে না হতেই তো হাট ভেঙে গেল। বাবলু কতটুকু পেল?

৬০

মনে পড়ছে, বাবলুকে নিয়ে দিদি-বড়ঠাকুর দেশে গেলেন। তখন গরমকাল, আমরা ঘাটশিলার বাড়িতে, ওঁদের পুনরাগমনের দিন গুনছি। আমার স্বামী কিছুদিন আগে পায়ে আঘাত পেয়েছেন। তখনও সম্পূর্ণ সারেনি। বড়ঠাকুরের চিঠি এল, বাবলুর টাইফয়েড হয়েছে। উনি তো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বড়ঠাকুর খুব উদ্বিগ্ন হয়েই চিঠি লিখেছিলেন। বাবলুর কাকা তার উত্তরে চিঠি লিখলেন। সে চিঠি আজও বাবলুর কাছে আছে। আমি এখানে তুলে দিচ্ছি।

১. ৫ .৫০

শ্রীচরণেষু,

বাবলুর জ্বর Normal হলে আর ভয় নেই। ওখানে ডাক্তার দেখে যা বলে সেইমতোই কাজ করতে হবে। জ্বর normal হয়ে গেলে আমার মনে হয় (একটা ওষুধের নাম পড়া যাচ্ছে না) দেওয়ার আবশ্যক নেই। পাতলা পায়খানা হলে

Thalazole বলে ঔষধ ২টা বড়ি ৪ বার দিনে দিতে হবে। দুদিন তিনদিন দিলেই ভাল হবে। বনগাঁ থেকে ৪টে Thalazole tab নিয়ে আসবে শান্ত। প্রতিবার আধখানা করে চারবার তিন ঘন্টা বাদে দিলেই পায়খানা কমে যাবে। উপস্থিত পাউরুটির ভিতরের নরম ভাগ একটু মাছের ঝালের সঙ্গে খাবে। জ্বর ছাড়বার ৫/৬ দিন পরে দুটি পুরানো চালের পোরের ভাত খেতে দেবেন। পায়ের ব্যথা রাতের দিকে বেশী হয়, তবে অনেক কমেছে, পা নিয়ে ঘুরতে পাচ্ছি। এখানে খুবই গরম পড়েছে। বৃষ্টি হয়নি। রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত গরম হাওয়া। সুতরাং খোকাকে এখন কিছুদিন ওখানে রাখুন। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে আসবেন। এখানেও চাল ২৬ টাকা হয়েছে— হঠাৎ।

আপনি বৌদি প্রণাম গ্রহণ করবেন। বাবলুকে আশীর্বাদ দেবেন। দ্বিজেনদা ভালো আছেন। আজ হংসানন্দ মহারাজ এসেছেন। ওঁরা সব ভালো। মহারাজের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। আপনার পত্র পেয়েই লিখছি। শীঘ্র উত্তর দেবেন। (তারপর আর একটু লিখেছেন) কই মাছের ঝোল-ভাত— আর রাত্রের দিকে Horlicks, ফলের রস।

(স্থানাভাবে স্বাক্ষর নেই।)

এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। দিদির মুখে শোনা। দেশের বাড়িতে বাবলুর খুব অসুখ। দিদি বড়ঠাকুর সেবা করছেন, রাত জাগছেন। বহুদিন ধরে ভুগছে, জ্বর ছাড়ছে না, তার উপর নানা উপসর্গ। ওঁদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তার ওপর দিদির সংসারের কাজ আছে, কাচাকুচি আছে। দিদি বাবলুর কাছ ছেড়ে উঠতে পাচ্ছে না. বেলা বাড়ছে। একসময় দিদি বড়ঠাকুরকে বলেছিল, তুমি একটু বাবলুর কাছে বোসো, আমি নদী থেকে জামা কাঁথাগুলো কেচে স্নান করে আসি।

বড়ঠাকুর বাবলুর জন্য অত্যন্ত চিন্তা করছেন। উনি বাবলুর মাথার কাছে বসলেন, দিদি গেল নদীতে। কিছুক্ষণ পরে দিদি বনসীমতলীর ঘাট থেকে স্নান করে বাঁশবাগানের মধ্য দিয়ে আসছে, আস্তে আস্তে দিদির মন বাবলুর জন্য আশঙ্কায় কেমন যেন হয়ে গেল, ভয়ভয় করছে, দ্রুতপায়ে পথ চলতে শুরু করল। বাড়ির কাছে এসে মনে হল কী যেন একটা হয়েছে। বাড়ির দিকে তাকিয়ে একটা অজানিত আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি এসে দিদি দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, তখন বড়ঠাকুর ধীরে ধীরে উঠে এসে দরজা খুলে দিয়েছেন। দিদি বললে, জানিস যমুনা, দেখি তোর বড়ঠাকুরের সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে, কেমন নিস্তেজ, শক্তিহীন একটা শিথিলতায় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। আমি জোরে বলে

উঠলাম, তোমার কী হয়েছে? বলে ওকে ধরে বাবলুর বিছানার পাশে বসিয়ে দিলাম। তারপর উনি একটু সুস্থ হয়ে বললেন, 'কল্যাণী, তুমি নদীর ঘাটে যাওয়ার পর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তুমি চলে যাওয়ার পর আমি বাবলুর মাথার কাছে এসে বসলাম। চিন্তা করছি, বাবলুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, হঠাৎ একজন এসে বললেন, বাবলুর আয়ু তো অল্পই, তবে তোমার আয়ু যদি ওকে দিতে পারো তা হলে ও নিরাময় হয়ে উঠবে। কল্যাণী, আমি বললাম, আমার আয়ু দিয়ে বাবলুকে বাঁচিয়ে দিন। তারপর আমি আমার ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা বাবলুর মাথায় ঠেকিয়ে আমি আমার আয়ু বাবলুকে দিলাম। চিন্তা করলাম, ধীরে ধীরে শরীর শিথিল অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল, তিনি চলে গেলেন। তখন তুমি দরজা ধাক্কা দিলে।' দিদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে এসেছিলেন? তিনি কে?' বড়ঠাকুর সে কথার উত্তর দেননি। এই ঘটনার পর বড়ঠাকুর বেশিদিন বাঁচেননি।

একটা কথা ভাবছি। স্মৃতির চয়নে বোধহয় ধারাবাহিকতা রাখা যায় না। আমার এক্ষেত্রেও প্রচুর হচ্ছে। স্মৃতির রাশ টানতে পারছি না। সেবার আমরা দুজন কলকাতা এসেছি। উদ্দেশ্য আমার ভাটপাড়ায় যাওয়া, আর উনি কিছু কেনাকাটা করে কাজ মিটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে ঘাটশিলা ফিরবেন। সেবার প্রথম মিত্র-ঘোষে উঠে গজেনবাবুর সঙ্গে আমি আর উনি একটি মাদ্রাজিদের দোকানে গিয়ে কয়েকটা কাপড় কিনেছিলাম। কলকাতা না এলে তো শাড়ি কেনা হত না। কারণ ঘাটশিলায় তেমন কাপড় পাওয়া যেত না। কাপড় কিনে একটা বড় সরবতের দোকানে ঢুকে সরবত খেয়েছিলাম বেশ মনে পড়ছে। পরে ভাটপাড়ায় এলাম। সবার খুব আনন্দ। দিদিরা ঘাটশিলায়, তখন বাবলু এতটুকু। সেদিন উনি ছোটমামা ও মামিমার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলেন। ভাই-বোনেদের সঙ্গে হইহই করলেন। এই জায়গাটি ওঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাপের বাড়ি গেলাম। সবার সঙ্গে দেখা হল। পরদিন সকালে উনি কলকাতা চলে গেলেন। আমি রইলাম। পরে যাব। উনি ফিরে গিয়ে চিঠি লিখলেন।

ঘাটশিলা

বুধবার রাত্রি ১১টা

প্রিয়তমাসু

মীনু, আজ চিঠি লিখছি। এসেই বেশ কাজ পড়েছিল। সময় হয়ে আর ওঠেনি। সেদিনের ব্যাপার শুনেছো বোধ হয় খোকার মুখে। ও বেচারীর যাওয়া হল না সমস্ত দুপুরটা। ব্রজেশ্বর মাঝরাস্তায় পাকড়াও করলো। ওদের বাড়ি খাবার কথা ছিল বলে আবার বেরুলাম আড্ডা দিতে। সেদিন রবিবার গয়না কেনা হল না, ভাল

দোকানগুলো বন্ধ ছিল। পরের দিন হার এবং একজোড়া দুল কিনেছি, বহু দোকান ঘুরে পছন্দ হয়েছে। বৌদির কাছে রেখেছি। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে, কারণ বৌদি বল্লে দুটো জিনিসই খুব ভাল পছন্দ করা হয়েছে। শান্ত কাল এসেছে, ওকে বলে দেবো তোমাকে আনার কথা। তবে এ সপ্তাহে ও ছুটিতে এসেছে। সম্ভবত আগামী রবিবার ও যাবে। সামনের সপ্তাহে শনিবার তোমাকে আনতে যাবে। তৈরী থেকো কিন্তু। আমি যেতে আর সময় করতে পারব না বোধ হয় এর মধ্যে। নানুদার ছেলে এবং দীপুকে তুমি কিছু কিনে দিও। যেমন, গরমের সোয়েটার জাতীয় বা অন্য যা কিছু হোক। যাক, আজ কানুমামা এখানে এসেছে, খুব দুঃখিত আমি না যাওয়াতে।

নিমগাছের আড়ালে চাঁদ জেগে আছে আমার সঙ্গে। চারিদিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। কলকাতায় গিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠি। বেশীদিন ভালো লাগে না। সোমবার বম্বে মেলে এসেছি। রবিবার লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম দু'জনে। ব্রজেশ্বর আর আমি। ওর বাড়িতে অনেক ঘুরে বাড়ি ফিরলাম, প্রায় তখন রাত্রি ১২টা। সকালে উঠে আরও ঘুরে ঘুরে দু'চারটা জিনিস কিনলাম এবং বেলা ৪টায় Bombay Mail-এ এলাম। তুমি কেমন আছ সংবাদ দিও। খোকন এখানে ভালই আছে। খুব কাকা কাকা বলে। কমলা কিনে এনেছি। খেয়ে উনি খুব খুশি। এদিকে অমন কমলালেবু দেখাই যায় না। তুমি না থাকায় ওর খুব অসুবিধা হচ্ছে। বেচারী প্রায়ই কান্নাকাটি করছে। তবে ও তো বলতে পারে না। ওদিকে গেলে এদিকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না। এবং এই মায়াপুরীতে এলে মনে হয় আর বেরুনো যাবে না। মেজদির বাড়িতে খোকন কেমন আছে? আর আর সংবাদ দিও। প্রীতি নাও, প্রণাম দিও, আশীষ দিও।

ইতি

তোমার প্রাণেশ

বড়ঠাকুররা দেশে চলে গেলেন, বাবলু ছোট। সঙ্গে নিয়ে গেলেন নেপালি ছোট ছেলে পদম বাহাদুরকে। আমরা বাহাদুর ডাকতাম। বেশ কিছুদিন ও দেশে দিদির কাছে ছিল। এদিকে আমার স্বামী মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বসে রইলেন। অসহ্য যন্ত্রণা, বেরুতে পারছেন না। রুগিরা বাড়ি আসে, বাড়ি বসেই দেখেন। কয়েকদিন নিজে নিজের চিকিৎসা করলেন, আমাকে দিয়ে ইনজেকশান নিলেন। পরে বললেন, প্লাস্টার করতে হবে। আমি কলকাতা যাব।

একলা যাবে? আমি বললাম, আমিও যাই।

উনি বললেন, তুমি গেলে ঝামেলা বাড়বে, তোমায় নিয়ে কোথায় যাব। আমি সোজা হাসপাতাল যাব। কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হাঁটতে পারেন না, ওই অবস্থায় একলা গিয়ে পা প্লাস্টার করে এলেন। অনেক দিন বেরুতে পারেননি। বড়ঠাকুর সংবাদ পেয়ে লিখলেন, 'তোমার পায়ের বেদনার কথা শুনে চিন্তিত আছি। কেমন আছ শীঘ্র লিখো।' ইত্যাদি।

বাড়ি বসে থাকতে ভালো লাগছে না। সন্ধ্যার দিকে একটুআধটু গান-বাজনা হচ্ছে। সুরেশবাবু দু-বেলাই আসছেন। পরিচিত, বন্ধুরাও আসছেন। চা, সিগারেট আর গল্প ও হাসির ফোয়ারা ছুটছে। কিন্তু যতই হাসি গল্প হোক না কেন, মনের কোণে একটা চিন্তার রেশ রয়েছে। সবাই চলে গেলে আমাকে বলতেন, দেখ, বাড়ি বসে ভালো লাগছে না। আমি বললাম, কেন? দিব্যি তো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হচ্ছে। বললেন, তা তো হচ্ছে, কিন্তু ডানহাতের ব্যবস্থা করতে হবে না?

যাই হোক, সেবার বেশ কিছুদিন বাড়ি বসে থেকে নিজেই পায়ের প্লাস্টার কেটে ফেলে রিকশা করে ডিসপেনসারি যেতে শুরু করলেন। পায়ে একটুআধটু আঘাত প্রায়ই লাগত। বড্ড সর্দি-কাশির ধাত ছিল। কিন্তু ওঁকে কখনও অধৈর্য হতে দেখিনি।

শ্রাবণ মাস। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। উনি সকালে বেরিয়েছিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখি ওয়াটার প্রুফ গায়ে চাপিয়ে উনি আর সুরেশবাবু দুজনে শালবাগানের রাস্তাটা দিয়ে সাইকেল নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছেন। আমি জানলা দিয়ে দেখে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, চলে এলে যে? বললেন, এত বৃষ্টিতে আজ আর কেউ আসবে না। এলে বাড়ি আসবে, তাই দুজনে চলে এলাম। আজ কবিতা পড়ব। 'সঞ্চয়িতা' দাও আর একটু চা করো। আমি সঞ্চয়িতা দিলাম। দুই বন্ধু জুত করে বিছানায় বসে কবিতা পড়া শুরু করলেন। আমি চা করে পাঁপড় ভেজে নিয়ে গেছি, বললেন, তুমিও বোসো।

আমার তখনও রান্না সারা হয়নি। বললাম, এখন না, একটু পরে।

চা খেতে খেতে দেশের বৃষ্টি, পথের কাদা ইত্যাদির কথা উঠছে। উনি বললেন, সুরেশ এদিককার ছেলে। ও বাংলার গ্রামের বর্ষাকাল দেখেনি। আচ্ছা, এক কাজ করো তো, আমার সেই কালো মলাটের ডায়রিখানা দাও তো, ওকে পড়ে শোনাই। তুমি রান্না সেরে এসো।

আমাদের বিয়ের পরেই একলা যখন মুরাতিপুর ছিলেন তখনকার ডায়রি সুরেশবাবুকে পড়ে শোনাতে লাগলেন। আমি গেলাম রান্নাঘরে। এখানে ডায়রির একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

৩১.৭.৩৯ মুরাতিপুর
১৫ শ্রাবণ

আজ শ্রাবণী পূর্ণিমার রাত্রি। কিন্তু বাইরে অমাবস্যার অন্ধকার একেবারে সূচিভেদ্য। কারণ আজ পাঁচ ছ দিন হল শ্রাবণের ধারাবর্ষণ শুরু হয়েছে। পথঘাট একেবারে নদী হয়ে গেছে। বহুদিন পরে প্রায় ১০ বৎসর পরে আবার এখানে এসে ম্যালেরিয়া জ্বর হল। কাল ভাত খেয়েছি। বহুদিন পরে আবার এসেছি এখানে ডাক্তারি ব্যবসার আশায়। এই স্থান আজকাল এত নির্জন হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে এ যেন কোন অজ্ঞাতবাসে এলাম, প্রতিটি মুহূর্তে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। কিন্তু নান্য পন্থা। এসেই যখন পড়েছি তখন এর প্রকৃত রূপ দেখে যাই। মন যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে, সমস্ত দিন বাইরে বেরুবার উপায় নেই। পথ কর্দমাক্ত, চারিদিকে সাপের ভয়। এখানে আসার পরই একটি ন বৎসরের বালিকা সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছে। আশপাশের লোকের মুখে সাপের ভয় শোনা যাচ্ছে।

দাদুর ভাঙাবাড়িতে একখানা ভাঙা চেয়ার নিয়ে বসে আছি। এখানে আমার ও দাদার জন্মভূমি। আজকাল গ্রামবাসী প্রত্যেকেই মাঠের কাজে ব্যস্ত। সকলেই প্রাণপণে সারা বৎসরের আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। এই মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর মানসপূজার পার্বণ। বনে ভোজন করতে হয়। পাশের বাড়ির মাসিমা বললেন, আজ বাইরে খেতে হয়। আমি বললাম, আমি বাবা মনসা দেবীকে বড় ভয় করি, আগে জানলে আমিও মাঠে গিয়ে খেতাম। হেসে বললেন, না বাবা, সবাই কেন করবে, এই আমি করলাম। এতে তোমাদের সকলের হল। কথা শুনে চোখে জল আসে। এমনি ধরনের কথা আজ আমার মা থাকলে বলতেন। এই পল্লীর প্রাণ এবং এই তার নিজস্ব। যুগে যুগে জন্মে জন্মে বেঁচে থাক এই পল্লীর মা। ভারী আনন্দ হয় এঁর সঙ্গে কথা বলে। স্বামী নেই, কত দরিদ্র অসহায়। দু' চারিটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সামান্য জমিজমা নিয়ে কোনক্রমে দিন কাটান। বয়স হবে ৪৯/৫০। উদয়অস্ত ঘরের ও মাঠের খাটুনি। সারাদিন ঘুরছেন। কখনো দেখি গরু নিয়ে বাঁধতে মাঠে চলেছেন, কখনো ঘড়া নিয়ে জল তুলতে, কখনো ধান নিয়ে আসছেন এমনি। আজ মনসার ব্রত উপলক্ষে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি যেতে নেই। আমার কাছে বসেছিলেন। দাদার নতুন বই 'আরণ্যক' খানিকটা পড়ে শোনাচ্ছিলাম। লবটুলিয়া বইহারের ঘন অরণ্য, সেখানকার অপূর্ব জ্যোৎস্না, কাশবন, বনঝাউ, নীলগায়ের দল, সে স্থানের দরিদ্র বনবাসীর দল। শুনতে শুনতে বললেন, হ্যাঁ নুটু, এদের সঙ্গে আমাদের তো খুব বেশি তফাৎ নেই, প্রায় সমান।

এই ক'দিন এসেছি এই ঘোর নির্জন পল্লীতে। কেবল শহরের জন্য মন পাগল হয়ে উঠে। কেবল এ কি পাপের পরিণাম ফল ভোগ করতে এসেছি। এখানে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এমনকি নব পরিণীতার সঙ্গে একটু দাম্পত্য কলহশ্চৈব না করলে কী করে চলে।

রাত্রি প্রায় ১২॥০। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। ভীষণ বাতাস বইছে। বাইরের পেয়ারা গাছটা যেন দুলছে। দূরের বড় কদবেল গাছটা ঝড়ে দুলছে। ঝপ্‌ঝপ্ করে একটা বাদুড় উড়ে গেল। কেবলই মনের ভার বেশী হয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন ভগবান এই নির্জন কারাবাসে থাকব? আরণ্যকের জয়পাল কুমড়ের অবস্থা হয়েছে। তা হলে আমার আর কুড়ি বৎসর সজীব থাকতে হবে না। ২ মাস হয়েছে। এক বছরের মধ্যে ১/২ পরপারে। চারিদিকে ভেকের রব আর ঝিঁঝিঁপোকার হু হু শনশন শব্দ। মনের এমন ভাব আর কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। সকলের চেয়ে আর একটা দুঃখ হচ্ছে...।

বৃহস্পতিবার মুরাতিপুর

3rd Aug 39

৮ দিন ধরে বৃষ্টি চলছে। শ্রাবণের আজ ১৮ তারিখ। কাল দিনে একটু কম ছিল। কিন্তু রাত্রি, ৯টার পর থেকে ঝড় আর বৃষ্টি দুর্দান্তভাবে বেড়ে উঠল। শুক্লা রাত্রি কিন্তু যামিনী ঘোর অন্ধতামসী। মনের ভিতর ঠিক সমান অন্ধকার। এতদিন ধরে মনের ভিতর কী ঝড় বইছে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। মন কেবলই বলছে কোথায় সে কতদূরে। এমন শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে। সত্যই দিশেহারা হয়েছি। চিন্তা দিয়ে এ দূরত্ব শত যোজন বেড়েই চলেছে।

"নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে।"

ক্ষণিকের জন্যও ভুলিনি, দিবারাত্রি প্রতিটি মুহূর্ত কেবলই ঘুরেফিরে তারই কথা মনে আসে। কিন্তু এর উত্তর নেই, কোনদিন এর উত্তর পাওয়া যাবে না। আজ আটদিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আজ প্রভাতে ঝড়বৃষ্টির গতি যতই বেড়ে উঠল, মনের ঝড় তার চেয়ে শতগুণ বেড়েছে। আর ঘরে থাকতে পারলাম না, সকালে চা খেয়ে রবারের জুতোপায়ে বর্ষাতি টুপি এবং মাথায় ছাতি। বেরিয়ে পড়লাম পাগলা নদীর রূপ দেখতে। সেও একটু পাগল। এই নদীর সঙ্গে তার নামের যোগ আছে।

প্রথমেই কাদাজল ভেঙে দাসুর বাড়ি গেলাম। মা-হারা ভবঘুরে দফাদার, সে ঝড়বাদলের দিনে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। ১০॥০ টা পর্যন্ত ওর ওখানে

হানা দিলাম। কী করে বেচারা, নেহাত আমি গেছি। ওর শাশুড়ি দেখি টিনের চালার দাওয়ায় এই ঠাণ্ডায় কাদার দলার মতো তাল পাকিয়ে বসে আছে। দাসুর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে ঠেলে তুললাম। কোনরকমে হাই তুলতে তুলতে উঠে আমাকে সে ঘরের ভিতর আসন পেতে দিলে, বললে, এই দুর্যোগে বেরিয়েচেন? বললাম, হ্যাঁ, চল, গঙ্গার ঢেউ দেখে আসি।

মনের আগুন বাইরে প্রকাশে লাভ নেই, মনে মনে বললাম, সেই আগুনের উত্তাপে এই দুর্যোগ তুচ্ছ করে বিরাট নদীর তুফানদর্শনে অভিলাষী, তাই এই অভিযান। অভিযান না, অভিসার?

উৎসাহী গোয়ালা তখন মালকোচা এঁটে ছাতি হাতে, তার কোম্পানীর দেওয়া বিশ্বাসী তরবারি হস্তে বেরিয়ে পড়ল। ছাতি হাতে রাখা যাচ্ছে না, ঝড় বইছে, তার কোন দিশা নেই। ঈষাণ অগ্নি উত্তর দক্ষিণ চতুর্দিক থেকেই বইছে। গোয়ালের পিছন দিয়ে উঠোনে, তারপর ধানক্ষেতের মধ্যে পড়া গেল। সবুজ কচি ধানগাছের মাথায় নদীর ঢেউ লেগেছে, অশান্ত শনশন শব্দ। মাঠের মধ্যে আর কিছুতেই দাঁড়ানো গেল না। ছাতা রাখা দুরূহ হয়ে উঠল। একটু একটু করে নদীতীরে বিশাল এক কাঁঠালগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ানো গেল। নদী আজ সত্যই উন্মাদ, অগণিত ঢেউ-এর পর ঢেউ চলছে। অবিশ্রান্ত শব্দ, উন্মাদনী রুদ্র ভৈরবী মূর্তি। ওর বুকে আজ সহস্র নাগিনীর নিত্য শুরু হয়েছে, উদ্দাম উত্তাল। প্রতিটি ঢেউ নদীতীরের মাটির বুকে উচ্ছ্বসিত ফণায় আঘাত করছে আর তার ব্যথাজর্জরিত বুকে তীরভূমি অম্লান চিত্তে আত্মনিবেদন করছে, কেবলমাত্র শব্দ হচ্ছে ঝুপঝুপ। এরাও যেন প্রেমে পাগল পরস্পরের, কোনদিন এদের যেন মিলন হয়নি। তাই বুঝি আজ নদী রুদ্রমূর্তি নিয়ে ওর উপর এই ব্যথার দংশন দিতে শুরু করেছে। একজন যখন প্রেম নিবেদন করতে কূলের কাছে আসে, আর একজন তা সহ্য করতে পারে না, একটু একটু করে দূরে সরে যায়। আমি খোলামাঠে ঝোড়ো হাওয়ায় বসে এদের মিলনলীলার তাণ্ডবগতি লক্ষ্য করছিলাম। মন উদাস হয়ে যায়। মনে হয়, তাই তো, আর কতদিন, আর কতদূর? কতই বা বাঁক?

দিকসীমার দিকে চাওয়া যায় না, দূরে খুব দূরে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন, নদীর দক্ষিণ পাড়ের বাবলা গাছের মাথা ঝাপসা দেখাচ্ছে। ওখানে কতকগুলো পাবনা এবং ত্রিপুরাবাসী মুসলমান তাদের ছেলেপুলে নিয়ে বসত করছে এবং ঠিক তার সামনে দিয়ে নদীর খাল বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সুতরাং ওরাও এ সময় দ্বীপবাসী হয়ে পড়েছে, কারণ খালের জল বেড়ে ওদের বাসস্থানটুকু বলয়াকারে বেষ্টন করে ফেলেছে। দাসু বলছে, দেখুন দেখুন ডাক্তারবাবু, ঢেউ কত বড় আর

কত উঁচু হয়ে উঠেছে। দেখি ঝড়ে ও একবার উল্টে পড়ে গেল, ওর ছাতাও উল্টে গেল। বললে, চলুন। বললুম, আর একটু দাঁড়াও, একটু ঘুরে যাই। সবুজ ধানের ক্ষেত থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষার জলরাশি ঝর্নার আকারে বিশাল নদীতে এসে পড়ছে। আমাদের পশ্চাতের আম কাঁঠাল লিচুর বাগিচায় ঐরূপ ঝড়ের তাণ্ডব চলছে, কিন্তু নদীর রূপই মনকে টানছে বেশি। কোথায় কত সহস্র সহস্র যোজন দূরে পর্বত ভেদ করে কত দেশ জনপদ, নগরী, জনশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী প্রদক্ষিণ করতে করতে এই ততোধিক জনবিরল পল্লীপ্রান্তরের ধার দিয়ে কোথায় চলেছে--- এ নদী?

মানুষের শক্তি এর কাছে কতটুকু, কত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। কত যুগ হয়ে গেল এর জন্ম হয়েছে, আর কত যুগ ধরে এমনি বয়ে চলবে? দাসু ঘোষ থাকবে না, আমি চলে যাব, বুড়ি দু'টো শেষ হয়ে যাবে। ঐ দাসুর ছেলেও একদিন বুড়ো হয়ে পড়বে।... এমনি করে কত জন্ম মৃত্যু এই নদী দেখবে তার ইয়ত্তা নেই। হয়ত সহস্র বৎসর পরে এখানে. আবার কোন এক অজ্ঞাত রাজার মর্মর প্রাসাদ উঠবে, ঘোড়া-হাতি লোক-লস্কর, কত কিছু, তখন হয়ত সতীমা আর থাকবে না। পালমশাইদের প্রতাপ কোথায় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আজ সে আমার কাছে নেই, থাকলে তাকে ঠিক এই প্রকৃতির এই মত্ত অবস্থায় এখানে নিয়ে আসতাম। আর এই মুক্ত প্রান্তরে তার পিঠের ওপর চুল এলিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে দেখতাম... কী সে রূপ! না, সে আসতে চায় না, সে আমার সঙ্গে এরূপে কেন কাটাবে। কিন্তু শহরের রুক্ষ নারীমূর্তি, এ সজীব পল্লীতে এলে সবুজ প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত হত। এখানেই ওর সৌন্দর্য্য পূর্ণতা পেত। জানিনা যদি কোনদিন ওর ভালো লাগে।

যুগে যুগে মৃত্যুর পর যদি জন্ম নিতে হয় তা হলে যেন চিরদরিদ্রা পল্লীপ্রকৃতির কোলেই জন্ম নিতে পারি। বিশ্ববিধাতার কাছে আমার এই প্রার্থনা। চিন্তাস্রোত এখানে শতমুখী হয়।

এখন বেলা প্রায় ৩টা বাজে। ঝড়ের প্রাবল্য বেশ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। নীচের ঘরের জানালা খুলে বসে লিখছি। হ্যাঁ, দুপুরে গঙ্গা থেকে ফিরে বদ্দিনাথদের বাড়ি গিয়েছিলাম। মামীমা বল্লেন, বদ্দিনাথ উনোনপাড়ে বসে গল্প করছে। আর সবাই ক্যাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু গল্প হল। ওদের সামনের চালাটা পড়ে গেছে। কি ভীষণ জল পড়ছে। ওরই একপাশে গরুগুলোকে ঘাস খেতে দিয়েছে। কোনরকমে দিনপাত।

ওখান থেকে কলাতলার বাগান দিয়ে খালের ধারের দিকে গেলাম। এ পথে সেই ছোটবেলায় যা গিয়েছি তারপর এই প্রথম জলবৃষ্টির মধ্যে যাচ্ছি। ছোট ছোট খড়ের চাল বাড়িগুলোতে। দরিদ্র পরিবার, ছেলেপুলে নিয়ে প্রাণ হাতে করে কাটাচ্ছে এই

দুর্যোগে। ধানগাছগুলোর মাথা ঝড়ে একেবারে মাটিতে নুয়ে যাচ্ছে আবার উঠছে। চতুর্দিকে জল ভর্তি হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট, বাগান মাঠ পথ বনজঙ্গল সব একাকার হয়ে গেছে। এতদিন ধরে এমন মুষলধারে বৃষ্টি বহুদিন দেখিনি। চারিদিকে ভেকের ডাক শোনা যাচ্ছে। জীবনে কয়েকটা এমন দিন চলে গেল, এর কাঁটা এর ক্ষত বুঝি আর সারবে না। উপায় নেই এমনি করে কি সে... (শেষেরটুকু উনি কোনদিনই লিখতে পারতেন না।)

উনি থাকবেন না, আমি কষ্ট পাব এ-চিন্তা ওঁকে ব্যথা দিত, কিন্তু সত্যই যখন মৃত্যু এল তখন একবারও কি আমার কথা মনে পড়ল না, একবারও কি মনে হল না, আমিও যে অনন্তকাল ধরে ওঁরই প্রতীক্ষায় বসে থাকব। আমার বিয়ের পর কয়েকটা মাস উনি মুরাতিপুরে একলা ছিলেন, আমি তখন ভাটপাড়ায়, উনি লিখেছেন, আমি ওঁর কাছে যেতে চাই না, ইত্যাদি। কিন্তু এটা ওঁর অভিমানের কথা। পরে ঘাটশিলায় এই নিয়ে যখন আমাদের কথা হয়েছে, আমি বলেছিলাম, তুমি এমনি কথা লিখলে কেন, তুমি নিয়ে গেলেই আমি যেতাম। উনি বলেছিলেন, তুমি যেতে চাইলেই হয়তো নিয়ে যেতাম।

যাই হোক, আজ থেকে প্রায় ৭১ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন ১৫ বছর পূর্ণ হয়নি, নতুন বৌ আমি। আমাদের মাথার ওপর মামাশ্বশুর, ভাশুর, শাশুড়িরা রয়েছেন, আমি বলতে পারিনি, আমি যাব। অথচ উনিও গুরুজনদের বলতে পারেননি, যমুনাকে নিয়ে যাব। থাক সে কথা। সেদিন দু'বন্ধুতে দুপুরের খাওয়া সেরে সারা দুপুর গল্প করে, কবিতা আবৃত্তি করে, ডায়েরি পড়ে কাটালেন। বৃষ্টি আর থামে না, কী করেন। বিকেলে চা খেয়ে দুজনে ডিসপেনসারি চলে গেলেন।

সেবার রবীন্দ্রনাথের স্মরণসভায় পাড়ার ছেলেরা ওঁকে সভাপতি করেছে। চিঠি দিয়ে গেল। আমার স্বামী দাদাকে আসতে লিখলেন। বড়ঠাকুর দেশে। দাদা না থাকলে ওঁর কোনো আনন্দই পূর্ণ হয় না। বড়ঠাকুর আসতে পারলেন না। চিঠি এল।

বারাকপুর
সোমবার

কল্যাণবরেষু,

যেতে বলেচ কিন্তু এত engagement এদিকে যে যাওয়ার উপায় নেই। তুমি সভাপতিত্ব করো, ভালো কথাই। আমি খুব খুশি। উত্তরপাড়ার অমরবাবু সামনের রবিবার তাঁদের ওখানে রবীন্দ্রজয়ন্তীর নিমন্ত্রণ করেচেন বিকেল ৫৷৷০ টায়। ঝাড়গ্রাম থেকে রত্না দেবীর স্বামী সমরেন্দ্র বাগচি মুন্সেফ ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র উৎসবে

নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাও যেতে পারব না বলে লিখেচি। তুমি পারো তো একদিন যেও সেখানে।

উমাকে নিয়ে যেতুম কিন্তু উমার জ্বর আজ ২ দিন। ম্যালেরিয়া ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে। না সারলে ওদের পাঠাতে পাচ্ছি না। এখানে ভীষণ গরম পড়েচে। বৃষ্টি বন্ধ। ওখানে কেমন সভা হল লিখো। সারলে ওদের পাঠিয়ে দেবো। তুমি হাওড়া পর্যন্ত আসতে পারবে কি?

মহাদেব চিঠি লিখেচে ডালটনগঞ্জ ভ্রমণে যেতে। বোধ হয় তাই এবার যাবো। ওদের পাঠিয়ে দেবো আষাঢ়ের প্রথমে ঘাটশিলায়। তবে পুরী সম্বন্ধে এখনও গজেনদের সঙ্গে দেখা না করে সম্পূর্ণ স্থির হচ্ছে না, শীঘ্রই জানাবো।

আশীর্ব্বাদ নিও। গুটকে এবং বৌমাকে দিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সভা করে সন্ধ্যার কিছু পরে উনি আর সুরেশবাবু দুজনে সাইকেল নিয়ে এসে বাড়ি ঢুকেই উঠোনে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, এই নাও মালা। জীবনে প্রথম সভাপতি হয়েছি, আর কেউ করবে না। তাই এই মালাটা আজ তোমাকে দিলাম। সুরেশবাবু বলে উঠলেন, হাতে নয়, গলায়। উনি হেসে বললেন, সুরেশ যখন বলছে, এসো। গলায় পরিয়ে দিই। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে মালাটা নিলাম। ওঁরা দুজন সাইকেলে চলে গেলেন।

কত কথা কত ছোট ছোট ঘটনা মনের মাঝে মাথা তুলে বলছে আমি—আমি—আমি। মানুষের মন কী অদ্ভুত। সে বোধ হয় কিছুই ভোলে না, কত কিছু জমা থাকে। কে যেন বলেছিলেন, মন একটা যেন বড় আলমারি, থাকে থাকে যত জিনিসই ভরাও, স্থানাভাব হয় না।

৬১

ভাটপাড়া থেকে আমার ছোট মামাশ্বশুর এসেছেন। আমার স্বামী এঁকে পিতৃতুল্য ভক্তি করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। মামাই এঁদের একমাত্র অভিভাবক ছিলেন। মামার অনুমতি ছাড়া ওঁরা দু'ভাই কিছু করতেন না। মামা আসাতে উনি খুব খুশি। কতরকমের যে কথা হচ্ছে তার ঠিক নেই। মামারও ভালো লেগেছিল ঘাটশিলা। মামা এখানে ওখানে বেড়ান, ছোট ভাগ্নে এলে গল্প হয়। আমি সরাসরি কথা বলছি না, মামিমার আদেশ— ভাশুর আর মামাশ্বশুর এঁদের সঙ্গে কথা বলতে নেই। আমার

স্বামী এটা পছন্দ করতেন না। উনি রাগ করতেন, মামা এসেছেন, তুমি কথা কইছ না। প্রথম থেকে বলিনি বলে একটু বাধো বাধো ঠেকছে। মনে মনে কুণ্ঠা হত মামাকে ঠিক যত্ন করতে পাচ্ছি না। ঘাটশিলা তখন এমনই একটা জায়গা ছিল, সেখানে কোনো জিনিসই ঠিকমতো পাওয়া যেত না। মামার কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সদাই সন্তুষ্ট। মামা চা খেতেন না, অন্য কোন নেশাও ছিল না। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যাআহ্নিক না করে জলগ্রহণ করতেন না। দুই ভাগ্নেই ছিল ওঁর খুব প্রিয়। মামা যে-কদিন ছিলেন আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। মাথার ওপর একজন বড় রয়েছেন বাড়িতে। এটা ভাবতে ভালো লাগত। একটা নতুন অনুভূতি। ভাগ্যের কথাও বটে। মামা চলে গেলে আমাদের খুব মন খারাপ লেগেছিল। আত্মীয়-স্বজনহীন দূর বিহারে সত্যিই ভালো লাগত না, নেহাতই স্বামীর সঙ্গে আছি, তাই ভালো লাগত।

মনে পড়ছে আর একবার মামা ও আমার বাবা ঘাটশিলায় আমাকে আনতে গিয়েছিলেন। ওঁর ইচ্ছা নয় আমি আসি। আমি বললাম, না গেলে ওঁরা দুঃখ পাবেন, কী ভাববেন বলো তো? ওঁদের সঙ্গে যাই। তুমি বরং তাড়াতাড়ি করে গিয়ে আমাকে নিয়ে এসো। অবশ্য যখন-তখন যাওয়া ওঁর পক্ষে অসুবিধার ব্যাপার। কারণ প্রথমদিকে প্র্যাকটিস, অথচ আমিই বা করি কী। ওঁদের সঙ্গে ভাটপাড়ায় এলাম।

এসেই চিঠি দিলাম। উত্তর এল—

ঘাটশিলা
13.11.40

কল্যাণীয়াসু,

মীনু, তোমার পত্র ঠিক সময়মতই পেয়েছি, উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। তোমরা যাত্রা করার পরের দিনই উমার জ্বর আর সেইরূপ সর্দ্দি। ও আর নড়তে পারে না, কিন্তু খোকা ভারি বাহাদুর, এত সুন্দর রান্না করতে পারে তা আর বলার কথা নয়। বিশেষ কিছু কষ্টে পড়তে হয়নি, উমা কাল ভাত খেয়েছে। আর টুকটাক কাজ রান্নাও করছে।

আমি শীঘ্রই মুসাবনি যাওয়া শুরু করবো। আশা করি ভালো আছো। আমি আর সুরেশ জ্যোৎস্নায় বনে বনে আর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, দুজনেরই সম অবস্থা। কেমন থাক মধ্যেমধ্যে পত্র দেবে। দাদার কোন পত্রাদি পাইনি। ছোটমামীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কি না? তিন দিন রাত্রি... যাক বেশি দিন ত নয়। একরূপ করে কেটে যাবে। আমার ভালোবাসা নাও। ইতি—

তোমার ডাক্তার

এ চিঠির উত্তর দিলাম। চিঠিটা অবশ্য ছোটই হয়েছিল। কারণ সেদিন একটু তাড়াতাড়ি ছিল। কতদিন পরে এসেছি। এবাড়ি ওবাড়ি যাব। সবার সঙ্গে দেখা করতে হবে, কথা বলতে হবে। দেশের মধ্যে মেজদির বাড়ি সেখানে যাব। তা ছাড়া যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে সেই জিগ্যেস করছে. কেমন আছিস? কবে এলি? থাকবি তো? ইত্যাদি। ওঁর কাছ থেকে উত্তর এল—

ঘাটশিলা

প্রিয়া

মীনু, কদিন হল তোমার লিপি ক'লাইন পেয়েছি। পড়ে মনে হল ভারী ব্যস্ত তুমি এখন। সত্যি কয়েকটা দিনের জন্য একটু মুক্তির আনন্দশ্বাস ফেলে নাও মিনা। আমি তোমাকে যে শাস্তি দিয়েছি, তা আমি বুঝতে পেরেছি। সকল স্নেহের নীড় থেকে ছিনিয়ে এনে কত বড় বড় বোঝা মাথায় চাপিয়েছি। নিজে তার জন্য খুব লজ্জিত। তোমায় কেমন করে বোঝাবো প্রিয়া, কোথায় আমার দুর্বলতা। হয়তো বুঝেছো নয়তো নয়। ভেবো না স্নেহবঞ্চিত। গৃহিণী আমার। এই দুর্যোগের রাত্রি একদিন নির্মল উষাতে সদ্যোত্থিত অরুণালোকের মতো শুভ্রসুন্দর হয়ে উঠবেই। বর্তমানকে আনন্দোজ্জ্বল করে নাও, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করে তুলবই।

প্রায় রোজ মুসাবনি যাওয়া শুরু করেছি। সেদিন বাঁ-পায়ে ভারী এক আঘাত লেগেছে। কেবলই ভাবছিলাম প্রিয়া আজ দূরে। তেমন করে ওকে ভালবাসতে পারিনি, তবে কেন আজ এত করে মনে পড়ছে। সেবা দিয়ে ও আমাকে জয় করেছে অনেকটা, তাই বুঝি ওর সেবারতা বাহুদুটির কথা আজ কেবলই মনে পড়ছে। ভাবছি কতকিছু বাজে সব। সে আমার সে আমার কৈ, আমারই বা কেন? আমার করে নেবার মতো কোন সম্পদ তো খুঁজে পাইনা নিজের ভিতর কিংবা বাইরে। বিবাহ হয়েছে সে তো একটা সমাজের বন্ধন মাত্র। তা দিয়ে কি মনের বাঁধনে বাঁধা চলে? হয়তো হতে চলেছে।

আগামী মঙ্গলবার কিংবা বুধবার বোধ হয় কলকাতা রওনা হব। তোমার সমীপে কবে যাচ্ছি ঠিক নেই, তবে শীঘ্রই হবে। উমা ভালো হয়েছে। সখি চলে গেছে, সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছো। শান্ত ভাল আছে। সুরেশ ও আমার মধ্যে গল্প দিন-দিন বেড়েই চলেছে। ভারি শান্ত প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান ছেলে, তাই ভাল লাগে। যাক, চিঠিতে মনে হল আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছো, না? এখন যাতে ব্যথা পাচ্ছ, দু'দিন পরে তা হলে যাবে। তখন বুঝবে আমার স্বভাবটাই ঐরূপ। এটা কিন্তু ছিল না, কি জানি কেন হল। ভালবাসা নাও...। ইতি

তোমার শ্রী এন্

৬২

সত্যিই উনি ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। সুন্দর পসার জমে উঠেছিল। দিদি, বড়ঠাকুর, আমরা দুজন, বাবলু। এঁদের দু'ভায়ের অটুট স্বাস্থ্য, মেয়ে জামাই, যাকে বলে জাজ্বল্যমান সংসার। নামযশ, প্রতিষ্ঠা, মান, সম্মান, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পার্থিব জীবনের সমস্ত কাম্য বস্তু তখন আমাদের ছোট্ট খোলার ঘরের তলায় ঈশ্বর উজাড় করে দিয়েছিলেন। তখন অতীতের দুঃখ স্মৃতি নব অনুভূতির তারে এসে আনন্দের ঝংকার দিত। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি না কোন কর্মফলে কোন অভিশাপে বিধাতার রুদ্ধ রোষ আমাদের ওপর নেমে এল। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল আমাদের ক'টা জীবন।

একবার ভাটপাড়া থেকে গিয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হ্যাঁগো, আমি তোমায় যে চিঠিগুলো লিখি, কী করো, ফেলে দাও? একটাও দেখিনা তো!' উনি গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'ফেলে দিই না, ছিঁড়ে ফেলি।' আমি বলেছিলাম, 'ও, আমি লেখাপড়া জানি না, ভালো চিঠি লিখতে পারিনা বলে ছিঁড়ে ফেলো।' বললেন, 'আরে ভুল বুঝছ কেন। রাখব কোথায়? আমার কি বাক্স আছে? সবই তো তোমার।' আমি বললাম, 'আমার কিছুই নয়, সবই তোমার।' হেসে বলেছিলেন, 'সবই তোমার, আমিও তোমার।'

ওঁকে আমি কাছে থাকলে কখনও বাক্স খোলা-দেওয়া করতে দেখিনি। টাকা-পয়সা এনে আমার কাছে রাখতে দিতেন। দরকার হলে চাইতেন। বাক্স খুলে কখনও টাকা-পয়সার হিসাব করতে দেখিনি। কি নিজের জামাপ্যান্ট কখনও বার করতে দেখিনি। যখন যা প্রয়োজন আমাকে বলেছেন, বার করে দিয়েছি। বড়ঠাকুরও কখনও তালাচাবি করতে করা বা জুতোর ফিতে বাঁধতে পারতেন না। বড়ঠাকুরের আর একটা অভ্যাস ছিল। টাকা অথবা চেক ইত্যাদি কাগজপত্র বই-এর মধ্যে রেখে হারিয়ে ফেলতেন। যেই রাখলেন, তখুনি ভুল। বহুদিন পরে সেই টাকা দিদির অথবা আমার চোখে পড়লে দিয়ে দিতাম। তখন বড়ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে! শিশু যেমন খেলার জিনিস হারিয়ে ফেলার বহুদিন পরে হঠাৎ পেলে খুশি হয়ে ওঠে, বড়ঠাকুরও ঠিক তেমনি খুশি হয়ে উঠতেন, বলতেন, তাই তো তাই তো! ওখানে রেখেছিলাম বুঝি?

দিদির মুখে শুনেছি ওঁরা তখন দেশের বাড়িতে। একবার একটা দরকারি কাগজ গজেনবাবুরা বড়ঠাকুরকে দিয়েছিলেন, হঠাৎ সেই কাগজটার প্রয়োজন। ওঁরা আমাদের ব্যারাকপুরের বাড়ি গেছেন। যথাযোগ্য আপ্যায়নের পর গজেনবাবু বড়ঠাকুরের কাছে সেই কাগজ চাইলেন। বড়ঠাকুর মনে করতে পারলেন না কোথায়

রেখেছেন। প্রথমে লেখার সুটকেস খোঁজা হল, তারপর এ-বই সে-বই, তাকে দেখা হল। ঘরের সম্ভাব্য সব স্থানই খোঁজা হল। শেষে র‍্যাকের কোণের দিকে একটা ছোট পোঁটলা, তার মধ্যে কিছু কাগজপত্র, সেটা খুলে দেখেন তার মধ্যে একগোছা টাকা, কয়েকটা চেক। সবকিছুই উইয়ে ঝুরঝুরে করে ফেলেছে। বড়ঠাকুর দেখে প্রথমে আমতা আমতা করলেন। সবাই আপশোশ করছে, উনি কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'চ্যান করুকগে যাক।' বলে এক ঝটকায় সেই ক্ষতিটা ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

ঘাটশিলায় একজন অল্পবয়সি বৈরাগী আসত। বাঁকুড়ার ওদিকে বাড়ি। বছরে একবার করে তার দর্শন পাওয়া যেত। বিয়ে-থাওয়া হয়নি। দেখতে মন্দ নয়, রোগা, গলায় কণ্ঠি, কাঁধে ঝোলা, হাতে খঞ্জনি। সে এলেই আমরা তার গান শুনতে বসতাম। আমার স্বামীও ওর গান শুনতে ভালবাসতেন। সে এলেই দু-চারটে গান শুনবেনই। সেই বৈরাগীর একটা গানের কলি মনে আছে। গাইত---

"আমি বঁধূর লাগিয়া সেজ বিছাইনু গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজলিনু মন্দির হইল আলা।"

সেই বৈরাগীর মিষ্টি কণ্ঠস্বর, তার দরদভরা ভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করত। বড়ঠাকুর বলতেন, ছোকরা বেশ গায়। যাবার সময় বৈরাগীটি আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে যেত।

নরসিংগড়ের রাজবাড়িতে আমার স্বামী প্রায়ই যেতেন। ধনপতিবাবুর সঙ্গে ওঁর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ধনপতিবাবু নরসিংগড়ের রাজবংশের সন্তান। একবার ধনপতিবাবু ওঁকে একটা সাদা রঙের রাগী কুকুর দিয়েছিলেন। নাম ছিল ব্রুটাস। কিন্তু জিমের সঙ্গে কামড়াকামড়ি-ঝগড়ায় বাধ্য হয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হল। আমাকে বললেন, ভালো কুকুর নিয়ে এলাম। কী বলো, ফিরিয়ে দিয়ে আসব? আমি বললাম, এটা ফিরিয়ে দিয়ে এসো। পরে একটা ভালো দেখে নিয়ে এলেই হবে।

একবার নরসিংগড়ে নিমন্ত্রণে গেলেন। নিয়ে এলেন একটা সুন্দর কাঁচা শালপাতার তৈরি বড় একটা রুটির মতো পাত্র। তাতে পান ভর্তি। এইরকম নাকি রাজবাড়ির নিয়ম, নিমন্ত্রিতদের পানপাত্র দিতে হয়।

ইতিমধ্যে দিদির বাবা কোলাঘাট থেকে ঝাড়গ্রামে বদলি হয়ে এসেছেন। বাড়ির সবাই ঝাড়গ্রামে আছেন। দিদিও কিছুদিন গিয়ে থেকে এল। বড়ঠাকুর তখন ঘাটশিলায়, মাঝেমাঝে ঝাড়গ্রাম যান। একবার ঝাড়গ্রাম গিয়ে বেলুকে নিয়ে এসেছিলেন। বেলুর তখনও বিয়ে হয়নি। তখন খোকা, নুটু, ওরাও আমাদের বাড়ি এসেছিল। ঝাড়গ্রাম থেকে ওরা ব্যারাকপুর যান।

সেবার আমি ভাটপাড়া এসেছি। দিদি ব্যারাকপুরে, বড়ঠাকুর দেশে, আমার স্বামী ঘাটশিলায়। চারজন চার জায়গায়। ওঁর চিঠি এল—

ঘাটশিলা
26.1 48

প্রিয়া

মীনু, তোমার পরপর কখানা পত্রই পেয়েছি। বেশ লাগছে লেখাগুলো। মাথায় আমার কাজের চাপ বেড়েছে। ২/৩টে শক্ত নিমোনিয়া case এসে পড়েছে, সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ মেজাজ চড়ে আছে। বকুনি খেয়ে মরছে গুটকে। শনিবার ভোরে ব্রজেশ্বর এসেছিল, দুজনে খুব গল্প হল, রবিবার ১১টায় চলে গেল। এখানে আবার জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছে। দেখার সময় নেই। কারণ মিহিরবাবু ফিরে এসেছেন। এখুনি আবার লোক আসছে। কেমন আছো জানাবে, কবিত্ব এবার দূর হয়ে যাচ্ছে। নানুদা কেমন আছে, একবার এদিকে আসতে বলবে। বলবে ভীষণ রাগ করেছি আসে না বলে। ব্রজেশ্বর বহুবার করে বলে গেল ওদের বাড়ি যেতে। ও গাড়ি কিনেচে। খুব ঘোরাবে বলেছে। তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

ওবাড়ি থেকে বৌদি এইমাত্র ডাকতে পাঠিয়েছে, কেন জানি না, বোধ হয় দুদিন যাইনি তাই। এবাড়ি ওবাড়ির মা কেমন আছেন, মামীমাকে বলবে রাগ করে চিড়িমিড়ি যেতে হবে না। বৌদি আর একদিন দেখে এসো কারোর সঙ্গে। দাদা আবার পত্র দিয়েছেন খোকাকে দেখতে যাওয়ার জন্যে। লক্ষ্মী বলে একটা পাগলি ঝি পেয়েছি। আমার প্রীতি নাও। অঞ্জলি এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা সব ভালো। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এটা লেখা সে এক ব্যাপার। ইতি—

শ্রী ন

আমি ওঁর চিঠি পেয়ে দিদি ও বাবলুকে দেখে এলাম। বড়ঠাকুর লিখেছেন—

বারাকপুর
বৃহস্পতিবার

কল্যাণবরেষু

নুটু, ভালো আছি। তোমার বৌদিদি ও খোকা ভালো আছে। তুমি একদিন এসে দেখে যেও। গজেনবাবুরা খোকার জন্য ভালো baby লেপ ও তোষক দিয়েচে। এখন একটু লম্বা হয়েচে। খোকা বড় দুষ্টু হয়েচে।

কানুমামার সঙ্গে ঘাটশিলা যাবো একদিন। কাল বারাকপুরে এসেচি। এখানে সব ভালো। সই মা গত বৃহস্পতিবার মারা গিয়েচেন, সতু বাঁড়ুয্যের স্ত্রী। আশীর্ব্বাদ নিও ও বৌমা উমাকে দিও। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন আমার স্বামী এসে বাবলুকে দেখে গেলেন। আমি ওঁর সঙ্গে ঘাটশিলায় চলে এলাম।

বাবলু হওয়ার পর থেকে বড়ঠাকুর যেন বাবলুময় হয়ে গিয়েছিলেন। পিতৃস্নেহের রুদ্ধ নির্ঝর যেন শতধারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঝরে পড়েছিল। বাবলুর হাসিকান্না, খাওয়া, বেড়ানোর কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তাই দেখি একান্ত প্রকৃতিপূজারী বিভূতিভূষণ ছোটনাগপুরের গভীর অরণ্যপর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একমাত্র পুত্রের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, হে ঈশ্বর, বাবলু যেন এই প্রকৃতিকে দেখার চোখ পায়। ধন নয়, মান নয়, পার্থিব কোনো ঐশ্বর্য তিনি তাঁর পুত্রের জন্য চাইলেন না, চাইলেন শুধু প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টি। যা ছিল বড়ঠাকুরের নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যাই হোক, বড়ঠাকুরের চিঠি এল। আমার স্বামী তখন ধলভূমগড় ছিলেন।

মঙ্গলবার

কল্যাণবরেষু

নুটু, ইদের ছুটিতে যাওয়া খুবই সম্ভব। আমি একাই যাবো। ইন্দু এবার যেতে পারবে না। আমার জন্যে একটা লেপ ও বিছানা ঘাটশিলা থেকে এনে রাখবে। সামনের রবিবার সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবো।

আমার মুস্কিল হয়েছে নীরদবাবু ও সুবর্ণ দেবী ওইদিন রবিবার বারাকপুরের বাড়িতে আসবেন লিখেছেন। আসেন ভালোই। একদিন মাত্র থাকবেন ওঁরা। আমার বিশেষ ইচ্ছা ধলভূমগড় যাওয়ার। এখানে সকলে ভালো।

আঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদার চিঠি পেয়ে উনি বাড়ি থেকে লেপ তোশক ইত্যাদি নিয়ে গেলেন।

ধলভূমগড় জায়গাটা বড়ঠাকুরের খুব পছন্দ ছিল। দেশ থেকে বেশ কয়েকবার উনি ধলভূমগড় গিয়েছিলেন। গুটকের বাবা ইন্দু রায়ও দু-একবার সঙ্গে ছিলেন। ঘাটশিলা থাকতে তো প্রায়ই যেতেন। একরাত থেকে চলে আসতেন। ওখানে মি. সিংহ, সুবোধ ঘোষ এঁরাও বহুবার গেছেন। ধলভূমগড়কে কেন্দ্র করে বড়ঠাকুর চাইবাসা সেরাইকেলা ইত্যাদি ঘুরেছেন। একবার ধলভূমগড়ে ভায়ের কোয়ার্টারে এসেছেন, খুবই ভালো লেগেছে। সেই ভালো-লাগা বড়ঠাকুরের ১৯৪৩ সালের দিনলিপির পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে। উনি লিখেছেন—

"আজ সকালে ধলভূমগড় এলুম। বেশ জায়গাটি। লখিরাম আমার সঙ্গে এল। সব বিদেশভ্রমণের সময় কি লখিরাম আমার সঙ্গে যাবে? গুটকেও বাক্স নিয়ে

হাঁটছিল। ট্রেনে Gun নিবাসিনী সেই মিস চাটুয্যের সঙ্গে দেখা। ওরা পাবনায় 'স্থন' নামক গ্রামে যাচ্ছে, সিরাজগঞ্জ থেকে যেতে হয়। ধলভূমগড়ে নুটুর কোয়ার্টার বেশ জায়গায়। রোদ থাকে সারাদিন। ধূ ধূ মাঠ, দূরে শালবন। বিকেলে সুবোধ ঘোষ আসবে বলে চাইবাসা থেকে গুটকেকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম পথে। কেউ এল না। আমি ও নুটু রাজবাড়ি বেড়াতে গেলুম। ধনপতিবাবু শিকারের গল্প করলেন। শঙ্খচূড় সাপের কথা বল্লেন। বেশ পুরানো ধরনের বাড়ি গড়খাইওয়ালা। চাঁদ উঠেছে তখন, সেখান থেকে মাইনর স্কুলের কম্পাউণ্ডে দিয়ে এলুম Rang officer নুরুল হকের ওখানে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, চা ও নাস্তা আনি। আমি বল্লাম, না। সেও plantation-এর গল্প করলে। চমৎকার জ্যোৎস্নায় শালবনের মধ্য দিয়ে বাসায় চলে এলুম। কতক্ষণ বাইরের জ্যোৎস্নায় বসে রইলুম। খেয়ে গল্প করলুম। উঁচু টিলার উপর জায়গাটি সারাদিন রোদ, তেমনি জ্যোৎস্নার শোভা কতদূর দেখা যাচ্চে। রাজাদের কুচরিত্রের গল্প শুনেছিলুম, বিশেষতঃ রাধিকাবাবুর। মংলা রুটি ও খাবার নিয়ে এসে জ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায় পাতা করে দিলে। ইসমাইলপুরের কথা মনে আনে। শেষরাত্রে জ্যোৎস্নায় বাইরে এসে দেখি ফুট্‌ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। কি অদ্ভুত শোভা। গত দ্বিতীয়ায় আজ থলকোবাদ।"

বড়ঠাকুরের ভালো লাগলেও ওঁর ভায়ের চাকরি নিয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। একঘেয়ে লাগছিল। বড়ঠাকুর নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এক আধদিনের জন্য যাচ্ছেন। ওঁর ছিল সংসার, অর্থ রোজগারের তাগিদ। আমাকে কোথায় রাখবেন তাই নিয়ে চিন্তা। আমাদের বিয়ের পরই লাগল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রায়ট। দেশ ও জীবন জুড়ে একটা অস্থির পরিবেশ। ওখানে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে একবার বড়ঠাকুরকে লিখেছিলেন, আমি দেশে গিয়ে প্র্যাকটিস করব। এখানে ভালো লাগছে না। ওই সময় ঘাটশিলায় আমার ছোট মামিশাশুড়ি ছিলেন। এবং দিদি বড়ঠাকুর বনগাঁয় বাসা করে ছিলেন। বড়ঠাকুর ভাইকে লিখেছিলেন—

বনগ্রাম
সোমবার

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেলাম। বনগ্রামে একরকম সব ভালো আছে। মিতে রোজই আসে। বাসাটা পাওয়া গিয়েছে ভালো। ছোট মামীমা টাটায় গিয়েছিলেন জানিলাম গুটকের পত্রে।

তুমি চাকুরী ছেড়ে এখানে আসবে লিখেচ, সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগল না। এ দেশে বেশিদিন ভালো লাগবার কথা নয়। গোপালনগর ও বারাকপুর দুই সমান। আমি ভাবছি এদিকের কাজ মিটে গেলে আর বেশিদিন এ দেশে থাকবো না। তোমার বৌদিদিকে নিয়ে ঘাটশিলায় চলে যাবো। দৃশ্য হিসাবে ও-দেশ আমার ঢের ভালো লাগে। তা ছাড়া এ সময়ে ও-জায়গা ছেড়ে আসা উচিত নয়ও। নানা কারণে গোপালনগরের চাকুরী আমি নাও করতে পারি। এ জায়গা বেশিদিন ভালো লাগে না। নূতন করে একটা জিনিষের পত্তন করা কঠিন। শেষে একূল-ওকূল দুকূল না যায়। এখানে যা দূর থেকে ভাবচো, আসলে তা নয়, কে পয়সা দেবে গোপালনগরে? বারোমাস বিশেষতঃ বর্ষার ৬ মাস রাস্তার মূর্তি দেখলে আঁতকে উঠবে। হাঁটা অসম্ভব, সাইকেল তো দূরের কথা। আশা করি ভালো আছো। ছোট মামীমাকে প্রণাম দিও। তুমি বৌমা, উমা, গুটকে ও গোপাল আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

আঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন রাত্রে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন। মুখ গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে গো? মুখ গম্ভীর করে আছো?' বললেন, 'আজ এইমাত্র খবর পেলাম হরদয়াল সিং (না কী একটা সিং বললেন নামটা, এখন মনে করতে পারছি না) মোটর অ্যাকসিডেন্ট করে মারা গেছে। এত ভালো পাকা ড্রাইভার। নিজের মোটর ছিল ওর প্রাণ, সেই মোটরই প্রাণ হারাল। তাই ভাবছি। বড় খারাপ লাগছে। যেমন বিরাট স্বাস্থ্য তেমনি ছিল শক্তি। আমার মোটর সাইকেলের সব কাজ ও করত। খুব ভালো লোক ছিল। আমাকে খুব ভালোবাসত। মৃত্যু কখন যে কার উপর তার শীতল হস্ত প্রসারিত করে ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষ আমরা তো বুঝতে পারি না।' ঘাটশিলার বাঙালি অবাঙালি সব পরিচিত ব্যক্তিই ওঁকে ভালোবাসতেন। কেউ কখনও খারাপ ব্যবহার করেননি।

সেবার পূজাকমিটির সেক্রেটারি আমার স্বামী। খুব তোড়জোড় করে পুজো হচ্ছে। সেবার পুজো হয়েছিল দ্বিজেনবাবুর নার্সারির ঠিক পিছনদিকের মাঠে। ছেলেরা থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছে। দিদি বড়ঠাকুর আছেন। সবাই এক জায়গায় আছি। ছোট পাড়ার মধ্যে পুজো, মনে হত যেন নিজেদের বাড়ির পুজো। সকালবেলায় পাড়ার ও বাড়ির সবাই মিলে অঞ্জলি, সন্ধ্যায় আরতি দেখা। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রি, মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছি, ঢাকের বাজনা আরতির ঘন্টাধ্বনি মনকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিত। বিসর্জনের দিন প্রতিমা বরণ করত পাড়ার মেয়ে বৌ। তাদের সঙ্গে আমরাও ছুটতাম

পূজামণ্ডপে। সিঁদুরখেলা কী অপূর্ব আনন্দের ব্যাপার ছিল। সেসব একটা দিন গেছে। মনে পড়ে যেত সেই ছোটবেলার কথা। তখন এই ঢাকের আওয়াজে একটা শিহরন জাগত। তখনও আনন্দের ভাণ্ডার যেন উপচে পড়ত। অহেতুক হাসিতে মন ভরপুর হয়ে যেত। তারই জন্য কত না বকুনি, কখনও কখনও কত না লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। আজ খুব হাসতে ইচ্ছা করে, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায় তারা? তাদের সন্ধান মেলে না।

তখন পূজার পরিবেশ ছিল আনন্দঘন শান্ত নিবেদনের আকুতি ও প্রণতিতে ভরা। এখন মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী অর্চনায় দম্ভ আর অহংকারের প্রতিযোগিতা দেখলে অবাক লাগে। অবশ্য সব জায়গায় নয়, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তখন আমাদের ভাটপাড়ার ঠাকুরপাড়ায় প্রায় প্রতি গলিতেই একটি দুটি করে দুর্গাপ্রতিমা পূজা হত। কাশীর পুজো দেখিনি, শুনেছি কাশীর পরেই নাকি ভাটপাড়ায় দুর্গাপুজোর সমারোহ এবং কৌলিন্যে উল্লেখযোগ্য এবং সংখ্যাতেও বেশি। বাড়ির পুজোই বেশি হত, বারোয়ারি ও সর্বজনীন মাত্র দুটি। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের বাড়ি, জানকী বল্লভঠাকুর, মন্মথ ঠাকুর, শক্তিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এঁদের সবার বাড়িতেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা হত। এদিকে গুড়ে বাড়ি, যোগীন ডাক্তারের বাড়ি, রজনী পালের বাড়ি এবং আরও বহু বাড়িতে পুজো হত। ঠাকুর দেখতে দেখতে পা ব্যথা হয়ে যেত। তার ওপর পায়ে পড়ত নতুন জুতোর ফোসকা।

মেজদির বাড়ি পুজো হত। সেই পুজোর দালানে ঠাকুর গড়া হচ্ছে, কতদিন আগে থেকে পুজোর আয়োজন চলত। চাল ডাল ঝাড়া-বাছা, নারকেল ছাড়ানো, বড়ি দেওয়া। নারকোল নাড়ু করা, ছাঁচ তোলা, চন্দ্রপুলি করে হাঁড়ি ভর্তি করে গুছিয়ে রাখা, সলতে পাকানো এইসব বড়রা করতেন। পুজোর ক'দিন ফুলতোলা, বেলপাতা গোছানো, শিশির তোলা, মালা গাঁথা এসব কাজ ছোটরা করতাম। কত লোকের নিমন্ত্রণ হত। বোঁদে জিলিপি ঢালাও। বেশ মনে আছে ওই সময় হালদার দাদামশাইদের বাড়ি ও কাশীদাদা মশাইদের বাড়ি পূজা আরম্ভ হল। এ পাড়া ও পাড়া সব নিমন্ত্রণ হত। পুজোর ক'দিন অনেকের বাড়িতে রান্নাই হত না।

বিকেলে আমি, সেজদি, সরযূদি, শঙ্করী, কালী, লীলা, দুর্গা, টাপু সবাই মিলে দল বেঁধে ঠাকুর দেখতে বেরুতাম। রাস্তায় ভিড় হত বটে তবে এখনকার মতো এতটা নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে হত। হাত-ধরাধরি করে যেতাম পাছে হারিয়ে না যাই। বেশ মনে আছে সে বছর আমার আর সেজদির ফ্রক হয়েছিল খদ্দরের, ব্লু রঙের ওপর মুগা সুতো দিয়ে হাতে গলায় নীচের ঘেরে কাজ করা। সেই জামাটা আমার খুব পছন্দ ছিল, তাই আজও মনে আছে। তখন বোধ হয় দেশে বিলিতি

জিনিস বর্জনের জের চলছে। তাই মা আমাদের খদ্দরের জামা করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন একদিন ছিল— ঘরে ঘরে চরকা কাটা হচ্ছে। মা দুপুরে চরকা নিয়ে বসছেন। সেজদা, ছোড়দা চরকা কাটছে। আমাদের হাতে হাতে টেকো ঘুরছে। কে কত সুতো কাটতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। প্রচুর সুতো কাটা হয়েছিল, জানি না কোথা থেকে সেই সুতোর কাপড় তৈরি হয়ে এল।

যাই হোক, পুজোর নতুন জামা পরে পায়ে নতুন জুতো পরে ঘুরতাম। হাতে একটা রুমাল থাকত। মা লালফিতে দিয়ে দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে দিতেন। সবাই মিলে চলেছি। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। কতরকমের জামা পরে আমার মতো মেয়েরা! আমি হাঁ করে দেখছি। প্রথমে রাস্তার ধারের রজনী পাল ও গুড়েবাড়ির ঠাকুর দেখে যোগীন ডাক্তারের বাড়ি যেতাম। পুরানো পুজো দালান। একই চালচিত্রের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ সবকটিকে নিয়েই সিংহের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে মা দুর্গা অসুরের বুকে বর্শা বিদ্ধ করছেন। প্রতিমার সর্বাঙ্গে সোনার গহনা। আমি অবাক হয়ে দেখছি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে আছে বোকার মতো সেজদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা দুর্গা তো সবার মা, অসুরের কি মা নয়? অসুরকে কেন মারছে রে? সেজদি আমাকে মুখ করে উঠে বলেছিল, কেন মারছে তা আমি কী করে জানব। নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় করেছে। তাড়াতাড়ি চ, অনেক জায়গায় এখনও দেখা বাকি। এক জায়গায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে! বেশি দেরি হলে মা বকবে না! সেকথা শুনে সবাই তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকালাম। সেজদি দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল। এরা সবাই সেজদির বন্ধু। আমি ওদের সঙ্গেই থাকি। আমার নিজস্ব বন্ধু একটিও নেই বললে চলে। সেজদির সই ছিল, মকড় ছিল, গঙ্গাজল ছিল, আমার ওসব ছিল না। অবশ্য তাতে আমার দুঃখ ছিল না। বেশ আনন্দেই ছিলাম।

বিজয়ার দিন ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত। সেজদিদের সকালে বিসর্জন হত, বিসর্জনের পর শূন্য পুজোর দালানে স্তিমিত দীপের আলো মনকে বিষণ্ণ করে তুলত। বিকেলে দলবেঁধে গঙ্গার ঘাটে যেতাম বিজয়া দেখতে। গঙ্গার বুকে অজস্র নৌকো, কত বা প্রতিমা ঘোরানোর নৌকো, কত বা আনন্দপিপাসু মানুষের আনন্দভ্রমণের নৌকো। গঙ্গার জল প্রায় দেখাই যায় না। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আমরাও নৌকোয় বেড়াতাম, কতরাত্রি পর্যন্ত গঙ্গায় বিজয়া চলত। একটু অন্ধকার হলেই আমরা বাড়ি আসতাম, এসেই বিজয়ার প্রণাম ও মিষ্টিমুখের পালা। অবশ্য ছোটবেলার বিজয়ার আনন্দের আয়োজন ঘাটশিলায় ছিল না বটে, তবে মন ভরে থাকত পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে।

৬৩

সেইসব দিনের কথা মনে হলে আমি বর্তমান ভুলে যাই, হারিয়ে যাই অতীতের মাঝে। তখন ঘুম ভাঙত একটা মধুর আবেশে। মনে মনে ঠিক করতাম ওঁকে কী কী বলতে হবে। ওঁর জন্যে কী কী করব। সারাদিন ওঁরই চিন্তা। আজ এখন নিভৃত শয্যায় শুয়ে কত কথাই তো মনে পড়ছে। ভুলে যাব ভাবছি কিন্তু মন তো মানছে না। ওঁর চিন্তা করতেই ভালো লাগছে। ইষ্টচিন্তা করতে করতে কখন দেখি ওঁরই চিন্তায় বিভোর হয়ে গেছি। তখন দু'চোখ উপচে জল আসে। সেই অশ্রুজলে আমি আমার ইষ্টের চরণদুখানি ধুইয়ে দিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করি, ওঁর আত্মার উত্তরণ হোক, শান্তিময়, মঙ্গলময় হোক ওঁর যাত্রাপথ। আমার যদি কোনো শুভ কর্মফল থাকে তার বিনিময়ে ওঁর যেন শান্তিলাভ হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে আর কোনোদিন— কোনোদিন যেন এমন অতর্কিত মৃত্যু ওঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

একবার ওঁর সঙ্গে ভাটপাড়ায় এসেছি। প্রথমে মামার বাড়ি উঠেছি। ওখানে সকাল থেকে আছি, সন্ধ্যাবেলায় উনি বললেন, চলো, ওবাড়ি ঘুরে আসি। ওঁর সঙ্গে হালকা মন নিয়ে বাপের বাড়ি আসছি। বড় দরজায় ঢুকে বাগান থেকেই দেখছি। চারিদিকে আলো জ্বলছে, লোকজন ঘুরছে। ভাবলাম কোনো কাজ-টাজ আছে। রণু, আমার বড় ভাইপোর ভাত হওয়ার কথা ছিল। বোধ হয় ভালো সময়েই এসে পড়েছি। মনে মনে ভাবছি। এখানে আসার মাত্র দু'দিন আগে বাবার চিঠি পেয়েছি, লিখেছেন সবাই ভালো আছে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই দেখি বাবার ঘরের মেঝেতে বিছানা, তাতে বাবা শুয়ে আছেন, বাবাকে সবাই ঘিরে বসে। ডাক্তার এসেছেন, মা দালানের জানলার কাছে বসে কাঁদছে, বাবার তখন জ্ঞান নেই, আচ্ছন্নমতো হয়ে আছেন। আমি কাছে গিয়ে বসলাম। একটু পরে বাবার জ্ঞান ফিরে এল। আমাকে দেখে বললেন, কখন এসেছ বসন্তের বাড়ি? আমার ছোট মামাশ্বশুরের নাম। বাবা আবার আচ্ছন্নমতো হয়ে গেলেন। তখন কত কথাই মনে হচ্ছিল। আগে যদি জানতাম বাবার এরকম অবস্থা এখানেই প্রথমে আসতাম। মাত্র দু'দিন আগে বাবার চিঠি পেয়েছি, হঠাৎ বাবার কী হল। সেদিন ভোরেই বাবা মারা গেলেন। অতর্কিত এই আঘাত আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। বাবা নেই, শূন্য বাড়ি। দিদিরা সবাই শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, আত্মীয়স্বজন সবাই এসেছেন, শুধু বাবা নেই। আমার স্বামী দু'দিন মামার বাড়ি থেকে এবাড়ি যাওয়া-আসা করে ঘাটশিলা ফিরে গেলেন। চিঠি লিখলেন—

ধলভূমগড়
শুক্রবার

প্রিয়া,

মীনু, অনেকদিন হল এসেছি। তোমাকে পত্র দিতে বিলম্ব হয়ে গেল। কিছু মনে কোরো না। সেদিন আসার পর শরীর খারাপ হয়েছিল। হাত পা ব্যথা, আর তেমনি সর্দি এবছর আর হয়নি। এখন বেশ সেরে গেছে। কদিন ধরে একটু বেশি কাজ পড়েছে, কয়েকটা শক্ত কেস ছিল। আজ আবার একটা এসেছে, কাল সকালে বোধহয় টাটা যাব। মধ্যে একদিন বাড়ি গিয়েছিলাম। ভাল লাগে না। ফুলমণি আছে, দেখাশোনা করে। ওরা চাল দিয়ে আসে। দাদার পত্র পেয়েছি, উনি লিখেছেন "তোমার বৌদিকে বাপের বাড়ি যেতে দিইনি কারণ তুমি এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু কৈ এলে? বা আমাকে পত্র লিখলে আমি মামার বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসতাম।" ইত্যাদি। এই ভাদ্রমাসে দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীরা মিলে দাদার জন্মদিনের উৎসব করবেন লিখেছেন। আশা করি পরমারাধ্যা শ্বশুরমশায়ের শ্রাদ্ধাদি সুশৃঙ্খলে সমাপ্ত হয়েছে। তুমি খুব সাবধানে থাকবে। ওবাড়ি আর গিয়েছিলে নাকি? ওবাড়িতে আমি আমার সবুজ শার্টটা আর একটা গেঞ্জি ফেলে এসেছি বোধহয়। ঠিক করে রেখো। তুমি ভাল বায়োস্কোপ দেখবে। টাকার আবশ্যক হলে আমাকে জানিও। দু'চারটে ভালো জামা কিনে নিও। খোকনের হাতে নাই হল আংটিটা। ছোট বড় করিয়ে নিও। মাকে সান্ত্বনা দিও আর গল্পে ভুলিয়ে রেখো। থাকি কি ওখানে আছে? সেজদি? বড়দি এসেছিলেন নাকি? ওবাড়িতে পত্র দিইনি। দাদাকে আজ দেবো। মনটা একরূপ চলছে। পুরানো হারমোনিয়াম যদি পাও চেষ্টা কোরো তো দাদাদের দিয়ে। উমাকে কি দাদা নিয়ে গেছেন না আছে এখনও?

মধ্যোমধ্যে বৃষ্টি হয়। মঙ্গল গুটকে ভালো আছে। বৌদি কেমন আছে আর দাদারা। গুরুজনদের প্রণাম দিও, তুমি আমার ভালবাসা নাও।

ইতি
তোমার

আমার স্বামীর চিঠি পেলাম। ভালো লাগছে না। উনি একলা ওখানে আছেন, শরীর খারাপ হচ্ছে। এমন একটা অবস্থা হয়েছে, দুজনে এক জায়গায় থাকতে পাচ্ছি না। ঘাটশিলার বাড়িতে আমাকে একলা রেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না। আমি থাকতে চাইতাম কারণ ধলভূমগড় তবুও অনেক কাছে এবং দু-একদিন অন্তর বাড়িতে আসতে পারতেন। এ-ছাড়া গুটকে মঙ্গলঠাকুরপোকে দিয়ে সংবাদ পাওয়া যেত।

যাই হোক, বাবার কাজ মিটে গেল। মন ভালো নয়। কত স্মৃতি মনে পড়ে চোখে জল আসছে। বাড়িতে মৃত্যুর থমথমানি। চিরদিনের মতো বাবা হারিয়ে গেলেন, যাঁর স্নেহধারায় আবাল্য বর্ধিত হয়েছি। দূর ঘাটশিলা, দু'দিন বাবার চিঠি পেতে দেরি হলে মন চঞ্চল হয়ে উঠত। এখন থেকে আর বাবার চিঠি পাব না।

বড়ঠাকুর সংবাদ পেয়ে একদিন মা ও দাদাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমাকে বললেন, বৌমা, খুব সময়ে হঠাৎ এসে পড়েছিলে। তাই বাবাকে শেষ সময় দেখতে পেলে। বাবা-মার মৃত্যু ভাগ্যে থাকলে তবে দেখা যায়। তুমি সাবধানে থেকো, নুটু এলে ওর সঙ্গে চলে যেয়ো।

ওই সময় আমার শরীর একটুও ভালো যাচ্ছিল না, জ্বর ও প্রচণ্ড সর্দিকাশি। ওঁকে জানাইনি, ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আসতে পারবেন না। এই সবে গেছেন। পরের চাকরি। কিন্তু আমার মামাশ্বশুর জানিয়েছেন। আমি এমনি একটা চিঠি দিয়েছি। তার উত্তরে লিখলেন—

ধলভূমগড়
শুক্রবার

প্রিয়া

মিনু, তোমার পত্র পেয়েছি। আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু গতকাল ছোটমামার পত্রে জানলাম তোমার জ্বর সর্দ্দিকাশী ইত্যাদি হয়েছে। এতে বিশেষভাবে মনটা দমে গেল। তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে আমার একটুও মন ভাল থাকে না। আবার কবে ছুটি পাবো তার ঠিক নেই। পুজোতে বোধ হয় যেতে পাবো। তখন ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। ছোটমামা লিখেছেন যত সত্বর হয় বধূমাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

এখানে আছি, বাড়ি একদিন গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়েও ঠিক মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। কেমন একটা আমার হয়ে গেছে। এই বনের দেশে বাস করে মন হাঁপিয়ে উঠেছে। তুমি থাকলেও দিনগুলো তবু একরূপ কাটে— আহারে, বিহারে, গল্পে, গানে।

মনটা তোমার এখন বেশ ভারী তাও আমি জানি, কিন্তু আর কোন উপায় নেই। খুব ভাগ্য ছিল তাই পিতৃদেবের শেষ নিশ্বাসের সময় তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছিলে, না? আমি ঠিক ওই আবর্তে থাকতে পারলাম না, অসহ্য হয়ে পড়ল। কোন কঠিন জিনিস আর আমি সহ্য করতে পারি না।

পরের দিন গঙ্গার তীরে গিয়ে বসলাম। পরপারে সবুজ গাছের সারি যেন নীল আকাশের সান্নিধ্য কামনা করছে। ভাবছিলাম একজন কত বৎসরের স্নেহ মায়া মমতার বন্ধন চিরতরে শেষ করে ওই নীলের মায়ায়, আবার নূতন গৃহরচনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, পিছনে আমরা পড়ে আছি। এখানকার মোহ কাটল।

ঘাটশিলায় এবার পুজো হবে রমণীবাবুর বাড়ি। ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে থিয়েটারের মহড়া দিচ্ছে। তোমার জ্বর হয়েছিল, আমাকে একটুও লিখলে না? কেমন থাকো লিখবে। আমরা ভালই আছি। গুটকে ছুটিতে কাল বাড়ি গেল। আমার ভালবাসা নাও। গুরুজনদের প্রণাম ও ছোটদের আশীষ দিও।

ইতি

তোমার প্রিয়

আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ওঁর মনে খুব চিন্তা ছিল। আমি কোনোকালেই মোটা নই। এঁরা সব মোটার দিক ঘেঁষা। আমাকে কেবলই অনুযোগ করতেন আমি নাকি ঠিকমতো খাই না। বলতেন, যা কিছু সব আমাকেই খাওয়াচ্ছ। নিজে কিছু খাও না, খাওয়া বাড়াও। একবার আমার টাইফয়েড হল, অনেকদিন ভুগেছিলাম, উনিই চিকিৎসা করেছিলেন। দিদি বড়ঠাকুর তখন ওখানে। কয়েকটা দিন নাকি একটু বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে আছে, বড়ঠাকুর বারবার এসে হাতটা ধরে নাড়ি দেখছেন। উনিও চিন্তিতমুখে বসে আছেন, রাত্রে বারেবারে উঠে দেখছেন। তখন সকলে এবং আমার স্বামী খুব যত্ন করেছিলেন। সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, জ্বর দেখা। তার ফাঁকে ডিসপেনসারিতে বসেছেন। ওখানে ভালো ফল পাওয়া যেত না, জামসেদপুর থেকে বারেবারে ফল আনিয়ে নিজে কেটে আমাকে খেতে দিয়েছেন, কারণ দিদি তখন একেবারে একলা। সংসারের সবকাজ দিদির ওপর। একলা কত করবে। উনি বলতেন, বৌদি, আমি এগুলো করি। তুমি কত করবে!

পরে যখন ভালো হয়ে উঠছি তখন একদিন বললেন, তুমি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। সেদিন রাত্রে যতবারই উঠছি তোমাকে ডাকছি, একটু সাড়া দিচ্ছ, তারপরই আচ্ছন্ন ভাব। আমার মা টাইফয়েডে মারা গিয়েছিলেন। তাই একটা ভয় ছিল মনের মধ্যে। তখন ওঁর চোখে একটা আকুলতা দেখেছিলাম। তখন যদি মরে যেতাম বেশ হত। তাহলে ওঁকে হারানোর যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হত না। আমি মারা গেলে, কিছুদিন পরে উনি বিয়ে করতেন। তার ভাগ্যে দীর্ঘজীবী হতেন, অকালমৃত্যু বরণ করতে হত না। সে বৌ শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী হত, ওঁকে বুঝত, আমি তো ওঁকে বুঝতেই পারিনি। বিয়ে ওঁকে করতেই হত, না করলে কে ওঁকে দেখত? যখন বাড়ি ফিরতেন কে ওঁর কাপড়-জামা এগিয়ে দিত? কে দিত তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন। কে করত, অসুখ হলে সেবা। একলা থাকতে পারতেন না। আমি সব দেখতাম, অবশ্য অদৃশ্যভাবে। তখন হয়তো ভালো লাগত না, কী হত জানি না। অন্তত তাঁর ভাগ্যে উনি বেঁচে থাকতেন। সেটাই হত আমার বড় সান্ত্বনা।

মনে পড়ছে উমা প্রথম ঘাটশিলায় এসেছে, আমিও তার দু'মাস আগে এসেছি। উমার হল নিউমোনিয়া। আমি উমার যথাসাধ্য সেবা করছি, উমার ছোটমামা ওষুধপত্র ইনজেকশান ইত্যাদি করছেন। রাত্রে উমার কাছে থাকতে হবে, আমি বললাম, আমি তো আছি। বললেন, তুমি পারবে তো? অবশ্য আমি পাশের ঘরেই আছি, দরকার হলেই আমাকে ডাকবে। মনে পড়ছে রাত্রে কতবার উঠে এসে উমাকে দেখে যাচ্ছেন। বাড়ির কারওর অসুখ করলে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। দেশে দিদি, বড়ঠাকুর, বাবলু, যারই অসুখের সংবাদ পেতেন, ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বারেবারে বলতেন, দাদা একলা সামলাতে পারবেন তো? ছোটবেলা থেকেই মৃত্যুর মিছিল দেখেছেন। বাবা, মা, ভাই, বোন, বৌদি অনেককেই চিরবিদায় দিয়েছেন, তাই প্রাণে একটা হারাই-হারাই ভয় ছিল। ওঁর প্রশস্ত বুকের মধ্যে অত্যন্ত কোমল একটা স্থান ছিল, যাকে বাইরে থেকে বোঝা যেত না। আমাকে বলতেন, মিনু, ওপর থেকে আমাকে কঠিন মনে হলেও, ভিতরটা কিন্তু আমার ততটা কঠিন নয়।

নরম বলেই তো নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। রূঢ়ভাষী মানুষের কঠিন ভাষণের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল একটি শুদ্ধ পবিত্র জীবন ও সংসার। হারিয়ে গেল একটি আনন্দময় অস্তিত্ব চিরতরে। কোমলতা পারল না দুর্বলতাকে জয় করতে, পারল না মিথ্যা বাস্তবের মুখোমুখি হতে। মুছে গেল আমার সিঁথির সিঁদুর।

'মাতৃধামে' ভোলামামা এসেছেন। স্ত্রী কন্যা নিয়ে। সঙ্গে জিপগাড়ি। কিছুদিন ওখানে থাকার পর ভোলামামা আমার স্বামীকে বললেন, ডাক্তার, ভাগনিকে নিয়ে চলো 'নেতারহাট' ঘুরে আসি, সঙ্গে জিপ আছে। উনি বললেন, আচ্ছা। বড়ঠাকুরকে বললেন। বড়ঠাকুর শুনে বললেন, ভালো। যাও, ঘুরে এসো।

নির্দিষ্ট দিন, আমরা দুজন মামা, মামি, তাঁদের কন্যা আর ড্রাইভার রওনা দিলাম।

এই প্রথম আমরা দুজন বেড়াতে যাচ্ছি, খুব আনন্দ হচ্ছিল। মামি আমার চেয়ে বেশ বড়, কিন্তু বন্ধুর মতো। পাহাড়ি রাস্তায় এইরকম প্রথম দূরের যাত্রী আমরা। অজানা পথ, কত পর্বত অরণ্য প্রান্তর অতিক্রম করে জিপ ছুটছে। ভোলামামা অনেক জায়গায় বেড়িয়েছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কথাও বলতে পারেন খুব। আমার কর্তাটিও গল্প ও কথার জাহাজ। দুজনে গাড়ি সরগরম করে রেখেছেন।

আমরা প্রথমে চক্রধরপুর ডাকবাংলোয় উঠেছিলাম। পথে চাইবাসায় সুরেশবাবুদের সঙ্গে দেখা করে গাড়ি সোজা পাড়ি দিল রাঁচির পথে। সারাপথ বেশ

আনন্দেই চলেছিলাম। মাঝে মাঝে ভালো জায়গায় একটু করে নামা হচ্ছে। রাঁচিতে পৌঁছে আমরা বাজারের কাছে অজন্তা হোটেলে উঠেছিলাম। ওখানেই খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা। সেদিন ওখানে থেকে পরদিন রাঁচির দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে বেরুনো হল। 'হুড্রু' ও 'জোনা' দুটি ফল্‌সই দেখেছিলাম। হুড্রু ফল্‌স দেখে সত্যি অদ্ভুত ভালো লেগেছিল। কত উঁচু থেকে প্রচণ্ড তোড়ে জলধারা নেমে আসছে। নীচেয় সৃষ্টি হয়েছে একটি হ্রদ। আমরা অনেকক্ষণ বসে দেখেছিলাম। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন লাগছে? বললাম, খুব ভালো। তারপর ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম।

পরদিন সকালে জাহাজবাড়ি, এরোপ্লেন বাড়ি এবং বিকেলে পাগলা গারদ দেখে মি. সিনহার বাড়ি গেলাম আমরা দুজনে। ফিরে আমাকে হোটেলে দিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন যখন, হাতে একটা কাগজের প্যাকেট। আমার হাতে দিয়ে বললেন, খুলে দেখ। খুলে দেখি দুখানা শাড়ি, একটা কালো রঙের আর একটা চাঁপারঙের। বললাম, শাড়ি কেন কিনতে গেলে? শাড়ি তো রয়েছে। উনি বললেন, পরো না। বাজারে গিয়ে ইচ্ছে হল। তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

বলা বাহুল্য, পছন্দ আমার খুবই হয়েছিল। আর শাড়ি পেলে কোন মেয়ের না আনন্দ হয়। ওই কালো রঙের শাড়িটা পরে নেতারহাটে অনেক ফটো তুলেছিলাম।

পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করেছিলাম নেতারহাট। আমার জায়গাটির নাম ঠিক মনে নেই, নেতারহাটের ঠিক নীচেয় আমার স্বামীর একজন ডাক্তারবন্ধু প্র্যাকটিস করছেন। উনি সেখানে গিয়ে কী করে তাঁর খোঁজ পেলেন জানি না। অনেকদিন পরে দুই বন্ধুতে দেখা হল। তিনি ছাড়তে চান না। সেদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে সবাই নিমন্ত্রণ খেলাম। স্ত্রী পুত্র ও বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ হল। বেলা একটু পড়তে ওখান থেকে আমরা রওনা হলাম।

পাহাড়ের বুক কেটে রাস্তা। একদিকে অতলস্পর্শী খাদ অপরদিকে পাহাড়ের প্রাচীর। অপূর্ব দৃশ্য। যত উঠছি ততই পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড়ের সমুদ্র। দিক-দিগন্ত জুড়ে শুধুই পর্বত আর তারই গায়ে সবুজ বনানী। বেলা ক্রমশই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। যেতে যেতে কয়েকটা পাখিও দেখলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা নেতারহাট ডাকবাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সূর্য তখন অস্তাচলে। তারই রক্তরাগ ছড়িয়ে আছে পশ্চিমাকাশে ও পাইনগাছের শীর্ষে শীর্ষে। উনি গাড়ি থেকে নেমেই বললেন, চলো একটু ঘুরে আসি, অন্ধকার হয়ে যাবে। লংকোটটা গায়ে দিয়ে নিলেন, প্রচণ্ড শীত। আমি শালের শাড়ি পরেই ছিলাম, তার উপর কোটটা গায়ে দিয়ে ওঁর সঙ্গে হাঁটা দিলাম। একটু ওপরে উঠেই একটি উপত্যকা। তাতে সবুজ গাছের সমারোহ। জিজ্ঞেস করলাম, কী গাছ এগুলো? বললেন, পাইন।

অনেকক্ষণ সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্তের শেষ বিলীয়মান রশ্মিজড়ানো পাইনবনের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। আমি বললাম, চলো, ওঁরা কী ভাববেন। উনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, চিরকাল লোকে কী ভাববে। চলো। পাশাপাশি নীরবে ডাকবাংলোয় ফিরলাম।

তখন নেতারহাট ছিল অতি নির্জন সৌন্দর্যভূমি। মাত্র কয়েকটা বাংলো আর সেই বাংলোর রক্ষক দু-চারজন ব্যক্তি ওখানে থাকত। দোকানপসার কিছুই ছিল না। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন আমাদের বাংলো ছাড়া সবক'টাই ছিল খালি। এসে দেখি ভোলামামারা দুখানা ঘরে বিছানাপত্র রেডি করে ফেলেছেন। বসার ঘরে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, ওঁরা সব বসে আছেন। ভোলামামা আমার স্বামীকে বললেন, ডাক্তার, ভাত আর ডিমের ডালনা রাত্রে হবে। চা এখুনি এসে যাবে, তোমরা রেডি হয়ে নাও।

ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ করে গল্পসহযোগে চা পান করা হল। একটু রাত্রে খাওয়া সেরে যে যার বিছানায় আশ্রয় নিয়েছি। কথা ছিল ভোরে উঠে গাড়ি করে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সূর্যোদয় দেখতে যাব। তারপর ওখান থেকে কিছুটা দূরে অরণ্যমধ্যে একটা বিরাট জলপ্রপাত আছে, সেটাও দেখে আসা হবে। সারাদিনের জার্নির ক্লান্তিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি। বেশ কিছুক্ষণ পরে দবজার পাশে কীসের যেন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সবার ঘুম ভেঙে গেছে। ভোলামামার অস্ত্র সঙ্গেই ছিল, উনি সেটা নিয়ে রেডি রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ, আমরা আবার বিছানায় গেলাম।

পরদিন জানা গেল, ভাল্লুক নাকি এঁটো ভাত তরকারি খেতে এসেছিল। যাই হোক, ভোরে আমরা সবাই তৈরি হয়ে নিলাম। এত শীত বেরুতে ইচ্ছা করছে না! আমি বললাম, মামিমা, একটা পাতলা কম্বল গায়ে জড়িয়ে যাই। ওঁরা সব হাসতে লাগলেন। তাতে কিছু যায় আসে না, কম্বলমুড়ি দিয়েই দিব্যি সূর্যোদয় দেখলাম। যা দেখলাম তার বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। শুধু বলব--- অপূর্ব। অনবদ্য যে-শিল্পীর কল্পনায় এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হয়েছে তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, বারংবার। ওই সময় জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া হল না। বিকেলে আমরা সেই জলপ্রপাত দেখতে বেরুলাম। জিপ একটা জায়গায় গিয়ে আর যেতে পারল না। তখন হেঁটে শুকনো ঝরাপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে সেই জনমানবহীন প্রকৃতির একেবারে নিভৃত কোলের কাছে গিয়ে, চঞ্চল উদ্দাম এক জলপ্রপাতের সামনে এসে দাঁড়ালাম! উনি বললেন, ভালো করে দেখো। বিস্মিত চোখে দেখলাম খেয়ালি প্রকৃতির এক অনবদ্য রূপ, যা মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয়, মনে করিয়ে দেয় স্রষ্টার কথা। আপনিই মাথা নত হয়ে আসে তাঁর চরণতলে। একসময় উনি বললেন, 'দাদা এলে বেশ হত।' কিছুক্ষণ পরে ফিরলাম।

তারপর সেই পাইনগাছে-ভরা উপত্যকায় বসে রইলাম দুজনে কতক্ষণ। ভারী ভালো লাগছিল, মনে হচ্ছিল যদি সমস্ত কর্মমুখর বাস্তবের সংস্পর্শ থেকে দূরে এমনি শান্ত নির্জন পরিবেশে দুজনে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম তা হলে বেশ হত। তখন কি জানতাম, কিছুদিনের মধ্যেই ওঁকে আমি হারাব। তা হলে আমার সেই আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে আরও আরও নিবিড়ভাবে অনুভূতিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করতাম। সেদিন রাত্রে দুজনে কত কথা বলেছি। এরপর আমরা কোথায় বেড়াতে যাব। উনি বলেছিলেন, আগে দার্জিলিং। আর আমি বললাম, তারপর হরিদ্বার। কত কল্পনাই মানুষের থেকে যায়।

ওখান থেকে সোজা কলকাতা। ওঁর ভাটপাড়া আসার ইচ্ছা ছিল না। কারণ অনেকদিন ঘাটশিলা ছেড়ে বেরিয়েছেন। ওঁর মনে চিন্তা হচ্ছে। আমার একান্ত ইচ্ছায় রাজি হলেন। ভাটপাড়া ঘুরে আমরা যাত্রা করলাম আমাদের অন্নভূমির দিকে।

এসে দেখি কানুমামা এসেছেন, সঙ্গে ক্যামেরা। বললে, 'নুটুবাবু, আপনার আর যমুনার ফটো তুলব।' ফটো ভালো হয় না তবুও তোলা হল, বাড়িতে একটা আতাগাছের তলায়, আর একটা কূর্মকুটে দুজনে দুদিকে বসে। কানুমামা ফটো দেখে বললেন, এ যেন হয়েছে 'দেহি পদবল্লভমুদারম্'। বলে হাসতে লাগলেন আমাদের ভালো ফটো নেই, ওঁর একটা অহীনের তোলা তানপুরা হাতে সুন্দর ফটো আছে। আর একটা আমার বিয়ের বছরে তোলা সুটপরা ভালো ফটো আছে।

মনে পড়ছে একবার কয়েকজন ডিপথিরিয়া রুগি এসেছে ওঁর হাতে, একজনের অবস্থা খুবই সংকটজনক। তখন ওখানে আর একজন ডাক্তার ছিলেন। নাম—তারাপদ রায়। ওঁর থেকে বয়সে ছোট। কিন্তু বন্ধুর মতো ছিলেন। দুই ডাক্তারে পরামর্শ করে সেই রুগিটিকে অপারেশান করেছিলেন, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় সেই রুগিটি সেরে উঠেছিল। দুই ডাক্তারের সে কী আনন্দ! উনি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিলেন। যেখানে যেতেন সেখানেই জমিয়ে নিতে পারতেন। গানে, গল্পে, সাহিত্যে, তাসের আড্ডায় কোনো কিছু থেকেই পিছিয়ে থাকতেন না। একবার আড্ডা দিতে বসলে ঘণ্টা কাবার হয়ে যেত। কিন্তু ডাক্তারির ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সিরিয়াস।

কাগজ পড়ার সময় বেশি পেতেন না, তাই ডিসপেনসারি থেকে এসেই স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলতেন, শিগ্গি খেতে দাও। খেয়েই কাগজটা নিয়ে বিছানায়। যেদিন দুপুরে হত না সেদিন রাত্রে শুয়ে কাগজটা দেখে নিতেন। আমি বলতাম, কাগজ রাখো, কথা বলো। কাগজ ভালো লাগছে না। রাতদুপুরে এসে আবার কাগজ। উনি হাত নেড়ে বলতেন, একটুখানি। এর মধ্যে রাত্রে ডাক এলে বেরুতে হত। একদিন শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই শুনি বাইরে থেকে

ডাকছে— ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু। উনি শুনতে পাননি, ওঁর শরীর ভালো ছিল না। জ্বর হয়েছিল। আমি উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কী দরকার? তাঁরা বললেন, ডাক্তারবাবুকে যেতে হবে। আমি পড়েছি মুশকিলে, ওঁর জ্বর, ডাকব? বললাম, না গেলেই চলবে না? কাল সকালে যদি যান, আজ ওঁর শরীরটা ভালো নেই। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ওঁর ঘুম ভেঙে গেছে, উঠে বললেন, যাচ্ছি দাঁড়াও। কী হয়েছে? ওঁরা সব কী বললেন, আমি বললাম, নাই বা গেলে। ওরা অন্য ডাক্তার ডাকুক না। তোমাব শরীর ভালো নেই। উনি বললেন, তা কি হয়? বিপদে পড়েই মানুষ রাত্রে ডাকে, আমি এখুনি চলে আসব। আমার ব্যাগ আর স্টেথস্কোপটা দাও। দরজাটা দাও। বলে বেরিয়ে গেলেন। শরীর খারাপ, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদিন ডিসপেনসারি থেকে এসে দিদিকে বললেন, বৌদি, একটা শুভ সংবাদ আছে। লরি বাংলার সামনের মাঠে যে সিনেমা হলটা তৈরি হচ্ছিল, কাল থেকে সেটা চালু হবে। যার হল সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন, যেতে অনুরোধ করে গেছেন। উনি সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসতেন। একদিন টিকিট কেটে এনে বললেন, বৌদি, আজ সিনেমা যাব। বাবলুকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাবে। দাদা থাকবেন।

সেইভাবে যাওয়া হল। আমরা তিনজন। আসতে আসতে দিদিকে বললেন, বৌদি, ঘাটশিলায় সিনেমা হবে ভাবাই যেত না। কী বলো? আর একদিন বাবলুকে রেখে যাওয়া হয়েছিল, সেদিন আমরা চলে যাওয়ার পরই ঘুম ভেঙে গেছে, বাবলু কেঁদেকেটে উদব্যস্ত করে তুলেছিল। আর একবার দিদি ছিল না, অনুদি (মল্লিকবাবুর পুত্রবধূ) আমি এবং উনি তিনজনে গিয়েছিলাম। কী বই দেখেছিলাম ঠিক মনে নেই, মনে হচ্ছে হিন্দি 'শকুন্তলা'। আসার সময় আনন্দভরা মন নিয়ে শালবনের মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ চাঁদের আলোর আলোছায়ার আলপনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ওঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলাম। হয়তো ব্যাপারটা অতি সামান্য, তথাপি সামান্য হতেই অসামান্যের আস্বাদন করা যায়। আনন্দের কাছে তুচ্ছ বলে কিছু নেই। আনন্দ মানুষের অমূল্য সম্পদ। সেদিনের আনন্দস্মৃতি মনের মণিময় কোঠায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

৬৫

একদিন রাত্রে হঠাৎ আমার বড়দার ডাকে ঘুম ভাঙল। আমি তো অবাক। আসছে যে সেকথা আগে কিছুই জানায়নি। সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল। উনি দাদার সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করলেন। পরদিন মকর সংক্রান্তি, টুসুর পুজো হয়। এই পুজো ওদিকের

বড় উৎসব। পরদিন দাদাকে নিয়ে দুপুরবেলা সুবর্ণরেখার ধারে টুসুপুজো দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের বাড়িতে রাধা কাজ করত। সে তো উৎসবে একেবারে মেতে উঠেছিল। বেশ গান করতে পারত।

উনি একদিন ডিসপেনসারি থেকে এসে জুতো খুলতে খুলতে বললেন, আজ সরোজের চিঠি এসেছে। তোমার মনে আছে আমার সঙ্গে ও তোমাকে দেখতে গিয়েছিল? লিখেছে— যাকে নিয়ে তুই ওখানে ভুলে আছিস তার জন্য তুই আমার কাছে ঋণী। বলে বললেন, চলো একবার ওদিকটা ঘুরে আসি। অনেকদিন কলকাতা যাইনি।

দুজনে এলাম। আমাকে ভাটপাড়ায় দিয়ে উনি এলেন কলকাতায়। বেশিদিন কলকাতায় না এসে উনি থাকতে পারতেন না। কদিন কলকাতায় থেকে সবার সঙ্গে দেখা করে ঘাটশিলায় ফিরে আমাকে চিঠি লিখলেন।

ঘাটশিলা
বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টা

প্রীতিভাজনেষু

মীন্, তোমায় পৌঁছে দিয়ে এসে কলকাতায় কতক কাজ সেরে, বেবিদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। মঙ্গলবার রাত্রে (Mail) মেলে উঠে বসলাম। যন্ত্রদানব পদভরে পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে আপন দাপটে পথ চলতে সুরু করে দিল। কিছুই মানে না। কত নদী উপনদী বন উপবন, ঘাটবাট, পথমাঠ, এদের বুক কাঁপিয়ে শিহরণ জাগিয়ে ছুটলো। আমার মনে হচ্ছিল আমি আজ একা যাত্রী, কোথায় যেন চলেছি। পৃথিবীর বাইরেও হবে, আর মনে হল এই গতির বেগ যেন না থামে। দূরে বহু দূরে ওই খরোজ্জ্বল শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গলের দেশের ওই নৈশমণ্ডল পেরিয়ে, ঘুরে ঘুরে চলবে আমার এই চলা। সেখানে গিয়েও যেন আমার গতি না থামে। তবে গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে শনিমণ্ডলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাব বাবা, আর নয়।

রাত্রির অধিকে দেখি দানবের গতি মন্থর হয়ে এলো। হঠাৎ সব স্বপ্ন তখন টুটেছে। বাইরে চেয়ে দেখি সেই পূর্ব্বপরিচিত লালমাটির পথ। (আমার মন ভুলায় রে।) ধীরে ধীরে নদীশৈলপাদমূলে আমার কুটিরে এসে পৌঁছলাম। অপূর্ব জ্যোৎস্না যেন সমস্ত সুপ্ত পৃথিবীকে গলিত রজত আস্তরণে রূপায়িত করেছে। বিরহী যক্ষের মনন নিয়ে নির্বাক বিস্ময়ে পৃথিবীর এই অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের দিকে চেয়েছিলাম।

আজ সকালে হঠাৎ ভাবছি, তার কিছুমাত্র আর একজনের চোখের কাছে যদি পত্রালির দূত হিসাবে প্রেরণ করি। এই মোর 'নব মেঘদূত' আজ তোমায় পাঠালাম।

প্রিয়া সানন্দে গ্রহণ করে আমায় প্রীত করবে। সকলকে আমার নমস্কার প্রণাম যতদূর অভিবাদন জ্ঞাপন করলাম, আর প্রিয়াসকাশে প্রেম রইল। ইতি

বিরহী

ওইবারই আমাকে ভাটপাড়ায় নিতে এসেছেন, বললাম, কলকাতা থেকে কয়েকটা কাচের কাপ-ডিশ ইত্যাদি কিনব। উনি খুশি হয়েই কিনে দিয়েছিলেন। নিজে জিনিস কিনতে ভালোবাসতেন। কিছু চাইলে খুশি হতেন। আমার স্বভাব তার ঠিক উলটো। চাইতে পারি না। তা ছাড়া না চাইতেই তো সব পাই। ঘাটশিলায় তখন বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না, তাই ভাটপাড়া আসার আগে বলতেন, তোমার যা যা দরকার কিনে নিয়ো। চিঠিতে লিখতেন, সিনেমা দেখবে। ভালো দেখে দু-চারটে জামা কিনে নিয়ো, জুতো কিনো ইত্যাদি। ভালো প্যাডের কাগজে চিঠি লিখতে লিখতে বোধ হয় ওঁর মনে হত আমি বঞ্চিত হচ্ছি। দু'খানা কাগজ আমাকে খামের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনে পড়ে, একবার ওঁর সঙ্গে মৌভাণ্ডারের স্টোর থেকে ওটিন স্নো আর একটা ওটিন ক্রিম কিনেছিলাম। খুশি হয়ে বলেছিলেন, আর কিছু? এখনকার মতো প্রসাধনের জিনিসপত্র তখন বোধ হয় ছিল না। তা ছাড়া আমি ওসব ব্যাপারে বড় নীরস ছিলাম। বিয়ের পরই বেলডাঙা গিয়ে ওঁকে একটা নীল ছোট্ট শিশি থেকে সেন্ট মাখতে দেখলাম। একদিন বলেছিলাম, 'ওটা কী সেন্ট?' আমাকে একটু দিয়ে বললেন, 'ইভনিং ইন প্যারিস।' 'বেশ সুন্দর গন্ধ তো!' তারপর বহরমপুর থেকে আমাকে একটা এনে দিয়েছিলেন। খুব আনন্দ হয়েছিল। স্বামীর কাছ থেকে পেতে কার না ভালো লাগে।

মেজ ঠাকুরপো সেজ ঠাকুরপোর পৈতে, মামা যেতে লিখেছেন। মা লিখেছেন, আবার কবে বাড়িতে কাজ হবে তার ঠিক নেই। তোমরা চলে আসবে। তখন দিদি বড়ঠাকুর ওখানে। ওঁর হাতে শক্ত রুগি, বললেন, পরের দায়িত্ব নিয়েছি। যাই কী করে।

খুব যেতে ইচ্ছে করছে। আমাদের দুজনেরই মন খারাপ। কোনোদিন আমি ওঁকে জোর করে কিছু বলিনি। বললে হয়তো একটা ব্যবস্থা হত, কিন্তু ওঁকে অসুবিধায় পড়তে হত।

এরপর আমার ছোট বোনের বিয়ে হল। তাতেও আমাদের আসা হল না। ওঁর অসুবিধা, আমি জোর করিনি, বাবা কত করে লিখেছিলেন, 'এই আমার শেষ কাজ।' মন অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। আমি বললে ভাটপাড়া থেকে কেউ গিয়ে আমাকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু উনি একলা থাকবেন বলে লিখিনি, আমি আনন্দ করব আর ও বেচারি এখানে একলা পড়ে থাকবে, তাব চেয়ে দুজনেই থাকি।

সে সময় একটা বেশ মজার ব্যাপার হয়েছিল। বিয়ের দিন আমার মন খুব খারাপ। মনে হচ্ছে বাড়িতে সবাই কত আনন্দ করছে। বোনেরা সকলে এসেছে, মা-বাবার নিশ্চয়ই আমার কথা মনে পড়ছে। সবাই জিজ্ঞেস করছে, যমুনা-নুটু এল না? একটা বই নিয়ে বাইরের বারান্দায় শুয়েছি। বেলা দেড়টা হবে। দিবানিদ্রা দেওয়ার জন্য ঘরে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আমায় বললেন, তোমার খুব মন খারাপ লাগছে, না? আমারও খুব মনে পড়ছে। বলে চলে গেলেন। আমি পড়ছি, ঘর থেকে নাক-ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ যেন একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার ঠিক মাথার কাছ দিয়ে একটা কুকুর ওর বড় ডুগিটা মুখে ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, আমার চেঁচানির চোটে ওঁর ঘুম ভেঙে গেছে, উনি তাড়াতাড়ি করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। হইহই-এর চোটে কুকুরটা ডুগিটা ফেলে পালিয়েছে। ডুগিটা হাতে নিয়ে দেখি কিছু হয়নি। উনি হেসে বললেন. আচ্ছা রসিক কুকুর তো, ঘরে ঢুকে আর কিছু পেল না, আমার ডুগিটার ওপর নজর পড়ল। এরপর ডুগি-তবলার জন্যে দুটো বেতের সুন্দর ঝাঁপি করেছিলেন।

কত টুকরো ছবি, টুকরো কথা, সুখ-দুঃখের কত স্মৃতি কখনও কখনও মনের গহন অতল থেকে ভেসে ওঠে, আবার অতলে তলিয়ে যায়। যেমন, 'তোএ জননী পুনঃ তোএ সমাহিত সাগরলহরী সমানা'।

শচীন-উমা ওয়ালটেয়ারে । চিঠি আসে, ফটো পাঠায়। উনি বলতেন, একবার সুবিধা হলে উমার কাছে যাব। আমি বলতাম, আমাকে সঙ্গে নেবে তো? না পুরীর মতো একলাই পালাবে? বলতেন, না-না। উমার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব, খুকি কত খুশি হবে।

বিয়ের পর একবারমাত্র উমা-শচীন ঘাটশিলায় এসেছিল। আমাদের সবার জন্য কাপড় এনেছিল। আমার কাপড়টা ছিল গাঢ় বেগুনি রঙের। আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। একবার উনি কানুমামাকে দিয়ে আমার জন্য কাপড় আনিয়েছিলেন। কানুমামা ভারী সুন্দর তিনখানা শাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা নীল রঙের মানে-না মানা, একটা ম্যাড্রাসি— সরু পাড় ডালিমফুল রঙের, আর একটা গোলাপি। তিনটে শাড়িই আমাদের দুজনের খুব পছন্দ হয়েছিল।

একবার উনি কলকাতা আসছেন, আমাকে বললেন, তোমার জন্যে কাপড় আনব। কী রঙের আমায় বলো। আমি বলেছিলাম তোমার পছন্দমতো যা হয় এনো, একটা সাদা লালপাড় এনো। উনি একটা সাদা লালপাড় শাড়ি, সঙ্গে আরও দুটো—

একটা সবুজ ও আর একটা নীল ভেলভেট-পাড় শাড়ি এনে দিলেন। বললাম, এতগুলো আনলে কেন? উনি বলেছিলেন, তুমি নিজে একখানা সাদা শাড়ি চেয়েছ। তাই খুশি হয়ে দুটো বেশি আনলাম। ইচ্ছা হল। পোরো।

একদিন সারা দুপুর ধরে একটা বই পড়লেন। আমি বললাম, আজ একটু ঘুমোলে না? বললেন, না। পড়তে পড়তে এত ভালো লাগল, ঘুম কোথায় পালিয়েছে। রাত্রে তোমাকে গল্পটা বলব। আমি চা করতে গেছি, এসে দেখি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্যাডের কাগজে কী যেন আঁকছেন। একটু ঝুঁকে দেখি একটা ফুল—পেন দিয়ে আঁকছেন। বললেন, এটা কী ফুল বলো তো? বললাম, কলকে। বললেন, তোমার মুণ্ডু। এটা নীলকণ্ঠ। আমি অবাক হয়ে বললাম, বাবা, এ তো একটুও নীলকণ্ঠের মতো নয়। তখন হেসে বললেন, ভাবো নীলকণ্ঠ, তবে তো বুঝতে পারবে। বলে বেরুবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। আজও সেই অলস অবসরে আঁকা ফুলের কাগজটা আমার কাছে আছে। চিহ্ন কতদিন থাকে অথচ যার চিহ্ন সে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। কিন্তু চোখে হারালেও মনে তার নিত্য আনাগোনা। উনি চলে গেছেন আজ কত যুগ হয়ে গেল, কিন্তু এমন একটিও দিন যায়নি যেদিন ওঁকে স্মরণ করিনি, মনে মনে ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি। মানুষ যেমন ঈশ্বরকে মনে মনে সব নিবেদন করে, তেমনি আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা, ওঁকে নিবেদন করেই যে শুরু হয়। আমার ইষ্টের মাঝে উনি একাকার হয়ে গেছেন। তাই কবির ভাষায় বলি, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

৬৬

একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমার ডাক্তার দেখানোর কাজ সব মিটে গেছে, ঘাটশিলায় এসেছি। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে বললাম, 'জানো নার্সিংহোমে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল, সে বলেছিল, জানেন আমার স্বামী আমার সঙ্গে বিয়ের আগে একটা মেয়েকে ভালোবাসত। পারিবারিক কারণে বিয়ে হয়নি। পরে মেয়েটি মারা যায়। সেইজন্য ওর স্বামী ওর প্রতি একটু উদাসীন।' উনি চুপ করে শুনলেন, তারপর বললেন, 'আমি যদি বিয়ের আগে কাউকে ভালোবাসতাম তুমি কেঁদেই ভাসাতে। ও দেখ কেমনভাবে তোমাকে বলেছে।' বললাম, 'সে মেয়েটি তো মারা গেছে। তাই সহজভাবে বলেছে।' আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মরে গেছে মানে আপদ গেছে, এই তো?'

একবার আমরা কলকাতা আসছি। এগারোটার প্যাসেঞ্জার। স্টেশনে গাড়ি আসতেই দেখা গেল গালুডির একজন পরিচিত ভদ্রলোক সপরিবারে কলকাতা ফিরছেন। উনি ওঁদের সঙ্গে আমাকে লেডিসে তুলে দিয়ে, নিজে অন্য কামরায় চলে গেলেন। প্রথমদিকে ওঁদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে চুপচাপ। মাঝে মাঝে কথা হচ্ছে। গাড়ি ছুটে চলেছে, স্টেশনের পর স্টেশন আসছে। ওঁর আর পাত্তা নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। দারুণ জলতেষ্টা পেয়েছে। ওঁদের কাছে চাইতে লজ্জা করছে। শেষে হাওড়া স্টেশন এল। দেখি উনি আসছেন। গাড়ি থেকে নেমে ওঁদের কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটছি, একটিও কথা বলছি না। কিছুক্ষণ পরে বললেন, কী হল? কথা বলছ না যে? বললাম, এমনি। এতক্ষণ তো চুপ করেই ছিলাম, এতটুকু পথ চুপ করেই থাকি। আমার দিকে চেয়ে বললেন, রাগ হয়েছে। মাত্র ক'টা ঘণ্টা। আমি ভাবলাম ওঁরা তো সব রয়েছেন, ওই জন্যে আর নামিনি। চলো পা চালিয়ে।

এখন ভাবি অযথা কত রাগ অভিমান করেছি। আজও রাগ হয় অভিমান হয়, অত্যন্ত বেদনায় মূক হয়ে যাই। অবশেষে দু'চোখে নামে অশ্রুর বন্যা। মনে পড়ে ওঁর কথা, অন্যে ভুল বোঝে। তখন ঘোড়ার গাড়ি ছিল, তাতে করে শিয়ালদা স্টেশনে এলাম। আমাকে জিনিসপত্র সমেত এক জায়গায় বসিয়ে বললেন, তুমি একটু বসো, আমি এখুনি আসছি। কিছুক্ষণ পরে এসে আমার হাতে একটা ঠোঙা দিয়ে বললেন, খাও। বললাম, তুমি? বললেন, আমি খেয়ে এসেছি। ওটা তুমি খাও। খিদেয় তো গলা দিয়ে সুর বেরুচ্ছে না। সত্যি, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। তারপর ভাটপাড়ায় এলাম। মামা, মামিমা, ভাইবোনেরা সবাই খুশি। আমার স্বামী মামাতো ভাইবোনেদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মামার বাড়িই ছিল ওঁর নিজের বাড়ির মতো। কত আশা-নিরাশার দোলা, কত আনন্দঘন মুহূর্ত। মনের কষ্টিপাথরে দাগ কেটে আছে যা আমৃত্যু মনে থাকবে।

একদিন পারুলদি বলেছিলেন (আমার পাড়ার দিদি, উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন), দেখ যমুনা, এঁদের মধ্যে (অর্থাৎ আমার স্বামী ও ভাশুরের মধ্যে) শক্ত কঠিন সংসারী শিকড় ছিল না। পিতা সংসারী ছিলেন না। বড় ভাই চিরপথিক, আর তোর স্বামী দাদাগতপ্রাণ। ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো, ওদের রাখা যায় না রে। ওঁরা দু'ভাই পরস্পর একই মূলের দুইটি ধারা ছিলেন।

আমাদের বাড়ির সবাই 'দেবযানে' বিশ্বাসী ছিলেন। আমার স্বামী বলতেন 'দেবযান' পড়ো, শান্তি পাবে। বড়ঠাকুর বলতেন, দেবযান সত্য, আত্মার মৃত্যু নেই। আমারও মনে হত, জীবনের চেয়ে মৃত্যুই মধুময়, অবশ্য ওপারের রহস্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালেই থেকে গেছে। বা যায়। মনে হয়, তা হলে কি দু'ভায়ের দেখা

হয়েছে? হয়েছে দিদির সঙ্গে বড়ঠাকুরের পুনর্মিলন? সবই তো প্রশ্ন, উত্তর কোথায়? উনি অত্যন্ত গান ভালোবাসতেন এবং গান শেখার একটা প্রবল বাসনা ওঁর মনে ছিল। একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করছি।

ওঁর যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন কোথা দিয়ে যে কী হয়েছিল জানি না, কে এসেছিলেন, কে চলে গেছেন, কখন সূর্য অস্ত গেছে তাও মনে নেই। আমি আচ্ছন্নের মতো বড়ঘরের মেঝেতে শুয়েছিলাম। পাশে ছিলেন বেলুর শাশুড়ি চারুশীলা দেবী। সেই অবস্থায় দেখি উনি যে ধুতিটা পরেছিলেন, সেই ধুতির একটা খোঁট গায়ে দেওয়া। খালি পা, মুখটা অত্যন্ত মলিন। দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে একটি জানলা, সেই খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর সরস্বতী প্রতিমার মতো দেখতে একজন মহিলা। বীণা বাজিয়ে গান করছেন। উনি চুপ করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর কেমন যেন ম্রিয়মান ভাব। সেই দেখে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। দেখি কখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। ওঁর দেহ তখনও বারান্দায় খাটিয়ার উপর শায়িত। কেন দেখলাম জানি না, এর অর্থ কী তাও জানি না। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরা বলেন, উনি গান ভালোবাসতেন, তাই দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ করেছেন। এঁরা দু'ভাই অধ্যাত্মবাদী, পরলোকবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে ভেবে কূলকিনারা পাই না, পাই না ওপারের ছিটেফোঁটা সংবাদ। মনটা ছটফট করে ওঠে। মনে হয় এপার-ওপারের অদৃশ্য পরদাটা যদি দু'হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারতাম, অথবা কোনো জাদুমন্ত্রে যদি ছিঁড়ে পড়ত, তা হলে কী করতাম। কী জানি কী করতাম।

একদিন ডিসপেনসারি থেকে এসে চুপ করে শুয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, শুয়ে আছো কেন? শরীর খারাপ? বললেন, ক'দিন ধরেই শরীর খারাপ লাগছিল। আজ কী মনে হল ইউরিনটা দেখলাম, একটু সুগার হয়েছে। আজ থেকে আমি বহুমূত্র রোগাক্রান্ত। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সুগার মানে খুবই সাবধানে থাকতে হবে। তারপর থেকে ভাতের বদলে রুটি, দুবেলা। মিষ্টি, আলু সব ছেড়ে দিলেন। রাত্রিবেলা সোনামুগের ডাল ও ডাল-ভাতে আর ডিমের ডালনা হলে আর কিছুর দরকার হত না। ভাত ত্যাগ হল। আমি বললাম, তুমি ভাত খাবে না, আমার নিজের জন্যে ভাত করতে ইচ্ছা করছে না। উনি ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা বিপদ তো, আমি ভাত খাচ্ছি না, অন্য সব খাচ্ছি। তুমি যেন ভাত ছেড়ো না। একেই তো রোগা, ভাত ছাড়লে আরও রোগা হয়ে যাবে। মাঝে মাঝেই খেতে খেতে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি ভাত খাচ্ছ তো?

ওঁর চেহারা ছিল হোমরাচোমরা, বেশ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। তার ওপর ডাক্তারমানুষ, যেখানে যেতেন সবাই একটু সমীহ্ করত। এগিয়ে এসে কথা বলত। তার ওপর বিভূতিভূষণের ভাই, তাই নিয়ে অনেকের ঈর্ষা হত, তাঁরা বলতেন, ডাক্তারকে লোকে খোশামোদ করে। তাই শুনে উনি বাড়ি এসে আমাকে বলতেন আর হাসতেন।

ওঁর একজন মুসলমান বন্ধু ছিল। নাম সিদ্দিক। আমাকে বোন বলতেন। দুজনেই মোটর সাইকেল ভক্ত। দুজনে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরতেন। আজ লিখতে বসে তাঁর কথাও মনে পড়ছে।

ভক্তদা রমণীবাবুর বাড়ি প্রথম ঘাটশিলায় আসেন পিকু , ডালু, গোপা। ওরা সবাই ভক্তদা বলত, তাই আমাদেরও উনি ভক্তদা। সুন্দর অমায়িক ভদ্রলোক। ওঁর স্ত্রী কমলাদিও খুব ভালো। ওঁরা লরিসাহেবের বাংলোটা কিনেছিলেন। এখন ওঁরা কোথায় জানি না। ওঁদের শ্রদ্ধাসহ্ স্মরণ করছি।

আর একটি পরিবার আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। সুধাময়বাবু অত্যন্ত মদ খেতেন। একদিন রাত্রে একটু বেশি মাত্রায় খেয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আমার স্বামীকে চিৎকার করে যা-তা বলছেন, ডাক্তার, ও বেটা নতুন বিয়ে করে এসেছে। বৌ নিয়ে পড়ে আছে। ইত্যাদি। উনি শুনে রেগে আগুন, বললেন, যাই দু'ঘা গিয়ে দিয়ে আসি! বড়ঠাকুর ছিলেন, ভাইকে বললেন, না না, ওসব কিছু করতে হবে না, জানলা বন্ধ করে দাও। কাল আমি ব্যবস্থা করব। পরদিন সকালে ওঁর স্ত্রী এসে ক্ষমা চেয়ে গেলেন।

একদিন দুপুরে গুটকে ডিসপেনসারি থেকে এল, সঙ্গে দুটো মোটামোটা বেশ লম্বা সাদা ধবধবে হাড়। জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কী রে গুটকে? গুটকে রেগে গিয়ে বললে, ছেড়ে দিন তো। ছোটকাকার যেমন খেয়াল। একজন জঙ্গল থেকে হাতির দুটো পা এনে দিয়েছে, ছোটকাকা বললে, বাড়ি নিয়ে যা। আনতে হয়েছে বলে গুটকের ভীষণ রাগ। যাই হোক, উনি এসে জামাজুতো না খুলেই আমাকে ডেকে বললেন, শিগগির এসো। দেখ হাতির দুটো পা এনেছি। আমি এসে দেখি উনি হাড়দুটো নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। জিজ্ঞেস করলাম, হাড়দুটো দিয়ে কী হবে? বললেন, দাঁড়াও, দাদা এসে আগে দেখুন, পরে দুটো টেবিল করলে হবে।

বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু হয়েছে। এসে পড়েছে ফাগুয়ার উৎসব। দ্বিজেনবাবুর বাড়ি সুবর্ণ সংঘের অধিবেশন। গালুডি থেকে সবাই এসেছেন। বিকেলে আমি সুবর্ণ সংঘের অধিবেশনে গেছি। সেবার বাণী রায়ও এসেছিলেন। আমার স্বামী পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরে ডিসপেনসারি বেরুলেন, বললেন, আমি সুবিধামতো যাব।

কিছুক্ষণ পরে উনি সাইকেল নিয়ে এসে পিছনের দরজা দিয়ে আসছেন আর অনুদি, সুবর্ণদি, বাদলবাবুর স্ত্রী এঁরা সকলেই আগে থেকে প্রস্তুত ছিলেন ওঁর গায়ে রং দেবেন বলে। ওঁরা আমাকে বলেছিলেন, খবরদার যমুনা, নুটুবাবু এলে বলে দিবি না। আমি মাথা নেড়ে বললাম, আচ্ছা। কিন্তু মনে মনে ভাবছি আহা রে, ভালো জামা-প্যান্ট নষ্ট হয়ে যাবে, খুব চটে যাবে আজ। যাই হোক, যেই ঘরে ঢুকতে যাবেন, তখনই ওঁরা গায়ে রং দিয়ে পালিয়েছেন। আমার স্বামী তো অপ্রস্তুত। ওঁর কাছে রঙ নেই, কী করেন, তখন বনবিহারীবাবু ওঁর হাতে রং দিয়ে বললেন, যান, বৌদিদের রং দিয়ে আসুন। তখন বৌদিদের কোথায় পাবে, সবাই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। শেষে উনি আমাকে বলছেন, তুমি জানতে, তবুও আমাকে বললে না কেন? আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আমিও জানতাম না, বিশ্বাস করো। সেদিন এই নিয়ে খুব হাসাহাসি। উনি অপ্রস্তুত। দোলের অধিবেশনে এমনি মজা হত।

৬৭

মনে পড়ছে কত বর্ষার দিনে, উনি বেরুতে পারছেন না, আমরা ছোটঘরের চৌকির ওপর বসে দুজনে গল্প করেছি, কবিতা পড়েছি, কত স্বপ্নের জাল বুনেছি। এতদিন পরেও মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। বাবলুর লেখা একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল। 'কোথাও যাওনি তুমি, আমি জানি তুমি আছ বুকের ভিতর।'

একদিন টাটা যাচ্ছেন। আমি বললাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। প্রথমে বললেন, আমার কাজ আছে। আমি কোথায় কোথায় ঘুরব, তুমি সঙ্গে থাকলে অসুবিধা। বললাম, থাক তা হলে। তারপর কী ভেবে বললেন, চলো, যাবে। তাড়াতাড়ি করে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। টাটায় গিয়ে উনি আগে ওষুধপত্র আরও কী সব কিনে নিয়ে একটা মোটর ভাড়া করে বললেন, ডিমনা লেক ঘুরে আসি। আমি ভাবিনি ডিমনা লেক যাওয়া হবে। গিয়ে খুব ভালো লাগল। শহর থেকে দূরে, বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করা হয়েছে। নির্জন স্থান। এখন কেমন হয়েছে জানি না। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রের গাড়িতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

উনি চিংড়ি মাছ খেতে বড় ভালোবাসতেন। একদিন একটি লোকের হাত দিয়ে বড় বড় চিংড়ি মাছ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং তার হাতে একটি চিরকুট লিখে দিয়েছেন। লিখেছেন— আজ আমার জন্যে ভাত কোরো এবং সকাল সকাল বাড়ি যাব। উনি রুটি খেতেন, তাই ভাতের কথা লিখে পাঠিয়েছেন। এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এখন আমার কাছে এটাও একটা মধুর অনুভূতির রসে জারিত হয়ে আছে। সেই যে আপন মানুষটি যার কিছুটা আমার ওপর নির্ভর করত, আমি তার

একান্ত আপন ছিলাম ভাবতে ভালো লাগে। সব মানুষই বোধ হয় অপরের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে নিজেকে আস্বাদন করে।

সেবার আমার ছোট মামাশ্বশুর বহরমপুর থেকে খুব ভালো মটকার জামার কাপড় এনে আমার স্বামীকে দিয়েছিলেন। উনি সেই কাপড় দিয়ে নিজের জন্যে দুটো ফুলহাতা শার্ট ও দুটো পাঞ্জাবি করালেন। তার একটা পাঞ্জাবি বড়ঠাকুরকে দিলেন। বড়ঠাকুর মহাখুশি, ওই পাঞ্জাবিটা পরেই উনি বঙ্কিমবাবুর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন, এবং অসুস্থ হয়ে ফেরেন। ওই পাঞ্জাবির পকেটে বাবলুর জন্যে সন্দেশ এনেছিলেন। কে জানত সেই পাঞ্জাবি উনি আর পরবেন না। সব শেষ হয়ে যাবে। কোন দিন কল্পনাও করতে পারিনি। তখন আমার ভাশুরের বয়স ছাপ্পান্ন আর আমার স্বামীর পঁয়তাল্লিশ।

প্রথম থেকেই আমি একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভ্রম ও ভালোবাসা নিয়ে নিজেকে স্বামীর পায়ে সমর্পণ করেছিলাম। ওঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র জোনাকির মতো মনে হত। ওঁর ওপর ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা আর নির্ভরতা যা বোধ হয় ঈশ্বরের ওপরও ছিল না। ঈশ্বরকে তো দেখিনি, কথা বলিনি, ভালোবাসিনি। ক্ষুদ্র মানুষ যাকে নিজের মতো পায়, তার ওপরই আসে জোর, আসে ভালোবাসা ও নির্ভরতা।

আমার স্বামী জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। অভাব-অনটন ছিল, হারিয়েছেন অনেক। নিজেদের সাংসারিক জীবন কখনও পাননি, একমাত্র দাদার স্নেহ ওঁকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছিল, সঞ্জীবিত করেছিল। তাই যাকে কাছে পেয়েছেন তাকেই স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন। ওঁর কাছে বকুনি খেয়েছি, কিন্তু সে বকুনি আমাকে সংশোধিত করেছে। আমি রাগ করলে বলতেন, তোমার দোষ ধরে দিই, তাতেই রাগো? না, কিন্তু কেন বোঝো না তোমার কোনো ত্রুটি থাকবে না এটাই আমি চাই, আর সেটাই হবে আমার গর্ব। বকেছেন, কিন্তু তা রূঢ়ভাবে নয়। পারতপক্ষে কারো মনে ব্যথা দিয়ে কোনো কথা বলেননি। কারওর ওপর মনে বা মুখে ঈর্ষা করতে দেখিনি। লোভ, তাই বা কোথায় দেখেছি? অর্থ রূপ যৌবন কোনোটার জন্যই লালায়িত হতে দেখিনি। শুধু চেয়েছিলেন, সুরুচিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকতে। কিন্তু তা আর হল কই? গান ভালোবাসতেন, তাও হল না।

নিয়তির অমোঘ বিধানে ঘাটশিলা থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য ছটফট করেছেন, কিন্তু পারেননি। ধলভূমগড়ে যখন ছিলেন তখন একই অবস্থা। আমাকে কোথায় রাখবেন এই ছিল এক সমস্যা। একবার ভাটপাড়া পাঠাচ্ছেন আবার ঘাটশিলা নিয়ে

যাচ্ছেন। এটা ওঁকে কষ্ট দিচ্ছিল। কোনো একটা জায়গায় যে দুজনে স্থির হয়ে থাকব তা হচ্ছিল না, দুজনে দুজায়গায়। আমি বলতাম, চলো এখান থেকে কোথাও চলে যাই। বলতেন, আর একটু অপেক্ষা করো। এক জায়গায় বসেছি। পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র জীবিকার জন্য যাওয়ার অসুবিধা আছে। সংসার রয়েছে, বাড়ি জিনিস, এসব কী করি বলো তো? আমি মাঝেমাঝে যাওয়ার কথা বললে বা লিখলে বলতেন, তোমার সব কথা আমার মনে আছে। সুবিধা হলে সব ব্যবস্থা করে ফেলব। বুঝেছ, মানা?

৬৮

একবার কী হল, আমি ভাটপাড়া, উনি ধলভূমগড়। আমার ওঁকে একলা রেখে ঘাটশিলা থেকে আসবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, অথচ ওঁর অসুবিধার জন্য আসতে হল। তা ছাড়া আমার ডাক্তার দেখাবার একটা ঝামেলা ছিল। যাই হোক, আমি চিঠি দিলাম, উত্তর এল না। আমার খুব দুঃখ এবং রাগ হয়েছিল। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর চিঠিও দিচ্ছে না। সত্যি খুব অভিমান হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, এমন মান-অভিমান কতই হয়। আমি লিখেছিলাম, তুমি আমাকে কোনোদিনও ভালোবাসোনি। ইত্যাদি। কী বোকার মতো লিখেছিলাম, আজ আর আমার মনে নেই। আমার চিঠিও আমার কাছে নেই, তাই স্পষ্ট লিখতে পারলাম না। আজ দীর্ঘদিন পরে ধলভূমগড় থেকে লেখা ওঁর চিঠিখানা বারবার আমার স্মৃতির দরজায় এসে আঘাত করছে। আর অনুতাপের দহন জ্বালায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। উনি লিখেছিলেন—

ধলভূমগড়
রাত্রি ১০টা
বুধবার

প্রিয়া,

তোমার গত সোমবারের লিপি আজ ১০টায় আমার সমীপে তোমার কুশল বয়ে এনেছে। আর এনেছে তোমার হতাশাপূর্ণ শূন্য হৃদয়ের বার্তা। সত্যই আমার ভারি দুঃখ হয়। যখনই আমি ভাবি যে তোমার ওই পুষ্প কোরকের মতো নির্মলতা পবিত্রতায় উজ্জ্বল যৌবন পুষ্পটিকে আমি ম্লান করে দিয়েছি, ব্যর্থ করে দিয়েছি। নিজের অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে কেমন করে তুমি এসে গেলে, একথা যখন ভাবি কূলকিনারা পাই না। এ জীবন দিয়েও যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাতেও আমি রাজি আছি। ঠিকই লিখেছ মীন, ভাল কি কোনদিন বেসেছ যে, ওকথা উঠতে পারে। সত্যিই বলছি— আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি খুব নিভৃতে। ভালবাসতে পারিনি এই কথাই যেন উত্তর পেয়েছি। তবে একটিমাত্র উত্তর পেয়েছি মনের কাছ

থেকে যে, মীনুর মনের কষ্ট হয়তো আমি দূর করতে সক্ষম নই, ও যদি শারীরিক কষ্ট পায় সে আঘাত আমার অন্তরে সত্যই বাজে আমায়, বিশ্বাস কর।

সন্ধ্যায় ওই স্টেশনের ওপারের শালবনের পথে বেড়াতে বেড়াতে আজ এই কথাই ভেবেছি, তোমার চিঠির কথা "নদী শীর্ণ হয়ে গেছে, হয়তো শুকিয়ে যাবে।" একথা তো সত্যিই কী উপায় করি। এ যেন আমার শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি তো কেবল আকাশের দিকে চেয়ে করজোড়ে বলছি, "ওগো মেঘ, এসো, তোমার ধারা শ্রাবণের অজস্র কোটি বর্ষণ নিয়ে এসো, আমার এই শীর্ণ স্রোতস্বতীকে পূর্ণ করে তোলো। উদ্দাম গতিতে সে বয়ে চলুক। এই অভিশপ্ত পাষাণস্তূপের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে যাক। আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে সে আঘাত এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে পরিণত হবে।" তা প্রকাশ করতে পারি না।

ছোট্ট স্তব্ধ সরোবরের নির্মল আঘাতে এ পাষাণের ঘুম কি ভাঙছে। ক্ষুব্ধ তটিনীর রুদ্র আঘাতে পাষাণের যদি ঘুম ভাঙে। পাষাণই যদি হয়ে যেতে হল তবে কেন এই রক্তের ধারা বইছে, তবে কেন এই মেদমজ্জা, কেন এই হিংস্র কামনা আর অতৃপ্ত বাসনারাজি? আমি বিশ্বস্রষ্টার কাছে এই প্রার্থনা কচ্ছি, ওগো, তুমি আমায় বিশ্বাস কর। হে দেব, সম্পূর্ণ পাষাণ করে গড়ে ফেল আমায়। অধিকার নেই আমার কোন জীবনকে ব্যর্থ করার, তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। তাতে আর কী হবে। আমার সুনন্দা হয়তো ব্যর্থ প্রাণ নিয়ে ঐ নীল নিঃসীম আকাশের দিকে চেয়ে ভাববে, সে কোথায়?

কেন এই মেলামেশা যা কোন দাগ রেখে গেল না মনের কষ্টিপাথরে। যে হৃদয় জ্বালাময় তাকে নিয়ে চলা যায়। এঁকেবেঁকে সে চলা, সে চলার আনন্দ আছে। তার অনুভূতির অপূর্ব্বতা আছে, তাই তুমি হয়তো ব্যর্থ পথযাত্রিণী। কিন্তু মনের কিছু কাজ আছে। আমার যেন সব স্থানুর মত অচল হয়ে এসেছে। কে আমায় আঘাত দিয়ে জাগাবে? আমার ঘুম ভাঙাতে হলে ক্ষুদ্র সরোবরের ন্যায় শান্ত হলে চলে কি? আরও চঞ্চল উদ্দাম হতে কি কেউ পারবে? সর্ব্বদা আঘাত করবে, শাসন করবে। একটু আঘাতে অনেক কিছু বেরিয়ে পড়ল, তাই শুনে নুয়ে পড়লে চলবে না। আঘাতের পর আঘাত চাই। সেই হবে আমার সোনার কাঠির স্পর্শ।

মধ্যে কতকগুলো লোক এলো। খানিকটা সময় গেল। কী যেন বলতে চেয়েছিলাম, একটু ভুলে গেলাম। খেয়ে নিলাম। ঋষি খেতে দিলে। নগেনের জ্বর-মতো হয়েছে। ওকে ইনজেকশান দিয়েছি কাল।

এর পূর্ব্বে তো তোমাকে একটা পত্র দিয়েছি। হয়তো পাওনি। কিন্তু ওবাড়ির ঠিকানায় বোধ হয় লিখেছি। ঠিক মনে পড়ছে না। গতকাল (মঙ্গলবার) দাদা এখান থেকে কলকাতা হয়ে বাড়ি গেলেন। এসেছিলেন তার আগের মঙ্গলবার। সঙ্গে

গুটকের বাবা পচাদা এসেছিলেন। ওঁরা আবার চাইবাসা গিয়েছিলেন। সেখানে সুবোধদার বাড়ি ছিলেন এবং ওঁর গাড়িতে বহু দূরের সব ঝর্ণা পাহাড় ইত্যাদি দেখেছেন। মায়াদি M.A. পরীক্ষা শেষ করে চাইবাসা এসেছিলেন, সেখানে থেকে সিংহসাহেবের স্ত্রীপুত্র ইত্যাদির সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মাটাবুরু পুরুলিয়া ইত্যাদি ঘুরে গত সোমবার ঘাটশিলার ডাকবাংলোয় এসেছিলেন। এবং সিংহসাহেব আমাদের সংবাদ পাঠান। আমি, দাদা ও ইন্দুদা গিয়ে বহু গল্প ইত্যাদি হল। এবং রাত্রের গাড়িতে আমরা এখানে এলাম এবং ইন্দুদা সোজা বাড়ি গেলেন। দাদা পরদিন সকালের ট্রেনে গেলেন। আমি যেদিন ব্যারাকপুর থেকে আসি, পরের দিনই বৌদিরা ওখানে এসেছেন। এসে দাদা বেরিয়েছেন। অনেক গল্প বললেন।

'দেবযান' বইটার খুব প্রশংসা হয়েছে। 'ইছামতী' সম্বন্ধে আর একটি নূতন নভেল লিখবেন খুবই শীঘ্র। এই গেল ওদিককার সংবাদ। লাইব্রেরীতে 'দেবযান' পেলে পড়বে, খুব আনন্দ পাবে। প্রাণে যাতে আনন্দ পাও তাই করবে। সিনেমা দেখো। তোমার ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার কথা তো কিছুই লেখোনি। আচ্ছা, পরে লিখবে। ঘাটশিলাতে সেদিন মোংলা আর আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। শোভা তোমার কথা বৌদির কথা জিজ্ঞাসা করল। কাল সন্ধ্যায় মোটর সাইকেলে গিয়েছিলাম পেট্রোল আনতে। মোংলাকে ফুলমণি বলেছে... পুলিশের নাম করে থামিয়ে দিয়ে এলাম। এ পাষাণভার নিয়ে আর চলতে পাচ্ছি না। আবার সেই এক কথা। একটা কিছু পরিবর্তন শীঘ্রই আনতে চাই। যোগাযোগের অপেক্ষায় আছি মাত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তো মানতেই হবে। ঘুম আসছে। শেষটুকু কাল।

সকাল হয়েছে, একটু তানপুরা নিয়ে বসলাম। বহু বাধা, ঠিক হল না। সাধনার স্থান এ নয়। হয়তো ভগবানের ইচ্ছা নেই। কী জানি এখন তুমি কী করছ। এখানে বেশ শীত পড়েছে। ওদিকে কেমন? আবার পরে, আমার প্রীতি গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার

পুঃ- তোমার ডাক্তার দেখাবার কী কতদূর হল। সময় হলেই মামীমাকে বলে ওবাড়ি যাবে। ওখান থেকে সত্বরই কলিকাতায় যাবার ব্যবস্থা করবে। বিশেষ চিন্তায় আছি।

এই চিঠিখানা ওঁর অশান্ত মনের প্রতিচ্ছবি। তখন চিঠিখানা পড়তে পড়তে চোখে জল এসেছিল। মনে হয়েছিল কেন আঘাত দিলাম। ওঁর মনের অবস্থা তো জানি। এই চিঠির কথা আমরা দুজনে কবেই একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ কত কত বছর কেটে গেল, হঠাৎ চিঠিখানা পড়ে মনে হল, আমাদের ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে হেসে এইসব ওঁর হাত দিয়ে লিখিয়েছিলেন। কেন ওঁর মনে হয়েছিল 'মেঘমল্লারে'র

সুনন্দা-প্রদ্যুম্নের কথা। ওঁর অজানিতে অন্তরাত্মা বুঝতে পেরেছিল ওঁকে চলে যেতে হবে। তাই নিজেকে পাষাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তখন ভেবেছিলাম, ইতস্তত ছড়ানো প্রস্তরবহুল প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে ওঁর মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছে। এখন মনে হয় সত্যিই তো প্রদ্যুম্নের জড়ত্বপ্রাপ্তি আর ওঁর মৃত্যু দুই-ই তো ইচ্ছাকৃত। সুনন্দা জানত না তার দয়িত বেতবনের ছায়াঘেরা পার্বত্য উপত্যকার কোলে প্রাণহীন জড়মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। সুনন্দা শুধু স্বপ্ন দেখত কোথায় বেত ও বেণুবনের শাখাপ্রশাখার অন্তরালে এক অর্ধভগ্ন প্রস্তরমূর্তি। সেখানে বাতাসে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে 'মেঘমল্লারে'র করুণ মূর্ছনা।

ওঁর শেষশয্যাও তো রচিত হয়েছিল প্রস্তরাকীর্ণ পার্বত্য প্রকৃতির বুকে, শাল-পিয়ালের ছায়াশীতল ঘন অরণ্যে। অনন্ত দূরে বয়ে চলেছে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা, দূরে বহু দূরে নীল শৈলশ্রেণি, বুকের উপর উন্মুক্ত রৌদ্রদীপ্ত আকাশ, বাতাসে কুরচি ফুলের সুবাস।

প্রদ্যুম্ন যাওযার সময় সুনন্দাকে বলে গিয়েছিল, কাজ সেরে সে ফিরে আসবে, তাই সুনন্দার অন্তহীন প্রতীক্ষা। কিন্তু উনি তো আমাকে কিছু বলে গেলেন না। উনি লিখেছেন, আমার সুনন্দা ভাববে, কই সে? কোথায় সে? আমি যে কত বিনিদ্র রাত্রির শেষ প্রহরে আকাশ-ভরা জ্বলজ্বলে তারকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছি, কোথায় সে? কেন সে চলে গেল, একটিবারও বলে গেল না। বুকের মধ্যে কান্না আমার গুমরে গুমরে উঠেছে। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যও কি আমার অশ্রুসজল মুখ ওঁর মনে দোলা দেয়নি? আমার ওঁকে হারানোর বেদনাঘন আকুলতা চির অন্ধকারময় মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করে ওঁকে যে ব্যথিত করে তুলবে, সজল করে তুলবে ওঁর দুটি চোখ।

লিখেছিলেন. শীঘ্রই একটা পরিবর্তন আনব। শুধু যোগাযোগের অপেক্ষায় আছি। যোগাযোগ কি এইভাবেই এল? এ পরিবর্তন তো আমরা দুজন কেউই চাইনি। লিখেছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা মানতে হবে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা ছিল? তাঁর কাছে তো সব খেলা, অর্থাৎ আমাদের নিয়ে পুতুল খেলা। কিন্তু আমরা তো প্রাণহীন পুতুল নই, আমরা প্রাণবান অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

বড়ঠাকুরের 'দেবযান' প্রকাশিত হয়েছে। আমি ভাটপাড়ায়, আমাকে লিখলেন, 'দেবযান'টা পড়বে, আনন্দ পাবে। 'দেবযান' পড়ে আমাদের বাড়ির সকলের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল পরলোক আছে এবং সেখানে গিয়ে আমাদের দেখা হবে। তখন এই নিয়ে আমরা কত কল্পনার জাল বুনেছি। এখনও ভাবি যদি সত্যিই তাই হয়, তা হলে কী হবে? বড়ঠাকুর চলে গেছেন, উনি আমাকে ফেলে পালালেন দাদার

কাছে। দিদিও চলে গেল। আচ্ছা, আমার কথা কি ওঁদের একবারও মনে পড়ছে না? আমি যখন যাব ওঁরা সামনে এসে দাঁড়ালেও ফিরে তাকাব না। ওঁদের ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে যাব, বলব, আমি তোমাদের কেউ নই। আমার কথা তোমরা কেউ ভাবনি, আমার কান্না তোমাদের স্বর্গবাসের শান্তি কিছুমাত্র বিঘ্নিত করেনি, আমি তোমাদের জীবনকাব্যে উপেক্ষিতা।

রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, তাই তাঁর গুণগানে জগৎ মুখরিত। মা জানকী রাজনন্দিনী হয়েও রাজ্যসুখ ত্যাগ করে স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসী হলেন। তাঁর নীরব ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্টসহিষ্ণুতায় জগত মোহিত। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ভাই হলেন তাঁদের সঙ্গী। এঁদের নিয়ে রচিত হল জাতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ'। কিন্তু কেউ ভাবলেন না, জানলেন না, 'বললেন না লক্ষ্মণপত্নী উর্মিলার কথা। সে রাজঅন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে বসে লক্ষ্মণের ফিরে আসার পথ চেয়ে দিনের পর দিন প্রহর গণনা করতে লাগল। তার বিরহকাতর হৃদয়ের যন্ত্রণা, তার নীরব ক্রন্দন, তার ত্যাগ প্রতীক্ষা অন্তঃপুরের অন্তরালেই রয়ে গেল। সবাই জয়গান করল, রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ক্ষণিকের জন্যও উর্মিলার কথা চিন্তা করলেন না। মহাকবিও তাঁকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। আমিও এবাড়ির উপেক্ষিতা। আমার ক্রন্দনকাহিনি কোথাও লেখা থাকবে না, কোথাও লেখা থাকবে না আমার একাকিত্বের যন্ত্রণা। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আমি, অনাদরে অবহেলায় উপেক্ষায় অপমানে, মৃত্যুর পদধ্বনি শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। কিন্তু কোথায়, কতদূর আমার সেই মৃত্যুর শান্ত শীতল কোল?

৬৯

সেবার পুজো এসে যাচ্ছে, কিন্তু বড়ঠাকুর কবে ঘাটশিলায় আসবেন, কিছুই লিখছেন না। বড়ঠাকুরের জন্মদিন এসে গেল। আমার স্বামী ভাবছেন। আমাকে বললেন, কী ব্যাপার বলো তো? দাদা কবে আসবেন কিছুই লিখছেন না। দাদার মতলব বোঝা যাচ্ছে না। এবার পুজোয় কোথাও যাবেন নাকি? তাই কিছু লিখছেন না। আমরা দুজন এইসব আলোচনা করছি। অবশেষে চিঠি এল— পুজোয় পুরী যাচ্ছি। উনি নিশ্চিন্ত এবং খুশি হলেন। আমিও কম খুশি হইনি। ওইবার সুইনহো স্ট্রিটে কানুমামার বাড়িতে বড়ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয়েছিল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ওখানকার জন্মদিন সেরে বড়ঠাকুর, দিদি ও বাবলু ঘাটশিলায় এলেন।

আমাদের ছোট্ট খোলার বাড়ি আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। বড়ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে কত লোক আসছেন। ওই সময় কয়েকজন সাহিত্যিক ওখানে গিয়েছিলেন।

প্রমথদা অর্থাৎ প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তখন বাড়ি ভাড়া করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ওখানে ছিলেন। গজেনবাবুরা যাওয়া আসা করতেন। প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় একবার গিয়েছিলেন। যাই হোক, আমি, দিদি, দিদির ঠাকুরপো ঠিক করলাম এবার বাড়িতে বড়ঠাকুরের জন্মদিন করা হবে। বড়ঠাকুর শুনে প্রথমে চটে উঠলেন, বললেন, ওসব ঝামেলা করার কোনো আবশ্যক নেই। রাজি হচ্ছেন না, অথচ উনি রাজি না হলে কোনো ব্যবস্থাই করা যাবে না। উনি বারেবারেই বলছিলেন, আমাদের বংশে জন্মদিন করা নেই, বাইরে বাইরে যা হচ্ছে হোক। আর দিদির ঠাকুরপো বললেন, আমরা তো বিশেষ কিছু করব না, বিকেলে শুধু একটু কবিতাপাঠ হবে ঘরোয়াভাবে। বড়ঠাকুর আর বাধা দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

সেদিন সত্যিই আমার স্বামী বিকেলে ডিসপেনসারি গেলেন না। আমরা সবাই বারান্দায় বসলাম, কবিতাপাঠ হল। বড়ঠাকুর 'দুঃসময়', আমার স্বামী 'শাজাহান' আবৃত্তি করলেন। আজও ওঁদের সেদিনের সেই আবৃত্তি ভালো করে কান পাতলে যেন শুনতে পাই। আমি 'জীবনদেবতা' পড়েছিলাম আর দিদি 'স্বপ্ন' পড়েছিল। বাবলু একবার এর কাছে একবার ওর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে দিদি বললে, ঠাকুরপো, এবার তোমার একটা গান হোক। উনি বললেন, না বৌদি। এখন বাবলুকে নিয়ে খেলা।

বাবলু কাকুর কাছে রইল। বড়ঠাকুর বেরিয়ে গেলেন দ্বিজেনদার বাড়ি। আমরা সেদিন আগেই রান্না সেরে নিয়েছিলাম। আমাদের একটু সবাইকে বলে বড় করে অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হল না। এখন মনে হয়, জন্মদিন না করলেই ভালো হত। বড়ঠাকুর বারবার আপত্তি করেছিলেন। সেই তো সইল না। সেই জন্মদিনই তো শেষ জন্মদিন হল।

দেখতে দেখতে এসে গেল পুজো। সপ্তমীর দিন। আমার স্বামী রিকশা ঠিক করে এসে দিদিকে বললেন, বৌদি, বাবলুকে নিয়ে তোমরা ঠাকুর দেখে এসো। রিকশা কখন আসতে বলব? দিদি বললে, সন্ধ্যার একটু আগে আসতে বোলো। ঘুরে এসে বাবলুকে খাওয়াব। সেদিন বাবলুকে নতুন জামা পরিয়ে নিজেরা নতুন কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে বেরুলাম। বাবলু তো মহাখুশি রিকশা চেপে। প্রথমে গিয়েছিলাম মৌভাণ্ডারে গুরুদ্বুয়ারে। ওখানে খুব ধূমধামের পুজো। ওখান থেকে সোজা ধলভূমগড় রাজস্টেটে। ওখানকার ঠাকুর দেখে, এলাম ঘাটশিলার স্কুলে। ওখানেও পুজো হয়। তারপর আমাদের বাড়ি ডাহিগোড়ার পুজোমণ্ডপে। তখন আরতি শুরু হয়ে গেছে। রিকশা ছেড়ে দিয়ে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আরতি দেখলাম, তারপর এলাম বাড়ি।

বড়ঠাকুর বারান্দায় বসে কার সঙ্গে কথা কইছেন। আমরা আসতেই বড়ঠাকুর বললেন, 'ক'খানা ঠাকুর দেখলে?' বাবলুকে বললেন, 'বাবলু, কেমন ঠাকুর দেখলে?' বাবলু কোল থেকে নেমেই বড়ঠাকুরের কাছে ছুট। তখন বাবলুর খাওয়ার সময়, ঘুমও এসে গেছে, দিদি তাড়াতাড়ি বাবলুকে খাওয়াতে বসল। সেই সময় ওর কাকা এসে গেছে। যেই ডেকেছেন, 'বাবলু' অমনি খাওয়া ফেলে কাকার কোলে।

সেদিন রাত্রে আরও কয়েকজন এসেছিলেন। আমাদের খাওয়া সারতে রাত হল। বাবলু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, দিদি বড়ঠাকুর বড়ঘরে শুয়ে পড়লেন। আমি আর আমার স্বামী বারান্দার সিঁড়িতে এসে বসলাম। উনি সিগারেট ধরালেন। দাদা এতক্ষণ ছিলেন বলে খেতে পারেননি। চারিদিকে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে, বাতাসে স্নিগ্ধ শীতলতার পরশ, আমি ওঁর পাশে বসে সেদিনের ঠাকুর-দেখার কথা বলছি, উনি বললেন, কালকে যাবে নাকি? আমি বললাম, দিদিকে জিজ্ঞেস করে, তোমাকে বলব। বললেন, কাল আমারও যাওয়ার ইচ্ছা আছে, দেখি, রুগি থাকলে যাওয়া যাবে না। আমি বললাম, তুমি গেলে বেশ আনন্দ হবে। উনি হেসে বললেন, সবসময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই ভালো হয়, কী বলো?

সেদিন প্রফুল্ল হৃদয় ও মন নিয়ে ওঁর পাশে এসে শুয়েছিলাম। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের বিছানায়। কোনো দুঃস্বপ্ন আমার সুখনিদ্রাকে বিঘ্নিত করেনি। পরদিন আমরা মৌভাণ্ডারে ঠাকুর দেখতে গেলাম। উনি আমাদের সঙ্গে মোটর সাইকেলে গেলেন। গুরুদ্বুয়ারে ওখানকার পাঞ্জাবিরা ওঁকে খুবই খাতির করলেন। বাবলুকে আদর করলেন। সেদিন ফেরার সময় আমরা পাড়ার ঠাকুর দেখে বাড়ি এসেছিলাম।

বিজয়ার দিন দিদি ও আমি প্রতিমা বরণ করতে গেলাম। পাড়ার সব বাড়ি থেকেই মেয়েরা এসেছেন। পরস্পর পরস্পরকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছেন। এই দিনটিতে মেয়েদের ভারী আনন্দ হয়। আমাদের বাংলাদেশের মতো এখানে বিজয়ার তেমন সমারোহ নেই, তবুও পাড়ার কয়েকজন বাড়িতে এলেন। বড়ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। আমি দিদিও বড়ঠাকুরকে প্রণাম করলাম। ওঁকে সবার সামনে প্রণাম করতাম না। তাই একটু নিভৃত স্থানের প্রয়োজন। রাত্রে ওঁকে প্রণাম করলাম। সেই প্রণামই আমার ওঁকে শেষ প্রণাম। আগে যদি কোনোভাবে জানতাম, কোনো একটু আভাস পেতাম, ওঁর মৃত্যু আসন্ন, কয়েকটা দিন পরেই চিরদিনের মতো, চলে যাবেন, তা হলে ওঁর পাদুটি ছাড়তাম না, অজস্র প্রণামে ভরিয়ে দিতাম, চোখের জলে ধুয়ে দিতাম ওঁর চরণযুগল। কেন আমাকে কিছু না বলে চলে গেলেন।

তখন উনি নিজেও বুঝতে পারেননি, অমোঘ মৃত্যু নিঃশব্দ চরণে ওঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এত প্রাণভরা ভালোবাসা যাঁর অন্তরে, তাঁর ছেড়ে যাওয়ার বেদনাও যে কত তীব্রভাবে প্রাণে বেজেছিল, ভাবতে গেলে যন্ত্রণায় বুক টনটন করে ওঠে। যাওয়ার সময় না জানি ওঁর কত কষ্ট হয়েছে। মানুষের সবচেয়ে প্রিয় নিজের প্রাণ, সেই প্রাণ, নিজহাতে নষ্ট করা কি সহজ? কী নিদারুণ বিতৃষ্ণা, কী অপরিসীম হতাশা এলে মানুষ এত বড় কাজ করতে পারে।

লিখতে লিখতে একদিনের একটি স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। তখন স্বপ্ন অলীক মনে হয়েছিল।

স্বপ্নে দেখলাম কোথায় যেন ভাঙা মন্দির, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। চারিদিক চেয়ে দেখলাম। দেখি মন্দিরের চূড়া নেই, মাথার ওপরটা খোলা। তার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুনীল আকাশ। দেবতা নেই, শূন্য বেদি। তারপর দেখি ঘাটশিলার নুড়ি-পাথরসংকুল পথের ওপর দিয়ে আধো আলো আধো অন্ধকারে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ মনে হল আমার শাঁখাদুটো নেই। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে হ্যারিকেনের আলোয় হাতদুটো তুলে দেখলাম, এই তো আমার শাঁখা। শাঁখাসুদ্ধু হাতদুটো তুলে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে জোড়হস্তে প্রণাম জানালাম। ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলাম। দেখলাম উনি নিশ্চিন্তে বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। ওই স্বপ্নের কথা ভয়ে কাউকে বলতে পারিনি। এটা কি ওঁর আসন্ন মৃত্যুর সংকেত?

৭০

দিন কেটে যাচ্ছে। এল কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। ডা. বোসের বাড়িতে সেদিন ঘাটশিলাবাসীর পক্ষ থেকে বড়ঠাকুরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সভা শেষ হলে ওখান থেকে বাবলুকে নিয়ে আমি আর দিদি ছেলেদের স্কুলে গিয়েছিলাম। ওখানে ছেলেরা যেন কী একটা অনুষ্ঠান করেছিল। ওইসব দেখেশুনে যখন বাড়ি ফিরি বেশ রাত হয়ে গেছে, বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছে, আমরা একটা রিকশা করে বাড়ি এলাম। সেদিন আমি বাড়িতে সুন্দর করে আলপনা দিয়েছিলাম। ছবির লক্ষ্মীতে পুজো হয়েছিল। উনি দেখে বলেছিলেন, বাঃ, ভারী সুন্দর হয়েছে। ওঁর কাছে প্রশংসা পাওয়া কঠিন, কিন্তু সেদিন খুশি হয়েই বলেছিলেন ভালো হয়েছে। বড়ঠাকুর তো ভালো বলবেনই। সেদিন চারদিক জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। ছোট পরিবার, আমরা সবাই আনন্দ ও তৃপ্তিতে পূর্ণ। কোনোখানে মালিন্যের স্পর্শ নেই।

সেদিনও আমরা দুজনে বারান্দার সিঁড়িতে এসে বসেছিলাম। এ জায়গাটি আমাদের খুব প্রিয় ছিল। বেশ রাত হয়েছে। উনি সিগারেট ধরালেন, ওঁর ডানহাতটা আমার দু'হাতে ধরা। বাঁহাতে সিগারেট ধরে খেতে খেতে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। সারাদিনের টুকিটাকি কথা, বড়ঠাকুরের সম্বর্ধনা, ছেলেদের অনুষ্ঠান এইসব। যত রাত্রি বাড়ছে ততই জ্যোৎস্নার রূপ আর রং বেশ আরও উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হচ্ছে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার যেন একটা আলাদা রূপ ও মাদকতা আছে। আমরা সেই আলোয় দুজনে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, যেন অবগাহন করলাম আলোর পাথারে। মনে একটা অপার্থিব লোকের পবিত্রতা অনুভব করছিলাম। ভালো লাগছিল, খুব ভালো লাগছিল। একসময় উনি বললেন, খুব ভালো লাগছে। কিন্তু চলো, উঠি। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।

দুজনে ছোটঘরে এলাম। পাশের ঘরে দিদি-বড়ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েছেন। সামনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে 'মাতৃধামের' ফুলে-ভরা বাগান। ফুলগুলোর ওপর জ্যোৎস্না পড়ে কেমন যেন স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। উনি বললেন, এই চাঁদের আলোয় গান গাইতে ইচ্ছা করছে। আমি বললাম, করো না, এখনও ঘুম পাইনি। উনি রাত্রে শোয়ার আগে আপনমনে কিছুক্ষণ গান করতেন। বড়ঠাকুর থাকলে করা হত না দাদার ঘুম ভেঙে যাবে বলে। সেদিনও বললেন, নাগো, দাদা ওঘরে ঘুমোচ্ছেন।

জানলা দিয়ে আসা জ্যোৎস্না-ঢালা বিছানায় শুলাম।

এমনি করে দিন এগিয়ে চলেছে। বড়ঠাকুর ভোরে উঠে বেরিয়ে যান, সেদিনও চলে গেছেন। আমার স্বামী আগে উঠেছেন, আমাকে ডেকে বললেন, ওঠো, দাদা এসে পড়বেন। উঠলাম। যথারীতি কপালে হাত ঠেকালাম দেবতার উদ্দেশে। উনি বাবলুকে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। আমি আর দিদি রান্নাঘরে। ওঁকে চা ও টোস্ট করে দিলাম, খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর হাতে জামাজুতো ইত্যাদি এগিয়ে দিচ্ছি। ফুলপ্যান্টের পায়ে ক্লিপ লাগাতে লাগাতে বললেন, 'আজ আমার ফিরতে একটু দেরি হবে।' উনি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম যেমন রোজ থাকি। ওঁর প্রতিটি পদক্ষেপের ওঠা-পড়া আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি। জিম থাকলে খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে যেত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরদিন থেকে জিমকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। জিম আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে কখনও কোথাও যায়নি। যদি বা গেছে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছে। কিন্তু সেবার জিম যে কোথায় গেল

আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। খারাপ লাগছে, সবসময় জিম কাছে কাছে থাকত। উনি বাড়ি এলে আগে জিম সামনের পাদুটো ওঁর বুকের উপর তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত আর উনি জিমের মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতেন। তারপর ঘরে ঢুকতেন।

এখন বাইরে থেকে বাড়ি এসেই উনি জিমের অভাব অনুভব করেন,. বলেন, জিম যে কোথায় গেল। সেদিন জিম নেই, উনি একা একা সাইকেল কিছুটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর উঠলেন। ওঠার আগে আর একবার পিছন ফিরে রোজকার মতো পিছন ফিরে দেখলেন। সেদিনও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি তেমনি করে চলে গেলেন।

আমরা দুই জা সংসার ও বাবলুকে নিয়ে ব্যস্ত। সেদিন একটু বেলায় বড়ঠাকুর বেড়িয়ে বাড়ি এলেন। চা এবং খাবার দেওয়া হল। খেলেন। দিদি বড়ঠাকুরের কাছে বসে আছে। বড়ঠাকুর দিদিকে বললেন, 'কল্যাণী, খিদেটা ঠিক গেল না। আর একটু কিছু থাকলে দাও।' বড়ঠাকুর ভালোবাসেন বলে দিদি চিঁড়ে আর নারকোল দিয়েছে। বড়ঠাকুর একটু খেয়ে বললেন, 'বুকটা কেমন ব্যথা করছে। বোধ হয় চিঁড়েটা আটকে গেছে। একটু জল দাও তো?'

জল খেয়েও কমল না। তখন দিদি বললে, 'যমুনা, তোর বড়ঠাকুরকে একটু কোরামিন দে তো।' কোরামিন দিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠিক হয়ে গেল। একটু বিশ্রাম করে বড়ঠাকুর একটু বেলায় বাঁধে স্নান করে এসে বারান্দায় ভাত খেতে বসেছেন। আমাদের সবকিছুই বারান্দায় হত। উঠোন বা দালান বলতে ওটাই সব। শীতকাল। রোদ্দুর আর। তা ছাড়া এঁরা বড় খোলামেলা পছন্দ করতেন। জানলায় পরদা লাগালে বলতেন, অন্ধকার হয়ে গেছে। আমরা জানলায় কোনোদিন পরদা লাগাইনি। সেই সময় বঙ্কিমবাবুর নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। বড়ঠাকুর খেতে খেতেই তাঁকে বললেন, আমি ঠিক সময় যাব, বঙ্কিমবাবুকে বলবেন।

ওঁর ভাই বাড়ি এসে সব শুনে বললেন, দাদা, আপনার শরীরটা আজ ভালো নেই, নাই বা গেলেন। আমি ওঁদের খবর পাঠিয়ে দেব।

বড়ঠাকুর বললেন, না না, আমার তেমন কিছু হয়নি। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

কারও কথা তো শুনবেন না। দিদি বারণ করল। বিকেলে দিদি আর দিদির ঠাকুরপো দুজনে দাঁড়িয়ে বড়ঠাকুরকে সাজিয়ে দিলেন। ওঁর দেওয়া মটকার পাঞ্জাবিটা পরেছিলেন। গাড়ি এল। বড়ঠাকুর চলে গেলেন। আমার স্বামীও চা খেয়ে যথারীতি বেরুলেন। আমরা দুই জা বাড়িতে বাবলুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে আছি।

রাত্রি প্রায় সাতটা সাড়ে-সাতটা নাগাদ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমরা ঘরে ছিলাম। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি,দেখি সুমথবাবু গাড়ি থেকে নেমে বড়ঠাকুরকে ধরে নামিয়ে আস্তে আস্তে আসছেন, দিদিকে বললেন, বৌদি, বড়দার শরীর খারাপ। ওখানে দু'বার বমি করেছেন।

তাড়াতাড়ি করে বাইরে খাটিয়ার ওপর বড়ঠাকুরকে শুইয়ে দেওয়া হল। দেখি হাত-পা ঠাণ্ডা। দিদি কাছে বসে রইল, আমি জল গরম করে বোতলে ভরে পায়ে সেঁক দিতে লাগলাম। আবার কোরামিন দেওয়া হল। বাড়িতে কেউ নেই। উনি ডাক্তারখানায়। কে ডাকবে। মনে পড়ছে ক'ফোঁটা ব্রান্ডিও আমরা খাইয়ে দিয়েছিলাম। একটু সামলালেন। পরে ওঁর ভাই এসে দেখেন এই অবস্থা। এখনও চোখের সামনে ভাসছে। উনি জুতো খুলতে খুলতে বলছেন, দাদাকে বারণ করলাম, যাবেন না, কথা শুনলেন না। তারপর ওষুধপত্র দিলেন। একটু ভালো লাগল। বড়ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটল।

সকালে সুমথবাবু, প্রমথ বিশী, কানুমামা আরও কে কে যেন এলেন। ভালো আছেন। তারপর হঠাৎ আবার বড়ঠাকুরের শরীর খারাপ হল। ডাক্তার বোস আর উনি দুজনে পরামর্শ করেই বড়ঠাকুরকে দেখছিলেন। প্রথম থেকে ওঁরা ঠিক করলেন টাটানগর থেকে ব্রহ্মাপদ ডাক্তারকে আনা হবে। তাঁকে কল দেওয়া হল। এদিকে বড়ঠাকুরের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমার স্বামী একলা। কাছে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। কাউকে খবর দিতে পারছেন না। দাদার কাছ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না। বহুলোক দেখতে আসছেন। দুই ডাক্তার বসে রয়েছেন। বঙ্কিমবাবু এলেন। তাঁকে বললেন, 'নুটু রইল, দেখবেন।' ওভারসিয়ারবাবুকে ডেকে বললেন, 'নুটু রইল, দেখবেন।' আশ্রমের মহারাজ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এসে নাম শোনাচ্ছেন। আমার স্বামী গীতা শোনালেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে বহুজনের নিঃশব্দ সমাবেশ। আমার স্বামী কাঁদছেন, দিদি কাঁদছে, বাবলু কখন পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিদি বড়ঠাকুরের পাশেই ছিল, হঠাৎ বাবলু কেঁদে উঠল। দিদি বাবলুকে নিয়ে বড়ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। বড়ঠাকুর ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। সেই হাসিই অম্লান হয়ে রইল। ১৯৫০ সন ১লা নভেম্বর বুধবার রাত্রি ৮টা ৩০ মি.। বড়ঠাকুর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কোনো সাধকের মৃত্যু আমি দেখিনি। শুধু শুনেছি, বইয়ে পড়েছি। এখন দেখলাম একজন গৃহী সাধকের মহাপ্রয়াণ। ঈশ্বর-চিন্তা করতে করতে মুক্ত আত্মার দেবযান-পথে আনন্দলোক যাত্রা।

শূন্যঘরে আমরা পড়ে রইলাম। বড়ঠাকুরকে দিদি সাজিয়ে দিলে। ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল গলায়। ফটো তুললেন। ঘাটশিলার সকল মানুষ চোখের জলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেলেন। সারা ঘাটশিলা প্রদক্ষিণ করে সুবর্ণরেখার কোলে পঞ্চপাণ্ডবের কাছে বড়ঠাকুরের শেষকাজ সমাপ্ত হল।

শান্ত চরণে ক্লান্ত দেহে শোকাকুল হৃদয়ে আমার স্বামী বাড়ি ফিরলেন। দিদি শোকাতুর ছিন্নমূল লতার মতো। দিদি কেমন যেন হয়ে গেছে, আমার স্বামীর ওই স্তব্ধ বেদনার্ত মূর্তি। বাবলু সবার কাছে যাচ্ছে, গিয়ে গিয়ে ফিরে আসছে। ওর সাথি চিরশিশু বাবা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। এরা কোথায় তাঁকে রেখে এল। তিন বছরেব শিশু বুঝছে না কী চলছে বাড়িতে, কী হল তার জীবনের। আমি চোখের জলে ওকে আগলাচ্ছি, সামলাবার চেষ্টা করছি।

খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতে একটিমাত্র পুরুষমানুষ, তিনি শোকে ভেঙে পড়েছেম। চারদিকে খবরাখবর করার লোক কোথায়? সবাই আসছেন। সুধাদি. রমণীবাবুর স্ত্রী দিদির কাছে বসছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমার স্বামী অশৌচ দেহে একলা একলা ম্লানমুখে ঘুরছেন। তাঁর সঙ্গে থাকার কেউ নেই। আমি যে থাকব সে সময় ও সুযোগ কোথায়?

ক'দিন পরে কানুমামা ও খোকার সঙ্গে আমার স্বামী কলকাতায় গেলেন নিমন্ত্রণ করতে। প্রথমে ভাটপাড়ায় গিয়ে মামার বাড়িতে ছোটমামাকে পুরোহিতের ব্যবস্থা করতে বলে এবং পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে কলকাতায় সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় আমার জা রমা দেবী সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী প্রতিমা দেবী যা লিখেছেন এখানে সেটুকু তুলে দিলাম—

"বড়দা চলে যাওয়ার দিন তিনেক পরে নুটুদা এলেন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে। আমার কাছে দাঁড়িয়ে 'বৌদি' বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কীই বা বলবেন। কিন্তু কলকাতায় আসাই কাল হল নুটুদার। কলকাতার কোনো সাহিত্যিক বন্ধু, বড়দাকে তো সবাই ভালোবাসতেন, খুব কটাক্ষ করে থাকবেন দাদার চিকিৎসা বিষয়ে, দাদার চিকিৎসা কেন নিজের হাতে রেখেছিলেন। এই আঘাত নুটুদা সইতে পারেননি, ফিরে গিয়ে আত্মহত্যা করলেন, বড়দার শ্রাদ্ধের আগেই। ওই হাসিখুশি পরিবারটি অনাথ হয়ে গেল কদিনে।"

ভগ্ন মন নিয়ে একা আমার স্বামী কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। এসে আমাকে বলেছিলেন, কলকাতায় সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন কেমন যেন একটা ইঙ্গিত করলেন আমি দাদার চিকিৎসা করেছি বলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি বলেছিলাম, তুমি তো একলা চিকিৎসা করোনি, ডা. বোসও তো ছিলেন। দুজনেই তো পরামর্শ করে দেখেছ।

উনি চুপ করে রইলেন।

বললাম, তা ছাড়া লোকে কত কিছু বলে।

উনি কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে বোধ হয় সর্বক্ষণ একাকী ওই চিন্তাই করেছেন।

বড়ঠাকুরের মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলেন, এসে জোরে জোরে কড়া নাড়লেন। খুলে দিলাম। দেখি চশমা চোখে নেই। বললাম, তোমার চশমা কোথায়? বললেন, এই তো চশমাটা হাতে ছিল। বললেন, দাদাকে দেখলাম। তারপর দিদিকে বললেন, বৌদি, দাদার চিকিৎসা সম্বন্ধে তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই তো?

দিদি বললে, না ঠাকুরপো, আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই।

উনি দিদিকে বললেন, বৌদি, আমি দাদার কাজ করতে পারব না। তুমি কোরো।

সেদিন রাত্রে উনি চুপ করে শুয়ে রইলেন। একই ঘরে দিদি, আমি, বাবলু এবং উনি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি উনি উঠে গেছেন। ছোটঘরে বসে রামকৃষ্ণদেবের একটা বই নাড়াচাড়া করছেন। আমি দু-চারবার ওঁর কাছে গিয়ে ঘুরে আসছি। কথা বলছেন না। একবার দুধ দিতে গেলাম, বললাম, খেয়ে নাও।

বললেন, এখন না, ১২টায় খাব। বললেন, তোমার চাবিটা দেবে?

দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, চাবি নিয়ে কী করবে? উত্তর দিলেন না। তখন আমাকে কে যেন ডাকল।

তাড়াতাড়ি করে ওঁর কাছ থেকে চলে এলাম। আমার সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। বাবলুর রান্না আছে, দিদি আর ওঁর হবিষ্যির ব্যবস্থা করতে হবে। কত কাজ। এর মাঝে একবার মনে হল, কিছু করবে না তো? তৎক্ষণাৎ মনের মধ্যে কে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে বললে, না না। তা কখনও করবে না। ওঁর ওপর ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা। সেই প্রশান্তি নিয়ে আমি কাজের মধ্যে ডুবে

গেলাম। একবার মাত্র রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম উনি নসিরঙের গায়ের চাদরটা গায়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ভাবলাম কোনো কাজ আছে বোধ হয়। উনি আর আমার কাছে ফিরে আসেননি।

শেষ হল আমার জীবননাট্যের মূল অধ্যায়। রেখে এলাম আমার সংসারের হাঁড়িকুড়ি। আমার স্বামী, ভাশুর, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকিত দিন ও রাত্রিগুলি। সব হারিয়ে, সব খুইয়ে নিঃস্ব আমি। স্বামী নেই, পুত্র নেই, সমাজ-সংসারে কোনো পরিচয় নেই। সামনে শুধু নিঃসীম শূন্যতা, আর নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম। আমার চোখের সামনে চিরদিনের মতো রুদ্ধ হল আনন্দের দুয়ার।

ভাটপাড়ায় এসে মনে হত, না-না, উনি কোথাও যাননি, ঘাটশিলায় আছেন। আগে যেমন আমাকে ভাটপাড়ায় পাঠিয়ে দিতেন, তেমনি আমি এসেছি। বাতাসে ওঁর গায়ের গন্ধ পেতাম। সিগারেটের গন্ধে চমকে উঠতাম। মনে হত উনি এসেছেন। ওঁর চশমা-পরা উজ্জ্বল চোখ, হাসিভরা মুখ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠত। দুপুরবেলা কেউ কড়া নাড়লে ছুটে গেছি, মনে হয়েছে, ওই বুঝি পিওন কড়া নাড়ছে। ওঁর চিঠি কি এল? খাম খুলে দেখব উনি লিখেছেন, 'মীন্, অনেকদিন গেছ, কবে আসবে? একলা আমার আর ভালো লাগছে না।'

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। কত যুগ যুগান্তর পার হয়ে চলেছে, কিন্তু ভুলতে পারিনি আমার একান্ত আপন মানুষটিকে যে ক্ষমায় ভালোবাসায় তিরস্কারে কাছে টেনে নিয়েছিল, যার হাসির মধ্যে লুকিয়ে থাকত আমার আনন্দ, যার দুঃখে দুঃখ পেয়েছি, ব্যথিত হয়েছি। ভুলতে পারি না তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে মৌন বিদায়।

ঋতুচক্র ঘুরে চলেছে। শীত বিদায় নিল। এল বসন্ত তার দক্ষিণা বাতাস নিয়ে। কোকিলের অশান্ত কুহুতান, আম্রমুকুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। তেমনি পাখি ডাকে, তেমনি কাঁপে নিমের পাতা। পিওন আসে, আজও আমি আগ্রহভরে এগিয়ে যাই। ওঁর চিঠি কি এল? পিওন চলে যায়, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে সরীসৃপের মতো দীর্ঘ পথ আমার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

ব্যক্তি-পরিচয়

শ্বশুরমশায়:	মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের পিতা।
বড়ঠাকুর:	কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মামাশ্বশুর:	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের মামা।
উনি:	ডা. নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ছোটভাই।
জাহ্নবীদি:	জাহ্নবী চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের বোন।
গৌরীদি:	গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রী।
দিদি:	রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী। ডাক নাম—কল্যাণী।
গজেনবাবু:	গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সাহিত্যিক।
সুমথবাবু:	সুমথনাথ ঘোষ। সাহিত্যিক।
প্রতিমাদি:	প্রতিমা মিত্র। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সহধর্মিণী।
মতিলাল:	শচীনদাস মতিলাল। সংগীতশিল্পী।
দ্বিজেনবাবু:	দ্বিজেন মল্লিক। ঘাটশিলার 'ডিজন নার্সারি'র মালিক।
নীরদবাবু:	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'সুশান্ত সা'র লেখক। ব্যারিস্টার।
খগেন্দ্র মিত্র:	খগেন্দ্রনাথ মিত্র। লেখক।
	রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সুপ্রভাদি	সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপিকা।
চণ্ডীদাস	চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের শ্যালক। সাহিত্য গবেষক।
মা	কুন্দবালা দেবী। লেখিকার মা।
বাবা	ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। লেখিকার বাবা।
ছোটমামা	সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখিকার ছোটমামা।
কানুমামা	নিবঞ্জন চক্রবর্তী। বিভূতিভূষণের মামাশ্বশুর।
সুন্দরমামা	যোগজীবন চক্রবর্তী। বিভূতিভূষণের মামাশ্বশুর।
পিসিমা	মেনকা মুখোপাধ্যায়।
মেজদাদাবাবু	সুশীলকুমার রায়।
মুকুলবাবু:	মুকুল চক্রবর্তী। 'ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ'-এর লেখক।
অম্বুজদা:	অম্বুজকুমার মৌলিক। বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুর।
নমিতা:	নমিতা মৌলিক। অম্বুজকুমার মৌলিক-এর সহধর্মিণী।

প্রতিমা: চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

মায়াদি: মায়া মুখোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের শ্যালিকা। অধ্যাপিকা।

মায়া: মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখিকার বান্ধবী।

বাণী রায়: সাহিত্যিক।

গুটকে: অজিত রায়। বারাকপুর গ্রামবাসী।

উমা: বিভূতিভূষণের ভাগনি। কথাসাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

শচীন: শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ভাগনি-জামাই।

অহীন: অহীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজভাই।

শান্ত: প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ভাগনে।

ভানু: সবিতেন্দ্রনাথ রায়। 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশন সংস্থার অন্যতম কর্ণধার।

মণীশ: মণীশ চক্রবর্তী। 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশন সংস্থার অন্যতম কর্ণধার।

খুকু: প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাকপুর গ্রামবাসী।

বাবলু: তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের পুত্র।

মিত্রা: মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের পুত্রবধূ।

মুন্নি: মন্দিরা চক্রবর্তী। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব শ্যালিকা।

পিনাকী: ড. পিনাকী চক্রবর্তী। মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি।

অধীশ: অধীশ ধর। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু।

বাবু: তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।

আম্পা: তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র।

শমীন্দ্র: শমীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।

কাবেরী: শমীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

শুভেন্দ্র: শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র।

সুস্মিতা: শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।